বর্ষ-সূচী।

[১ম খণ্ড, আশ্বিন, ১৩১৭ হইতে, ১২শ খণ্ড, ভাদ্র, ১৩১৮ পর্য্যন্ত।]

অর্ঘ্য।

শরতের নিশা ওই ঊষার চরণতলে, মরি !
দিয়া গেল উপহার বাষ্পসিক্ত শেফালি-রাশির ;
ভক্তি-অশ্রুমাখা যেন হৃদি-পুষ্পগুচ্ছগুলি ঝরি'
দিল অর্ঘ্য অপরূপ—লোকে তা'রে ভাবিল "শিশির" !
ঊষা দিয়া গেল পুনঃ প্রভাতের আঁচলে ঢালিয়া,
কুসুমের মৃদুগন্ধ, বিহগের কলকণ্ঠ-ভাষ !—
খণ্ডে খণ্ডে শুভ্র মেঘ দু'টী ধারে উড়াইয়া দিয়া,
সুবর্ণ-কিরণে ভরি' দিয়া গেল নীলিম আকাশ !

কবি ভেবেছিল বুঝি লঘু মেঘ-কেশ সুবিন্যাসি,
প্রভাত-সীমন্তে ঊষা ঢেলে দিল সিঁদূরের রাগ !
না কবি—সীমন্তে নহে, প্রভাতের পদতলে আসি,
অর্ঘ্য দিল রবিকরে যত্নে আঁকা সঞ্জীবতা-দাগ !
ওই দেখ বিশ্ব-প্রাণ কর্ম্মস্রোতে উঠিয়াছে ভেসে,
"অর্ঘ্য" সাজাইয়া আজ আমরাও করি তবে দান !
নম্র ক্ষুদ্র হিয়াগুলি অজানার চরণ-উদ্দেশে,—
অমর হউক 'অর্ঘ্য' ! ধন্য হোক, পূর্ণ হোক প্রাণ !

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

ভারতবর্ষের ভৌগলিক।

সলেমান বণিক।

১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে আবে রেণো যে পুস্তক * প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রতীচ্য তাহা হইতেই প্রথমে প্রাচ্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, রেণোর পুস্তক একখানি অনুবাদমাত্র। রাজমন্ত্রী কলবার্টের পুস্তকাগারে প্রাপ্ত একখানি পাণ্ডুলিপির অনুবাদ করিয়া রেণো প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সলেমন নামক জনৈক বণিক-রচিত সল্‌সিল-তু-ত-তারিখ নামক গ্রন্থই ভারতবর্ষের প্রথম ভূগোলতত্ব বলিয়া পরিচিত। সলেমান্ একজন আরববাসী বণিক ছিলেন। তিনি পারস্য উপসাগরে বাণিজ্য করিতেন এবং ভারতবর্ষ ও চীনদেশ পরিভ্রমণ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৮৫১ সালে লিখিত হইয়াছিল। সেই ভূগোলতত্ব দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয় ভাগ সিরাথবাসী আবু জৈদুল হাসানের লিখিত। তিনি নিজে কথনও ভারতবর্ষে আসেন নাই, কিন্তু নানাবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ও বণিক-দিগের নিকট তত্বজিজ্ঞাসু হইয়া সল্‌সিল্‌-তু-ত-তারিখের দ্বিতীয় ভাগ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেকালের বিশ্বাস পৃথিবী মধ্যে চারিটি নৃপতি ছিলেন। তাঁহাদিগের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। আরব-নৃপতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার পরই চীন দেশের রাজা; বল্‌-হার নৃপতিগণ তথন ভারতবর্ষে ছিলেন, তাঁহারা তৃতীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বল্‌হার-রাজের বেতনভোগী সৈন্যসামন্ত, অসংখ্য হয়, হস্তী এবং প্রভূত অর্থ ছিল। ভারতবর্ষে তথন অনেক নৃপতি বাস করিতেন, কিন্তু সকলেই বল্‌হার রাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশে তাতারীয় দিরাম মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থে কান্যকুব্জের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজসভার রাজকবি, দার্শনিক প্রভৃতিগণের কথাও ইহাতে আছে।

---

*Anciennes Relations des Indes at de la chime de deux voyagers Mahomitous quiy allvent daus le ix Esinle de notnevere.

ইবন্ খুরদাদব।

আবুল কাশিম উবৈদুল্লা বিন্ খুরদাদব, ইবন খুরদাদব নামে সুপরিচিত। ইনি প্রথমে অগ্নির উপাসক ছিলেন, পরে মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খালিফাদিগের অধীনে তিনি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। "বডলিয়ন" পুস্তকাগারের নাম বোধ হয় অনেকেরই অজ্ঞাত নহে। সেই পৃথিবীবিখ্যাত পুস্তকাগারে ইবন্ খুরদাদব্-কৃত বিতাবুল্ মসালিক ওয়াল মমালিক নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বর্ত্তমান আছে। এম্ বারবিয়ার ডি মেনার্ড সাহেব সেই গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৯১২ অব্দে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়; সুতরাং তাঁহার পুস্তক আরও অধিক পুরাতন।

এই গ্রন্থেও বলহাররাজকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তৎকালে ভারতবর্ষে জাব্, তাফন, জুজুর (গুজরাট) ঘাম, রমী এবং কামরুণ এই কয়েকস্থানের রাজারাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

বলহাররাজের অঙ্গুরীয়কে লিখিত ছিল—"দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেই সে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ঘটে।" সেকালে সিন্ধুদেশ হইতে বেত্র ও বংশ আরবদেশে রপ্তানী হইত। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তৎকালে ভারতবর্ষে সপ্ত প্রকার জাতি বাস করিত। (১) সাংকুফরিয়া—ইহাদিগের মধ্য হইতে রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন; (২) ব্রহ্মা—ইহারা মদ্য স্পর্শ করিতেন না এবং সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখ হইতে বিরত থাকিতেন; (৩) কন্টারিয়া—ইহারা প্রত্যহ তিন পাত্রের অধিক মদ্য পান করিতেন না; (৪) সুদারিয়া—ইহারা নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য করিত। লহুদ—ইহাদিগের রমণীগণ বিলাসপ্রিয় এবং পুরুষগণ কৌশলী ও ক্রীড়াসক্ত। ভারতবর্ষে তৎকালে বিয়াল্লিশটি ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

অলমাসুদি।

বাগদাদের অধিবাসী হোসেনের পুত্র আবুল হাসান আবি ইতিহাসে অল মাসুদি নামে পরিচিত। তাঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষের নাম মাসুদ ছিল। মাসুদের প্রথম পুত্র হজরত মহম্মদের সহিত মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন। মাসুদের জীবনকালের অধিকাংশই দেশভ্রমণে ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি পশ্চিমে মরক্কো এবং স্পেন দেশ ও পূর্ব্বে চীনদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রবল অনুসন্ধিৎসা ছিল। আরবীয় সাহিত্যে তাই তাঁহার সমাদর অত্যধিক। তাঁহার পর্য্যটনকাহিনীর রত্নফল—"মারুজাল জহব" অর্থাৎ সুবর্ণ প্রান্তর। ইবন্‌খল্‌দুন্ সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে মাসুদীর সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির যেরূপ অবস্থা ছিল, তিনি তাহা অকপটে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মাসুদীর কাহিনী অতি পুরাতন এবং সর্ব্বদা প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত, প্রত্যেক জাতির জ্ঞান, প্রতিভা, দেশগত পার্থক্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই মাসুদী আলোচনা করিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে তাই তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে। মাসুদীর গ্রন্থের প্রথম ভাগ ডাক্তার স্পেঞ্জার কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছিল; ইহার দ্বিতীয় ভাগের অনুবাদক ফরাসী বারবিয়র দে মিনার এবং পাভেত দি কোতিলে।

মাসুদ বলেন যে, ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন কাল হইতেই জ্ঞান ও শিক্ষার জন্য বিখ্যাত। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের প্রথম নৃপতি ব্রহ্মা ৩৬৬ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহার সময়েই সিদ্ধান্ত এবং আর্য্যভট্ট বিরচিত হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে কোরেষের (বোধ হয় হর্ষ) আমলে রাজবংশের অবনতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই ভারতবর্ষে সিন্ধু, কনৌজ এবং কাশ্মীর রাজ্যের উৎপত্তি। তখন চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে, কেহই ভারতের সিংহাসনে বসিতে পারিতেন না এবং নৃপতি সকল সময়েই প্রজাদিগের সম্মুখে আসিতেন না।

আবু ইশাখ অল ইস্তাখরি।

শেখ আবু ইশাখ ইস্তাখর পার্শিপলিস (Pirsepolis) নগরে বাস করিতেন বলিয়া "ইস্তাখরি" নামে খ্যাত। কেহ কেহবা তাঁহাকে "অলফারসি" বলিয়া থাকেন। কারণ "ইস্তাখর" নগর ফারস প্রদেশের অন্তর্গত। ভারতবর্ষ হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত এবং পারস্য উপসাগর হইতে কশ্যপ হ্রদ পর্য্যন্ত তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না; তবে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, তিনি দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার "কিতাবুল্-অকালিক্" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইবন্ হকুল্ এবং ইস্তাখির সমসাময়িক ব্যক্তি। সিন্ধুনদের তীরে ইঁহাদিগের উভয়ের সাক্ষাৎ

হইয়াছিল। গোথার পুস্তকালয়ে ইস্তাখরির গ্রন্থ রক্ষিত ছিল। ডাক্তার ময়েনার উহা লিথোগ্রাফ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। হামবার্গ (Hamburg) নগরে ১৮৪৫ সালে উক্ত গ্রন্থের জর্ম্মাণ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার অংশবিশেষ ইতালীয় ভাষাতেও অনূদিত হইয়া ১৮৪২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে সিন্ধুদেশের কয়েকটী নগরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়,—মনস্থর, দেবল, নীরুর, কালউই, অনুরি, বলওই, মসয়াহি, লহরাজ, বানিয়া, মন্‌হানুরি, সাদুসান এবং অলরুক্ষ বা আলর।

হিন্দের নিম্নলিখিত নগরের নামও এই পুস্তকে পাওয়া যায়,—

মুলতানের সেই বিখ্যাত মন্দিরের বর্ণনা ইস্তাখুরির পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। মুলতানের অধিবাসিগণ সেকালের পাজামা পরিধান করিত এবং পারস্য ভাষায় কথা কহিত। সেখানে সিন্ধুভাষাও প্রচলিত ছিল।

ইবন্ হউকল।

লক্ষ্ণৌয়ের একটী বিখ্যাত পুস্তকালয়ে "আসকালুল বিলাদ" নামে আরব্য ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তক আছে। এই পুস্তকে নানা দেশের মানচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানচিত্রে প্রধান প্রধান নগরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই সকল নগরের বর্ণনাও ইবন হউকলের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। তাৎকালিক সমগ্র মুসলমান রাজ্যকে যে কুড়ি ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই,—

(১) আরব (২) পারস্য উপসাগর (৩) মগ্রীব (৪) মিসর (৫) সিরিয়া (৬) ভূমধ্য সাগর (৭) মেসোপোটেমিয়া (৮) ইরাক (৯) খুজিস্থান (১০) ফারস (১১) কিরমান (১২) মনস্থুরা এবং সিন্ধু ও ভারতবর্ষ (১৩) আজর বৈজান (১৪) জীবাল (১৫) দৈলম্ (১৬) খজর সমুদ্র অথবা কশ্যপ হ্রদ (১৭) ফারস ও খোরাসান এবং (২০) মাউয়ারউন্‌নহর।

ইবন হউকলের প্রকৃত নাম মহম্মদ আবুল কাশিম। তিনি বাগদাদে বাস করিতেন। তাঁহার শৈশব সময়ে খালিফাদিগের অবনতি ঘটিয়াছিল এবং তুর্কগণ কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব আবুল কাশিম তখন দেশভ্রমণ ও বাণিজ্য করিতে বাসনা করিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আফ্রিকাতেও গিয়াছিলেন।

তাঁহার গ্রন্থ খ্রীঃ পূর্ব্ব ৯৭৩ অব্দে রচিত হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালের ২২ সংখ্যায় আবুল কাশিমের গ্রন্থের অংশবিশেষের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কর্ণেল আওয়ার্সন ইহার অনুবাদক।

কাশিমের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, সমুদ্রতীর হইতে তিব্বত প্রদেশ চারি মাসের পথ ছিল এবং ফারস হইতে কান্যকুব্জ আসিতে তিন মাস সময় লাগিত।

স্মারুল বুলদান।

সার ডব্লিউ কুইসিয়ে "প্রাচ্যে ভূগোল" নাম দিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পারস্য ভাষায় লিখিত। "সারুল বুলদান" বা দেশের চিত্র একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, উহা ইস্তাখরি এবং ইবন হউকলের লিখিত পুস্তকের সারসংকলনমাত্র।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

প্রতিভার বিকাশ।

ইংরাজীতে একটী কথা আছে যে 'A poet is born, not made' অর্থাৎ কবি প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন এবং এইরূপ ক্ষণজন্মা ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ প্রকৃত কবির গৌরবান্বিত পদবীতে আরূঢ় হইতে পারেন না। কিন্তু 'not made' বলিতে বোধ হয় ইহাও বুঝায় যে শিক্ষা কিম্বা অন্য কোন অভাবনীয় অনুকূল অবস্থাও মানুষকে কবি করিয়া তুলিতে পারে না। এইখানে আমার একটী সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়িতেছে, তাহা এই—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভন্তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥

কবিত্বশক্তি যে বাস্তবিকই সুদুর্লভ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শক্তির বিকাশ কি অনুকূলঅবস্থানিরপেক্ষ? বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে দেশকালপাত্র এবং অন্যান্য নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা কবি-প্রতিভা অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক অবস্থা এবং প্রতিভা-বিকাশের মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ লক্ষিত হয়।

কোন কোন সময়ে প্রতিভা এরূপ অকস্মাৎ এবং অতর্কিতভাবে আত্ম-প্রকাশ করে যে, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ বলিয়া বোধ হয়। যেমন কখনও কখনও জলমিশ্রিত শর্করা কিম্বা অন্য কোন দ্রবমান পদার্থ পর্য্যায়ক্রমে তাপ ও শৈত্যসংযোগ দ্বারাও দানায় (crystal) পরিণত হয় না, সেইরূপ কোন কোন মানব প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার অস্তিত্বের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যেরূপ উক্ত জলমিশ্রিত পদার্থ কোনরূপে সামান্যমাত্র নাড়া পাইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ দানায় পরিণত হইতে আরম্ভ হয়, সেইরূপ বক্ষ্যমান গুপ্ত প্রতিভাও কোন সাময়িক ঘটনাদ্বারা নাড়া পাইয়া হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এরূপ প্রতিভা-বিকাশের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

মহাকবি কালিদাস-সম্বন্ধে "অস্তিকশ্চিদ্ বাগ্ বিশেষো"-মূলক যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু যুবক সেক্ষ্পীয়র স্বীয় উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য জন্মভূমি Stratford-on-Avon, স্ত্রীপুত্র এবং পশমের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের আশায় লণ্ডনে আসিয়া অভিনেতৃরূপে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহার রুদ্ধ প্রতিভা নির্গমপথ পাইয়া সুধাধারাবর্ষণে জগৎ প্লাবিত করিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকবি মোলিয়ের (Moliere) যৌবনে সেক্ষ্পীয়রের ন্যায়ই কিম্বা তদপেক্ষা উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তাঁহার পিতামহ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে ভালবাসিতেন এবং সঙ্গে মোলিয়েরকেও লইয়া যাইতেন। ইহাতে মোলিয়েরের পিতা একদিন ক্রোধান্বিত হইয়া ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আমার ছেলে অভিনেতা হইবে না কি?' তদুত্তরে বৃদ্ধ বলেন—ভগবান্ করুন, মোলিয়ের যেন মনরোজের ন্যায় অভিনেতা হইতে পারে। মনরোজ (Monrose) তখন ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। পিতামহের এই উক্তি মোলিয়েরের মর্ম্মে আঘাত করিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার জীবনের পথ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সামান্য ঘটনার ফলে সেই দুর্ব্বৃত্ত যুবক ফ্রান্সের সর্ব্বপ্রধান হাস্যরসিক কবি হইলেন। রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সেক্ষপীয়র পশমের এবং মোলিয়ার কার্পেটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। আর একজন ফরাসী কবি কর্ণেয়ী (Corneille) যৌবনে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া নিরুদ্বেগে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন;

কবিত্বের কোন ধার তখন ধারিতেন না। অকস্মাৎ একদিন প্রেম নামক বিশেষ ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেইদিন হইতে আইনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘুচিল এবং তৎপরিবর্ত্তে তিনি প্রণয়িনীর উদ্দেশে যে কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন, তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্বের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। ইংরাজ কবি কাউলী (Cowley) ঘটনাক্রমে বাণীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি একদিন তাঁহার মাতার ঘরে স্পেন্সারের Fairy Queen একখানি দেখিতে পান এবং এই কাব্যগ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে এরূপ আত্মহারা হইয়া যান, যে সেই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয় হইতে কবিত্বের উৎস প্রবাহিত হইতে থাকে। তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রমকালে তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইংরাজি সাহিত্যাভিজ্ঞমাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, ঘটনাচক্রের নাড়া না পাইলে বায়রণের প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিত না। এডিনবরা রিভিউএর আক্রমণফলে তিনি যে British Bards and Scotch Reviewers নামক ব্যঙ্গকাব্য প্রণয়ন করেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভার প্রথম নিদর্শন। আবার নিজের চরিত্রহীনতার জন্য সমাজকর্ত্তৃক ঘৃণিত হইয়া যখন স্বদেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন আবার তাঁহার সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হইয়া 'Childe Harold' (প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ) সৃষ্টি করিল। এই কাব্য স্বদেশে এবং বিদেশে কিরূপ সার্ব্বজনীন সমাদর লাভ করে, তাহা বায়রণের 'I awoke one morning and found myself famous'—এই উক্তিতেই সম্যক্ উপলব্ধি হয়। অবজ্ঞাত, অবমানিত বায়রণ আবার সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেশের যত বড় লোক তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সম্মান ও সৌভাগ্য অধিকদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। যে অসংযত চরিত্রের জন্য তিনি দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আবার আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে চারি বৎসর পরে একদিন স্বদেশবাসিগণের নিন্দা ও কুৎসার বোঝা স্কন্ধে লইয়া জন্মের মত প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। 'Childe Harold' এর শেষ দুই সর্গ এবং Don Juan কবির এই আত্মনির্ব্বাসনের ফল।

শুধু কাব্যজগতেই যে আকস্মিক ঘটনাবিশেষ প্রতিভাবিকাশের সাহায্য করে তাহা নহে; সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে এবং ইতিহাসে, জ্যোতিষে ও বিজ্ঞানেও এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয়। ইংরাজ ঔপন্যাসিক Fielding ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অর্থাভাব দূর করিবার মানসে পনর বৎসর ধরিয়া নানা নাটকাদি প্রণয়ন করিয়া যখন তিনি সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে অসমর্থ হন, তখন সমসাময়িক ঔপন্যাসিক Richardsonএর 'Pamela' নামক উপন্যাসের parody বা 'অনুকৃতি' লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রতিভার সহিত পরিচয় পাইলেন। এই প্যারডি "Joseph Andrews"ই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রথম সোপান। আমাদের সাহিত্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত দুই একটী পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের একটীমাত্র কথায় প্রণোদিত হইয়া রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাবিকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি অতুলনীয়, কিন্তু সেগুলির উৎপত্তির বিবরণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়াছেন যে, জমীদারি কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে নৌকাযোগে অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে যাইতে হইত। একদিন তিনি এইরূপ কোন গ্রামের ঘাটে নৌকা সংলগ্ন করিয়াছেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন যে কয়েকজনে জোর করিয়া একটী বয়স্থা বালিকাকে বোধ হয় শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবার জন্য নৌকায় তুলিতেছে। এই ঘটনাই তাঁহার প্রথম গল্পের উপাদানস্বরূপ হইল। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও যশস্বী লেখক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষসম্বন্ধেও এবম্বিধ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গিবনের (Gibbon) মনে রোমের ইতিহাস লিখিবার কল্পনা যেরূপে প্রথমে উদিত হয়, তাহা যেমন আকস্মিক, তেমনি আশ্চর্য্য। রোমের প্রাচীন গৌরব Capitolএর ভগ্ন স্তূপের উপর তিনি একদিন সন্ধ্যাকালে বসিয়াছিলেন; জুপিটারের মন্দিরে নগ্নপদ সন্ন্যাসিগণ সন্ধ্যাবন্দনা গায়িতেছিল; সেই সময় ঐ নগরীর অভ্যুদয় ও পতনের ইতিহাস লিখিবার বাসনা তাঁহার মনে হয়।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম এবং ভল্টার (Volta) প্রবহমান বিদ্যুৎ-উৎপাদন-প্রণালী কিরূপ তুচ্ছ ঘটনা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। একটী সামান্য ঘটনায় Flamsteed দেশবিশ্রুত

জ্যোতির্ব্বিদ হইতে পারিয়াছিলেন। নিয়ত রোগভোগের জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া শৈশবেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সময় Sacrobosco প্রণীত 'Sphæra' নামক জ্যোতিষবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ ঘটনাক্রমে তাঁহার হস্তে পতিত হয় এবং তিনি সেই অবধি জ্যোতিষিক তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

এইরূপ আরও বহু উদাহরণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও, অনেক মনীষী জাতমাত্রেই প্রতিভার সন্ধান পান নাই। পরে সামান্যমাত্র ঘটনায় তাঁহাদের জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে।

অতএব আমরা প্রথমে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বোধ হয় এখন অনেকটা বিশদ হইয়াছে। কবি যে কখনও কখনও 'made' হন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রতিভা থাকা চাই; কারণ প্রতিভা শুধু কাব্যের নহে, যাবতীয় জ্ঞানের মূল প্রস্রবণ। কাহারও কাহারও হৃদয়ে প্রতিভার প্রেরণা স্বতঃ অনুভূত হয় না; বোধ হয় সংসার ইহার উপর একটা আবরণ চাপাইয়া দিয়া ইহার স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়; কিন্তু বিধাতা অকস্মাৎ এক সময়ে সামান্যমাত্র একটী আঘাতে এই আবরণ সরাইয়া দেন এবং তখনই সেই রুদ্ধ প্রতিভার উজ্জ্বল জ্যোতিতে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ।

ভারতবর্ষের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিয়া একটা দুর্নাম আছে। ইতিহাস যদি কেবল তারিখপরম্পরাগত ঘটনাবলীর বর্ণন মাত্র না হয়, যদি মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করা ইতিহাসের প্রধানতম লক্ষ্য হয়, তবে ঐ দুর্নাম নিতান্তই ভিত্তিহীন—কাল্পনিক কথামাত্র হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ যেমন অন্যবিধ রত্নাবলীর অক্ষয় খনি, তেমনি ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলিরও অসীম ভাণ্ডার। ভারতবর্ষের উপর দিয়া কত অত্যাচার-অবিচারের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার প্রাচীন ইতিবৃত্তের উপকরণসমূহ একেবারে লোপ পায়

নাই। প্রাচীন ভারতেতিহাসের উপকরণ এখনও এতাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে যে, তৎসাহায্যে আধুনিক নীতি-সম্মত একটি সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন করা আদৌ দুরূহ নহে। ইহার উপকরণের তুলনায় ব্যাবিলোনিয়া, মিশর, গ্রীস বা রোমের ঐতিহাসিক উপকরণের সংখ্যা ও পরিমাণ অতীব নগণ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে। ঐ সকল রাজ্যের তুলনায় ভারতেতিহাস সংকলন যথেষ্ট সহজসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে। *

প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কথা, মুসলমান ভারতসম্বন্ধেও সেই কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। এই সময় হিন্দু ও মুসলমান—উভয় ধর্ম্মাবলম্বী অনেক ভারত-বাসীই স্ব স্ব প্রত্যক্ষীভূত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল বিবরণের সহিত ভারতপর্য্যটক ইয়ুরোপীয়দিগের বর্ণনাগুলি মিলাইয়া পাঠ করিলে, এই যুগের একটি সুন্দর বিশ্বাস্য চিত্র চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয়, এদেশবাসীরা যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার অধি-কাংশই আরবী ও পারসী ভাষার কঠোর আবরণে লুক্কায়িত। আজকাল আমরা ঐ দুই ভাষার চর্চ্চা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি। যে দুই চারি জন মুসলমান উহাদের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা আবার ইতিহাসের কঠোর আলোচনায় নিমগ্ন হইতে চাহেন না। কাজেই ঐ সকল গ্রন্থের পরিচয় পাইবার জন্য আমাদিগকে কর্ম্মঠ ইংরেজ অনুবাদকদিগের দ্বারস্থ হইতে হয়। কিন্তু আমাদের মধ্য হইতে কয়েক-জন যোগ্য ব্যক্তি যদি উহাদের উদ্ধারের ভার গ্রহণ করেন, † তবে অচিরেই বঙ্গসাহিত্যে এক মহা যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারে। সে যুগ ইতিহাস আলোচনার যুগ—আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া লক্ষ্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইবার যুগ। সে যুগ কি শীঘ্র আসিবে না?

---

* অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিন্‌সেণ্ট স্মিথ-প্রণীত প্রাচীন ভারতেতিহাসের অনুক্রমণিকাটি মনো-যোগের সহিত পাঠ করিলে এ বিষয়ে অনেক সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন। এখানে সে সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজনবোধে তৎসাধনে বিরত হইলাম।

† শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও শ্রদ্ধেয় রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়দ্বয় কেবল এক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন। ৺গৌরসুন্দর মৈত্র মহাশয়ও সায়র-উল-মুতাখরিণ অনুবাদ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে উপকৃত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে পর্য্যাপ্তসংখ্যক সাধক কোথায়?

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ মুসলমান ভারতের একখানি সুন্দর আলেখ্য। আবুল ফজলের আইন-ঈ-আকবরী পাঠে যেমন সম্রাট আকবরের সময়ের একখানি নিখুঁত চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠেও তদ্রূপ ঔরঙ্গজেবের আমলের একটি সুন্দর প্রতিচিত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি শেষোক্ত সম্রাটের রাজত্বকালেই লিখিত হয়। সুতরাং ইহার প্রায় সকল বিবরণই যে সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অনেক স্থলে যে অতিরিক্ত ঘটনা বা অলৌকিক ব্যাপারের বর্ণনা লক্ষ্যীভূত হয়, সে সকল দৃষ্টিমাত্রই ধরা পড়ে। এ সকল অতিরঞ্জনের জন্য আমরা গ্রন্থকারকে নিন্দা করিতে পারি না, ইহা সে সময়ের দোষ। তখনকার প্রায় সকল লেখকই এই দোষে দুষ্ট হইতেন।

খুলাসৎ-প্রণেতা গ্রন্থখানিকে নির্ভুল করিবার জন্য অন্যূন সাতাশখানি ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ সকল ইতিহাসের অনেকগুলিই আজ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে (ক) মৌলানা উলস্মুরী-প্রণীত মহমুদ সবুক্তীগীন, (খ) সুলতান শাহবুদ্দীন ঘোরী, (গ) সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী, (ঘ) ইজ্জুদ্দীন খালি উখালী-প্রণীত তারিখ-ঈ-ফিরোজসাহী, (ঙ) হোসেন খাঁর আফগান ইতিহাস, (চ) আনাবের্গ কজ্জাওনী প্রণীত আকবরের ইতিহাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খুলাসৎ অধুনা দুষ্প্রাপ্য হইলেও 'অরাইস-ঈ মহফীল' নামে ইহার একখানি উর্দ্দু অনুবাদ আছে। সেখানি অনেকেরই নিকট পরিজ্ঞাত। এই খুলাসৎ হইতে সায়র উল-মুতাখরিন-কার বহু তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। আজ সায়রের নাম সকলের মুখে মুখে, কিন্তু খুলাসতের কথা অনেকেরই নিকট অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে!

গ্রন্থখানি বিপুলকায় ও বহুখণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রথম কয়খণ্ড অতীব সুন্দর এবং গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলিয়াই পরিগণিত। ঔরঙ্গজেবের আমলে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির ভৌগলিক অবস্থা কিরূপ ছিল, কোন্ প্রদেশে তখন কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হইত, ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ এই অংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে দিল্লীর পূর্ব্বতন সম্রাটগণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু প্রথম চারিজন মোগল সম্রাটের যে বৃত্তান্ত ইহাতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা গ্রন্থের আয়তনের তুলনায় অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে

হইবে। শাহ্ জাহানের বৃত্তান্ত ইহাতে নামমাত্র দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন যে, ওয়ারিস্ খাঁ ইতিপূর্ব্বে এই নরপতির সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন বলিয়া তিনি নিষ্প্রয়োজনবোধে তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু লেখেন নাই। এই নরপতির রাজ্যাবসানকালে রাজপুত্রদের মধ্যে 'তক্‌ৎ তাউস্' বা ময়ূরাসন লইয়া যে বিগ্রহ উপস্থিত হয়, গ্রন্থকার তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার উল্লেখযোগ্য যাবতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে, গ্রন্থকার আর তৎসম্বন্ধে কোন কথা বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই।

গ্রন্থকার ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজন্যবৃন্দের কোন বিবরণ পৃথকভাবে সংকলন করেন নাই। যথন যে রাজ্য যে মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, কেবল তখনই প্রসঙ্গতঃ সেই রাজ্যের রাজাদিগের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। এজন্যই মুলতানের রাজাদিগের কথা, বাবরের রাজত্বর্ণনকালে মালব, গুজরাট, বঙ্গ, কাশ্মীর, সিন্ধু, ও দাক্ষিণাত্যের আমেদাবাদ, খান্দেশ প্রভৃতির কথা আকবরের সময়ে দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থখানি যে যে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা দিতেছি :—

(১) ভূমিকা, (২) হিন্দুস্থান—ইহার অধিবাসী ও শস্যাদি, (৩) সুবাসমূহের বিস্তারিত ভৌগলিক বিবরণ, (৪) হিন্দু রাজন্যবৃন্দ, (৫) গজনীর রাজন্যবৃন্দ, (৬) দিল্লীর মুসলমান রাজগণ, (৭) বাবরের রাজত্ব, (৮) হুমায়ুনের রাজত্ব, (৯) আকবরের রাজত্ব, (১০) জাহাঙ্গীরের রাজত্ব, (১) শাহ জাহানের রাজত্ব, (১২) ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব।

তৃতীয় (৩) খণ্ডটি আবার নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলিতে বিভক্ত ;—(১) শাহ জাহানাবাদ বা দিল্লী প্রদেশ, (২) আকবরাবাদ বা আগরা, (৩) এলাহাবাদ, (৪) অযোধ্যা, (৫) বিহার, (৬) বাঙ্গলা, (৭) উড়িষ্যা, (৮) ঔরঙ্গাবাদ, (৯) বেরার, (১০) খান্দেশ, (১১) মালব, (১২) আজমীড়, (১৩) গুজরাট বা আহম্মদাবাদ, (১৪) থাথা, (১৫) মুলতান, (১৬) লাহোর, (১৭) কাশ্মীর, (১৮) কাবুল।

এই প্রদেশ বা সুবাগুলির বিবরণমধ্যে প্রধান সহর, তীর্থক্ষেত্র, মনোরম স্থানাদি ও সাধুব্যক্তিদিগের বৃত্তান্ত সর্ব্বপ্রথম বর্ণিত হইয়াছে ; তৎপরে প্রধান শস্য ও পণ্যাদি এবং নদনদী প্রভৃতির কথা বলিয়া প্রদেশগুলির সীমা নির্দ্দেশ

করা হইয়াছে। অতঃপর প্রদেশগুলি কতগুলি জিলা বা সরকার ও মহল বা মহকুমায় বিভক্ত এবং তাহাদের রাজস্বের পরিমাণ কত, তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল বিবরণ সংগ্রহের জন্য খুলাসৎ-প্রণেতাকে বহুলপরিমাণে আইন-ঈ-আকবরীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেই সব বর্ণনার মধ্যে স্বীয় মৌলিকতার পরিচয় দিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তবে পঞ্জাবের সহর গুলির বিবরণে তিনি যেরূপ মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ আর কোন-টাতেই পারেন নাই এবং বঙ্গ-উড়িষ্যার ন্যায় দূরতর প্রদেশের বিবরণে তাঁহার কোন নূতন কথা নাই বলিলেও চলে। সে সব প্রদেশের বিবরণ বহু পরিমাণে আইন-ঈ-আকবরীর অনুকৃতিমাত্র।

ঔরঙ্গজেব নানাবিধ কূট কৌশলের আশ্রয় লইয়া যে সকল রাজ্য জয় করিয়া-ছিলেন, সেই সকলের বিবরণ খুলাসতে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, খুলাসৎ যে সময় লেখা হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত তত্তৎ প্রদেশের সঠিক বিবরণ সংগৃহিত হয় নাই, অথবা তাহা হইয়া থাকিলেও গ্রন্থকার তাহা কোন ক্রমেই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী কালের কয়েকখানি গ্রন্থে সেই সব নববিজিত রাজ্যের বিবরণ দৃষ্ট হয়।

আকবরের সময় ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বের সীমা যতটুকু ছিল, ঔরঙ্গজেবের আমলে তাহা অনেকাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য উভয় আমলের সুবা-সমূহের বিস্তৃতির তারতম্য লক্ষিত হয়। তার পর অধুনা যেমন বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য এক প্রদেশের কোন অংশ অপর প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হয়, অথবা এক জিলার মহকুমা অন্য জিলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, মোগল রাজত্বেও ঠিক তদ্রূপ হইত। এই সকল পরিবর্ত্তনের অনেকগুলির বিবরণ খুলাসতে দৃষ্ট হয়।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বহু পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থখানির তৃতীয় খণ্ডের ইংরেজী ভাষায় একটি সুন্দর অনু-বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে এই অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং নব তত্ত্বের আধার। যদুবাবু ইহার অনুবাদ করিয়া ঐতিহাসিকদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তিনি ইহার মধ্য হইতে নানা তত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থ-প্রারম্ভে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের একখানি আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের

হিসাবে অমূল্য বলিলেও চলে। তিনি আইন-ঈ-আকবরীর সহিত তুলনা করিয়া উভয় আমলের রাজস্বাদির তারতম্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থখানির, বিশেষতঃ ইহার তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই দেখিয়া অক্ষম হইলেও আমরা এই দুরূহ কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য, যদুবাবুর অনুবাদই আমাদের অবলম্বন।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির প্রণেতা কে তাহা ঠিক করিয়া বলা দুরূহ। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইলিয়ট্ সাহেব ইহার যতগুলি 'কাপি' দেখিয়াছেন, তাহাদের অনেক-গুলিতেই গ্রন্থকারের নাম পান নাই। ম-আসিরুল উমরা তদীয় গ্রন্থে খুলাসৎ-প্রণেতাকে হিন্দু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইলিয়ট্ সাহেব কিন্তু তাঁহার হিন্দুত্বের প্রতি বিশেষ সন্দিহান। খুলাসতে এমন অনেক স্থল আছে, সেগুলি গোঁড়া মুসলমান লেখকের পক্ষেই লেখা সম্ভব,—হিন্দুর পক্ষে নহে; তার পর মুসলমান সাধু ফকীর ও তাঁহাদের সমাধিমন্দির-সম্বন্ধে অনেক গল্প ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া গ্রন্থকারকে মুসলমান বলিয়া সন্দেহ হয়; কিন্তু তাহা সন্দেহই মাত্র, তাহার পরিপোষক কোন প্রমাণ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা কোন ধর্ম্মাবলম্বী ইলিয়ট্ তাহা ঠিক করিতে না পারিলেও, তাঁহাকে পাতিয়ালার অধিবাসী সুভান রায় ক্ষত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির পারসী পুস্তকাবলীর তালিকায় তাঁহাকে 'সুজন রায়' বলা হইয়াছে। সোসাইটির ১৫৬ ডি সংখ্যা-যুক্ত পাণ্ডুলিপিতে 'সজান রায় নহদরী' নাম দৃষ্ট হয়। যদুবাবু বলেন, লিপিকরের অসাবধানতাতেই ইহার নামের এরূপ বর্ণা-শুদ্ধি ঘটিয়াছে। যদুবাবুর লিখন-ভঙ্গীতে স্পষ্ট মনে হয় যে তিনি গ্রন্থকারকে 'সুজন রায়' বলিয়াই ঠিক করিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রন্থকারের নিবাস পাতি-য়ালায় নহে, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার অন্তর্গত বতালা নামক স্থানে। খুলা-সতে পঞ্জাবের বিবরণ বতালার সৌষ্ঠববৃদ্ধিকারী এক সুজন সিংহ কানোনগোর নাম পাওয়া যায়। সেই সুজনসিংহ ও খুলাসৎ-প্রণেতা সুজনসিংহ এক ব্যক্তি কি না, তাহা যদুবাবু ঠিক করিতে পারেন নাই।

গ্রন্থকারের নাম যাহাই হউক, হিন্দী, পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, তাহা সোসাইটির গ্রন্থ হইতে জানা যায়। তিনি

তদীয় যুগের একজন প্রধান সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচনা সে সময় সকলের আদরণীয় ও আদর্শস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ের কথা যাহাই হউক, এখনকার পাঠকেরা কিন্তু তাঁহার রচনাভঙ্গীতে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন না। তাঁহারা তাহাতে অলঙ্কারের ছটা দেখিয়া বড়ই বিরক্তি বোধ করেন। সে কালে রচনা-মধ্যে অলঙ্কারের আতিশয্য না থাকিলে রচনা মাধুর্য্যময়ী বলিয়া বিবেচিত হইত না। সুখের বিষয়, আজ সে কাল চলিয়া গিয়াছে।

'ম্যাকেনজিক্ কলেক্শন' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় খুলাসৎ প্রণেতাকে 'সিংহাসন বত্তীশী', 'পদ্মাবতী', ও 'রাজাবলি'র প্রণেতা বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। ইলিয়ট্ সাহেব বলেন, তিনি আর কুত্রাপি ইহার পুনরুল্লেখ দেখেন নাই। সুতরাং উক্ত পুস্তকের কথা কতদূর সত্য, তাহা আজ ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

পুস্তকখানি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ৪০শ বর্ষে অর্থাৎ ১১০৭ হিজরী বা ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। ইহার রচনা সম্পূর্ণ হইতে দুই বর্ষ সময় লাগিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত।

পুঁটুমণির আদর।

১

কে গো শিরিষের ফুল? কে গো শিশিরের দুল?
কাহার কোমল প্রাণ? দয়ার শরীর?
পরদুঃখে ঝরে কা'র দু'নয়নে নীর?
মাছ-কোটা দেখে মেয়ে কেঁদেই অস্থির!
মোর পুঁটুমণি, মোর পুটুমণি।

২

কে গো প্রভাতের রাণী? কে গো প্রভাতের রাণী?
গোলাপী উষার মত কার মধু মুখ,
প্রভাতে হেরিলে পরে ঘুচে যায় দুঃখ?

(আর) রাঙা রবি উঁকি মারে—বড়ই কৌতুক!
মোর পুঁটুমণি, মোর পুঁটুমণি।

৩

কে গো বসন্তের রাণী? কে গো বসন্তের রাণী?
ললিত লবঙ্গলতা কা'র বাহু দু'টী?
বদন-চম্পকে শত ফুল আছে ফুটি!
(আর) অশোক-অধর কা'র হেসে কুটি কুটি
মোর পুঁটুমণি, মোর পুঁটুমণি।

৪

কে গো ঝরণার জল? কে গো ঝরণার জল?
কলকণ্ঠে ঝরে কা'র সঙ্গীত তরল?
কোকিলের কুহুস্বরে ভুবন পাগল!
কান যায় জুড়াইয়া, পরাণ শীতল!
মোর পুঁটুমণি, মোর পুঁটুমণি।

৫

কে গো মূর্ত্তিমতী বীণা? কে গো মূর্ত্তিমতী বীণা?
ঝঙ্কারে বাজিয়ে উঠে সুর কা'র নানা?
(শুনি) ফুল হাসে, পাখী নাচে, নাহি মানে মানা;—
(আহা) আপনার ভাবে কন্যা আপনি মগনা!
মোর পুঁটুমনি, মোর পুঁটুমণি।

৬

কা'র নাহিরে উপমা? কা'র নাহিরে উপমা?
অপরাজিতার মত নয়ন-নীলিমা!
বরণে অতসী-আভা, বদনে চাঁদিমা!
(আহা) রাজলক্ষ্মীমার কিবা মহিমা-গরিমা!
মোর পুঁটুমনি, মোর পুঁটুমণি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অভিজ্ঞান।

মৃত্যু ত মরণ নয়—জীবন-বিস্তৃতি,
জীবনের পরপারে আত্মার সংহতি;
"প্রেমই ঈশ্বর" জ্ঞান হইয়াছে যাঁর
সর্ব্বজীবে সমভাব আত্মার প্রসার,
আমিত্বের নাশ যাঁর, আমিত্ব-বিস্তার,
অজর অমর আত্মা অভিজ্ঞান তাঁর,
তিনিই বোঝেন "মৃত্যু" সৃজন-শকতি,
মৃত্যু ত মরণ নয়—জীবন-বিস্তৃতি।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র।

সন্ধ্যা-তারা।

(কীট্‌সের অনুকরণে।)

সাধ যায় সন্ধ্যা-তারা! তোরি মত ওরে
রহি স্থির অচঞ্চল—রজনী-শিয়রে;
একাকী জাগিয়া রহি তন্দ্রাহীন চোখে
যোগী যথা রহে মগ্ন হৃদয়-আলোকে;
প্রাণপূর্ণ এ ধরার সকল কালিমা
মুছে দিবে সাগরের চঞ্চল নীলিমা,
ঘনাইবে অন্ধকার দিগ্বিদিক ছেয়ে
একদৃষ্টে নির্নিমেষে আমি রব চেয়ে;—
না-না র'ব আরো স্থির, আবো অচঞ্চল
প্রিয়ার বক্ষের পরে রাখি তপ্ত ভাল
নিশিদিন চিরসুখে আবেশবিহ্বল—
মৃদুমন্দ আন্দোলিবে প্রিয়াবক্ষতল;
নবানন্দ দিবে প্রতি নিশ্বাস পবনে
চিরপ্রাণ পা'ব কিম্বা মোহিব মরণে।

বংশধর।

১

এক দিন অপরাহ্নে রায় মহাশয় তাঁহার প্রবাসী ছোট ছেলে সুশীলের নিকট হইতে এই পত্রখানি পাইলেন :—

শ্রীচরণেষু

বাবা, এখানে আমি ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছি। কেবল যে আমি, তাহা নহে—ইহাতে আপনিও নিগৃহীত হইবেন। আমি নিম্নে সমস্ত বিষয় লিখিয়া আপনাকে জানাইতেছি। আপনার সম্মুখে দাঁড়াইবার সাহসমাত্রও আর আমার নাই। বোধ হয়, জীবনে আর আপনার শ্রীচরণ-দর্শন এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঘটিবে না।

বাবা, আপনি চিরজীবন যাহার ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিতাবস্থায় দিনপাত করেন, আপনার জীবিতাবস্থায় আপনার বংশধর এই হতভাগ্যের দ্বারাই অবশেষে আপনার সেই নির্ম্মলবংশে কলঙ্ক কালিমা ঢালিত হইল। সঙ্গদোষে আজকাল আমি 'জুয়াড়ে' হইয়া উঠিয়াছিলাম। গত দুই মাস হইতে প্রতি শনিবারে গড়ের মাঠে যাইয়া ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলিতাম। এতদিন হার-জিতে একরূপ কাটিয়া গিয়াছে। এখন আমি নিঃস্ব ও ঋণী। আপাদমস্তক ঋণজালে জড়িত। জীবনে তত টাকা একত্রে দেখি নাই। ভবিষ্যতে যে দেখিব, সে আশাও দুরাশা মাত্র।

বাবা, আপনাকে আমার ঋণের পরিমাণ জানাইবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু গোপন করিবার আর উপায় নাই। কারণ আপনার ন্যায় পিতার এই অধম পুত্র জানিয়াই লোকে আমাকে ধার দিয়াছে। আমার ঋণ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। আগামী পরশ্ব টাকা দিবার দিন। উঃ কি হতভাগ্য বংশকলঙ্ককারী সন্তান আমি!

প্রথমে আত্মহত্যায় এ অভিশপ্ত জীবনের শেষ করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম। পরক্ষণে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম। আমার আত্মহত্যায় কাহারও কোনরূপ ইষ্ট সাধিত হইবে না, অধিকন্তু নিষ্কলঙ্ক রায়-বংশে আর একটি দুরপনেয় কলঙ্ক-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিবে।

আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে, সীমান্ত-প্রদেশবাসী মোল্লারা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। এখান হইতে টিরাভিমুখে শীঘ্রই একদল সৈন্য প্রেরণ করা হইবে। আমি সেই দলের ডাক্তারের পদপ্রার্থী হইয়া দরখাস্ত করিয়াছিলাম। কলেজের বড় সাহেব নিজে সঙ্গে করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। তিন দিনের মধ্যেই আমাদের রওনা হইতে হইবে। বাবা, দূরে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সুযোগ কতই না সহজে পাইব? তখন এই নিরাশ, মর্ম্মপীড়িত সন্তানের অনুতাপক্লিষ্ট প্রাণের বেদনা বুঝিয়া বোধ হয় তাহাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারিবেন। বাবা, যে সন্তান হইতে আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বংশগৌরব ক্ষুণ্ণ হইল, সে আজ আপনার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল। ইতি—

প্রণত সুশীল।

হরিপ্রসন্ন রায় নাগরপুরের জমিদার। দশবৎসর হইল, তাঁহার গৃহ শূন্য হইয়াছে। তাহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইবে। টাঙ্গাইল মহকুমায়, এমন কি ময়মনসিংহ জেলার সর্ব্বত্রই হরিপ্রসন্নবাবু 'রায় মহাশয়' নামে পরিচিত। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, তেজস্বিতা ও সত্যবাদিতাগুণে অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী। জেলার রাজকর্ম্মচারীগণও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহারই ফলে তিনি লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, জেলা স্কুল-সমিতির সভ্য এবং নিরপেক্ষতা-গুণে নিজ গ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তা। রায় মহাশয়ের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ সুবোধ, কনিষ্ঠ সুশীল। সুবোধ ময়মনসিংহ কোর্টে ওকালতি করেন। প্রত্যহ বাড়ী হইতেই যাওয়া আসা করিয়া থাকেন। সুবোধের চারি বৎসরের একটি কন্যা, নাম মাধুরী। ছোট ছেলে সুশীল সম্মানের সহিত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাহেবের একান্ত আগ্রহে কলেজেই এসিন্ট্যান্ট সার্জ্জনের পদ গ্রহণ করেন। তিনি সেই কারণে কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী। সুশীল এখনও অবিবাহিত।

জমিদারী কার্য্যের কূটনীতি যে ধর্ম্মশীলকে পর্য্যন্ত কালে অত্যাচারী এবং কলুষিতপ্রকৃতিতে গঠন করিয়া তোলে, রায় মহাশয় তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। তাই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রদ্বয়কে নিজ জমিদারী কার্য্যের ত্রি-সীমানায়, অধিক কি তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে কাছারী বাড়ীতে পর্য্যন্ত যাইতে দিতেন না। ভয় পাছে উহারা পীড়ন-মন্ত্রের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অবর্ত্তমানে উৎপীড়নের সাহায্যে প্রজাশোষণ করিয়া তাঁহার চিরজীবন-অর্জ্জিত এই সুনাম লোপ করে। একবার কোন রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"রায়, তুমি যে এমন সুশিক্ষিত ও রত্নবিশেষ সন্তানদের পিতা, ইহা বাস্তবিকই হিংসার বিষয়; কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, তুমি উহাদের জমিদারী কার্য্য কিছুই শিখাইলে না। তোমার অবর্ত্তমানে তোমার এই জমিদারী রক্ষা করা উহাদের পক্ষে প্রকৃতই কষ্টকর হইয়া পড়িবে।"

প্রত্যুত্তরে রায় মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—"সাহেব টাকা কি একস্থানে চিরকাল থাকে, না প্রভুত্ব কাহারও হাতধরা? ছেলেদের সময়ে যদি আমার এই জমিদারী এবং এই একটানা প্রভুত্ব চলিয়া যায়, তাহাতে আমি এতটুকুও দুঃখিত নহি; কিন্তু সাহেব আমার বংশমর্য্যাদা, তোমরা যাহাকে

family name বল, তাহাত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যাহাদের জমিদারী নাই, তাহারাও ত সম্মানের সহিত দিন কাটায়। তা'হলে আমার এই সুশিক্ষিত ছেলেটুটি জমিদার নাম হারিয়েও কেন তা পারবে না?"

সেইদিন হইতে দেশের সকলেই জানিয়াছিল, রায় মহাশয় বংশমর্য্যাদাকে কতদূর সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আজ সেই বংশমর্য্যাদা তাহার ছোট ছেলের দ্বারাই হীনপ্রভ হইতে চলিল।

চিঠিখানি হাতে করিয়া বৃদ্ধ আরাম কেদারায় নির্জ্জীবের মত শুইয়া পড়িলেন; সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্তল শূন্য করিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল। বৃদ্ধ ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না, তাই একবার উদাসচক্ষে উহা আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। না, স্বপ্ন নহে, সত্য—দিনের আলোর ন্যায় ইহা ধ্রুব সত্য। সুশীল তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। তাঁহার চিরবাঞ্ছিত সুনামের মস্তকে তিনি বর্ত্তমানে তাঁহারই সন্তান দারুণ পদাঘাত করিল। বৃদ্ধের মাথা ঘুরিতে লাগিল। সজ্জিত প্রকোষ্ঠের দ্রব্যসামগ্রীসকল যেন সেই সঙ্গে ঘুরিতেছে বোধ হইল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। হাত হইতে চিঠিখানি পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। শত চেষ্টায়ও বৃদ্ধ একপদ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় চেয়ারে অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িলেন। সেই সঙ্গে বড় দুই ফোঁটা অশ্রুজল বৃদ্ধের শুষ্ক গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

২

রায় মহাশয় ঠিক করিলেন যেমন করিয়াই হউক, যতদূর নীচতা স্বীকার করিতে হউক না কেন, এ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। আর যথাসময়ে উহা উত্তমর্ণদের হস্তেও দিতে হইবে। কিন্তু ইহা কি সহজসাধ্য? মধ্যে কেবল একদিনমাত্র অবসর। তহবিলে যে টাকা মজুত আছে, তাহা কোন প্রকারে ৫৭ হাজারের অধিক হইবে না। সৌভাগ্যের বিষয় সরকারী খাজনা দেওয়া হইয়াছে। বাকি ৭৫ হাজার টাকা কি প্রকারে কিনারা হইবে? জমিদারী বিক্রয়? প্রস্তুত; কিন্তু এক দিনের মধ্যে কে উহা ক্রয় করিবে? আর বিনা পরিদর্শনে কেই বা অত টাকা দিয়া কিনিতে রাজি হইবে? তবে উপায়? বৃদ্ধ

আর ভাবিতে পারিলেন না। কতক্ষণ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিলেন। মুখস্থিত আলবোলার নল খসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ নিশ্চল।

চকিতের ন্যায় বৃদ্ধের মনে অধর্ম্মের ক্ষীণ ছায়াপাত হইল। বৃদ্ধ চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সজোরে ঘাড় নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"অস্বীকার! আমি দায়ী নহি বলিয়া অস্বীকার! না, কখনই না; হইতেই পারে না। দেশের মাথা, ধর্ম্মের আশ্রিত, সমাজের নেতা হরি রায় অস্বীকার করিবে? কখনই না! মৃত্যু যেন তার পূর্ব্বে আমাকে গ্রাস করে।"

রায় মহাশয় সংকল্প করিলেন, সুবোধকে তাহার ছোট ভায়ের এই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ও তাহার পরিণামের কথা জানাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার প্রাণপণ শক্তিতে সমস্ত অর্থসংগ্রহের চেষ্টা একেলাই করিবেন। বৃদ্ধের হৃদয়ে তখন যুবকের তেজ ফুটিয়া উঠিল, শীর্ণ দেহ যেন অযুত হস্তীর বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল।

সারারাত বিনিদ্র হইয়া রায় মহাশয় অর্থসংগ্রহের উপায় চিন্তা এবং মোট সংগ্রহের হিসাব ঠিক করিতেই কাটাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সংবদ্ধ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রথমে তিনি দুই চারি জন বিশেষ বন্ধুর নিকট যাইয়া নিজ আকস্মিক বিপদের কথা জানাইলেন। সকলেই দুঃখের সহিত তাঁহার উপস্থিত বিপদে সহানুভূতি দেখাইলেন। ঋণস্বরূপ সকলেই অর্থসাহায্য করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। রুদ্রমূর্ত্তিতে রবি চারিদিকে প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছে। প্রান্তরস্থিত বালুরাশি প্রতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পশু-পক্ষী সূর্য্য-কিরণে ক্লান্ত হইয়া কাতরকণ্ঠে অস্ফুট রব করিয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের শ্যাম-শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইতেছে। সমস্ত গ্রামখানি কোলাহলশূন্য। ক্বচিৎ দুই একটি গ্রামবাসীকে আর্দ্র গামছা মাথায় দিয়া বৃক্ষের ছায়ায় গ্রামান্তরে যাইতে দেখা যাইতেছিল। এমনই সময়ে বৃদ্ধ রায় মহাশয় শূন্যমস্তকে রৌদ্রতপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ স্বেদ-সিক্ত; ললাটের শিরাদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। চক্ষুদ্বয় নিম্নে আনত। তিনি দুই হস্তে প্রাণপণ শক্তিতে নিজ উত্তরীয় বাঁধা কি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন।

গ্রামের সীমানার উপরেই সুবোধচন্দ্র পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

দূর হইতে পিতাকে দেখিতে পাইয়া সুবোধ তাঁহার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার এবম্প্রকার বিলম্বের কারণ ও হস্তস্থিত দ্রব্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ শুষ্ককণ্ঠে কেবলমাত্র বলিলেন,—"বাড়ী চল, সব শুনিতে পাইবে।" পিতাপুত্রে ক্রমে গৃহে পৌঁছিলেন।

রায় মহাশয় যথাস্থানে হাতের পুলিন্দাটি রাখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে সুশীলের চিঠির কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। বিস্ফারিতনেত্রে ও স্পন্দিত-হৃদয়ে সুবোধ একে একে সমস্তই শুনিলেন। বৃদ্ধের বলা শেষ হইলে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া দুই হাত কপালের উপর রাখিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

সুবোধচন্দ্র কতকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। পরে আর থাকিতে পারিলেন না। শঙ্কিতহৃদয়ে অতি ধীরে কেবলমাত্র বলিলেন,—"তার পর"।

রায় মহাশয় চক্ষু খুলিয়া সুবোধচন্দ্রের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর কি সুবোধ? কি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ?"

সুবোধ পূর্ব্বের ন্যায় সভয়ে বলিলেন, "আজ্ঞে, টাকার উপায় কি হ'বে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম।"

রায় মহাশয় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"হুঁ, টাকা, উঃ এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা! সুবোধ সব কি যোগাড় হ'বে? সময় নেই, আজকের মধ্যেই যা করিতে পারা যায়।"

সুবোধ বলিল,—"আপনি এতক্ষণ চিঠির কথা বলেন নাই কেন? আমার মক্কেলদের কাছ থেকে কতক টাকা পাবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। আজ ছুটি; কাছারী বন্ধ।"

বৃদ্ধ ছল-ছল-নেত্রে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সুবোধ সাহসে কুলায় নাই। এক পুত্র হইতে এই যম-যন্ত্রণা। অন্য পুত্র যদি আমার ব্যথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ততটা আগ্রহে টাকা যোগাড়ের চেষ্টা না করে? তা'হলে এই বুড়ো বয়সে, জীবনের শেষ দশায়, নিজের হাতে রায় বংশের নাম ডুবিয়ে দিয়ে কিসের জোরে আর লোকসমাজে মুখ দেখাব? যা'র মান গেল, নাম গেল, তা'র আর থাকল কি? সুবোধ, তাই তোমাকে প্রথমেই বলি নাই।"

পিতার কথা শুনিয়া সুবোধ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং নির্ব্বাক হইয়া হেটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন।

রায় মহাশয় বুঝিলেন, সুবোধ তাঁহার কথায় হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছে। তিনি জানিতেন, তাঁহার পুত্রদ্বয় রত্নবিশেষ। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদেশে সংসর্গ-দোষ-দুষ্ট হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন বিপথগামী- হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সুবোধের দোষ কি? এ দারুণ অনুযোগ তাহার প্রতি করিয়া কি লাভ? রায় মহাশয় আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "সুবোধ দেখ ত বাবা চাদরে বাঁধা সর্ব্বসমেত কত টাকা যোগাড় হ'ল? সুবোধ ধীরে ধীরে যাইয়া পুলিন্দাটি গ্রহণ করিলেন। তার পর একে একে গণনা করিয়া সারি সারি টাকা এবং নোট মেজের উপর সাজাইয়া রাখিলেন। গণনা শেষ হইলে মুখ তুলিয়া পিতাকে বলিলেন—"তিপান্ন হাজার।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "তিপান্ন হাজার। আর কাছারীর তহবিলে মোক সাতান্ন হাজার আছে। তা'হলে একুনে হ'ল এক লাখ দশ হাজার। এখনও পনের হাজার টাকা বাকী! তাই ত। সময়ও নাই। পাই কোথায়?" এই বলিয়া রায় মহাশয় পুনরায় চক্ষু মুদিয়া কপালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ঘরের দরজায় মৃদু আঘাত শুনা গেল। সুবোধচন্দ্র উঠিয়া বাহিরে গেলেন। তথায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রমীলা অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনিই দ্বারে আঘাত করিয়া স্বামীকে বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

সুবোধচন্দ্র বাহিরে আসিলে প্রমীলা চাপা কণ্ঠে বলিলেন, "আর ভাবিবার ত কোন কারণ নাই? আমার পিতৃদত্ত এবং তোমাদের প্রদত্ত অলঙ্কারে প্রায় ১৩।১৪ হাজার টাকা হইবে। তারপর দু'একটা আসবাব বিক্রী করিলেই ত বাকী সামান্য টাকা উঠিয়া আসিবে। এই লও।" এই বলিয়া সাধ্বী স্ত্রী শ্বশুর-বংশের সম্মান ও মুখরক্ষার জন্য নিরাভরণা হইয়া নিজের যাহা কিছু সমস্ত স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন।

সুবোধচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রিয়তমের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অমনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"ভাব্‌ছ কি? বাবাকে দাও গিয়ে। এত বেলা

হ'লো, তিনি এখনও মুখে হাতে জল দেন নাই। সমস্ত টাকা যোগাড় না হ'লে মনেও ভেবো না, উনি জলপর্য্যন্ত আজ স্পর্শ করবেন? যাও, দাও গিয়ে।"

সুবোধচন্দ্র নিজেকে সামলাইয়া নিজগৃহ হইতে তাহার নিত্যব্যবহার্য্য বহুমূল্য সুবর্ণঘড়ি, চেন, বোতাম ও হীরার অঙ্গুরী লইয়া পুনরায় সজ্জিত অর্থ-রাশির নিকট আসিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ রায় মহাশয় তখন সেই অবস্থায় ছিলেন।

সুবোধচন্দ্র ডাকিলেন, "বাবা"।

বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল; বলিলেন, "কি সুবোধ"।

সুবোধচন্দ্র বলিলেন,—"দয়াময়ের করুণায় সমস্ত টাকা যোগাড় হইয়াছে; বোধ হয় কিছু অধিকও হইবে।"

সন্তানহারা জননীর হারানিধি পুনঃপ্রাপ্তির সংবাদে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে ব্যগ্রতা জাগিয়া উঠিয়া এক মানুষিক শব্দে উহা মুখে ব্যক্ত হয়, বৃদ্ধ রায় মহাশয় তড়িৎ প্রবাহে চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া সেইরূপ ব্যাকুলতা-জড়িত রসনায় সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কই,—কই"?

সুবোধচন্দ্র অমনই তাঁহাকে অলঙ্কারের স্তূপ দেখাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ রায় মহাশয় বাস্পজড়িত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"বউ মা, তুমিও কাঙ্গালিনী সাজিলে? হা হতভাগ্য সন্তান!" তিনি বস্ত্রপ্রান্তে ধীরে ধীরে অশ্রু মার্জ্জন করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই মাধুরী তাহার মায়ের কাছে তাহার বড় আদরের, বড় সাধের 'খুকী'কে লইয়া খেলা করিতেছিল। 'খুকী' তাহার মেয়ে; প্রায় তাহারই ন্যায় বড় একটি কাচের পুতুল। তাহার কাকাবাবু কলিকাতা হইতে তাহাকে কিনিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। যখন ঘরের বাহিরে সুবোধচন্দ্র ও প্রমীলার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন মাধুরী 'খুকী'কে শোওয়াইয়া তাহার পিতামাতার মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে উহাদের সব কথা শুনিয়াছিল। সংসারানভিজ্ঞ ক্ষুদ্র বালিকা তাহার শিশু বুদ্ধিতে যতটুকু ধারণা করিবার ক্ষমতা ছিল, তাহাতে বুঝিয়াছিল যে, যাহার যা' কিছু আছে, আজ তাহাকে সমস্তই তা'র দাদা মহাশয়কে দিতে হইবে। তাই সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব—তা'র আদরের 'খুকু'কে বুকে করিয়া আনিয়া তাহার দাদা মহাশয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। তা'র পর একবার 'খুকু'র মুখে সুগভীর চুমু খাইয়া, যেন সেই উভয়ের শেষ

দেখা—হাসিমাথামুখে রায় মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া বীণাবিনিন্দিত মধুরস্বরে বলিল, "দাদা মহাশয়, 'খুকু'কে নিন; একেও বিক্রী করুন।"

অনাবিল স্বচ্ছ হৃদয়ের এবম্বিধ আত্মত্যাগে সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দুইহস্তে দেবশিশুতুল্যা পৌত্রীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"দিদি তুমিও! দুর্ভাগ্য সন্তান দেখে যাও, স্বকৃত কর্ম্মের শোচনীয় পরিণাম কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছে!"

অশ্রুজল অজস্রধারে বৃদ্ধের দুইগাল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

৩

সুশীল-কৃত ঋণ পরিশোধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার বৃদ্ধ পিতার ভাগ্য বোধ হয় সেই সঙ্গে তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিল।

বৃদ্ধ রায় মহাশয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি কপর্দ্দকশূন্য এবং পরের দারস্থ হইয়া উপস্থিত দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এই দুঃসময়ে সাহায্যকারী বন্ধু ও হিতৈষীবর্গের ঋণ হইতে কি প্রকারে যে মুক্তিলাভ করিবেন; ইহাই এখন তাঁহার প্রধান ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

সুবোধচন্দ্র পিতার মনোভাব বুঝিলেন। তিনি স্ত্রীর সহিত এ বিষয়ে এক দিন পরামর্শ করিলেন। উহাতে ইহাই স্থির হইল যে, সংসারের ব্যয়ভার হ্রাস করিতে হইবে। এত দাস দাসী, লোক লস্কর—একে একে সমস্তই কমাইতে হইবে। তা'রপর কোর্টের ওকালতী কাজ ব্যতীত সুবোধকে রাত্রে'ও অবসর পাইলে প্রাতঃকালে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া প্রত্যহ নিজ জমিদারীর সেরেস্তায় কর্ম্ম-করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে প্রমীলা একটু জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"এই রকম পরিশ্রমে যত দিনেই হউক এ দায় থেকে মুক্ত হইতে হইবে। সেই সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী মা জগদম্বাই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।" তারপর অনুচ্চ স্বরে বলিলেন—"হায়, সোণার সংসারে কি ভয়ানক বজ্রপাত হ'ল!" অঞ্চল-প্রান্তে প্রমীলা চক্ষু মুছিলেন।

বৃদ্ধ রায় মহাশয় পুত্র ও পুত্রবধূর পরামর্শে বিশেষ কোন আপত্তি করেন নাই। কিন্তু সর্ব্ব প্রথম সে দিন প্রত্যূষে তিনি মাধুরীকে ছোট একটি পাত্রে কতকগুলি মুড়ি লইয়া দালানের এক ধারে বসিয়া প্রফুল্লমুখে খাইতে দেখিলেন,

সে দিন তিনি সুবোধকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুবোধ, বাবা এতটা টানাটানি করা ঠিক নয়! দুধের বাছা, একি ওর পেটে সহ্য হবে?"

প্রত্যুত্তরে সুবোধ কেবলমাত্র বলিলেন, "ও সব আপনি কিছু ভাবিবেন না; মাধুরী অন্য জিনিষের চেয়ে 'মুড়ি' খেতে ভালই বাসে।"

"কাজেই! অভাবে স্বভাব নষ্ট করে।" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া এই কথা বলিতে বলিতে রায় মহাশয় বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এমনই অনাটনে ও অসীম কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া দেশখ্যাত প্রসিদ্ধ রায়-পরিবারের দিন কাটিতে লাগিল। প্রতি মাসান্তে সুবোধচন্দ্র সমস্ত উদ্বৃত্ত টাকা বৃদ্ধের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতেন। রায় মহাশয় সেগুলি লইয়া স্বয়ং পাওনাদারদের দিয়া আসিতেন। প্রত্যাগমনকালে দুঃসময়ে সহায়তার জন্য তাহাদিগকে প্রভূত ধন্যবাদ দিতেন এবং হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেন।

নিজ সন্তান-কৃত দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত বৃদ্ধ বয়সে রায় মহাশয় এমনই প্রকারে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

৪

পর্ব্বতমালাবেষ্টিত সীমান্ত-প্রদেশের ইংরাজাধিকৃত প্রায় সমস্ত সমতল ভূমিতে তাঁবু পড়িয়াছে। ছাউনীর মধ্যস্থল হইতে শূন্য ভেদ করিয়া ব্রিটিশ পতাকা উড়িয়াছে। তাঁবুর দ্বারদেশে স্ব স্ব রেজিমেন্টের চিহ্ন উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। রসদদার, ডাক্তার, কর্ণেল প্রভৃতি সকলেরই পৃথক পৃথক তাঁবু পড়িয়াছে। প্রতি তাঁবুই সশস্ত্র প্রহরীদ্বারা রক্ষিত।

মধ্যস্থলস্থিত লালরঙ্গের তাঁবু ডাক্তারের জন্য নির্দ্দিষ্ট। সুশীলচন্দ্র উহারই কর্ত্তা।

দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বতীয়গণের সহিত যুদ্ধ করা সুশিক্ষিত ইংরাজবাহিনীর পক্ষে ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল। কারণ বিদ্রোহীগণ সম্মুখযুদ্ধের প্রয়াসী নহে। দস্যুর ন্যায় অতর্কিতভাবে আসিয়া মারধর ও লুণ্ঠনপূর্ব্বক পুনরায় পর্ব্বতগাত্রে বিলীন হইয়া যাওয়াই উহাদের উদ্দেশ্য। যাহা হউক, ক্রমান্বয়ে তিন মাস কাল যুদ্ধের পর বিদ্রোহীগণ যেন শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। তাই আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে জেনারেল সাহেবের আজ্ঞায় প্রচারিত হইল, রাত্রের জন্য পূর্ণ অবসর; ইংরাজ সৈন্যসমূহ আমোদ-প্রমোদের আয়োজনে মত্ত হইয়া উঠিল। অনতি-

বিলম্বে নাচ-গান-হাস্য-কোলাহলে স্তব্ধ প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল। উল্লসিত সৈন্যগণের কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই ঘন ঘন 'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে' ধ্বনি পর্ব্বতান্তরালস্থিত সদ্য-শান্ত আফ্রিদীগণের কর্ণে প্রবেশ করিল, কারণ বুঝিতে উহাদের বেশী বিলম্ব হইল না। পরক্ষণে একজন হৃষ্টপুষ্ট যুবক কটিদেশস্থিত বংশী গ্রহণ করিয়া উহাতে জোরে ফুৎকার দিল। দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া চারিদিক হইতে দলে দলে সশস্ত্র আফ্রিদীগণ আসিয়া যুবকের চারিদিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। সকলে উপস্থিত হইলে যুবক উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বিপক্ষের সৈন্যগণ আমোদে মাতোয়ারা; এই আমাদের উপযুক্ত অবসর। এই সুযোগে একবার সর্দ্দার মোল্লার নাম লইয়া শেষ আক্রমণ করি। তোমাদের মত কি?"

সমবেত আফ্রিদীগণ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া যুবকের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

দ্বিপ্রহর রজনী। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মেদিনী ঘোর অন্ধকারে আবৃত। সারা জগত নিদ্রায় সুপ্ত। কেবল ইংরাজ সৈন্যগণের অবিশ্রান্ত আমোদ-কোলাহলে ও অট্টহাস্যে সেই স্থল নিনাদিত। সহসা চারিদিক হইতে 'দীন দীন' রব শ্রুত হইল; পরক্ষণেই ইংরাজ শিবিরের উপর মুষলধারে গুলি-বর্ষণ হইতে লাগিল।

সুশিক্ষিত ও সাহসী ইংরাজ সৈন্য এইরূপ আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না; তাহারা জেনারেলের আদেশে সেই রাত্রের জন্য পূর্ণ অবসর ভোগ করিতেছিল। কিন্তু তাহারা নিশ্চেষ্ট হইবার পাত্র নহে—যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্র-কারিতার সহিত তাহারা স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অনেকেই বিপক্ষের গুলিতে হতাহত হইল।

ইংরাজ সৈন্য প্রস্তুত হইয়া সেনাপতির অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছিল; এমন সময় জেনারেল গর্ডন অশ্বারোহণে ছাউনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি প্রধান সহকারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, আমাদের কোলাহল-ধ্বনি শুনিয়া আফ্রিদীগণ সদলে আসিয়াছে। পূর্ব্ব দিকের প্রবেশপথ আমি আমাদিগের সৈন্যদ্বারা রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি। এখন তুমি অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া পশ্চিম দিক আক্রমণ কর। আমি অবশিষ্ট সৈন্য সাহায্যে দক্ষিণ দিক রক্ষা করিব। উত্তরে পাহাড় ও নদী; মনুষ্যের একেবারে অগম্য।"

সেই সময়ে একটি গুলি আসিয়া হাঁসপাতাল তাঁবুর একপাশ ভেদ করিল। সকলে বুঝিল, শত্রুদল অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তখনই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিকাভিমুখে ইংরাজ সৈন্য ছুটিল। কেবল তাঁবুর পাহারায় মুষ্টিমেয় সৈন্য অবশিষ্ট রহিল।

একদল আফ্রিদী সৈন্য যে বাস্তবিকই ইংরাজ ছাউনীর খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা শিবির-রক্ষক প্রহরীগণ অবিলম্বে বুঝিল। ভীষণরবে 'দীন দীন' শব্দ করিতে করিতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী আফ্রিদীকে উহারা ছাউনীর দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল। অমনি পরিত্যক্ত ইংরাজ সৈন্যগণ একত্র মিলিত হইল। বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে ভুট্টাসিং কর্পোরাল একবার তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া বলিল, "ডাক্তার, সাবধান থাকিও। একদল আফ্রিদী নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে; চলিলাম।" ভুট্টাসিং শান্তি-প্রিয়, নিরীহ বাঙ্গালী ডাক্তারকে বড় ভাল বাসিত। গত তিন মাস হইতে অবসর পাইলেই সে ডাক্তারবাবুকে যুদ্ধের রীতি ও অস্ত্র-চালনার কৌশল শিক্ষা দিত। সে ডাক্তারের অস্ত্রচালনায় লঘুহস্ততা ও অশ্বারোহণে ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া তাহার প্রভূত প্রশংসা করিত। ভালবাসিত বলিয়াই আসন্ন বিপদ সময়ে সে ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া সাবধান হইতে বলিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বাঙ্গালী ডাক্তার আমাদের সুশীলচন্দ্র। ভুট্টাসিংয়ের কথায় সুশীল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন অকালে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। তাহারই ক্ষণিক আলোকে সে দেখিল, তাহাদের সৈন্যদল ক্রমশঃ পাছু হটিতেছে। সে মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিল। তার পর শিবির হইতে একটি অশ্ব বাহির করিয়া আনিয়া উহাতে আরোহণ করিল। অশ্বের বল্গা সংযত করিয়া একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া সে অস্ফুটস্বরে কি বলিল। "বাবা, ক্ষমা করিবেন, চলিলাম"—কেবলমাত্র ইহাই শোনা গেল।

অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটিল। অনতিবিলম্বে সুশীল ভুট্টাসিংয়ের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময়ে পশ্চাৎ হইতে বিপক্ষদলের একব্যক্তি ভুট্টাসিংকে লক্ষ্য করিয়া বর্ষা ত্যাগ করিতেছিল। সুশীল ভুট্টাসিংকে পশ্চাতে রাখিয়া শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল! অব্যর্থসন্ধান গুলি আফ্রিদীর বক্ষস্থল ভেদ করিল।

কিন্তু শত্রুর দৃঢ়হস্ত-নিক্ষিপ্ত বর্ষা সবেগে আসিয়া সুশীলের ললাট বিদ্ধ করিল। অবিরলধারে শোণিতপাত হইতে লাগিল; সুশীলের উহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ভূট্টাসিং শত্রুকে মারিয়াছি। সে তোমাকে এই বর্ষা দিয়া পিছন দিক থেকে লক্ষ্য করিতেছিল। আর নিমেষমাত্র দেরী হইলে সর্ব্বনাশ হইত।"

ভূট্টাসিং মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহার প্রিয় শিষ্য, রেজিমেণ্টের সুদক্ষ বাঙ্গালী ডাক্তার সুশীলচন্দ্র রক্তাক্তকলেবরে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে।

সে তখন বিস্ময়াপ্লুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ডাক্তার বাবু, তুমি এখানে? শত্রু মারিয়াছ, সাবাস্; কিন্তু চেয়ে দেখ, কপালের রক্তে তোমার সর্ব্বাঙ্গ লাল হ'য়ে উঠ্ল।"

ঠিক সেই সময়ে বিপক্ষদল হইতে একটা চীৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইল—"ভাগো, সর্দ্দার মাট্টি লিয়া। ভাগো—ভাগো।"

নিমেষমধ্যে সেই স্থান শত্রুশূন্য হইল। ভূট্টাসিং সুশীলের দেহ দৃঢ়রূপে নিজ হস্তে ধরিয়া স্নেহ-বিগলিত-কণ্ঠে বলেন,—"সাবাস্। আজ আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইল। তুমি বিপক্ষের সর্দ্দারকে ভূমিশায়ী করিয়াছ। আমাদের এ অভিযান তোমার দ্বারাই সফল হইল।"

দূরে বজ্রগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হইল,—"কোথায় আফ্রিদী সর্দ্দার? কে মারিল, কে সে বীর?"

সকলেই বুঝিল, উহা জেনারেল গর্ডনের কণ্ঠস্বর। প্রশ্নকারী তাঁহার কথা শূন্যে বিলীন হইতে না হইতে সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভূট্টা সিংয়ের মুখে সমস্ত শুনিলেন এবং ভূপতিত আফ্রিদী সর্দ্দার হামিদ খাঁর নিস্পন্দ শরীরের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর নিজ হস্তে সুশীলের ললাটের ক্ষতমুখ বাঁধিয়া দিয়া নিজ পরিচ্ছদ হইতে "ভিক্টোরিয়া ক্রশ" খুলিয়া উহার বুকে বাঁধিয়া দিলেন। চারিদিক হইতে সমবেতকণ্ঠে" হিপ্ হিপ্ হুর্রে" শব্দ উত্থিত হইল।

রণবাদ্যের তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে অশ্বগুলি আরোহীগণকে বহন করিয়া তাঁবুর দিকে ফিরিল।

৫

উপস্থিত বিপদ, বিশেষ যদি উহা অভাবনীয় হয়, মানুষকে প্রায় ধৈর্য্যহারা করিয়া ফেলে। উহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য তখন তাহার সমস্ত শক্তি একযোগে কার্য্য করিয়া থাকে। যখন তাহার বেগ প্রশমিত হইয়া আসে, তীব্রতা মৃদু হইয়া পড়ে, তখন সে উহার আনুসঙ্গিক সমস্ত বিষয়গুলি স্থির হইয়া ভাবিবার অবসর পায়। বৃদ্ধ রায় মহাশয়ের এখন এইরূপ দশা উপস্থিত। অর্থ সংগ্রহের দারুণ ভাবনায় তিনি পুত্রের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। যখন সে ভাবনা দূর হইল, তখন পরিত্যক্ত ভাবনার বিষয়গুলি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বসিল।

"সুশীল কেন একবার তাহার দাদার সহিত গোপনেও দেখা করিল না। তাহা হইলে তাহার জন্য এখন এরূপ দুশ্চিন্তায় ভুগিতে হইত না। ছেলেটার মাথায় কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঢুকিয়াছিল!"—এই রকম নানা ভাবনায় রায় মহাশয়ের মন সুশীলের জন্য সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন থাকিত। সেইজন্য তিনি যে আজকাল অত্যন্ত অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল।

একদিন সুবোধবাবু অসময়ে কাছারী হইতে বাড়ী আসিলেন। সে সময়ে রায় মহাশয় গীতা পাঠ করিতেছিলেন। পায়ের শব্দ শুনিয়া তিনি চক্ষু ফিরাইলেন। সুবোধকে আসিতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ যে এত সকাল সকাল এলে? শরীর কি অসুস্থ বোধ কচ্ছ?"

শুষ্কভাবে ক্ষুদ্র একটিমাত্র 'না' বলিয়া তিনি হস্তস্থিত 'বেঙ্গলী' পত্রের অংশবিশেষ পিতাকে পড়িতে দিলেন। উহা রয়টারের তারের একটি সংবাদ। তাহা এই—"জেনারেল্ গর্ডন সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, অদ্যকার যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের জয় হইয়াছে। আফ্রিদী সর্দ্দার হামিদ খাঁর মৃত্যু ও পতন হইয়াছে। বাঙ্গালী ডাক্তার সুশীলচন্দ্র রায়ের অদ্ভুত বীরত্বে ইহা সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু সুশীলচন্দ্র কপালে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তাঁহার বুকে জেনারেল স্বহস্তে 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' পরাইয়া দিয়াছেন। আশা করা যায়, এইবার সীমান্তে শান্তি সংস্থাপিত হইবে।"

বিস্ফারিতনেত্রে ও জড়িতকণ্ঠে বৃদ্ধ রায় মহাশয় সুবোধের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "য়ঁ্যা! সুশীল আমার এমন বীরত্ব দেখাইয়াছে? সে

'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' উপহার পাইয়াছে? কেবল আমার বংশের নহে,—সে আজ সমস্ত বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে! তারপর মৃদুস্বরে পুনরায় এই অংশটি পাঠ করিলেন, "কিন্তু সুশীলচন্দ্র কপালে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।" বৃদ্ধের চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল।

দাবাগ্নির ন্যায় এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পরদিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাছারী-অন্তে স্বয়ং আসিয়া রায় মহাশয়ের সহিত করমর্দ্দন করিয়া তাঁহার পুত্রের এবম্বিধ যশোলাভে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিয়া গেলেন। দলে দলে লোক আসিয়া 'রায়' বাড়ী পূর্ণ করিতে লাগিল। এমন সুসন্তানের পিতা বলিয়া সকলে তাঁহাকে কত প্রকারে স্তুতিবাদ করিতে লাগিল; কিন্তু বৃদ্ধের মুখে কেবল একই কথা 'আশীর্ব্বাদ করুন, তাহাকে যেন ফিরিয়া পাই'।

এই ঘটনার পর একমাস গত হইয়াছে। একদিন রায় মহাশয় যখন জমিদারীর আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিতেছিলেন, সেই সময় ধীরে ধীরে রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে চিরহাস্যময়ী মাধুরী হাসিমাখামুখে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "দাদা মহাশয়, দেখুন কে এসেছে?" এই বলিয়া সে তাহার বড় আদরের কাকাবাবুকে ঘরের ভিতর লইয়া আসিল। সুবোধচন্দ্রও উহাদের পশ্চাতে গৃহ প্রবেশ করিলেন।

চিরদুঃখী পথের ভিখারী অকস্মাৎ ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিলে যেমন বিস্ময়াপ্লুতনেত্রে নির্ব্বাক হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করে, বংশোজ্জ্বলকারী যশস্বী পুত্র সুশীলকে গৃহমধ্যে দেখিয়া রায় মহাশয়ের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছিল। পরক্ষণে তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কে? সুশীল আমার?"

ভীত ও কম্পিতহৃদয় অপরাধী শিশুর ন্যায় সুশীল নতমুখে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, তাহার পিতার তুষারধবল কেশ ও চিন্তাভারাক্রান্ত বদন তাঁহাকে কত অধিক প্রবীণ করিয়া তুলিয়াছিল। সুশীল বুঝিল, তাহার দুশ্চরিত্রতা এবম্বিধ পরিবর্ত্তনের কারণ। তাহার মনে বড়ই ধিক্কার জন্মিল। সে যেমন পিতার পদযুগল ধরিয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে যাইবে, অমনই বৃদ্ধ রায় মহাশয় দুই বাহু দিয়া তাহাকে দৃঢ়ভাবে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইলেন এবং স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন,—"না সুশীল ওখানে নয়; বংশোজ্জ্বলকারী সন্তানের স্থান এই খানে!

আলিঙ্গন-বদ্ধ পিতা-পুত্রের চক্ষের অবিরল অশ্রুধারা সেদিন দু'টি ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা ধৌত করিয়া দিয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু ও হিন্দু-সমাজ।

(প্রথম প্রস্তাব)

ঋষি-প্রতিম চন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নাই! বিধি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া, অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠার স্মৃতি পশ্চাতে রাখিয়া, দুঃখ-দারিদ্র্য-দৈন্য-বিজড়িত পার্থিব মোহপাশ ছেদন করিয়া, আজ সেই ভীমকর্ম্মা পুরুষ চির-শান্তির সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি আমাদের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা পর্য্যালোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। নানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তিনি জীবদ্দশাতেই চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে কেবল সাহিত্যসেবিমাত্র ছিলেন, কেবলমাত্র বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে রাজকীয় কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনের অবসরভাগ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু হিন্দুকে হিন্দুর মহত্ত্ব দেখাইতে, হিন্দুর অতুলনীয় আদর্শ বুঝাইতে, হিন্দুর কর্ত্তব্যপথ পরিস্ফুট করিতে, তিনি যত চেষ্টা করিয়াছেন, তত বুঝি আর কেহ করেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও একাগ্রতা তাঁহার এই চেষ্টাকে যে সফলতার পথে আনিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? অধুনা হিন্দু-সমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, সংস্কারের নামে হিন্দু-আদর্শের মূলে যেরূপ কুঠারাঘাতের প্রয়াস হইতেছে, তাহাতে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুমাত্রেই সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই সময়ে জনসমাজে তাঁহার কার্য্যাবলীর কথঞ্চিৎ প্রচার অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ভাবিয়া, আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

ইংরাজি শিক্ষার প্রথম প্রচলন-যুগে হিন্দু-সমাজের এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন আমাদের যাহা কিছু সমস্তই প্রতীচ্য-মোহমুগ্ধ শিক্ষিত-সমাজ কর্ত্তৃক ঘোর ঘৃণার চক্ষে অবলোকিত হইত এবং তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজের আচার-ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। ঘোর যথেচ্ছাচারের স্রোতে হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ যখন এইরূপে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, বাঙ্গালীর "সে ঘোর দুর্য্যোগদিনে' মহাত্মা রামমোহন রায় ভগবৎ-প্রেরিত হইয়াই যেন ভারতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তদানীন্তন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চা-

ত্যের সমন্বয়ে এক নব ধর্ম্মের সৃজন করিয়া মুমুর্ষু জাতিকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, ইহা জড় জগতে যেমন সত্য, ধর্ম্ম, সমাজে ও রাজনীতিতেও সেইরূপ সত্য। রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সমাজস্রোত এইবার বিপরীতমুখী হইল! শিক্ষিত-সমাজের দৃষ্টি এই নব ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল; অনেকেই ইহাতে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। ক্রমশঃ শিক্ষিত ব্যক্তিগণও তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বিরত হইল। ফলে আবার এমন এক সময় আসিল, যথন দেশের যাহা কিছু সবই ভাল এবং পাশ্চাত্য সমস্ত ভাবই পরিহার্য্য, এই মত শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে প্রচলিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু এই যুগে আবির্ভূত হন এবং তাঁহারা উভয়েই অসাধারণ প্রতিভাবলে যুগধর্ম্মের উক্ত প্রভাব হিন্দু-সমাজে বদ্ধমূল করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চন্দ্রনাথ বসু হিন্দু-আদর্শের বিশ্লেষণসহকারে হিন্দু-সমাজনিয়মসমূহের শুধু যে যৌক্তিকতা ও হিন্দুর পক্ষে তাহাদের উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু তিনি আমাদের ব্যবস্থাসমূহের সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রতিপাদন করিতেও প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি 'সাবিত্রীতত্ত্বে'র এক স্থলে লিখিয়াছেন, "কঃ পন্থায় বলিয়াছিলাম, একদিন সমস্ত মানবকে ভারতের বাসনা-বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে। 'সাবিত্রীতত্ত্বে' বলিতেছি—একদিন সমস্ত মানবকে ভারতের লোক-সৃষ্টি-বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে।" ভারতের আদর্শ, ভারতের জ্ঞান, ভারতের দূরদর্শিতা পৃথিবীর আর কুত্রাপি কোন জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না, এই কথাই তিনি বার বার অধঃপতিত হিন্দুজাতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুর যাবতীয় সমাজনিয়ম আত্মীয়স্বজনের একান্নবর্ত্তিতায় ও সংযমে প্রতিষ্ঠিত, য়ুরোপীয় সমাজনিয়ম ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় ও সংযমনিরপেক্ষ ভোগবিলাসে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই একটা যে দুরতিক্রমণীয় ব্যবধান এক সমাজকে অন্য সমাজ হইতে পৃথক্ করিতেছে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না এবং যিনিই এই ব্যবধানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া প্রতীচ্য-সমাজনিয়ম প্রাচ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টিত হইবেন, তিনিই সংস্কারের নামে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবেন।

তাই যখন দেখি সম্প্রতি একদল স্থূলদর্শী সমাজসংস্কারক জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তখন আমরা ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 'হিন্দুসমাজের বিশেষত্ব কি?' এই প্রশ্নের উত্তর হিন্দুর জাতিভেদ ও হিন্দু-বিধবার আজীবন ব্রহ্মচর্য্য। সত্য বটে, একান্নবর্ত্তী পরিবার লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত; এবং এই—একান্নবর্ত্তিতা আজ পর্য্যন্ত অধিকাংশস্থলে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ইহাকেও হিন্দুসমাজের অবিচ্ছিন্ন বিশেষত্ব বলিয়া অনেকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এই ব্যবস্থা কালের প্রভাব সহ্য করিতে পারিবে না। সে যাহা হউক, এখনও ইহা এরূপ দৃঢ়ভাবে আমাদের সমাজকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে যে, ইহাকেও আমাদের সমাজের বিশেষত্ব বলিলে অসঙ্গত হয় না; কিন্তু জাতিভেদ ও বিধবার চির-ব্রহ্মচর্য্যই হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র্য চিরকাল রক্ষা করিবে। আজ আমরা শুধু যে এই দুই ব্যবস্থার মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছি তাহা নহে, পক্ষান্তরে এইগুলিই আমাদের জাতীয় জীবন-গঠনের বিষম অন্তরায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্ হইতেছি। ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন জাতিসমূহের যে ভ্রাতৃভাব থাকিতে পারে না এবং তাঁহারা পরস্পরের শত্রুতাসাধনেই তৎপর, এইরূপ ধারণা কেবল আধুনিক বিকৃতমস্তিষ্ক সংস্কারকদিগের কল্পনাতেই বর্ত্তমান; বাস্তবের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কি সহরে, কি গ্রামে যেথানেই যাও, দেখিতে পাইবে কেমন বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়াতে এই ব্যবস্থাগত ভেদের বাহ্য আবরণ অপসৃত হইয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতিসমূহ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মিলিয়া-মিশিয়া পরমসুখে কার্য্য করিতেছে। সহরে শিক্ষা দ্বারা এই একীকরণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে; গ্রামে সহানুভূতি-মূলক স্বাভাবিক বৃত্তি বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা সৃজন করে যে, অনেক সময়ে একখানি গ্রাম একটী সুবৃহৎ পরিবারে পরিণত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে জাতিভেদকে সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা কি যুক্তি-সঙ্গত? আর এই সকল সমাজসংস্কারকগণ সভ্য জগতের কোথাও এমন কোন সমাজ দেখাইতে পারেন কি, যেথানে কোন-না-কোন আকারে জাতিভেদ বর্ত্তমান নাই? বিলাতে অর্থের উপর সমাজ-বিভাগ গঠিত;—যাহার যত অধিক অর্থ, সে সেই পরিমাণে সমাজের উচ্চ স্তরে

প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে যে বিষম ব্যবধান, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। এতদ্ব্যতীত peasants, farmers, gentry, aristocracy প্রভৃতি সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে দুরতিক্রমণীয় চিরন্তন বৈষম্য ত আছেই। প্রতি বৎসর নববর্ষারম্ভে এবং রাজার জন্মদিন উপলক্ষে ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক ব্যক্তি রাজানুগ্রহে অভিজাতসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্যক্তিও মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায়ের (যে সম্প্রদায় হইতেই তিনি উন্নীত হইয়াছেন) সহিত আর সামাজিক কোন সংস্রব রাখেন না। এমন কি অভিজাতসম্প্রদায়ের কেহ যদি মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায়ের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি স্বীয় সমাজ হইতে পতিত বলিয়া পরিগণিত হন। আহারাদি-সম্বন্ধেও এইরূপ। কিন্তু আমাদের দেশে লর্ডের স্থানাভিষিক্ত রাজোপাধি-ভূষিত ধনবান্ জমীদারের পুত্র-কন্যার স্বজাতীয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পরিবারে বিবাহ হওয়া একেবারেই বিচিত্র নহে। অতএব হিন্দুসমাজেই কেবল জাতিভেদ আছে, আর কোথাও নাই, এরূপ অভিযোগ সম্পূর্ণ অলীক ও অসঙ্গত।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক।

রশিদু-দ্-দিন।

আমাদের সপ্তম ভৌগোলিক রশিদু-দ্-দিনের গ্রন্থ "জামিউ-ত্-তারিখ" নামে পরিচিত। খ্রীঃ ১৩১০ সালে ইহা রচিত হইয়াছিল। দশম শতাব্দীতে মুসলমানগণ ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে কতদূর অভিজ্ঞ ছিল, "জামিউ-ত্-তারিখে" তাহার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, রশিদু-দ্-দিন অল্-বিরুণির ভূতত্ত্ব হইতে সার সঙ্কলন করিয়াই 'জামিত-ত্-তারিখ' রচনা করিয়াছিলেন। অল্-বিরুণির গ্রন্থ একান্ত দুষ্প্রাপ্য; উহার একখণ্ডমাত্র পারিস নগরের রাজকীয় পুস্তকালয়ে আছে। অল্-বিরুণির গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই "জামিউ-ত্-তারিখে"র

এত আদর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া আপিসের পুস্তকালয়ে এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মে "জামিউ-ত্-তারিখ" সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে "জামিউ-ত্-তারিখে"'র আরব্য অনুবাদ আছে বলিয়া জানা যায়।

গ্রন্থ-পরিচয়।*

হিন্দুস্থানের পর্ব্বত ও নদী।

পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষকে অসমান নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। সলিলমধ্যে ভাসমান কর্কটীর পৃষ্ঠদেশ যেরূপ, ভারতবর্ষের আকারও ঠিক তদ্রূপ। ভারতে অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজিত আছে। মেরুদণ্ডের গ্রন্থিগুলি যেরূপ সম্বন্ধবদ্ধ, এই পর্ব্বতমালাও ঠিক সেইরূপ। দেখিলে মনে হয়, যেন একটি পর্ব্বত অপরটির অতি নিকটে অবস্থিত। চীন হইতে তিব্বত, কাবুল, বদাক্ষাণ, তুখারিস্থান, খুরসান প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া এই পর্ব্বতশ্রেণী পশ্চিমে গ্যালিসিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সুবিশাল শৈলশ্রেণীর পাদমূল হইতে নদ-নদী প্রবাহিত হইয়া সমতলক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। হিন্দুস্থান পূর্ব্বে চীন এবং মাচীন, পশ্চিমে সিন্ধুদেশ ও কাবুল এবং দক্ষিণে সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে তুর্কদিগের রাজধানী কাশ্মীর এবং বহু উচ্চ মেরুপর্ব্বত শোভমান। সৌরমণ্ডল এই মেরুপর্ব্বত বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করে এবং ইহারই অন্তরালে অস্তমিত হয়। এই মেরুদেশের এক দিন এবং এক রাত্রি আমাদের ছয় মাসের সমান। এই পর্ব্বতের সম্মুখেই আর একটি পর্ব্বত আছে; উহা রজত ও কনকের স্তূপ। হিম-পর্ব্বত কান্যকুব্জের উত্তরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হিম-পর্ব্বত একান্ত শীতল ও তুষার-সমাচ্ছন্ন, তাই অত দূরে অবস্থিত। ভারতের উত্তর-ভাগে যে শৈলশ্রেণী আছে, সেই সমুদয় হইতেই হিন্দুস্থানের একাদশটী নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতমালা হইতেও একাদশটী নদী বাহির হইয়া সাগরে যাইয়া মিশিয়াছে। কেবল দক্ষিণভাগের নদীগুলিই সমুদ্রে মিশে নাই। তিব্বত ও ভারতবর্ষ এবং তুর্কিস্থানের মধ্যে একটী বিশাল পর্ব্বত আছে। কোন পর্ব্বতই ইহার ন্যায় উচ্চ নহে। হেমকূট পর্ব্বত হইতে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইয়া দিগন্তে প্রধাবিত হইয়াছে। * * * ভারতের যে স্থানে পাঁচটী নদী মিলিত হইয়াছে, তাহাকে পঞ্চনদ কহে। সরস্বতী নদী

সোমনাথের পূর্ব্বভাগ দিয়া সাগরে মিশিয়াছে। গঙ্গার পশ্চিম-ভাগে কান্যকুব্জ অবস্থিত। যমুনা এই গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গা ও যমুনা সম্মিলিত হইয়া অবশেষে অবশেষে গঙ্গা-সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুস্থানের নগর ও নাগরিক।

ভারতবর্ষ নয় খণ্ডে বিভক্ত বটে, কিন্তু প্রত্যেক খণ্ডই ইরাণ অপেক্ষা বৃহৎ। ভারতের মধ্যভাগকে মধ্যদেশ কহে। পারসীকগণ ইহাকেই কান্যকুব্জ বলিয়া থাকে। ভারতের গর্ব্বস্ফীত, উদ্ধত, অত্যাচারী ও পরাক্রান্ত নৃপতিকুল এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। মধ্যদেশের পশ্চিমেই সিন্ধুদেশ। এককালে কান্যকুব্জ একটী অতি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল। কিন্তু অধুনা উহা ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার তীরে কান্যকুব্জ হইতে তিন পথ দূরে 'বারি' নামক নগর এখন রাজধানী। পাণ্ডবদিগের জন্মস্থান বলিয়াই কান্যকুব্জের এত গৌরব ছিল। * * * কাশ্মীরের নাগরিকগণ চতুষ্পদ জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ করে না। সিংহাসনের ন্যায় কাষ্ঠাসনে তাহারা মনুষ্য কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। রাজকর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদাই গিরিপথ ও দুর্গাদি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। অপরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই দলবদ্ধ হইয়া কাশ্মীরে প্রবেশাধিকার পায় না। একে একে বা দুইয়ে দুইয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। এমন কি হিন্দু ও ইহুদিদিগের পর্য্যন্ত এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়—অন্য লোকের ত দূরের কথা! সিন্ধু দেশ এবং জিনাব নদীর মধ্যবর্ত্তী বিরাহান (বাবরখানা) নামক স্থান দিয়াই কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে হয়—অন্য পথ নাই। লাহোরের ন্যায় সুদৃঢ় দুর্গ আর নাই। * * * শুনিতে পাওয়া যায় যে, গুজরাটে ৮০,০০০ সহস্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদ আছে। তথাকার অধিবাসিগণ সকলেই ধনাঢ্য ও সুখী। চারি ঋতুতে গুজরাটে ন্যূনকল্পে ৭০ প্রকার গোলাপফুল ফুটিয়া থাকে। গুজরাটের সকলেই পুত্তলিকা পূজা করিয়া থাকে। তাহাদিগের একজন নৃপতি আছেন। হিন্দুস্থানের নানা দিক হইতে হিন্দুগণ গুজরাটে আসিয়া থাকে। মালবের শর্করা এবং গুজরাটের তীর হইতে গন্ধ-দ্রব্যাদি জাহাজে বোঝাই করিয়া নানা দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। (করোমণ্ডল) তীরে মবর প্রদেশ। এই স্থান হইতে রেশম, মুক্তা প্রভৃতি ইরাক্, খুরাসান, সিরিয়া, রুম এবং ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে

চুনী-পান্না পাওয়া যায়—এখানে গন্ধদ্রব্যেরও অভাব নাই; পদতলে সমুদ্র। সেই সমুদ্রে অনন্ত মুক্তারাশি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বলিতে গেলে, মবর প্রদেশই হিন্দুস্থানের দ্বারস্বরূপ। শেখ জমালু-দ্-দিন খ্রীঃ ১২৯৩ সালে যখন এই প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন, তখন তিনি ৭,০০০ সহস্র গড্ডালিকা-পূর্ণ হেম-মণি-মুক্তাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এদেশের লোক একান্ত মসীবর্ণ। বিষুবরেখার নিকটে থাকে বলিয়াই বোধ হয় তাহারা এইরূপ কালো।

অল্-ইদ্রিসি।

আবু আবদুল্লা মহম্মদ একাদশ শতাব্দীতে মরোক্কো দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইদ্রিস্ বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি ইদ্রিসি নামে পরিচিত। তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপ পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন এবং শেষে সিসিলিতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সিসিলির নৃপতির অনুরোধেই ইদ্রিসি তাঁহার ভূতত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ "নঝ্‌তু-ল্-মষ্টক্" অথবা "পর্য্যটক-হৃদয়ানন্দ" বলিয়া পরিচিত। পারিসে ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে ইহার অনুবাদ হইয়াছিল। ইহারও পূর্ব্বে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে রোমে ইদ্রিসির গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ-পরিচয়।

নৃপতি।

ভারতে একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি আছেন। তিনি বহ্লর দেশে রাজত্ব করেন। বহ্লর অর্থেই 'রাজার রাজা' বুঝায়। তাঁহার পরই সাজ দেশের মকম্‌কম্। তাঁহার পর সাফন দেশের রাজা, তৎপরে জাভা, কামরূণ্ প্রভৃতি জনপদের নৃপতিগণ বর্ত্তমান আছেন।

জাতিভেদ প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে ৭টী জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্রিয় জাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য জাতি শাক্রিয় জাতির নিকট অবনত থাকে। ইঁহাদিগের ভিতর হইতেই দেশের নৃপতি বাছিয়া লওয়া হইয়া থাকে। ইঁহাদিগের পরই ব্রাহ্মণ। তাঁহারা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও মদ্যপান করেন না। ব্রাহ্মণের পর ক্ষত্রিয়, শূদ্র এবং বৈশ্যজাতি। বৈশ্যজাতির পর শব্দাল্য জাতি

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ভাল গান করিতে পারে; এই জাতির রমণীগণ দেখিতে পরমাসুন্দরী। শব্দাল্যের পরই জাখ্য জাতির উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহারা নানা রকম ভোজ-বিদ্যা দেখাইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ৪২ প্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে।"

চরিত্র।

ভারতবাসিগণ ন্যায়নিষ্ঠার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তাহাদের সাধুতা, প্রতিজ্ঞা-পালনে প্রাণান্ত চেষ্টা প্রভৃতি এতই প্রশংসনীয় যে, সেই সকল কারণেই নানা দেশের লোক ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে। তাহারা সত্যকে শ্রদ্ধা করে এবং পাপকে অত্যন্ত ঘৃণা ও ভীতির চক্ষে দেখে।

বহ্লর রমণী।

বহ্লর দেশে সকল রমণীই সহবাসের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যে কেহ যাহার-তাহার সহিত সহবাস করিতে পারে। কেবল বিবাহিতা রমণীর পক্ষে এ সমস্তই নিষিদ্ধ।

কান্দাহারের শ্মশ্রু।

কান্দাহারের অধিবাসিগণ শ্মশ্রু রক্ষা করিয়া থাকে। অনেকের শ্মশ্রুই আজানুবিলম্বিত হইয়া দেহের শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

ঝাকরিয়া-অল্-কঝ্উইনি।

ইনি পারস্য দেশের কঝউইন্ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কঝ উইনি নামে পরিচিত। ইনি কোন দিনই পর্য্যটক ছিলেন না; ইস্তাখারি, ইবন্ হউকল্ প্রভৃতি ভৌগোলিকদিগের গ্রন্থাদির সাহায্যে কঝ্উইনি তাঁহার "আশারু-ল্-বিলাদ" অর্থাৎ "কালের কীর্ত্তিস্তম্ভ ও মানুষের স্মৃতি-মন্দির" নামে গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (খ্রীঃ ১২৬৩ সালে) তাঁহার গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

শুকতারার স্বপ্ন ।

সারারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া ঘুমে চোখ ছু'টী ঢুলিয়া আসিল, তাই নিশা এইবার ঘুমাইতে চলিয়াছে। চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যামা ধরণীকে ঘুম পাড়াইয়া, জড়প্রকৃতির নয়নে ঘুমঘোর জড়াইয়া দিয়া, শেষে নিশা নিজেও ঘুমাইতে চলিয়াছে। এখন জাগিতেছে কে? নদী ঘুমাইতেছে, পর্ব্বত ঘুমাই-তেছে, জীব-জগত ঘুমাইতেছে—এখন জাগিতেছে কে? স্বপ্নের বুকে হৃদয় ঘুমাইতেছে, বিরহের কোলে মিলন ঘুমাইতেছে, মিলনের অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বিরহও এদিকে অঘোরে নিদ্রিত! তরুলতা?—না সাড়া নাই—তাহারাও নিদ্রিত! এমন সময়ে—ছি, ছি, বায়ু! ও কি ও?—ঝির্ ঝির্ ঝির্! ব্রহ্মার বরে না অভিশাপে কুম্ভকর্ণ সারাবর্ষ ঘুমাইয়া একদিন মাত্র জাগিত, আর কাহার অভি-শাপে পোড়া বায়ুর চক্ষে নিদ্রা নাই?—তাই এমন সময়ও তার ঝির্ ঝির্ ঝির্। আহা, বায়ু, কর কি? ওই শোন, তরুলতা বিরক্ত হইয়া ঘুমের ঘোরে বলিতেছে —সর্ সর্ সর্; যাও সরিয়া যাও, উহাদের ঘুমাইতে দাও—এমন ঘুমের সময় কাহাকেও জাগিবার জন্য বিরক্ত করিও না।

নিদ্রা!—আকাশ হইতে ভূতল পর্য্যন্ত সুষুপ্তির যবনিকা ঝুলিয়া পড়িয়াছে —সৃষ্টির বুকে ঘুমের রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—তন্দ্রার কোলে সমগ্র সৃষ্টি সরিয়া আসিয়াছে; কি সুন্দর, কি মোহময়! এখন জাগিতেছে কে? কেহ নয়, কেবল আমি—আমি শুকতারা। কেন আমি জাগি? আমার যে আশ্রয় —যাহার কোলে আমি আসি, হাসি, ভাসিয়া যাই—আমার সেই আশ্রয়-আকাশেরও সহস্র নক্ষত্র-নয়ন মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে; ঐ যে চন্দ্র, অমানিশা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ম্লান হইতে উজ্জ্বল, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম—উহারও আঁখিপাতা বুঝি এ সময় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে—তবে আমি কেন জাগি? আপনা আপনি প্রশ্ন করি, আপন মনে মনে ভাবি—কই, মীমাংসা করিতে পারি না ত! কিন্তু—

এ কি বাস্তবিকই জাগরণ, না স্বপ্ন? স্বপ্ন!—তাইত, এ কি সন্দেহ! কিন্তু স্বপ্ন না বলিয়া কি বলি? যাবতীয় সৃজন-সমষ্টি যখন নিদ্রালস, তখন আমাকেই বা জাগিয়া থাকিতে হইবে কেন? আমি কি সৃষ্টির বহির্ভূত?—না—না,

আমিও ত সৃষ্টির ক্ষুদ্র কণিকা; আপনাকে "সৃষ্টিছাড়া" বলিয়া গালি দিয়া বিশ্ব-স্রষ্টার বিদ্রোহী হইবার অধিকার ত আমার নাই! তবে কি এ সত্যই স্বপ্ন?—না হইলে কি বলিব? স্বপ্নে কেহ কখনও দিবালোক দেখে নাই, আমিও কখনও তাহা দেখি নাই; স্বপ্ন চিরদিন আবছায়ে আবৃত, আমারও জীবন-স্বপ্ন আবছায়ার কোলেই ফুটিয়াছে; স্বপ্নের ভিতর চন্দ্রকর দেখা যায়, আলোক ও ছায়ার সংমিশ্রণ দেখা যায়, দিবসও দেখা যায়, কিন্তু সে দিবস রৌদ্রহীন, যেন কেমন ছায়াময়—আমিও এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু রৌদ্র কখনও দেখিলাম না! সৌরকরের সহিত স্বপ্নের কিরূপ সম্বন্ধ জানি না, কিন্তু এতদুভয়কে কখনও পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিতে শুনি নাই। * তবে?—তবে ইহা স্বপ্নই স্থির; এখন বল দেখি, কিসের এ স্বপ্ন? কিসের এ 'জাগিয়া স্বপন দেখা, স্বপ্নে জাগরণ'?

আমি জাগিতেছি—বিনিদ্র ঊষা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিতেছি; এখনি কে আসিবে—তাহাকে দেখিবার আকুল বাসনা নিস্পন্দ বক্ষে সযত্নে লুকাইয়া এই স্থির, নীরব, আকাশতলে—এই নিদ্রাচ্ছন্ন, মৌন নিষ্কম্প জগতখানার বহু ঊর্দ্ধে—এমনি অচঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত, অপলক দৃষ্টিতে প্রত্যহ জাগিয়া থাকি, আজও জাগিতেছি। পৃথিবীর লোকে আমাকে 'প্রভাতী তারা' বলিয়া জানে, প্রভাতের আগমন-সূচনা করিতেই আমার বিকাশ ভাবিয়া ক্ষান্ত হয়—কিন্তু কাহারে চাহিয়া, কাহারে ডাকিয়া, কাহার আগমন পথ লক্ষ্য করিয়া, অভাগিনী আমি বসিয়া থাকি, কেহ জানে না! কেমন করিয়া জানিবে? আমি যে নিজেই আজও বুঝিতে পারিলাম না—এ আমার স্বপ্ন কি জাগরণ—দুরাশা কি আত্মপ্রতারণা—নবোঢ়ার লজ্জা, কি ব্যথিত-হৃদয়ার নিরাশ-প্রেম!

আচ্ছা—দেখিতে সাধ যায় তবু দেখিতে পারি না কেন? চোখোচোখি হইলেই লজ্জায় মরিয়া যাই কেন? যাঁহার আলোকের কণামাত্র লইয়া এই

---

* স্বপ্নরহস্য আমি অবগত নহি, কিন্তু একটী বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, স্বপ্নদৃষ্ট কোন অভিনয় বা বিষয় রৌদ্রময় দিবসের আলোয় আলোয় ঘটিতেছে, এমন দেখি নাই; সুতরাং আমার বিশ্বাস, স্বপ্নে দিবালোক দেখা যায় না। যদি এ ধারণা ভুল হয়, পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ তাহা ভাঙ্গিয়া দিলে অনুগৃহীত হইব। লেখক।

ক্ষুদ্র হৃদয় সমুজ্জল—যাঁহার দর্শনসুখ লাভ করিবার জন্য অন্তরের সমগ্র বৃত্তি উন্মুখ—যাঁহার আসিবার সময় হইলে আপন অজ্ঞাতসারে পথিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াই—তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াও দেখিতে পারি না কেন? তপনোদয়ে শুকতারার উৎফুল্ল আনন অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া আসে কেন? লজ্জা?—এ কি লজ্জা! যাঁহাকে ভালবাসি—যাঁহাকে লইয়া আমি আপন আলোকে আপনাকে দেখি, তাঁহাকে লজ্জা? হ্যাঁ—তাইত; লজ্জা ছাড়া প্রেম—ছি, ছি! "ছি-ছি" বটে, কিন্তু পৃথিবীতে না-কি স্থানে স্থানে লজ্জাটা প্রেমের দৌর্ব্বল্য! একটা দেশ ছিল এবং এখনও আছে—যেখানে লজ্জাই নারী-হৃদয়ের ভূষণ—যেখানে লজ্জা প্রেমের গভীরতম ভিত্তি; হায়! সেখানেও নাকি 'সভ্যতা' প্রবেশ করিতেছে—স্ত্রী স্বামীকে লজ্জা করিলে তাহার প্রেম অগভীর বিবেচিত হইতেছে, সে হৃদয়হীনা প্রতিপন্ন হইতেছে—বিড়ম্বনা বটে! দূর হোক্, মর্ত্ত্যের কথা ভাবিয়া কাজ কি—আমি কিছুতেই লজ্জা ছাড়িতে পারিব না। তিনি কত মহান্, আমি কত ক্ষুদ্রা—তবু কি স্পর্দ্ধা, আমি তাঁহাকে ভালবাসি! কিন্তু এ স্পর্দ্ধার সান্ত্বনা আছে—আমার ভালবাসা নির্লজ্জ নহে; তিনি গুরু, আমি শিষ্যা—তিনি সেব্য, আমি সেবিকা—তিনি দেবতা, আমি ভক্ত—এ অভিজ্ঞান আমার জীবনের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, তাই লজ্জা ছাড়িতে পারি না। লজ্জা ছাড়িব—ছি! লজ্জা ছাড়িতে হইলে ত ছোট বড় ভেদ-জ্ঞান উঠাইয়া দিতে হয়—লজ্জা ছাড়িতে হইলে ত তাঁহাকে আমার সমতুল্য ভাবিয়া লইতে হয়! না—না, তাহা পারিব না—কুসুমে, কীটে—আলোকে, ছায়ায়—সাগরে, সরোবরে তুলনা করিতে আমি পারিব না।

তবে কি এমনি করিয়াই জীবন কাটিবে? বেশ ত—তাহাই হোক্; তপন! দেবতা! স্বামিন্!—শিষ্যার এ নিভৃত-নীরব-হৃদয়ের সলজ্জ-গোপন প্রেম চিরদিন এমনি বিরলে তোমাকে উপহার দিব, তথাপি জানিতে দিব না যে শুকতারা তোমাকে দেখিবার আশায় কত দিন প্রভাত-প্রতীক্ষা করিয়াছিল—কত দিন আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশমার্গে তোমার অনুসরণ করিয়া অস্তাচলপানে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল।* তোমাকে দেখিব, কিন্তু দেখা দিব

* শুকতারা যখন উদীয়মান সূর্য্যের পুরশ্চর, তখন আমরা তাহাকে 'প্রভাতা-তারা' বলিয়া জানি; আবার যখন সে অস্তগামী সূর্য্যের অনুচর, তখন তাহাকে আমরা 'সান্ধ্য-তারা'

না—বুঝিতে দিব না যে শুকতারার হৃদয় তোমার প্রেমে পূর্ণ—জানিতে দিব না যে শুকতারার অস্তিত্ব এ জগতে আছে!

ইহাতে শুকতারার সুখ? অপরিমেয়,—তবে তোমরা বুঝিবে কি? আমার এ দুঃখের আনন্দ—বাসনা-জয়ের তৃপ্তি—নিরাশ-প্রেমিকার সীমাহারা উচ্ছ্বাস, তোমরা বুঝিবে কি? আমার এ জাগ্রত-স্বপ্ন—অনারুদ্ধ প্রেম—অনন্তে হৃদয় প্রসার—বুকভরা শান্তি, তোমরা বুঝিবে কি? আশায় পূর্ণতা, প্রেমে মিলন—তাহাতে সুখ কতটুকু? নাই—তাই মর্ত্ত্যের কবি গায়;—

"প্রেমের সুখ সে সখি পলকে ফুরায়
প্রেমের কণ্টকজ্বালা চিরকাল রয়"—

যে প্রেমের পরিণতি মিলনে, তাহার সুখের অভিব্যক্তি-সীমা এই পর্য্যন্তই; আমার প্রেম মিলনাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, তাই তাহাতে সুখেরও তীব্রতা নাই—কণ্টকেরও জ্বালা নাই। আমার সুখ তোমরা বুঝিবে কি? বুঝিবে বৈকি—একবার আমার দিকে চাও দেখি; এই স্বপ্নময়, শান্তিময়, তন্দ্রাময়, মোহময় শেষযামার ছায়ায় দাঁড়াইয়া—আমার স্থির-ভাস্বর-উজ্জ্বলপ্রভ নয়নে নয়ন সংস্থাপিত করিয়া—আমার হৃদয়-স্বপ্নের সহিত তোমাদের স্বপ্ন-কল্পনা মিলাইয়া আমার দিকে একবার চাও দেখি; ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলিয়া, সংসার-চিন্তা ভুলিয়া, চতুষ্পার্শ্বস্থ বিশ্ব-প্রকৃতির হৃদয়-যন্ত্রে আপনাপন অন্তরের জড়তাটুকু ভাসাইয়া দিয়া, আমার দিকে একবার চাও দেখি; চেষ্টা করিয়া ভুলিতে হইবে না—শুধু একবার চাও! ঐ দেখ,—নিম্নে পৃথিবী ভাষাহীন, নির্ব্বাক, আমার দিকে চাহিয়া মন্ত্রমুগ্ধ! ঐ দেখ বিশাল ব্যোমপথ আমার পানে চাহিয়া অবাক্—তাহার বুক গলাইয়া গুঁড়ি-গুঁড়ি বাষ্পকণা তোমাদের পৃথিবীর দূর্ব্বাশিরে নীহার-মুকুতা সাজাইতেছে! ঐ দেখ আলোক ও ছায়া, প্রেম ও বৈরাগ্য, গলা জড়াজড়ি করিয়া আমার পানে চাহিয়া আছে! ঐ—ঐ বুঝি দু'একটা পাখী জাগিয়াছে, কিন্তু এই বিরাট প্রেম-অভিনয়-গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিবার অধিকার না পাইয়াই যেন গলা ছাড়িয়া ডাকিতে পারিতেছে না! দেখ, ভাব, অনুভব কর—আরও দেখ সর্ব্বোপরি আমি শুকতারা! দুর্ব্বাসা-অভিশাপের

আখ্যা দিয়া থাকি; বস্তুতঃ বিভিন্ন নাম হইলেও ইহারা পরস্পর পৃথক নহে—একই তারকা। লেখক।

পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দুষ্মন্ত-ধ্যান-নিরতা শকুন্তলার মত আমি শুকতারা! রণক্ষেত্রে শৈবলিনীর হিতার্থ বিসর্জ্জিত-প্রাণ, অনুরাগ-অটল প্রেমিক প্রতাপের হৃদয় লইয়া, আমি শুকতারা!—প্রভেদ এই যে, আমার এ সাধনায় দুর্ব্বাসার অভিশাপ বর্ষিত হওয়া দূরে থাক্, জড় জগতেরও প্রাণ এ সাধনায় পূর্ণ হয়, মুগ্ধ হয়, দীক্ষা লইতে উন্মুখ হয়!—প্রভেদ এই যে, প্রতাপের মত আমার ভালবাসার নাম প্রাণ প্রতিষ্ঠার ব্রত উদ্‌যাপন! জীবন তুচ্ছ—একদিন না একদিন বিসর্জ্জনের কোলে ঢলিয়া পড়িবেই; প্রেম অমূল্য—জীবন-বিসর্জ্জনেই তাহার চরম পরিণতি নয়। প্রেমের কার্য্য প্রতিষ্ঠা—একটী হৃদয়কে সহস্র হৃদয়ের ভিতর প্রতিষ্ঠা—একের মহত্ত্ব সহস্রে সঞ্চারিত করা, সহস্রকে এক করা! জীবন-বিসর্জ্জন—সে কতটুকু? শুকতারা বিসর্জ্জন চায় না—প্রতিষ্ঠা চায়। বুঝিলে—আমি কি চাই বুঝিলে? না, এখনও বুঝিতে পার নাই; ঐ শোন, কান পাতিয়া শোন—এমনি নিভৃত-নির্জ্জনে, জীবকুলকে লুকাইয়া, জগতের বুক নাচাইয়া, অনন্তের পানে ও কি গম্ভীর সামগান ভাসিয়া উঠিতেছে, শোন দেখি! দেখ, জড়জগতেরও প্রাণ জাগিতেছে—কিন্তু তোমরা প্রাণীজগত, তোমরা প্রাণহীন কেন? আমি সূর্য্যকে ভালবাসিয়া সৌরজগতময় প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই—তোমরা কি আমার এ ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে দিবে না?

কি ভাবিতেছ? 'স্বপ্ন' বলি কেন বুঝিতে পারিতেছ না—এই ত? কিন্তু তাহা না বলিয়া কি বলি? তোমরা জান—স্বপ্ন অমূলক; আমি যাহা বলিলাম, তাহাও কি তোমাদের নিকট অমূলক বোধ হইতেছে না? তোমরা জান আমি 'প্রভাতী'মাত্র, কিন্তু কখনও শুনিয়াছ কি যে আমি রবি-প্রেমার্থিনী? ভাবিয়াছ কি যে, তাঁহার প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই আমি তাঁহার জগতকে ভালবাসি, তাঁহার জগতময় প্রেমের উৎস খুলিয়া দিতে চাই? না, শোন নাই—ভাব নাই; তাই ত বলিতেছি, এ স্বপ্ন—অন্ততঃ তোমাদের অভিজ্ঞানে স্বপ্নেরই মত অমূলক! দেখ, স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই নয়—অনেক সময় তাহা নিগূঢ় সত্যের প্রচারক; এখন বিচার করিয়া বল দেখি, আমার এ স্বপ্ন কি সত্যই অলীক?

যাক্, গোল করিও না; আমার গাথা, আমার এ প্রেম-স্বপ্ন তোমরা বুঝিবে না, আমিও ভাষায় তাহা বুঝাইতে পারিব না। কেমন করিয়া বুঝাইব? তোমাদের ভাষা যে অপূর্ণ। শুধু তোমাদের বলিয়া নয়, কোন্ ভাষা এ পর্য্যন্ত

প্রেমের রহস্যময় ভাবটুকু বুঝাইতে পারিয়াছে ? অক্ষরের নিগড়ে শব্দের বাঁধনে যাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে তাহা ভাষা হইতে পারে, কিন্তু প্রেমের 'ধরি ধরি ধরিতে না পারি'-ভাব তাহার ভিতর দিয়া কতটুকু ফুটিয়া উঠে ? অসীম যাহা, তাহাকে সীমার ভিতর দিয়া যে ভাবেই দেখাও না কেন—তাহা সীমাবদ্ধ ! তাই বলিতেছি, বুঝিতে না পারিলেও গোল করিও না। তবে, যদি বুঝিতে না চাও—এক উপায় আছে ; প্রতিদিন এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইও—প্রতি লোমকূপে কর্ণ ফুটাইয়া আমার এই নীরব ভাষার অব্যক্ত ঝঙ্কার শ্রবণ করিও—সহস্র জিহ্বায় তাহার ভাব-সুধা পান করিও—সহস্র চক্ষে আমার এই প্রেমোচ্ছ্বল নয়নের দিকে চাহিও ; দেখিবে—সকরুণ এস্রাজের তারে মাঝে মাঝে যে অজানা রাগিণী বাজে, শুকতারার শব্দহীন ভাষার এককোণে তাহা দুলিতেছে ! বুঝিবে বিশ্বের স্তূপীকৃত প্রেমকাব্যে যতটুকু ভাব এ পর্য্যন্ত ফুটিয়াছে, তাহা শুকতারার ভাষায় ব্যক্ত ভাবের কত সূক্ষ্ম কণাংশ ! আরও বুঝিবে—তোমাদের প্রিয়তমার আঁখিকোণে, কখনও অভিমানে, কখনও লজ্জায় বা সস্নেহ তিরস্কারে যে ভাষার প্রবাহ খেলিয়া যায়, তাহার শিক্ষয়িত্রী এই শুকতারা কি না !

কিন্তু না—আর আমি থাকিতে পারি না ; ঐ পূর্ব্বাকাশ ভেদ করিয়া তাঁহার হেমাভা বাহির হয় বুঝি ! কৈলাস পর্ব্বতে যোগমগ্ন মহেশ্বরের আদেশে পর্ব্বতের শান্তিরক্ষার জন্য, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গকে স্তব্ধ থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া, প্রহরী-স্বরূপ নন্দী আজও দাঁড়াইয়া আছে কি না, তাহা তোমাদের জানিবার উপায় নাই—তাই তাহার অনুরূপ ছবি এতক্ষণ দেখাইলাম ; দেখাইলাম—মানব-জ্ঞানকে লুকাইয়া, আত্মহারা অচেতন সৃষ্টি কেমন করিয়া এ সময় বিশ্বপিতার নিকট যোগশিক্ষা করে—আর সেই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া, কেমন করিয়া শুকতারা তাঁহার প্রিয়তম সবিতার উদ্দেশে সুগভীর সাধনায়, দিকে দিকে প্রেম, শান্তি, আনন্দ ও আলোক জাগাইয়া তোলে ! আর কি—আজ আমার কাজ শেষ হইল ; ঐ নদী সরোবর লাল হইয়া উঠিতেছে—ঐ যে কমল ঘোম্‌টা খুলিতেছে ; কমল কালামুখী—লজ্জা নাই, ছি ! *

প্রণাম দেবতা ! প্রণাম সবিতা ! কমল ঘোম্‌টা খুলিয়া তোমাকে আহ্বান করুক, কিন্তু আমি পলাই—আমি লুকাই।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

---

* শুকতারা কমলকে 'কালামুখী' বলিয়া গালি দিল—এ কি সপত্নী-বিদ্বেষ, না লজ্জাহীনতার প্রতিবাদমাত্র ? লেখক।

পোড়ো বাড়ী।

একবার নদীয়া জেলার কোনও একটী গ্রামে একজন আত্মীয়ের বাটী নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। রাত্রে আহারাদির পর নৌকাযোগে বাটী ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলাম। গঙ্গার ঘাট বড় বেশী দূর নহে, তবুও চলিতে একটু কষ্টবোধ হইতেছিল—সেটা বোধ হয় বার্দ্ধক্যবশতঃ। পথে আসিতে একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা দেখিলাম। তাহার ফটকের দুই পার্শ্বে দুইটী ছোট রোয়াক ছিল; ক্লান্তি দূর করিবার ইচ্ছায় তাহার একটী রোয়াকে বসিলাম।

বড় সুন্দর বাতাস বহিতেছিল; সেই নিস্তব্ধ অট্টালিকার সম্মুখে প্রশস্ত ভূভাগে বড় বড় ঝাউ ও দেবদারু বৃক্ষগুলি মাথা দোলাইতেছিল। পূজার দালানের নিকটেই একটী প্রকাণ্ড বকুল গাছ,—তাহার ঘন পল্লবের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়া যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। বাটীর ছাদের পিছন দিক হইতে অষ্টমীর চাঁদ উঠিয়া চারিদিকে জ্যোৎস্না ছড়াইতেছিল। বাটীখানি একবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম;—তাহার ধবলকান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অনেক বর্ষা-বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার গায়ে কাল দাগ ধরিয়া গিয়াছে; কোথাও খিলান ফাটিয়াছে, কোথাও বাতায়নের উপরিভাগে অশ্বত্থ ও বটগাছ জন্মিয়াছে; বারাণ্ডার রেলিং বহিয়া, ছাদের গা-নল বহিয়া লতা উঠিয়াছে। পূজার দালানখানি প্রায় 'পড় পড়',—বোধ হয় এ বৎসর বর্ষায় টিকিবে না। সেদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কতকগুলি পেচক তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া নীরব নহবৎখানার দিকে উড়িয়া গেল।

বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ বাটীখানি দেখিলাম, অনেকক্ষণ ভাবিলাম—গৃহে ফিরিবার কথা ভুলিয়া গেলাম। হায়, কত বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া গৃহস্বামী এই বাটীখানি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তাহার কত সাধের সংসার—কত সাধের সম্পত্তি! কোথায় আজ তাঁহার আনন্দকোলাহলপূর্ণ গৃহ—কোথায় তাঁহার সমৃদ্ধি-গৌরব! একদিন হয় ত এই পূজার দালানে গ্রামের লোক ধরিত না,—একদিন হয় ত এই পেচকের আবাস—নহবৎখানা, আগমনী-সঙ্গীতে মুখর হইয়া উঠিত—একদিন হয় ত অন্তঃপুর-মহিলাদের বোধন-শঙ্খের ধ্বনিতে সমস্ত

গ্রাম কাঁপিয়া উঠিত। ওই যে বাতায়ন,—ঐখানে বসিয়া হয় ত কোন দিন কোন সাধ্বী প্রবাসী স্বামীর উদ্দেশে চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন,—ওই আঙ্গিনায় হয় ত কোনও জননী তাঁহার ক্ষুদ্র শিশুকে চলিতে শিখাইয়াছেন,—ওই আমগাছের নীচে কতদিন জ্যৈষ্ঠের প্রভাতে হয় ত বাটীর সমস্ত বালক একত্র হইয়া আম কুড়াইয়াছে। হায়! আজ সে স্বর্গীয় দূতেরা কোথায়? কাহার অভিসম্পাতে,—কাহার পাপে তাহারা এ পৃথিবী ছাড়িল!

বাটীখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম সেই জনশূন্য নীরব অট্টালিকার দ্বার মুক্ত করিয়া প্রেতমূর্ত্তিবৎ একটী মনুষ্য চলিয়া আসিতেছে। নিকটে আসিলে বুঝিলাম, তিনি বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ নহেন। আমায় দেখিয়া তিনি বলিলেন, "অনেকক্ষণ আপনাকে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখিতেছি—এত রাত্রে এরূপ বসিয়া থাকিবার কারণ কি?"

আমি বলিলাম—"রাত্রেই নৌকাযোগে বাটী ফিরিব মনে করিয়া বাহির হইয়াছিলাম, পথে ক্লান্ত হইয়াছি বলিয়া এখানে কিছুক্ষণ বসিয়াছি।"

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমায় বলিলেন, "মহাশয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

আমি বলিলাম—"শ্রীমহেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা,—উপাধি মুখোপাধ্যায়।"

বৃদ্ধ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের নাম?"

বৃদ্ধ—শ্রীনবীনচন্দ্র দাস বসু।

আমি—আপনি একাকী এই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করিতেছেন কেন?

বৃদ্ধ—সব গিয়াছে,—রাবণের মত এখন এই পুরীতে একা বাস করিতেছি।

বৃদ্ধের যেন কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমি বলিলাম—"এরূপ ঘটনা ত প্রায় দেখিতে পাই না,—বড়ই দুঃখের বিষয় যে বিধাতা আপনার প্রতি বিরূপ।"

"তবে হতভাগার কাহিনী শুনিবেন কি? আজ আর তাহা হইলে আপনার বাটী যাওয়া হইবে না;—অনুগ্রহ করিয়া দাসের বাটীতে পদার্পণ করিবেন চলুন—কল্য প্রত্যূষে বাটী রওনা হইবেন।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমারও কৌতূহল বৃদ্ধি হইল ; আমি বলিলাম, "তবে চলুন, বসুজ মহাশয় আপনার বাটীতে তামাক খাইয়া ও কথোপকথন করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিই।" আমরা দুই বুড়ায় বড়ই মিশিয়া গেলাম।

বসুজ মহাশয়ের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি যে প্রকাণ্ড ঘর ; কড়ি-কাঠের চারিদিকে মাকড়সার জাল হইয়াছে। এক পাশে একখানি ছোট খাটের উপর বসুজ মহাশয়ের মলিন শয্যা রহিয়াছে। আমাকে বসিবার জন্য তিনি বাহিরের দালানে একখানি মাদুর বিছাইয়া দিলেন ও বহুকালের একটী ওয়ারহীন তাকিয়া আনিয়া দিয়া তামাকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তামাক প্রস্তুত হইলে হুঁকাটী আমার হাতে দিয়া বসুজ মহাশয় তাঁহার দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

"সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা ; বাটীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইতেছে, লোকে লোকারণ্য। আমরা সাত ভাই একান্নে ছিলাম, সকলেরই পুত্রকন্যা হইয়াছিল, তাহার উপর পোষ্যবর্গ অনেক ছিল ; এত বড় বাড়ীতে একখানি ঘরও খালি থাকিত না। পূজার সময় আত্মীয়-কুটুম্ব অনেক আসিয়াছেন, আমরা সকলেই ব্যস্ত। সে দিন আবার মহাষ্টমী, গ্রামের অনেক ভদ্র মহিলা পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছেন। আমরা অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলাম, বড় ভাইকে ভয় করিতাম না—সকলেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলাম। দাদা নিতান্ত ভালমানুষ, তিনি নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের আদর অভ্যর্থনা লইয়া ব্যস্ত আছেন, সুতরাং আমরা কি করিতেছি না করিতেছি সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। আমরা সকলে নেশা ভাঙ্ করিয়া একটা বীভৎস আমোদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আমাদের নিকট খাদ্য ও পানীয় প্রার্থনা করিল। ব্রাহ্মণ স্থবির, অতি কষ্টে লাঠি ধরিয়া পূজাবাড়ীতে কিছু পাইবে বলিয়া আসিয়াছে। আমরা বলিলাম, এখনও ব্রাহ্মণভোজন হয় নাই, এখন কিছু পাইবে না। ব্রাহ্মণ বলিল, ভাল কথা ; তবে শুধু একটু গুড় ও জল দাও—আমার বড় পিপাসা হইয়াছে।"

কে তাহাকে জল দেয়! আমরা হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিলাম। দুই গ্রাম্য বালক হিন্দুস্থানী দেখিয়া তাহাকে ছোটো ছোটো ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতে

লাগিল। ব্রাহ্মণ মহা কুপিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমাদেরও হঠাৎ রাগ বাড়িয়া গেল।

আমরা তাহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম। আমাদের ছোটো ভাইটী তাহার হাত হইতে লোটা কাড়িয়া লইতে গিয়া নিজের দোষে নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিল। আর কি রক্ষা আছে? আমরা একে উন্মত্ত, তাহার উপর এই ঘটনায় ক্রোধে একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলাম। সকলে মিলিয়া সেই প্রাচীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহার মাথা ফাটিল—ঠোঁট কাটিল, ক্ষীণ পঞ্জরে বিষম আঘাত লাগিল। বুকে হাত দিয়া ব্রাহ্মণ ওই বকুলগাছের তলায় বসিয়া পড়িল। ব্যাপার সাংঘাতিক দেখিয়া আমরা সকলে ছুটিয়া পলাইলাম। দাদার নিকট সংবাদ গেল, তিনি আমাদিগকে তিরস্কার করিতে করিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ ঘন ঘন কাঁপিতেছে ও তাহার বাক্‌রোধ হইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনাইলেন, কোনো ফল হইল না; সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিল।

সেদিন সন্ধি-পূজায় বলিদানের মহিষ 'বাধিয়া' গেল। অমঙ্গলাশঙ্কায় সকলের মুখ শুকাইল। পুরোহিত মহাশয়কে শান্তির জন্য বলিলে তিনি অভয় দিয়া বলিলেন "ঐ হত পশুর মাংস দিয়া হোম করিলে—সমস্ত অশুভ নষ্ট হইবে।" আমরা হোমের আয়োজন করিয়া দিলাম,—পুরোহিত হোম করিলেন; কিন্তু হায়, ছেলে খেলায় কি দেবতা ভুলে! বিজয়ার দিন রাত্রে দাদা ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিলেন; বাটিতে প্রত্যহ দুই তিন জন করিয়া লোক মরিতে আরম্ভ হইল। এক ব্যাধিতে পনের দিনের মধ্যে বাটী শ্মশান হইল। এক মাসের মধ্যে কেবল আমি অবশিষ্ট রহিলাম।"

গল্প শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আমি বলিলাম "তারপর"?

"তারপর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইলাম—ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিলাম; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত শান্তি পাইলাম না। বাটীখানি দেবতার জন্য লিখিয়া দিয়াছি, কিন্তু এত বড় বাটীর জীর্ণ সংস্কার কে করিবে?"

"একে একে বাটীর ছাদে বটগাছ জন্মিল। জানালা ভাঙ্গিল, কার্ণিস খসিল,

উঠানে আগাছা বাহির হইল। ওই দেখুন, আমার বড়দাদার ঘর, ওই ছোটো বৌমার ঘর, ওই ছেলেদের পড়িবার ঘর; ওই দেখুন আমগাছ ফলভারে মাটীতে ঠেকিতেছে, আজ আম খাইবে কে? কোথায় আমার হৃদয়ের ধনেরা"—বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ আবার বলিয়া উঠিল—"আজ ত্রিশ বৎসর ওই বকুলগাছের দিকে চাহিতে পারি নাই,—চাহিলেই বুক কাঁপিয়া উঠে; দেখুন, দেখুন ভূদেব ও কি।

সবিস্ময়ে বকুলগাছের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যেন তাহার তলদেশে একটী মনুষ্যের অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মূর্ত্তি বাতাসে মিশাইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠের নিশীথ-বায়ুতে ঘনপল্লবসমন্বিত বকুলগাছটি যেন মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ আবার বলিল—"আজ ত্রিশ বৎসর ওই মূর্ত্তি বকুলগাছের তলায় দেখিয়া আসিতেছি।"

আমি ভাবিলাম গল্প শুনিয়া বুঝি আমার চক্ষের ভ্রম হইয়াছিল। পরদিন প্রভাতে নৌকায় উঠিলাম।

শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উড়িষ্যার তপোভূম।

উড়িষ্যা-প্রদেশের প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থক্ষেত্রসমূহ তপোভূম, সাধনভূম, দর্শনভূম ও পরিক্রমভূম এই চারি ভাগে বিভক্ত। যেস্থানে কেবল দর্শন ও পরিক্রম ক্রিয়া হয় তাহা পরিক্রমভূম নামে খ্যাত; যে স্থানে দর্শন মাত্র হয়, কিন্তু পরিক্রম না করিলেও অপরাধ হয় না, তাহা দর্শনভূমমধ্যে গণ্য। যে পুণ্যময় স্থানে সাধনায় ব্রতী হইতে পারা যায়, তাহা সাধনভূম এবং যেখানে তপস্বীরা অবস্থান করিয়া তপঃক্রিয়া করেন, তাহা তপোভূম বলিয়া প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যার সাক্ষীগোপালের মন্দির দর্শনভূম, জগন্নাথের মন্দির পরিক্রমভূম, বৈতরণী ও বিরজা এই স্থানদ্বয় সাধনভূমি এবং ভুবনেশ্বর, কপিলেশ্বর, খণ্ডগিরি

ও উদয়গিরি তপোভূম বলিয়া গণ্য। দর্শনতীর্থ অপেক্ষা পরিক্রম-তীর্থ শ্রেষ্ঠতর, পরিক্রম-তীর্থ হইতে সাধন-তীর্থক্ষেত্র উৎকৃষ্ট এবং সাধনভূম হইতে তপোভূম কেবল শ্রেষ্ঠতর নহে, পরন্তু সমুদয় তীর্থস্থল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। নানা কারণে পুরীধামস্থ জগন্নাথদেবের প্রখ্যাতি উত্তরোত্তর এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, উড়িষ্যা-প্রদেশে জগন্নাথদেবের মন্দির এখন শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম দেবালয় বলিয়া গণ্য এবং সর্ব্বোত্তম তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। জগন্নাথের প্রবল প্রভাবে অথবা পাণ্ডাদিগের প্রবল পরাক্রমে অন্যান্য তীর্থসমুহ ঈদৃশী খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু শাস্ত্রমতে—আধ্যাত্মিক বিধিমতে—উড়িষ্যার তপোভূমের যেরূপ প্রসিদ্ধি, পবিত্রতা ও প্রাচীনত্ব রক্ষা করা উচিত, নানাকারণে তদ্দেশবাসীরা তাহা করে নাই। কারণগুলি অতঃপর যথাস্থানে অভিব্যক্ত করিব।

উড়িষ্যায় সাধক, জাপক, যাত্রী, উপাসক ও তপস্বীর স্থান আছে বটে, কিন্তু যাজ্ঞিকের স্থান নাই। শাস্ত্রমতে উড়িষ্যা যজ্ঞভূমি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, এজন্য এ প্রদেশে যজ্ঞ করা নিষিদ্ধ। শাস্ত্রমতে যজ্ঞের যে সকল অন্তঃরায় আছে, উড়িষ্যায় প্রায় তৎসমুদয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সমুদ্রতীরে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ; যেখানে এক শৃঙ্গের কৃষ্ণবর্ণ গাভী বিচরণ করে, সে স্থানে যজ্ঞাদি হইতে পারে না; যে দেশে সূর্য্য প্রথমে উদয় হয় (অর্থাৎ প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্যালোক পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়) সেদেশে যজ্ঞ হয় না; যে দেশে বৈতরণী নদী অবস্থিতা, সেদেশে যজ্ঞ হইবে না। ইত্যাদি, ইত্যাদি। উড়িষ্যা প্রদেশে এই সমুদয়ই আছে, সুতরাং ওড্র দেশ যজ্ঞভূম নহে। বৈতরণী পার হইয়া প্রাচীনা বিরজা দেবীর স্থানে তান্ত্রিক, কাপালিক ও অঘোরী সাধকগণ এত অত্যাচার করিত, এতাদৃশ তামসিক ও ম্লেচ্ছজনোচিত ব্যবহার করিত যে, ঐ স্থানে গমন এবং তথায় কোন পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে অনেক শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কালক্রমে বিরজাতীর্থে তান্ত্রিকগণের এই অত্যাচারাদি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন আর ম্লেচ্ছাচার নাই। ফলতঃ তপোভূমের তুল্য উড়িষ্যা প্রদেশে শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম স্থান আর নাই। আমি পূর্ব্বেই কহিয়া রাখিয়াছি, ভুবনেশ্বর, কপিলেশ্বর, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি এই চারিটি স্থান উড়িষ্যার তপোভূম বলিয়া গণ্য। ইহা তপস্বীদিগের স্থান। অতি পুরাকালে তপোপ্রভাবশালী

মহাপুরুষগণ এস্থানে তপঃসাধন করিতেন। ছোটনাগপুর বিভাগের দুই স্থল ব্যতীত এমন মনোহর স্থান বঙ্গদেশে আর নাই। এক সময়ে এই সমুদয় স্থান গহনারণ্যে সমাবৃত ছিল, কালক্রমে বনের বৃক্ষাদি কর্ত্তিত ও ঐ স্থানসমূহ পরিষ্কৃত এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক অধিবাসিত হইয়া আসিয়াছে; এখনও অনেক স্থানে গহন বন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই পুণ্যময় ও প্রাচীন তপোভূমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে অভিলাষী হইয়াছি। উড়িষ্যার তপোভূমে আমি অনেকবার গিয়াছিলাম, কিন্তু কখন ইহাদের বিবরণ লিখিয়া রাখি নাই। বঙ্গীয় ১৩১৪ সালের শীতঋতুর প্রারম্ভে এই স্থানে পুনরায় গমন করিয়া ভুবনেশ্বর, কপিলেশ্বর, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পরিব্রজন করিয়াছিলাম; বর্ত্তমান প্রবন্ধের অধিকাংশ এবারকার লিখিত রোজনামচা হইতে গৃহীত। কলিকাতা হইতে ভুবনেশ্বর যাইতে হইলে পুরীধাম পর্য্যন্ত যাইতে হয় না, কয়েকটা রেলওয়ে ষ্টেশন বাকী থাকে। ভুবনেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩॥০ মাইল পথ দূরবর্ত্তী; বহুবর্ষ পূর্ব্বে আমি যখন সর্ব্বপ্রথমে এই তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছিলাম, তখন যে পরিমাণে বন ছিল, এবারে দেখিলাম তাহার অনেক কম হইয়া গিয়াছে। বনের মধ্যে ও পথের দুই পার্শ্বে বহুসংখ্যক আশ্রম, স্তূপ, স্তম্ভ, মন্দির ও যোগী-কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়; অনেক মন্দির ও তপস্বীর আশ্রম অর্দ্ধভগ্ন বা একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এরূপ মন্দির একালের মিস্ত্রির দ্বারা নির্ম্মিত হয় না; যাহারা পুরুষানুক্রমে এরূপ ভাস্কর্য্য-বিদ্যায় পটু ছিল তাহাদের বংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা ভুবনেশ্বরস্থ বিন্দু সরোবর নামক প্রাচীন ও সুদীর্ঘ পুকুরে স্নানাদি করিয়া ভুবনেশ্বর মহাদেব দর্শন করেন। মন্দিরের সম্মুখে ৫টা সিংহমূর্ত্তি; মন্দির উচ্চতায় যেমন প্রকাণ্ড, পরিধি ও প্রাঙ্গণের প্রশস্ততাতেও তেমনি বিরাট। ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে এতৎসম্বন্ধে ধারণা হওয়া সুকঠিন। এদেশে মুসলমানের আদৌ বসতি নাই, সমুদয় অধিবাসীই হিন্দু এবং প্রতি সহস্রে প্রায় ৯৯৫ জন উড়িয়া। এখানকার শস্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ওজন ১২০ সিক্কায় সের অর্থাৎ কলিকাতা হইতে প্রায় অর্দ্ধ সের অধিক। ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র এক সময় বৌদ্ধ শ্রাবক (সাধক)দিগের অধিকৃত ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এখানকার গুহাদি দর্শন করিলেই তাহা সহজে স্থির করিয়া লওয়া যায়। মহাদেবের মূর্ত্তি আমাদের দেশের লিঙ্গমূর্ত্তিবৎ নহে, ইহার

নাম "হরিহর মুর্ত্তি।" ভারতবর্ষের আর কোথাও শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রথানুসারে একই দেবমন্দিরে এরূপ একত্র পুজা হয় না; এখানে বৈষ্ণবের তুলসী এবং শাক্তের বিল্বদল দ্বারা মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, "হরি" শব্দ বৈষ্ণবের উপাস্য বিষ্ণু শব্দাত্মক এবং "হর" শব্দ শাক্তের উপাস্য শিব। জগন্নাথ-মন্দিরে যেমন প্রসাদে বর্ণভেদ নাই, এখানেও তদ্রূপ বর্ণভেদ নাই; সকল জাতি উচ্ছিষ্টজ্ঞান বা বর্ণভেদজ্ঞান বর্জ্জন করিয়া মহাদেবের "ভোগ" ভক্ষণ করেন। কার্ত্তিক মাসের সন্ধ্যার আরতিতে ভুবনেশ্বর মহাদেবকে দামোদর মুর্ত্তিতে ভূষিত করা হইয়া থাকে এবং তখন ঐ আরতি "দামোদর শৃঙ্গার" বলিয়া কথিত হয়। যে পুণ্যময় তীর্থক্ষেত্রে ভুবনেশ্বর মন্দির অবস্থিত, তাহার প্রাচীন নাম সুবর্ণকোট। সমুদয় স্থানটি না-খিরীজ সম্পত্তি অর্থাৎ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে কিম্বা কোন স্বদেশীয় রাজা বা ভূস্বামীকে কর দিতে হয় না; অতি পুরাকাল হইতে ইহা "নিষ্কর" বলিয়া গণ্য। আমাদের দেশে বর্ষার প্রারম্ভে রথোৎসব হইয়া থাকে, ভুবনেশ্বর-ধামে চৈত্র মাসে রথ হয়, তখন মেলা-উপলক্ষে বহুযাত্রী নানা স্থান হইতে আগমন করিয়া থাকে। শিবরাত্রি উপলক্ষেও অত্যন্ত জনতা হয়, কিন্তু এদেশে যবনের বসতি নাই বলিয়া কোন প্রকার উৎপাত আরম্ভ হয় না। ভুবনেশ্বরের চারি ধারে দশ মাইল (পঞ্চ ক্রোশ) দূর পর্য্যন্ত এক সময়ে এক লক্ষাধিক মন্দির, দেবমুর্ত্তি, যোগাশ্রম, গুহা, তাপস-কুটীর, প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে অগণ্য ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও সহস্র সহস্র মন্দির, আশ্রম ও মুর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বরে জলকষ্ট প্রায় বারমাসই বিদ্যমান দেখা যায়; এখানকার লোকেরা কূপোদক পান করে, কিন্তু কূপের সংখ্যা অধিক নহে অথচ বৎসরের সকল ঋতুতেই যাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমভাবেই দৃষ্ট হয়। বিন্দু সরোবর বা "দেবীপদগ্রাহী" নামক পুকুরের জল একেবারে পানের অনুপযুক্ত। শেষোক্ত সরোবর অতি পুরাতন। ইহার আকার বৃহৎ ও ইহা দেখিতে পরম সুন্দর। ইহার চারিধার মনোহর ও সুদৃঢ় প্রস্তর দিয়া বাঁধান; চতুর্দ্দিকেই সাধুদের অবস্থান জন্য ছোট ছোট অগণ্য স্তূপ ও আশ্রম দৃষ্ট হয়। উড়িষ্যাবাসীদিগের প্রাচীনতম ইতিহাস ও পঞ্জিকামতে ভুবনেশ্বর মন্দির ১৮১২ বৎসরের পুরাতন। ইহা কেশরী রাজবংশের শাসন-কালে নির্ম্মিত বলিয়া সর্ব্ব দ্বারে সিংহমুর্ত্তি দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক প্রয়ো-

অনীয় স্থানে বা কীর্ত্তিতে সিংহের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এক সময়ে উড়িয়ারা অত্যন্ত পরাক্রমী হইয়া উঠিয়াছিল সে সময়ে "সিংহ"-মূর্ত্তি তাহাদের রাজচিহ্ন ছিল (Royal insignia)। দক্ষিণাবর্ত্তে ও মধ্যপ্রদেশে এখনও অনেক উড়িয়া রাজা আছে। বামড়া, নওয়াপাড়া, কালীকট, রণপুর, টেন্‌ণী প্রভৃতি বহুস্থানে এখনও উড়িয়া রাজাদের বংশ ও জমিদারী রহিয়াছে। খাস ওড্র দেশে অদ্যাপি আঠারটি রাজবংশ রাজ্যশাসন করিতেছেন। উড়িষ্যার শাস্ত্রীয় নাম ওড্র।

কপিলেশ্বর তীর্থ, ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্র হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে যাওয়া যায়। ইহাও নাথিরাজ সম্পত্তি। ভুবনেশ্বর ও কপিলেশ্বর এতদুভয় তীর্থ পুরী জেলান্তর্গত খুর্দ্দা মহকুমার অধীন। ভুবনেশ্বর হইতে কপিলেশ্বর যাইবার সময়ে "ছোট বৈদ্যনাথ শিব" নামে এক অতি প্রাচীন স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে; শুনা যায়, একস্থানে এক সময়ে কেশরী রাজাদিগের সহিত অনার্য্য বীরজাতির বহুবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। শিবের ছোট মন্দির, লিঙ্গ ও প্রাচীন "ভোগাশ্রম" এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কপিলেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে মণিকর্ণিকা নামে এক মনোহারিণী পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সলিল যেমন স্বচ্ছ, চারিদিকের প্রস্তর বাঁধাইও তেমনি সুন্দর। ঘাটের উপরে বুদ্ধদেবের কয়েকটী মনোহর প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখা যায়। কপিলেশ্বরেও বর্ণভেদ নাই এবং কেহই উচ্ছিষ্টজ্ঞান করে না। মন্দিরের ভিতর ভৈরবী, দক্ষিণাকালী, গণেশ, কার্ত্তিকেশ্বর, নন্দী-ভ্রুকুটি, শনিচর গ্রহ, পার্ব্বতী, চন্দ্রশেখর, মহাদেব, পাতাল লিঙ্গেশ্বর, জলেশ্বর, বৃহস্পতি প্রভৃতি মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের চারিধারে সুন্দর প্রাচীর। বিন্ধ্যবাসিনী বুদ্ধদেব, হনুমান ইত্যাদির মূর্ত্তিও মন্দির-প্রাঙ্গণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মন্দিরের শিখরে ত্রিশূল ও ধ্বজা থাকে। মন্দিরের দুই দ্বার, প্রত্যেক দ্বারে সিংহমূর্ত্তি, বুদ্ধদেব ও ভগবতীর মূর্ত্তি আছে। এক স্থানে রথ রাখিবার ঘর দেখিলাম, তাহার উপরে উঠিলে বাবা ভুবনেশ্বরকে দর্শন করা যায়। আর একস্থানে নবগ্রহের পূজার জন্য সমস্ত গ্রহের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এক দিকের কোণে বহুসংখ্যক প্রস্তরময়ী ফণিমূর্ত্তিও দৃষ্ট হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বর ও কপিলেশ্বর এই উভয় তীর্থক্ষেত্র অতীব পুরাতন, পবিত্র ও প্রখ্যাত। অতি পুরাকাল হইতে মহাতপপ্রভাবশালী তপস্বীগণ এখানে তপ-সাধনা করিতেন, তাঁহাদের সাধনের অসংখ্য আশ্রম এখনও পর্ব্বত ও অরণ্য

মধ্যে অর্দ্ধভঙ্গ অথবা সম্পূর্ণ ভঙ্গাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা সিদ্ধপুরুষদিগের সাধনভূম, এজন্য "তপোভূমি" বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠতম তপোভূমের কথা এখনও বলা হয় নাই, বারান্তরে তাহার বিবরণে হস্তক্ষেপ করিব।

স্বর্গীয় ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বাণী-বন্দনা।

(রাজসাহী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে লেখক কর্ত্তৃক গীত।)

তিমিরনাশিনী, মা আমার!
হৃদয়-কমলোপরি, চরণ-কমল ধরি',
চিন্ময়-মূরতি অখিল-আধার!
নিন্দি' তুষার-কুমুদ-শশি-শঙ্খ,
শুভ্র-বিবেক-বরণ অকলঙ্ক,
মুক্ত-শূন্য-ময়, শ্বেত রশ্মি-চয়,
দূর করে তমঃ-তর্ক-বিচার।
ওই করিল করুণাময়ী দৃষ্টি,
সম্ভব হইল জ্ঞানময়ীসৃষ্টি;
আদি-রাগ-ধর, বীণ-সুধা-স্বর,
জাগ্রত করিছে নিখিল সংসার।
কালিদাস-ভবভূতি, মহাকবি,
বাল্মীকি, ব্যাস, ভাগবত ভারবি,
ও পদ-ধূলি-বলে, লভিল ধরাতলে,
অক্ষয় কীর্ত্তি, পরম সৎকার।
জ্যোতিষ-গণিত-কাব্য-শুভ-হস্তে!
ভগবতি! ভারতি! দেবি! নমস্তে!
দেহি বরপ্রদে! স্থানমভয় পদে,
ত্বরিতে দূর কর মোহ-আঁধার।

স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন।

---

* নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, গ্রন্থকার এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিক।

দিল্লী।

রাজধানী—যুক্তপ্রদেশ—শাহজাহানাবাদ।

গঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী হস্তিনাপুর নগর যে প্রাচীন কালে হিন্দুস্থানের রাজন্য-বর্গের রাজধানী ছিল, তাহা ভারত ও পারস্যের বহু ইতিহাস হইতেই জানা যায়। তৎকালে এই নগরের প্রসার ও বিস্তৃতি অত্যন্ত অধিক ছিল বলিয়া শুনা যায়। এখনও এখানে বহু লোকের বসতি থাকিলেও, লোক-সংখ্যা কিন্তু তৎকালের তুলনায় অল্পই বলিতে হয়। পাণ্ডব ও কৌরব রাজদিগের শাসন-কালে, তাঁহাদের উভয় দল মধ্যে বিরোধ জ্বলিয়া উঠিলে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া যমুনা-কুলবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থে গমন পূর্ব্বক তথায় তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করেন।

তারপর বহুকাল অতীত হইলে রাজা আনন্দ পাল তোমর * ৪৪০ বিক্রমজিতে (৩৮৩ খৃঃ) ইন্দ্রপথের সন্নিকটে দিল্লী নগরীর স্থাপনা করেন। তৎপরে প্রায় দ্বাদশ শত বিক্রমজিতে রায় পিথোরা † স্বীয় নামে একটি নগরী ও একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সুলতান কুতুবুদ্দিন ঐবক ও সুলতান শামসুদ্দিন আল্‌তামাশ (পরে) সেই রায়পিথোরা দুর্গে বাস করিয়াছিলেন। সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন বল্‌বন ৬৬৬ হিজরীতে (১২৬৭-৬৮ খৃঃ) 'সরণ' ‡ নামে আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সুলতান মৈজ্জুদ্দিন কৈকুবাদ ৬৮৬ হিজরীতে (১২৮৭ খৃঃ) যমুনার তীরে কিলুগড়ী ¶ নামে মনোরম প্রাসাদপূর্ণ এক নগর স্থাপন করেন।

---

* বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির ১৫৬ ডি–সংখ্যাযুক্ত পুস্তকে 'তোনবার' (তোনোয়ার) আছে। আইন-ঈ-আকবরী মতে তারিখ ৪২৯ সম্বৎ (৩৭২ খৃঃ) এবং নাম 'তোনবার'। টডের মতে নাম 'তুয়ার' ও তারিখ ৮৪৮ সম্বৎ (৭২৯ খৃঃ)।—সরকার।

† চুহানরাজ পৃথ্বিরাজ। তিনি ৫৮৫ হিজরী (১১৯২ খৃঃ) ১২৪৯ বিক্রম সম্বতে দেহত্যাগ করেন।—সরকার

‡ ইলিয়টের মতে "শহর জঘন" (The City Kite)—সরকার।

¶ সোসাইটির পুস্তকে ইহাকে "কিৎলুগড়ী" রূপেও পড়া যায়। ইলিয়টে 'কিলুগড়ী' আছে। আইন-ই-আকবরী মতে "কেলুখরী"।—সরকার।

আমীর খুসরু তাঁহার "কিরানু-স-সাদৈন" নামক পুস্তকে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সুলতান জালালুদ্দিন খিলজী, "কুশকলাল" (লোহিত প্রাসাদ বা চুনীর প্রাসাদ) নগর এবং সুলতান আলাউদ্দিন "কুশক সৈরি" (প্রাচুর্য্য-প্রাসাদ) নগর নির্ম্মাণ করিয়া তত্তৎ স্থলে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন।

সুলতান বিয়াসুদ্দিন তঘলক শাহ ৭২৫ হিজরীতে (১৩২৫ খৃঃ) তঘলকাবাদ শহর নির্ম্মাণ করেন। তৎপুত্র সুলতান মহম্মদ ফকরুদ্দিন জুনা অপর একটি নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে এক সহস্র স্তম্ভশোভিত এক উচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। লোহিত প্রস্তর-নিৰ্ম্মিত আরও কতকগুলি মনোরম গৃহ নগরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। সুলতান ফিরুজশাহ ৭৫৫ হিজরীতে (১৩৫৪ খৃঃ) ফিরুজাবাদ নামক এক বৃহৎ নগর স্থাপন করিয়া এক খাল কাটাইয়া যমুনার জল শহরের নিকটে আনাইয়াছিলেন। ফিরুজাবাদ হইতে তিন ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে অভ্রভেদী (মূলে আছে—পৃথিবী-অবলোকনকারী) চূড়াসমন্বিত এক প্রাসাদ এখনও বিরাজ করিতেছে। লোকে ইহাকে ফিরুজ-শাহের লথ্ বা স্তম্ভ কহিয়া থাকে। সুলতান মুবারক শাহ মুবারকাবাদ শহর স্থাপন করেন।

৯৩৮ হিজরীতে * (১৫৩১ খৃঃ) সম্রাট নশীরুদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুন ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের (পুনঃ) স্থাপনা করিয়া তাহাকে সুশোভিত করিয়া তুলেন এবং তাহার "দিন্‌পনহ" (বিশ্বাসের আশ্রয়) নামকরণ করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। শের শাহ আফগান আলা (উদ্দিন খিলজী)র "কুশকসৈরি" নগর বিধ্বস্ত করিয়া আর একটি শহর নির্ম্মাণ করেন। তৎপুত্র সেলিম সাহ ৯৫৩ হিজরীতে (১৫৪৬ খৃঃ) সেলিমগড় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; শাহজাহানাবাদ দুর্গের বিপরীত দিকে যমুনা নদীর মধ্যে ইহা এখনও বর্ত্তমান আছে।

যদিও এই রাজগণের সকলেই ভিন্ন ভিন্ন শহর নির্ম্মাণ করিয়া তথায়

---

* সোসাইটির পুস্তকমতে ৯৩৮ হিজরী। ইলিয়ট অষ্টম খণ্ডে ৯৪৩ হিজরী লিখিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চম খণ্ডে দিন্‌পনহ্ নির্ম্মাণের বর্ণনাকালে যথার্থ তারিখ ৯৩৯ হিজরী লিখিয়াছেন।—সরকার।

আপনাপন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি কেবল একমাত্র দিল্লী শহরই হিন্দুস্থানের রাজবৃন্দের রাজধানীরূপে দেশের সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সম্রাট শাহজাহান ১০৪৮ হিজরীতে (১৬৩৮ খ্রীঃ) স্বীয় গৌরবময় সিংহাসনারোহণের দ্বাদশ বৎসরে দিল্লীর সন্নিকটে এক শহর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার শাহজাহানাবাদ নাম রাখেন। অন্যান্য নদী যেমন গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়া গঙ্গা নামেই অভিহিত হইতে থাকে, সেইরূপ শাহজাহানাবাদ স্থাপিত হইবামাত্র পূর্ব্বতন রাজদিগের শহরসমূহ আপনাপন নাম হারাইয়া এক শাহজাহানাবাদ নামেই পরিচিত হইয়া উঠে।

ইহার দুর্গ লোহিত প্রস্তর দ্বারা অতি সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। মনোরম হর্ম্ম্যরাজি, (আমোদের ভাণ্ডারস্বরূপ) বহুল প্রাসাদ, (প্রফুল্লতার নিভৃত নিকেতন-স্বরূপ) নানাবিধ গৃহ, (শান্তির আবাসস্বরূপ) বিভিন্ন প্রকারের উপবেশন পীঠ, কতকগুলি দৃষ্টি-সুখকর 'গাড়া বারাণ্ডা', বহমান্ প্রণালী-সমূহ, বৃহৎ বৃহৎ দীঘি, বিস্তৃত বিস্তৃত জলাধার, উচ্চ উচ্চ নির্ঝর, চির-বসন্ত-সেবিত উদ্যানাবলী, ফলভারাবনত বৃক্ষরাজী তন্মধ্যে শোভা পাইতেছে। সে সমস্তই লোকের মনে স্বর্গভূমির কথা জাগাইয়া দেয়। সহরের প্রত্যেক অংশই নন্দন কাননের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। ইহার প্রত্যেক প্রাসাদ যে কোন কৈসরের (সম্রাটের) প্রাসাদ অপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। ইহার প্রত্যেক হর্ম্ম্য (ন্যায়বান্ নোশিরওয়ান্) কিস্রার হর্ম্ম্যের ন্যায় হৃদয়কে আনন্দে অভিভূত করিয়া তুলে।

(শ্লোক)

ইহার মৃত্তিকার প্রতি অণু স্বর্গের ন্যায়;
ইহার সর্ব্বত্র উদ্যান আছে।
ইহার কুসুমান্তরগুলি এত মনোরম যে, যে কেহ বলিতে পারে,
যে, ইহার অনতিপ্রসর পথগুলি নন্দনের বর্ত্ম।
ইহার বাতাস হৃদয়াকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর;
সঞ্জীবতা ইহার দাস-সন্তান-বৎ॥

ইহার চতুঃপার্শ্বে সুনির্ম্মল জলপূর্ণ এক বিস্তৃত পরিখা—তাহার জল এত স্বচ্ছ যে, তামসী রজনীতেও তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণাগুলি পর্য্যন্ত চক্ষুগোচর হয়

এবং তাহা এত গভীর যে, তাহার অভ্যন্তরস্থ মৎস্য-সমূহ জগদ্ধারণ মৎস্য (-রাজ) এর * সহিত সমকক্ষতা করে।

(শ্লোক)

ইহার নির্ম্মলতা এত অধিক যে, এক জন অন্ধও মধ্যরাত্রে ইহার তলদেশস্থ সূক্ষ্ম বালুকণাগুলি গণিতে পারে। ইহার গভীরতা এত অধিক যে, মনে হয়, পৃথিবী যেন ইহার তলদেশ হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।

পূর্ব্ববাহিনী যমুনা এই দুর্গের পাদদেশ চুম্বন করিয়া গৌরব ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে এবং আরও শতাধিক গরিমামণ্ডিতা হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। সিরমুর পাহাড় হইতে খনিত এক রাজকীয় প্রণালী † শহরের রাজপথাবলী ও বাজার-সমূহের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে এবং শহরবাসীদিগের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিতেছে। কত দীঘি ও কত জলাধার জলপূর্ণ রাখিয়া ও কত উদ্যানের সতেজতা সম্পাদন করিয়া ইহা কত বড় বড় হর্ম্মের শোভা বাড়াইয়াছে ও শত নির্ঝর হইতে বাহির হইয়া এক সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে।

(শ্লোক)

উদ্যানের প্রতি পার্শ্বেই এক একটি খাল আছে,

তাহারা মাতালের মত উঠিতেছে পড়িতেছে।

শহরকে বেষ্টন করিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত এক প্রাচীর দণ্ডায়মান—তাহার পরিধির ধারণা কল্পনাতীত। শহরের অভ্যন্তরস্থ ও বাহিরে চতুঃপার্শ্বস্থ জন-সংখ্যা গণনাতীত। রুম (টার্কি), জাঞ্জিবার এবং সিরিয়ার অধিবাসীরা, ইংরেজ ও ডাচেরা, ইয়েমেন্, আরব, ইরাক্, খোরাসান, খোয়ারিজম্, তুর্কিস্থান, কাবুল, জবুলিস্থান, কাথে, খোটান, চীন, মচীন, ‡ খাসগড়, কলমাকিস্থান, তিব্বত ও কাশ্মীর এবং হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রদেশের জনবর্গ হিন্দুস্থানী ভাষার জন্মস্থান এই বিশাল শহরের ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা করিয়া এখানে বসবাস করিতেছে ও নানা ব্যবসায়-বাণিজ্যে বা অন্য কোন কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল

* পারসীক কবিরা কল্পনা করেন যে, এক বিশাল মৎস্য এই জগৎকে তাহার পৃষ্ঠদেশে বহন করিতেছে।

† ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিরুজশাহ কর্তৃক খনিত 'যমুনা খাল'।—সরকার

‡ মহাচীন বা মচীন—চীনেরই নামান্তর। (আইন ২,১১৮ এবং ইলিয়ট ১,৪৮)—সরকার।

বিভিন্ন শ্রেণীর জনবর্গ গদ্য বাক্যাবলীর ন্যায় একত্রে মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে; আর তাহাদের রীতি-নীতি পদ্যশ্লোকের ন্যায় এক সুরে গাঁথা।

ইহার হৃদয়-মুগ্ধকর হর্ম্ম্যগুলির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য নিখুঁত; প্রাণতৃপ্তিকর প্রমোদাগারগুলি সুখ ও কমনীয়তায় মণ্ডিত; বর্ত্মগুলি শোভা ও সৌন্দর্য্যে উদ্যানের কুসুমাস্তরের মত সুদৃশ্য; প্রতি পল্লীর বর্ত্মসন্ধিগুলি উদ্যানের বর্ত্মসন্ধির ন্যায় সুন্দর ও মনোরম; ইহার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিগৃহই চিরবসন্ত-সেবিত কুসুমাস্তর বলিয়া ভ্রম হয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি বর্ত্মেরই পার্শ্বে সুস্বাদু জলপূর্ণ প্রণালী বিরাজ করিতেছে। ইহার বাজারের পথগুলি রত্নাবলীর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্নবর্ণের তরঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল ও হৃদয়াকর্ষক; ইহার পণ্যবীথিকাগুলি প্রিয়তমের ভ্রূযুগ্মের ন্যায় সুখ ও সৌন্দর্য্যের আধার। বিভিন্ন দেশ, বন্দর ও ও শহরের দুষ্প্রাপ্য যাবতীয় দ্রব্যই ইহার বাজারে পাওয়া যায়। তাহার কোথাও বদখ্‌শানের মরকত, ওমানের দীপ্তিদায়ক মুক্তা ও নীলকান্তমণি, সমুদ্র ও খনির উজ্জ্বল মুক্তা, প্রবাল ও অন্যান্য তেজোময় রত্নাবলী, কোথাও বা বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র, পণ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য দ্রব্য, পানীয়, সুগন্ধি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য বিক্রীত হইতেছে। কোন স্থানে নানা দেশের বহু প্রকারের শুষ্ক ও টাটকা ফল দোষোদ্ঘাটন-নিপুণ সুভোজ্যপ্রিয় ব্যক্তিদিগের পাকস্থলীর সূক্ষ্মত্বক্‌বিশেষে আনন্দের ও কেমন এক সুখাবেশের সৃষ্টি করিতেছে। কোথাও বা বিখ্যাত হস্তী, বায়ুগতি অশ্ব, ভারবাহী দ্রুতগামী উষ্ট্র ও অপরিচিত সহস্র সহস্র জন্তু ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই লাভ জন্মাইতেছে। প্রতিদিনই পণ্যরাজির ক্রয়-বিক্রয়কালীন ধ্বনি বিষমাকার ধারণ করে এবং ক্রেতাবিক্রেতার সংখ্যা গণনাতীত ও জনতা সীমাতীত হইয়া উঠে। অধিক কথা কি, রাজ্যের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যই এক দিনে এই স্থান হইতে ক্রয় করিতে পারা যায় এবং সহস্র সৈনিকের আবশ্যক সাজ-সজ্জা সমস্তই এক ঘণ্টার মধ্যে সংগ্রহ করা যায়— প্রস্তুতের অপেক্ষা করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবার প্রয়োজন হয় না।

(শ্লোক)

ইরাক্ ও খোরোসানবাসীরা তাহাদের অসংখ্য পণ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখিয়াছে;
ইয়ুরোপ হইতে আগত ইয়ুরোপীয়েরা ফরমাস-মত দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য দুষ্প্রাপ্য পণ্যচয় সাজাইয়া রাখিয়াছে;

প্রতিদিকেই জহুরীরা সাগরের শোকোৎপাদন করিয়া (রত্নচয় লইয়া) বসিয়া আছে ;

চারিদিকেই শত শত তেজোময় চুনী সাজান রহিয়াছে ; প্রত্যেক বিপণিই বদথ্ শানের খনি ।

প্রত্যেক দোকান হইতেই সমগ্র জগতের পণ্যচয় পরীক্ষা করিতে পারা যায় । (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত ।
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

নিরাভরণা ।

কাঞ্চন-ভূষণ আসি কহে যোড়হাতে
হে রূপসি ! অঙ্গে তব দাও মোরে স্থান !
তোমার রূপের দীপ্ত-আলোক-সম্পাতে
মোরাও উঠিব হাসি ! আমাদের মান
তোমারি করুণা শুধু ! কুসুমের গায়
উঠে নাকি প্রজাপতি ? নক্ষত্র-বিকাশ
হয় না কি শোভা-ভরা লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় ?
সঙ্গত ছাড়ে কি সখি সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস ?
এত গর্ব্ব নাহি রাখি, ভাবি যাহে মনে
আমরাই রূপ-স্রষ্টা, প্রাণ-সঞ্চারিণী
কুহকী সোণার কাটি ? রতন-ভূষণে
তুমিই সজীব কর, হে বিশ্বমোহিনি !
তুমি যদি নগ্নরূপে দাঁড়াও আসিয়া,
মূর্চ্ছিত কাঞ্চন থাকে ধূলায় লুটিয়া ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন ।

চন্দ্রমা।

কবি।

নিশীথ আকাশ-তলে নিস্তব্ধ নিঝুম
কবি একা আছে বসি, চোখে নাহি ঘুম,
শরতের পূর্ণিমার জ্যোছনা-মদিরা
বিভোর সে করি পান, শিরা উপশিরা
আনন্দ-প্রবাহ-ভরে ভরি' গেছে আজি—
মুখর নূপুর বুঝি উঠিয়াছে বাজি
মানসী বধূর কবির কোমল বক্ষে ;
জ্যোছনা দিয়েছে তার স্বপ্নভরা চক্ষে
মোহের অঞ্জন টানি, কভু জ্যোৎস্না-স্রোতে
নিমেষে নামিয়া এসে দূর স্বর্গ হ'তে
নিখিল-নন্দন-মূর্ত্তি জ্যোৎস্না-বাস-পরা
কবির নয়নপথে যদি দেয় ধরা,
শুভ দৈবক্ষণে,—তাই বসি প্রতীক্ষায়
চকিতে সে দেখা দিয়ে কখন লুকায়।

চকোর।

কবির হৃদয়মাঝে বেঁধেছ কি বাসা!
হে চকোর! তাই লয়ে দুরন্ত পিপাসা
ধাও উর্দ্ধপানে! মাগি চন্দ্রকর-সুধা
মিটাবারে চাহ তব অন্তহীন ক্ষুধা!
গভীর আকাঙ্ক্ষা-ভরা তোমার সে প্রাণে
কি মহা বেদনা বাজে কেহ নাহি জানে,
দেখেনি তোমারে কেহ, শুনে নাই সুর,
কবি মুগ্ধ তাহা শুনি—করুণ-মধুর।
বিহঙ্গ নহ ত তুমি তৃষ্ণা অশরীরী,
কবির হৃদয় হ'তে মুক্ত-পক্ষ ধরি'
ভ্রম নভঃ-পথে, তুলি' জ্যোৎস্না-আবরণ
নিত্য দেখিবারে চাহ সৌন্দর্য্য-ভবন
কোথায় লুকান আছে ;—তাই কবি শ্লোকে
কাহিনী শুনেছে তব দেখে নাই লোকে।

কুমুদী।

উর্দ্ধমুখে নির্নিমেষে চন্দ্রপানে চাহি
প্রেমাতুর কুমুদীর চোখে নিদ্রা নাহি,
সারারাত্রি আছে জাগি, রাশি চন্দ্রকরে
কুমুদীর শুভ্র বুক রাখিয়াছে ঘিরে
সরম-বিহীন প্রাণে, এরা বুঝি বোঝে
বিশ্ব সুপ্ত, কেহ নাহি ইহাদের খোঁজে
হেরিতে কৌতুকভরে প্রণয়ের খেলা!
তাই দেছে টানি' কেলি-স্তব্ধ রাত্রিবেলা
লজ্জা-আবরণ খানি,—নয়নে নয়নে
বহিছে প্রণয়-স্রোত আকাশে ভুবনে।
সহসা জাগিল উষা মেলি' রক্ত আঁখি,
সভয়ে ফেলিল চন্দ্র আপনারে ঢাকি,
—পাছে পড়ে ধরা,—আর কুমুদী তখনি
মুখ নত করি দিল ঘোমটাটি টানি।

প্রবাসে।

বন্ধুগণ গেল ফিরি সাঙ্গ হ'ল খেলা,
দাবা-পাশা রাখি তুলে প্রবাসী একেলা
চলিল শয়ন-গৃহে ; নিবাইতে বাতি
বাতায়ন-পথে আসি জ্যোৎস্না দিল পাতি
শুভ্র স্বচ্ছাঞ্চল, মৌন হাস্যে অবিরত
জাগায়ে প্রবাসী-হৃদে কথা কত শত
জ্যোৎস্না-ভরা পল্লী-গৃহে লয়ে গেল টানি'
বেদনা-ব্যথিত-প্রাণে, প্রিয়া-মুখখানি
সুপ্ত-পুত্রমুখ-সাথে দেখা দিল ধীরে,
চন্দ্রিমার মায়াময় আবরণ ছিঁড়ে ;
বিনিদ্রনয়নে রাজপথে চাহি র'ল
উদাসীন প্রবাসী,—রজনী গভীর হ'ল,
বিছাইল ক্লান্ত তনু শয্যা'পরে শেষে
লঘু করি মর্ম্ম-ব্যথা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে।

স্ববাসে।

দুই বর্ষ পরে পুনঃ ফিরিয়াছে ঘরে
গ্রামের প্রবাসী আজি, কৌতূহলভরে
সুধায়ে কুশল-প্রশ্ন পল্লী-বন্ধুদলে,
রজনী বাড়িল দেখি ফিরে গেল চলে
একে একে সবে, শয়ন-গৃহেতে' আসি,
বহুদিন পরে আজি হেরিল প্রবাসী
বসে আছে প্রিয়া তা'র তা'রি প্রতীক্ষায়,—
অদূরে কোলের শিশু অঘোরে ঘুমায়;
পড়েছে রজত জ্যোৎস্না কক্ষ-ধারে এসে,
প্রিয়ার সহাস্য মুখে, যত্নে বাঁধা কেশে
সকলি সুন্দর করি; বায়ু মুক্তবক্ষ
আনিছে বহিয়া রজনী-গন্ধার গন্ধ;
করেছে প্রবাসী-হৃদি সার্থক মধুর
নভঃচন্দ্র আর মুখ-চন্দ্রমা বধূর।

জ্যোতিষী।

বিছায়ে মাদুর বসি' আপনার ঘরে
জ্যোতিষী গণিছে একা বেলা দ্বিপ্রহরে
জাতকের চন্দ্র কোথা—কুম্ভে কিম্বা মেষে,
কেতুর কি দৃষ্টি যায় ত্রিকোণেতে এসে,
উচ্চ কিম্বা নীচ, আর আছে কত কলা;—
গণিতে গণিতে শেষে পড়ে এল বেলা,
সূর্য্য অস্ত গেল, নিম্ব-বৃক্ষ-শিরোপরে
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র দেখা দিল ধীরে;
সুবিমল জ্যোৎস্নারাশি অনন্ত অশেষ
মুক্ত বাতায়ান-পথে মাগিল প্রবেশ;
সন্ধ্যা হ'ল, দেখি দেখা নাহি যায় ভাল
গণিতে লাগিল পুনঃ জ্বালিয়া সে আলো;
ভ্রূক্ষেপ নাহিক আজ পূর্ণিমার রাতি,
চন্দ্র কোথা আছে শুধু দেখে খড়ি পাতি!

জ্যোতির্ব্বিদ।

জ্যোতির্ব্বিদ বসি মানমন্দিরের ছাদে
দূরবীণ লয়ে করে সপ্তমীর রাতে
খুঁজিছে চৌদিকে,—যদি আকাশের গায়
ভাগ্যক্রমে নব এক গ্রহ দেখা যায়;
—তখনো উঠেনি চন্দ্র রাত্রি দ্বিপ্রহর,
আকাশে তারকা জ্বলে নীরব নিথর।
দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্তসীমায়
ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের যেন আলো দেখা যায়
হ'ল মনে, দূরবীণ যেমনি ফিরাল
বহুআশে, পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রমা উদিল,
অমনি উজ্জ্বল সেই জোছনার রাশি
ক্ষীণ আলো জ্যোতিষ্কের ফেলিলেক গ্রাসি,
বহু চেষ্টা করি দেখা নাহি গেল আর—
জ্যোতির্ব্বিদ এল নেমে হৃদে ব্যথাভার।

শিশু।

দুষ্ট শিশু কিছুতেই চোখ মুদিবে না
মাতৃকোলে শুয়ে করিছে দুরন্তপনা,—
কভু উঠিবারে চায়, কভু লয়ে দাঁতে
কাপড় ছিঁড়িছে রোষে; অবশেষে ছাদে
ঠাকুমা লইয়া গেল ভুলাইয়া তারে
ঘুমপাড়াবার তরে, দেখায়ে চাঁদেরে
—ওই বসে আছে চাঁদে দেখা যায় মাথা
কাটনাকাটা বুড়ী, আর হরিণের কথা
বলিল অনেক, শান্ত হ'ল শিশু শুনি
চন্দ্রলোকবাসীদের উপকথাগুলি,
পড়িল ঘুমায়ে শেষে ক্রোড়পরে শুয়ে;
মাথা দোলাইছে আর মুখপানে চেয়ে
ঠাকু'মা বলিছে তবু অতি মৃদুস্বরে,—
'চাঁদের কপালে চাঁদ টিক্ দিয়ে যারে।'

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

অর্ঘ্য।

ওগো নিখিল-নম্যা জননি!
ওগো কোটিসন্তানপালিনি!
ঝলিছে অঙ্গে শত বিভঙ্গে
মাধুরী, দীপ্তিশালিনি!
তোমারি মুক্ত-কিরণ ইন্দু,
তোমারি বিশাল অসীম সিন্ধু,
লহরী সান্দ্র গভীর মন্দ্র
ঘোষিছে পুণ্যকাহিনী!
তোমারি ললিত-কুঞ্জ-কুটীরে
পুলকে পুষ্পগন্ধ,
তোমারি শ্যামল-শস্য-সুবাস
ভাসিছে সমীরে মন্দ;
এস এস অয়ি কল্যাণময়ি
জননী আমারি গো,
লহ গো ভক্তি-অশ্রু-অর্ঘ্য
রচিয়া তোল গো অসীম স্বর্গ
পুণ্য-ভারতে, নিষ্ঠাব্রতে
অয়ি মঙ্গলদায়িনি!

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

প্রতিবেশী।

১

যেখানে রায় বাহাদুর গোলকচাঁদের বিশাল হর্ম্ম্য অভ্র ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাহারই সন্নিকটে আলোকের পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় এক ভগ্ন জীর্ণ কুটীর ছিল।

এক ক্ষুদ্র বাঙ্গালী পরিবার এই কুটীরে বাস করিত। প্রসন্নকুমারের চিরদিন এ অবস্থা ছিল না। সে কলিকাতার একটি সদাগরি অফিসে ৫০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিত। পরিবার-সংখ্যা অধিক ছিল না, স্ত্রী সুকুমারী ও শিশু কন্যা সুধা; কাজেই এই অল্প বেতনেই প্রসন্নকুমারের এক প্রকার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত।

কিন্তু বিধাতা সে সুখ সহিলেন না। সহসা একদিন সাহেব প্রসন্নকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহাদের আয় অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের বাধ্য হইয়া কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করিতে হইতেছে। প্রসন্নকুমার ম্লানমুখে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

তখন প্রসন্নকুমার ও সুকুমারী উভয়েরই নবীন যৌবন, তরুণ হৃদয়, অনন্তপ্রসারিণী আশা—এই দুর্ব্বিষহ ঘটনা তাহাদের অভিভূত করিতে পারিল না। বুদ্ধিমতী সুকুমারী প্রসন্নকুমারের স্বল্প আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সে উচ্ছ্বাসে তাহার চিরসঞ্চিত ধনভাণ্ডার প্রসন্নকুমারের সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"আর পরাধীনতায় কাজ কি? একটা স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দাও না কেন?" প্রেমিক প্রসন্নকুমার পরিপ্লুত প্রেমোচ্ছ্বাসে সুকুমারীর মুখচুম্বন করিলেন।

তখন দেশভক্তির অপূর্ব্ব স্বর্ণরশ্মিচ্ছটা স্থানে স্থানে এই হতাশা-কালিম হতভাগ্য দেশের বক্ষের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। প্রসন্নকুমার হাসিয়া সুকুমারীকে বলিল—"স্বদেশী জিনিসের একটা দোকান খুলিলে হয় না?" সুকুমারী সোৎসাহে স্বামীর প্রস্তাব সমর্থন করিল।

কত আনন্দে, আশায় এই মুগ্ধ দম্পতীর যে সে নিশা অতিবাহিত হইল, তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝাইব? আশার স্বর্গালোকে সে দিন এই তরুণ চক্ষে

সকলই স্বর্ণময় দেখাইতেছিল, আনন্দের মধুর বাঁশরী সে দিন দু'টী তরুণ হৃদয় ব্যাপিয়া মুহুর্মুহু নিনাদিত হইতেছিল।

২

কিন্তু মানুষ যাহা আশা করে, সকল সময়ে কি তাহা পূর্ণ হয়? মানুষের বাসনা ও অহঙ্কারের পশ্চাতে বিধাতার অভিশাপ অধিকাংশ সময়েই অদৃশ্যভাবে রহিয়া যায়। মানুষ এক করিতে যায়, বিধাতা আর এক ঘটাইয়া তোলেন।

প্রসন্নকুমারের স্বদেশী দোকান চলিল না। দিন দিন কেবল মূলধন ক্ষয়িত ও দোকানের দেয় ভাড়ার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিপদ দেখিয়া প্রসন্নকুমার অর্দ্ধমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। বাড়ীওয়ালার পাওনা এবং মুদির দেনা পরিশোধ করিয়া সভয়ে প্রসন্নকুমার দেখিল, সমস্ত টাকার মধ্যে পঞ্চাশ টাকা মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেইদিন অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রসন্নকুমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিল।

প্রসন্নকুমার নানাস্থানে পুনরায় কর্ম্মের চেষ্টা করিল, কিন্তু কোথাও কিছু জুটিল না। সুকুমারী—আশাময়ী সুকুমারী একদিন হাসিয়া বলিল, "এক কাজ করিলে হয় না? তুমি যদি একটা সেলাইয়ের কল কিনে দাও, তা হ'লে আমি নানা রকম পোষাক তৈরি কর্ত্তে পারি, তাতে কি সংসার চলে না?" প্রসন্নকুমার বলিল—"কিন্তু সুকুমারী সে যে বড় পরিশ্রম!" মধুর হাসি হাসিয়া সুকুমারী বলিল—"আমি ত আর রাজকন্যা নই যে একটু পরিশ্রমে আমার ননীর দেহ গলে যাবে! সে জন্য তোমার ভাবতে হবে না।" প্রেম ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চক্ষে প্রসন্নকুমার সুকুমারীর সুমধুর মুখখানির দিকে একবার চাহিল। শেষে তাহাই স্থির হইল। সুকুমারী পোষাক তৈয়ার করিতে লাগিল এবং প্রসন্ন সেগুলিকে দোকানে বিক্রয় করিয়া আসিতে লাগিল।

কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া গেল। কিন্তু পূজা নিকট হইয়া আসিল; নানা প্রকার বিদেশী রেশম ও সূতার পোষাকে বাজার আচ্ছন্ন হইয়া গেল। স্বদেশ-প্রাণ দেশবাসীর বিদেশী-সৌন্দর্য্য-ঝলসিত নেত্রে আর "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" স্থান পাইল না। দোকানদার প্রসন্নকুমারের "স্বদেশী" পোষাক লইতে অস্বীকৃত হইল।

নিরুপায় প্রসন্নকুমার দোকানের আশা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া

পোষাক বিক্রয় করিতে কৃতসংকল্প হইল। অভাগিনী জন্মভূমি! তোমার স্নেহের দান তোমার সন্তানের চক্ষে নিতান্ত হেয় বলিয়া মনে হইল। কেহ "বেজায় দাম" বলিয়া, কেহ "স্বদেশী কাপড় এর চেয়েও অনেক ভাল আছে বৈকি" বলিয়া, কেহ বা স্পষ্টাক্ষরে "দেশী সবই চুরি" বলিয়া আপনাপন স্বদেশী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। দুই একজন যাহারা এতাদৃশী সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিল না, তাহারা দরিদ্র; অধিক কিনিবার তাহাদের সামর্থ্য ছিল না। প্রসন্নকুমারের আশালোক নিবিড় নৈরাশ্য-মেঘে ঢাকিয়া গেল। অর্দ্ধাশনে অনশনে প্রায় এক মাস কাটাইয়া প্রসন্নকুমার একদিন সন্ধ্যার সময় বাটী আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; আর সে উঠিতে পারিল না।

৩

সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সুকুমারী কয়েকদিন চালাইল। কিন্তু তার পর? ক্ষুদ্র কুসুম সুধা দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। প্রসন্নকুমার দিন দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছিল। সুকুমারীর সমস্ত সম্বল শেষ হইয়াছিল। হায় অভাগিনী! আর সে কি করিবে? সুকুমারী মনে করিল ভিক্ষা করিবে। পার্শ্বে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর এক মুষ্টি অন্ন দিয়া এই দরিদ্র পরিবারের জীবন রক্ষা করিবেন না কি? সুকুমারী বার বার চক্ষু মুছিয়া বহুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া মরণাহত স্বামীর ম্লান মুখ ও স্নেহ-প্রতিমা সুধার কালিমামণ্ডিত চক্ষু-দু'টী স্মরণ করিয়া কম্পিতপদে ধীরে ধীরে রায় বাহাদুরের প্রাঙ্গণমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহিণী তখন বিশাল দেহ অনাবৃত করিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া বায়ুপ্রশমনার্থ দাসী দ্বারা মস্তকে "জবাকুসুম" তৈল মর্দ্দন করাইতেছিলেন। ম্লানবস্ত্রপরিহিতা, রুক্ষকেশা সুকুমারীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার কথঞ্চিৎ উপশমিত বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল। হুঙ্কার করিয়া সুকুমারীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আরে মোলো! এ ভিকিরি মাগীকে উঠোনে ঢুক্‌তে দিলে কে? দূর করে দে! দূর করে দে!" অনভ্যস্ত-ভিক্ষাবৃত্তি সুকুমারী অতি কষ্টে মৃদুস্বরে বলিল, "মা আমরা আজ দু'দিন খাইনি, আমার স্বামী মৃত্যুশয্যায়, আমার কন্যা মৃত্যুমুখে, যদি দয়া করে আমাদের প্রাণরক্ষা কর, তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—তোমার কোন ক্ষয় হবে না।" গৃহিণী আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আরে মোলোরে, আবার কথার বাঁধুনি দেখ, ঝাঁটা মেরে দূর করে দে! ঝাঁটা

মেয়ে দূর করে দে!" গৃহিণীর ইঙ্গিত পাইয়া দাসী হুঙ্কার করিয়া উঠিল। লজ্জায়, অপমানে, আরক্তমুখে, অশ্রুপ্লাবিতলোচনে অভাগিনী দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ক্ষুদ্র কুটীরে নীরবে ফিরিয়া আসিল।

রায় বাহাদুরের বাটীতে আজ প্রবল সমারোহে দুর্গোৎসব চলিতেছিল। কত জুড়ি—কত গাড়ী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। "দীয়তাং ভুজ্যতাং"-রবে বিশাল প্রাঙ্গণ নিনাদিত হইতেছিল। দরিদ্রের কিন্তু সেখানে স্থান ছিল না। সুধা শীর্ণ দেহ লইয়া ম্লানমুখে একবার মাতার অনুরোধে সেই খাদ্যসমাকুল প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সহসা তাহার প্রতি রায় বাহাদুরের এক মো-সাহেবের দৃষ্টি পড়ায় তিনি তাহার গ্রীবা ধরিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সুধা কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী আসিতেছিল, এক ভিখারিণী বালিকা দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে ডাকিয়া পথিপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে সংগৃহীত খাদ্যের কিয়দংশ তাহাকে আহার করাইয়া দিল। সুধা ক্ষুধার বৃশ্চিক দংশন হইতে কিয়ৎ কালের জন্য অব্যাহতি পাইল।

৪

মহাষ্টমীর সন্ধ্যা। রায় বাহাদুরের বাটীতে আজ সাহেব বিবির নিমন্ত্রণ ছিল। পুষ্পে, পত্রে, আলোকে, সঙ্গীতে আজ রায় বাহাদুরের বিচিত্র অট্টালিকা অপূর্ব্ব সুষমা ধারণ করিয়াছিল। একে একে সাহেব বিবি বিচিত্র অশ্বযান হইতে অবতীর্ণ হইতেছিলেন এবং বিচিত্র পরিচ্ছদ-ভূষিত রায় বাহাদুর শ্বেত হস্তের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছিলেন।

পার্শ্বে প্রসন্নকুমারের জীবনস্রোত ধীরে ধীরে বিশুষ্ক হইতেছিল। সুধা শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সুকুমারী ম্লানমুখে বিদীর্ণহৃদয়ে স্বামীর চরণতলে বসিয়াছিল। প্রসন্নকুমার সুকুমারীকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন; সুকুমারী নিকটে সরিয়া গেল। প্রসন্নকুমার অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন—"সুকুমারী চলিলাম, সব ফুরাইল, ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন"—বলিতে বলিতে প্রসন্নকুমারের মুখমণ্ডল কালিমামণ্ডিত হইয়া উঠিল। সুকুমারী চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। প্রসন্নকুমারের ক্ষীণ জীবন-প্রদীপ চকিতে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

ভূরি ভোজন-তৃপ্ত ইংরাজ নরনারী যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আগামী

বারে আশা করি রায় বাহাদুরকে 'রাজা বাহাদুর' দেখিতে পাইব। আপনার দানশীলতা ও উদারতা চিরপ্রসিদ্ধ। গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই আপনার এই সকল মহৎ গুণাবলীকে উপযুক্তরূপে সম্মানিত করিবেন।" রায় বাহাদুর হর্ষোদ্বেলিতহৃদয়ে অর্দ্ধ বোতল "হুইস্কি" এক নিশ্বাসে উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে নিশীথ রাত্রে সুকুমারী দেখিল, সব শেষ। বক্ষে সে অসহ্য বেদনা অনুভব করিল। তাঁহার শোকাগ্নিতপ্ত চক্ষের উপরে সঞ্চিত অশ্রুরাশি মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গেল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া তাহার মনে পড়িল, স্বামীর মৃতদেহের সৎকার আবশ্যক। মনে করিতে অশ্রুস্রোত আবার উথলিয়া উঠিল, স্তব্ধ প্রাণ হাহাকার করিতে লাগিল। সুকুমারী—অভাগিনী, নিরাশ্রয়া, সহায়-হীনা সুকুমারী—কোন পথ খুঁজিয়া পাইল না। অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, গৃহিণী ত কোন সাহায্য করিতে চাহিলেন না; একবার কর্ত্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিলে হয় না? তাঁহার ত লোকজনের অভাব নাই; তিনি কি এই দরিদ্রা বিধবার স্বামীর সৎকারের ব্যবস্থা করিতে পারেন না? উপায়ান্তর ছিল না। কাজেই এ যুক্তি সুকুমারীর সমীচীন বলিয়াই মনে হইল। সুকুমারী পাষাণে বুক বাঁধিয়া বাবুর সভাগৃহে প্রবেশ করিল। তখন লালসাময়ী নর্ত্তকী বিলাসবিহ্বল অঙ্গভঙ্গীসহযোগে রায় বাহাদুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মধুরকণ্ঠে গাহিতেছিল—

"নিমেষের দেখা যদি পাই তোমারি
আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারি"

সুরাবিগলিতচিত্ত রায় বাহাদুর বাইজির গৌরদেহে উর্ব্বশীর সুষমা দেখিয়া ক্রমেই উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। এমন সময়ে ছুটিয়া আসিয়া সুকুমারী বলিল—"বাবা অভাগিনীকে উদ্ধার করুন, আমার কেহ নাই; পার্শ্বের বাটীতে আমার স্বামীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে; শব-সৎকারের কোন উপায় আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না, দয়া করিয়া আমার উপায় করিয়া দিন।" কিন্তু তাহার অকলঙ্ক রূপরাশি যেন তাঁহার চক্ষে বাইজীর রূপকেও পরাজিত করিল। নরপশু সুরাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "তোমার স্বামী মারা গেছে, তোমার স্বামীর ভাবনা কি চাঁদ!" এই কুৎসিৎ বাক্যে সুকুমারী তড়িতাহতের ন্যায় শিহরিয়া উঠিল। তাঁহাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া রায় বাহাদুর চীৎকার করিয়া

বলিলেন, 'এই আওরৎকে পাক্‌ড়ো" দুইজন মো-সাহেব আজ্ঞামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেই সতীত্ব-তেজোদীপ্ত মহীয়সী ললনার অঙ্গে হস্তস্পর্শ করিতে কুক্কুরদের সাহসে কুলাইল না। সুকুমারী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুকুমারী মৃত স্বামীর চরণ আলিঙ্গন করিয়া বহুক্ষণ বিবশা হইয়া কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মস্তক তুলিতে দেওয়ালস্থিত একটী কৌটার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টি পড়িতেই তাহার চক্ষুদ্বয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কৌটায় আফিং ছিল। অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় সুধা জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "মা, জল"—সুকুমারীর আয়ত চক্ষু দীপ্ততর হইয়া উঠিল। আফিমের গোলা সুধার মুখে ধরিয়া বলিল, "খাও সুধা"। সুধা একটু খাইয়াই মুখ ফিরাইল, বলিল, "বড় তেতো।" সুকুমারী উত্তর না দিয়াই অবশিষ্ট বিষ সমুদায় নিজে পান করিল; তার পর আদরের কন্যাকে বক্ষে লইয়া স্বামীর পদতলে শয়ন করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে কুটীর-সম্মুখে সমবেত জনতা সবিস্ময়ে দেখিল - তিন জনেই মৃত। সেইদিনই "ইংলিশম্যান" রায় বাহাদুরের বদান্যহস্ত এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কীর্ত্তিকাহিনী দিকে দিকে প্রচারিত করিয়া দিল।

শ্রীযুতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু ও হিন্দু-সমাজ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি এই যে, ইহা সম্প্রদায়-বিশেষকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে; সুতরাং সেই সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতিও সীমাবদ্ধ হইয়া যায়; বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্য প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রের অভাবে সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশলাভ করিতে পারে না। আর আমাদের সমাজে কার্য্যক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পূর্ণ অভাব; কাজেই সমাজ নিশ্চল ও প্রাণহীন; উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প।

কারণ আমি যখন জানি যে, আমার ব্যবসায় অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া কাড়িয়া লইবার ভয় নাই, তখন আমি নিজ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিব কেন? এই অভিযোগও যে একান্ত অসার, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, প্রথমতঃ, সমাজ-বিধান কোন কালেই এইরূপ কঠোর ছিল না যে, মানুষ ইচ্ছা করিলে জাত্যন্তর-নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত না; তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা বীরাগ্রগণ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই বিশাল হিন্দু-সমাজের সম্প্রদায়-বিশেষ এরূপ সঙ্কীর্ণ নহে যে, তাহার মধ্যেই ব্যবসায়গত ন্যায্য প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না। তবে যে হিন্দু জাতির এত অবনতি হইয়াছে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাই কি তাহার কারণ? ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কি ইহাই প্রতীয়মান হয় না যে, সহস্র বৎসরাধিক কালের পরাধীনতায় সে তাহার মনুষ্যত্বটুকু সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিয়া আছে? কে অস্বীকার করিবে যে, আমাদের এই মনুষ্যত্বহীনতাই আমাদিগকে নির্জ্জীব, অলস ও কার্য্যে অনুৎসাহী করিয়াছে? ইহার উপর পাশ্চাত্য প্রতিযোগিতা আসিয়া পড়িয়াছে। তাই, তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে, শিল্প-জগতের বিস্ময় ঢাকাই মসলিন প্রবাদে পরিণত হইয়াছে, ভারতের অতুলনীয় অর্ণবপোত-নির্ম্মাণবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়াছে; এক কথায়, যে ভারতের পণ্যসম্ভার এককালে জগতের প্রতি বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রেরিত হইত, সে ভারত আজ বিদেশী বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেছে এবং বৈদেশিক পণ্যদ্রব্যে স্বীয় বিপণি পূর্ণ করিতেছে। জাতিভেদ ভারতবর্ষের এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কারণ নহে।

তবে একথা সত্য যে, যে আসুরিক প্রতিযোগিতার উপর আধুনিক বাণিজ্য-নীতি—এই বিংশ শতাব্দীর Industrialism প্রতিষ্ঠিত, ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ সে ভীষণ সংগ্রামের কল্পনাও কখনও করেন নাই। ইহা কি তাঁহাদের অদূর-দর্শিতার পরিচয় দেয়? বিচার করিয়া দেখা যা'ক, বর্ত্তমান যুগে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক বাণিজ্যনীতির ফল কি হইয়াছে। এরূপ আলোচনা বোধ হয় এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের সুখ ও সম্পদের কারণ হয়, তাহাই সর্ব্বথা ন্যায় ও যুক্তি-সঙ্গত। নৈতিক জগতে এই নিয়ম না মানিতে

পারা যায় (যদিও দার্শনিক বেন্‌থাম (Bentham) নীতিকেও এই নিয়মভুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন); কিন্তু সমাজে ও রাজনীতিতে,—যেখানে একটি ব্যবস্থার উপর অসংখ্য নরনারীর সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে—সেখানে যে উক্ত নিয়মই ব্যবস্থা-প্রণয়ণের মূলে নিহিত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। এখন য়ুরোপীয় বাণিজ্যনীতি সর্ব্বত্রই দুই শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করিতেছে—ধনী Capitalist; আর দরিদ্র শ্রমজীবী।

একদিকে মুষ্টিমেয় ধনী ব্যবসাদার কলকারখানা ও শ্রমজীবী-সাহায্যে অতুল সম্পদের অধীশ্বর হইতেছে, আর একদিকে অসংখ্য শ্রমজীবী দারিদ্র্যের ভীষণ তাড়নায় অস্থির হইতেছে। পরস্পর প্রতিযোগিতার সংগ্রাম হইতে কলকারখানার সৃষ্টি এবং কলকারখানা হইতে উক্ত দুই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ফলে একদিকে ধনসম্পদ ও বিলাসিতার চূড়ান্ত, আর একদিকে নিরন্ন হত-ভাগ্যের করুণ আর্ত্তনাদ! হায়! ইহাই কি বর্ত্তমান বাণিজ্যজগতের সাধারণ দৃশ্য নহে? এই অন্যায় ব্যবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে মানব-সমাজ যে একেবারে উৎসন্নপ্রায় হইয়া যাইবে, তাহা স্থূলদর্শী ব্যক্তিও বুঝিতে পারে। পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে যখন শ্রমজীবিগণের মধ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, সহস্র সহস্র শ্রমজীবী যখন উদরের তাড়নায় উন্মত্ত হইয়া Chartism-রবে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিয়া ধনিসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিল, তখন সর্ব্ব-প্রথমে কার্লাইল-প্রমুখ মনীষিগণের দৃষ্টি বর্ত্তমান বাণিজ্য-নিহিত লোকক্ষয়-কর কু-ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তখন তাঁহারা সাধ্যমত প্রকারে এই মহানর্থকরী নীতির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন। তারপর বহু বৎসর গত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু হতভাগ্য অনশন-ক্লিষ্ট শ্রমজীবিকুলের কাতর ক্রন্দন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। একদিন যদি বিলাতের কারখানাগুলি বন্ধ থাকে, তাহা হইলে যে কত সহস্র শ্রমজীবীকে উপবাস করিতে হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এ সম্বন্ধে সমস্ত আলোচনা ও বিতণ্ডা নিষ্ফল হইয়াছে। তাই সম্প্রতি এই অন্যায় সামাজিক ব্যবস্থা রহিত করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত নব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর এক নবীন সম্প্রদায় ধীরে ধীরে আপনাকে গঠিত করিয়া তুলিতেছে। ইঁহারাই হইতেছেন Socialists; প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল

পরিবর্ত্তন করিয়া মানব-সমাজকে সাম্যমূলক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করাই ইহাদের চরম লক্ষ্য।

এইবার আমাদের সমাজনিয়মের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। অগণ্য লোক পদদলিত করিয়া একজন মাত্র লোক যে অর্থশালী হইবে, আমাদের শাস্ত্রকারগণ এরূপ ধারণা কখনও মনে স্থান দেন নাই। তাই তাঁহারা সমাজ শরীরের পুষ্টি-সাধনের জন্য জাতি বা সম্প্রদায় বিভাগ করিয়া বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। হিন্দু কখনও অর্থোপার্জ্জনই জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন নাই; তাই পরস্পরের প্রতি একটা ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব তাঁহাদের মনে কখনও ছিল না; সুতরাং প্রত্যেকেই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মুসলমানের আমলেও এই অবস্থার ব্যতিক্রম হয় নাই। তখন দেশের ধন দেশেই থাকিত; আর বাড়ী বাড়ী গোলাভরা ধান থাকিত। কিন্তু হায়! পাশ্চাত্য সংস্রবে আমরা এই সুখের জীবন হারাইলাম। ভীষণ প্রতিযোগিতায় আমাদের যাবতীয় শিল্প নির্ম্মূল হইল। ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তার দ্বারা আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা এখন চারিদিকে হইতেছে। কিন্তু এখানেও সেই প্রতীচ্যের অনুকরণ। আমরা বুঝিয়াছি যে, দেশে বহুসংখ্যক কল-কারখানা স্থাপিত করিতে পারিলেই আমাদের সমস্ত দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে। কারণ প্রতিযোগিতায় আমরা তখন কিয়ৎপরিমাণে পাশ্চাত্যগণের সমকক্ষ হইতে পারিব। কল-কারখানায় পাশ্চাত্য দেশসমূহের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিয়াও আমরা সেই পথেরই পথিক হইতে বসিয়াছি! হে সমাজ-সংস্কারক! জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া হস্ত-নির্ম্মিত শিল্পের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইংরাজি 'পায়োনীয়র' কি বলিতেছে শুন—"**In the new hopefulness which stirs the veins of Young India, our Indian fellow subjects are apt to believe that they are at least the equals of Europeans in practical, in poitical and in social wisdom. So may it be. The Europeans philosopher and statesman must humbly admit that the** ***Social life of European countries, and even of the freer and less embarrassed communities of the new***

world, display many problems which at present seem insoluble. (The Italics are ours) Old age pension and such devices, extravagantly expensive as they are, are but Sops to Cerberus, a mere laying out of "Conscience money", a reluctant and wistful admission that the present system is not wholly equitable. * * Our educational system is being recast so as to give a chance to all clever and industrious boys and girls to better their social and economical status. But that merely extends the area of competition and makes it fiercer and those who fail, meet with the old penalty of rags and destitution, and degradation. The old contrast of rich and poor remains and indeed seems accentuated." অর্থাৎ নবভাবে অনুপ্রাণিত ভারতবাসী মনে করিতে পারে যে তাহারা ব্যবহারিক, রাজনীতিক ও সামাজিক জ্ঞানে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমকক্ষ। তাহাদের এরূপ ধারণা অসঙ্গত নয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও রাজনীতিককে স্বীকার করিতে হইবে যে য়ুরোপের দেশসমূহ, এমন কি স্বাধীনতর আমেরিকাতেও, সমাজ-জীবনে এমন অনেক সমস্যা আছে, যে গুলির সমাধানের কোন উপায় আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃদ্ধ বয়সে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি যে সকল প্রতিকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেগুলি দ্বারা কেবল 'মনকে চোখ্ ঠেরা' হয় মাত্র এবং সেগুলিতে ইহাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নয়। আবার নব-গঠিত শিক্ষাপদ্ধতিও শ্রমশীল বালক বালিকাগণের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়াই পথ উন্মুক্ত করিতেছে। কিন্তু ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বাড়িয়া যাইতেছে, এবং তাহা আরও ভীষণতর হইতেছে; আর যাহারা এই প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য্য হইতেছে, তাহাদের ভাগ্যে সমাজের নিম্নস্তরে অধঃপতন ও অনশন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ত থাকিয়া যাইতেছেই, বরং আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সমাজ-ব্যবস্থার এত গলদ, তাহারই আদর্শে আমাদের সমাজ গঠিত করিতে দেশের নেতৃবর্গ এত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন কেন? জাতিভেদই যত অনিষ্টের মূল, এই কথা প্রচার

করিয়া একদল সংস্কারক তথা-কথিত নিম্ন শ্রেণীর লোকের মনে অসন্তোষের বীজ বপন করিতেছেন এবং বংশগত জাতীয় ব্যবসায়ের উপর অনাস্থা উৎপাদন করিয়া মহা অনর্থের সূচনা করিতেছেন, * আর একদল নেতা

---

* পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিলাতের সমাজে যেরূপ বিভিন্ন স্তর বর্ত্তমান তাহাতে, সেখানে প্রকারান্তরে জাতিভেদ নাই বলিতে পারা যায় না, তবে তাহা শাস্ত্রবিধান দ্বারা নির্দ্ধারিত নহে, অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানেও নিম্নস্তরের লোক যখন উপরিতন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে চেষ্টা করে, তখন সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বিখ্যাত লেখক রস্কিন (John Ruskin) ইংরাজ সমাজের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন :—The very removal of the massy bars which once separated one class of society from another, has rendered it ten-fold more shameful in foolish people's, i. e., in most people's eyes, to remain in the lower grades of it than ever it was before. When a man born of an artisan was looked when as an entirely different species of animal from a man born of a noble, it made him no more uncomfortable or ashamed to remain that different species of animal, than it makes a horse ashamed to remain a horse, and not to become a giraffe. But now that a man may make money, and rise in the world, and associate himself, unreproached, with people once far above him, not only is the natural discontedness of humanity developed to an unheard-of extent, whatever a man's position, but it becomes a veritable shame to him to remain in the state he was born in, and everybody thinks it his duty to try to be a "gentleman." * * * There is no real desire for the safety, the discipline, or the moral good of the children, only a panic horror of the inexpressively pitiable calamity of their living a ledge or two lower on the mole-hill of the world—a calamity to be averted at any cost whatever, of struggle, anxiety, and shortening of life itself. I do not believe that any greater good could be achieved for the country, than the change in public feeling on this head. (Ruskin's Essay on Pre-Raphaelitism.) যে সকল সামাজিক ব্যবধান শিথিল হওয়ায় ইংরাজ সমাজে উক্তরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, আমাদের সংস্কারকগণও সেই সকল ব্যবধান দূর করিতে যত্নবান হইয়াছেন কেন, এই প্রশ্নের সদুত্তর কি তাঁহারা দিতে পারেন ?

কলকারখানাই দেশের মুক্তির উপায় স্থির করিয়া হস্তশিল্পের একেবারে উচ্ছেদ-সাধনের সূত্রপাত করিতেছেন ; কিন্তু হস্তশিল্পই যে সমাজ-সংরক্ষণকল্পে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা যদিও তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, কলকারখানায় প্রপীড়িত য়ুরোপীয় সমাজের শিক্ষা যদিও তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কার্লাইল-প্রমুখ বিদেশীয় মনীষিগণ এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা এখন তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। রস্কিন বলেন,—By hand labour, and that alone, we are to till the ground. By hand labour also to plough the sea; both for food and in commerce, and in war. (Ruskin's lecture on *The Future of England* in his *Crown of Olive.* অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য ও অর্ণবপোত-চালনা কেবলমাত্র হস্ত দ্বারাই নির্ব্বাহিত করিতে হইবে, কলকারখানার সাহায্য লইলে চলিবে না। এখন হস্ত-শিল্পের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল ; কারণ যতদিন যন্ত্রজাত ও অপেক্ষাকৃত সুলভ বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতিযোগিতা থাকিবে, ততদিন দেশে হস্ত-শিল্পের সম্যক প্রচার হওয়া প্রায় অসম্ভব এবং যতদিন ভারতবাসী স্বায়ত্ত শাসন না পাইবে, ততদিন এই বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হ্রাস হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই আপত্তির উত্তর পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বে বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ দ্বারা ভারতবাসী নিজেই দিয়াছিল। এই ভাব বজায় রাখিয়া যদি এখন হস্তশিল্পের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা চলিতে থাকে, তাহা হইলে অভীষ্ট-লাভ সুদূর-পরাহত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

জাতিভেদের একটিমাত্র দিক বিশদভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে বর্ত্তমান বাণিজ্যনীতির বিষয় অবতারণা করিলাম, তাহা বোধ হয় অবান্তর হয় নাই। আমরা দেখিলাম যে, এই সুপ্রাচীন সমাজনিয়মের মূলগত অর্থনীতিক ব্যবস্থা এরূপ সুন্দর যে কালক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও, ইহার পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। এই প্রথার যে অবনতি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের কর্ত্তব্য উন্নতিশীল সমাজের উপযোগী করিয়া ইহার সংস্কার করা, কিন্তু ইহা রহিত করার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। যাঁহারা সমাজে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সাম্যস্থাপনে বদ্ধপরিকর,

তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, বৈষম্যই গতিশীল যন্ত্রমাত্রের শক্তির মূল। তাপ ও শৈত্যের একত্র সমাবেশ না হইলে বাষ্পীয় যন্ত্র (Steam Engine) চলিতে পারে না; সেইরূপ সমাজেও উচ্চনীচস্তরভেদ না থকিলে সমাজ-যন্ত্র নিশ্চল হইয়া যায়। আর এই স্তরভেদ বা জাতিভেদ যে পরিমাণে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাসম্মত, সেই পরিমাণে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের আশঙ্কাও অল্প।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

শুক্লা। *

(সমালোচনা।)

"শুক্লা" একে কাব্য তাহাতে স্বপ্ন—সুতরাং ইহার অশরীরী দেহ সমালোচকের কঠিন অঙ্গুলি-স্পর্শের যোগ্য কি না প্রথমেই এই এক সমস্যা—তার পর স্পর্শযোগ্য হইলেও 'স্বপ্ন সমালোচনার যোগ্য কি না সে এক বিচার্য্য। এরূপ স্থলে অতি স-সঙ্কোচে এই সুকঠিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে।

"শুক্লা"'র আখ্যায়িকাংশ এইরূপ।

একদিন বর্ষাসিক্ত "নিরন্ধ্র-তামসী নিশিতে" কবি "শয়ন নিলীন" রহিয়া "কণ্ঠে নাসিকায় ধ্বনি" করিতেছিলেন, এমন সময়ে "কবিজায়া মুছিয়া রন্ধন চিহ্ন দেহ হতে, শত বার মাজিয়া ঘসিয়া মুখ রক্তোন্মুখ করি' এল স্বামী-কক্ষে।" অনেক কষ্টে কবিজায়া কবিকে জাগাইলে কবি "জড়িতকণ্ঠে" বলিলেন, "কেন জাগাইলে?" কবিজায়া "ব্যাথ্যাপূর্ণ কণ্ঠে" অনুযোগ করিলেন,

> "চিরপ্রাপ্য চুম্বনটী হ'তেও কি আজ মোরে
> বঞ্চিত করিলে প্রিয়?"

কবি মহা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন :—

---

* শুক্লা (কাব্য)। শ্রীসুখরঞ্জন রায় বি-এ প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

"নাঃ আর লাগে না ভালো
এই চুম্বনের মালা রচে যাওয়া দিন
হতে দিনান্তরপানে, অনন্ত কর্ত্তব্যভার।
বড়ই পুরাণো তুমি, তেলেতে কালীতে ম্লান
আগুণে শোষিত রস, জীর্ণ গৃহ ব্যবহারে
স্বপ্ন স্বর্গ-লোকভ্রষ্ট একখণ্ড গতবহ্নি
ধরার প্রস্তর! সমস্ত পরাণখানা
আর ত যায় না গলি অধর-সঙ্গমে।"

রোম্যাণ্টিক কবি একবারও ভাবিলেন না যে, গৃহিণী "আগুণে শোষিত রস" "তেলেতে কালীতে ম্লান" না হইলে তাঁহার কবিত্ব-রস বহু পূর্ব্বেই শুষ্ক হইয়া যাইত এবং উদ্‌ভ্রান্ত নয়নের তটে রীতিমত কালিমা জমিয়া যাইত। সে যাহা হউক চুম্বন-প্রয়াসিনী কবিজায়া রাগ করিয়া বলিলেন

"যাও তবে ত্বরা
নূতনে লও গে খুঁজি!"

কথাটা কবির মনে লাগিল। কবি বলিলেন—

"মালা
ছিল, ফুলগুলি গেল যবে, ডোরের বাঁধন
আজিকে ছিঁড়িব আমি।"

বলিয়াই উৎসাহে

"অর্দ্ধ নিদ্রামগ্ন কবি
পূর্ণগ্রাসে ডুবিল নিদ্রায়।"

নিদ্রাঘোরে কবি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যে, তিনি

"মধ্যাহ্নকালীন অলস তন্দ্রায়
মগ্ন শব্দহীন পল্লীটির দৃষ্টি এড়াইয়া
গ্রামপ্রান্তে"

আসিয়া ট্রেণে উঠিয়া পড়িয়াছেন।

ট্রেণ চলিতে লাগিল। "দুই দিন দুই রাত্রি পরে" কবি "পিককণ্ঠ" বন্ধুর সঙ্গে "সকাল বেলা" "নীলিম কোটে" নামিয়া পড়িলেন। অপরাহ্নে বন্ধু বলিলেন—

"ভাল কথা মনে আসে পড়েছি ভূগোলে
প্রসিদ্ধ নীলিম কোট কীর্ত্তি-চিহ্ন লাগি এক
প্রাচীন রাজার, তুমি ত পুরাতত্ত্বের গন্ধে
অন্ধবেগে ছুট যেথা সেথা, এটা ছেড়ে যাবে ?"

"স্ফুট তারাসম" কবিরও "সে কথা উঠিল ফুটি' মানস-আকাশে উজ্জ্বল লেখায়।" অতএব কবি "নগরের উপকণ্ঠে হাঁটিয়া" চলিলেন।

যাইতে যাইতে এক "জীর্ণভিত্তি হর্ম্ম্যশ্রেণী" কবির দৃষ্টিপথে পড়িল। "কিছু দূরে বিস্তৃত প্রান্তর শ্যামতৃণঢাকা। শুধু খানিকটা অংশ তার নিঃশেষে গিয়েছে পুড়ে যেন বজ্রপাতে; এক স্বর্ণময় বেদী দগ্ধ স্থান ঘেঁষি সগৌরবে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে।" "শ্রমক্লান্ত" কবি বেদিকার পরে বসিয়া পড়িলেন। "সুখানিল স্পর্শে" তাঁহার "নয়ন মুদিয়া এল।" এমন সময়—

"অনিন্দ্য কনককান্তি
সুঠাম সুন্দর দেহে তরঙ্গিয়া গতিলীলা
রূপসী রমণী এক দাঁড়াল সহসা কাছে।"

কবি দেখিয়া "বিস্ময়-আতঙ্কে সচকি" উঠিলেন। "সসম্ভ্রমে" জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আপনি ?" রমণী বলিলেন—

"কে আমি ? বড় কঠিন প্রশ্ন
সহস্রেক বর্ষ ধরি বেঁচে আছি, মোরে কেহ
মানবী ত বলিবে না, নিজে আমি জানি তবে
আমি মানবীই বটে !"

তার পর রমণী নিজের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন :—পুরাকালে নীলিমকোট নামে এক রাজধানী ছিল। তার রাজার নাম বীররুদ্র। বীররুদ্রের দুই কন্যা— অমা ও শুক্লা। অমা "নবদূর্ব্বাস্নিগ্ধ কান্তি"—গুণেও শান্তস্নিগ্ধ; "বহ্নিভরা শুক্লা মানিত না কাহারো বাঁধন।"

দুই ভগ্নীতে যথেষ্ট প্রণয় ছিল। দুরন্ত শুক্লা নিরীহ অমাকে স্নেহের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বদা উৎপীড়িত করিত, অমা স্নেহ ধৈর্য্যভরে সব সহ্য করিত। ক্রমে "যৌবনে জোয়ার এল অমার শুক্লার।"

সংবাদ পাইয়া রাজন্যবর্গ অবিরাম দূত-হস্তে "প্রেমভেট" পাঠাইতে লাগি-

লেন। "বিসিন্দার" রাজপুত্র ইঁহাদের অন্যতম। রাজা বীররুদ্র গর্ব্বভরে তাঁহার প্রেমভেট প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রোধে বিসিন্দরাজ পূর্ণেন্দু বীররুদ্রের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। ফলে "বন্দী হ'য়ে পশিলেন কারাগৃহে।" "শৈলশীর্ষে ঝিল্লা" নামে কারা "সম্মানিত বন্দী লাগি" নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ঝিল্লার অপর শীর্ষে অমা ও শুক্লার প্রমোদ-ভবন। এখানে

"অমা শুক্লা সখীসহ খেলিত প্রমোদখেলা
হেথা আলসে লালসে, হাসিত নাচিত রঙ্গে
গাইত তরল কণ্ঠে।"
"শুক্লার খেয়ালে শুক্লা
সখীবৃন্দসহ শুভ্র বস্ত্র, অমা ঘনকৃষ্ণ
পরিত সদাই।"

একদিন হঠাৎ প্রাতে শুক্লার খেরালে দুই ভগ্নীতে বস্ত্র বিনিময় করিল। তার পরে দুইজনে প্রমোদগৃহে প্রমোদ-ক্রীড়ায় মত্ত হইল। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া যখন এইরূপ ক্রীড়ামগ্ন, সেই সময় পূর্ণেন্দুর "দুটী মোহমুগ্ধ অনিমেষ আঁখি" তাহাদের দিকে চাহিল। তাহাদেরও মুগ্ধ দৃষ্টি ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বন্দীর দিকে পড়িল।

"চুম্বকের আকর্ষণে
শুক্লা অমা যেন শুধু একটী দৃষ্টির সনে
বাঁধা পড়ি গেল এক প্রকাণ্ড পুলক-গূঢ়
আনন্দ মরণমাঝে হারায়ে আপনা।"

দুই জনেই এই শুভ মুহূর্ত্তে একই সময়ে পূর্ণেন্দুকে ভালবাসিয়া ফেলিল এবং অজ্ঞাত ঈর্ষায়

"ভুজপাশ খুলি নিয়া দোঁহে
দুই বিপরীত মুখে নির্ব্বাক চলিয়া গেল
নিজ নিজ কক্ষপানে। ঘন কৃষ্ণ নিশীথিনী
তিমির অঞ্চল দিল দুটি হিয়া মাঝে টানি।"

শান্ত অমা নীরবে হৃদয়ের মধ্যে এই প্রেমভার বহিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু অসংযত উচ্ছৃঙ্খল শুক্লাকে ইহা উন্মত্ত করিয়া তুলিল। দিদির হৃদয়

হইতে ছিঁড়িয়া কেমন করিয়া সে এই প্রণয়-দেবতাকে নিজের হৃদয়ে স্থান দিবে এই চিন্তা নিরন্তর তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। অশান্ত আবেগে শুক্লা একদিন এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইল এবং ধর্ম্মকে হৃদয়ে বরণ করিবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কিছুদিন গৈরিক ধারণ করিয়া যোগিনী সাজিল এবং শাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করিল।

দু'দিন না যাইতেই

"শুক্লা ছাড়ি দিল ধীরে
গৈরিক বসন; উপেক্ষিত ধর্ম্মগ্রন্থ যত।

আবার সে কাব্য-পাঠে ও স্বপ্ন-রচনায় ব্যাপৃত হইল। একদিন প্রমোদ-কাননে গিয়া দেখিল, অমার এক শিক্ষিত কপোত পূর্ণেন্দুর নিকট হইতে পত্র বহিয়া আনিতেছে। শুক্লা সে পত্র কাড়িয়া লইয়া পড়িল, "অমা, অন্তর-রাজ্যের মোর পূর্ণ পূর্ণিমাটি!" ইত্যাদি দেখিয়া তাহার—

"বর্ম্মপরিহিত যুদ্ধোন্মত্ত
সৈনিকের মত দেহ সুকঠিন ঋজুতায়
এল দৃঢ় হ'য়ে।"
অমার প্রতি তাহার "স্নেহ-তরল পয়োরস" নিমিষে—
"দ্বেষ অম্লে জমি এল"

"আপন ত্রিতল কক্ষে ফিরি গেল শুক্লা।"

সেই দিন

"রাত্রিশেষে তন্দ্রাযোগে এল এক
ভীষণ স্বপন রক্ত-অক্ষরে আঁকিয়া দিয়া
ভবিষ্যৎ জীবনের তা'র পাপ চিত্রপট।"
"প্রভাতে জাগিল শুক্লা সেই স্বপ্নমাঝে, সেই
স্বপ্নখাতে বহিয়া চলিল জীবনের স্রোত
সেই স্বপ্নদৃশ্যগুলি একে একে টানি নিল
আত্মহারা স্বপ্ন-লুপ্ত শুক্লারে অজানা টানে।"

তার পর সেই দিন হইতে শুক্লার জীবন-স্রোত "স্বপ্নখাতে বহিয়া চলিল।" শুক্লা অতি ভীষণ পাপে রত হইল!

কবি বলিতেছেন :

"স্বপ্নযন্ত্র যা করিল তার লাগি ওগো বিশ্ববাসী
সকলে তোমরা ওগো শুক্লারে করিও ক্ষমা।"

কবি-হৃদয় অতি উদার। কিন্তু যেমন করিয়া পাপিষ্ঠা শুক্লা আপনার স্বার্থসাধনের জন্য স্নেহময়ী সরলা ভগ্নীটিকে ঘাতকের মত হত্যা করিল, বিশ্বাসী প্রেমময়, চিরভক্ত উদয়নের মৃত্যুর কারণ হইল, তাহাতে তাহাকে সাধারণ পাঠকের ক্ষমা করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

শুক্লা অন্যায় প্রেমের জন্য আমাকে যথাসাধ্য লাঞ্ছিত করিল, পিতাকে বলিয়া তাহাকে পাত্রান্তরে সমর্পণের ব্যবস্থা করিল এবং পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া তীক্ষ্ণ কঠোরস্বরে তাহাকে বলিয়া গেল।

"নীলাক্ষের সাথে কল্য বিবাহ তোমার।"

এইরূপে নানা অত্যাচার সহিয়া কুসুমপেলবা অমা-কুসুম নীরবে শুকাইয়া গেল। শুক্লা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ঔষধ আনাইয়া উদয়নের হস্তে দিয়া পূর্ণেন্দুকে সেবন করাইবার জন্য পাঠাইল—ঔষধ খাইয়া অচেতন হইয়া পড়িলে মৃতবোধে রক্ষীগণ সৎকারার্থে তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাইবে, তখন শুক্লা রক্ষী-দিগকে বশীভূত করিয়া তাহাকে সন্ন্যাসীর মন্দিরে লইয়া গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবে।

কিন্তু এইখানে আসিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত অসত্যে পরিণত হইল। উদয়ন ঔষধ পূর্ণেন্দুকে সেবন না করাইয়া সমস্ত ঔষধ নিজে পান করিয়া মৃত্যুলাভ করিল এবং পত্র লিখিয়া এ কথা শুক্লাকে জানাইয়া গেল। শুক্লা উদ্ভ্রান্তচিত্তে বন্দীর কক্ষে ছুটিয়া গেল। বন্দী তাহাকে অমা বলিয়া সম্বোধন করিল। ইতিমধ্যে রাজা পূর্ণেন্দুকে উদয়নের মৃত্যুর কারণ স্থির করিয়া তাহার "শূলে মৃত্যু" ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অমার নাম করিতে শুক্লা হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল এবং পূর্ণেন্দুকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে ঘাতকদিগকে আদেশ করিল।

শেষে কক্ষে গিয়া স্থিরচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে সে বুঝিতে পারিল যে, সমস্ত ব্যাপারটা একটা মহা ভ্রান্তিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ণেন্দু চিরদিন শুক্লাকেই ভালবাসিয়াছে। সে দিনের বস্ত্র-বিনিময়ের দোষে রক্ষী শুক্লাকে অমা বলিয়া

পরিচিত করিয়া দিয়াছিল—তাহাতেই এ বিভ্রাট! হায় বৃথা শুক্লা তাহার স্নেহময়ী দিদিকে হত্যা করিয়াছে, বৃথা সে পূর্ণেন্দুর মৃত্যুর কারণ হইয়াছে! উন্মাদিনীর মত শুক্লা বধ্যভূমিতে ছুটিয়া গেল। কিন্তু তখন সব ফুরাইয়াছে—ধরাতল পূর্ণেন্দুর শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে!

সেই দিন হইতে রমণী—

"অচঞ্চল পরিবর্ত্তহীন কৃচ্ছ্র সাধনায়
অনন্ত মিলন লাগি' জীবনের স্বামীসাথে"

অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

কবিতে রমণী পূর্ণেন্দুকে প্রাপ্ত হইল। এমন সময়ে কবিজায়া বলিলেন,

"ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল জল
চা খাবে ত খাও।"

ভাবমুগ্ধ কবি বিস্মিতদৃষ্টিতে দেখিলেন তাঁহার স্ত্রীর শরীরেই

"ছায়ামূর্ত্তি কার
যেন স্বচ্ছ দেহমাঝে তার উঠিছে ফুটিয়া।"

কবি চীৎকার করিয়া পত্নীকে ডাকিলেন, "শুক্লা শুক্লা।"

পত্নী উত্তর করিলেন "পূর্ণেন্দু! স্বামিন্।"

ইহাই শুক্লা কাব্যের উপাখ্যানাংশ।

অতঃপর সমালোচনা।

যে কবি আজিকার "ট্রেন ট্রামের" দিনে—"চা"এর পেয়ালার মধ্য হইতে নূতন "কাদম্বরী" কল্পনা করিতে পারেন, তাঁহার কল্পনা-শক্তির প্রবলতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্থানে স্থানে কবিত্বও অতি সুন্দর। যথা—

"ছুটিল বাষ্পের রথ বেগে উপকণ্ঠ দিয়া
কত নগর পল্লীর, সচকিয়া পল্লীঘাটে
ললনা-মুখর মেলা, কাড়িয়া উৎসুক দৃষ্টি
নব অবগুণ্ঠিতার। কত ঘন অরণ্যানী—
বসুধা-কুন্তলসম সীমন্ত ভূষিত চারু
বিকচ বল্লরীচয়ে; হেমন্তের হিল্লোলিত
হেমধান্যমালা বুকে নিয়ে কত শস্যক্ষেত্র।

কত উন্মুক্ত প্রান্তর আকীর্ণ শ্যামলশস্পে
নিয়ে তার দূর প্রান্তে মিলন-চুম্বন-রেখা
শ্যামলে ও নীলিমায় বিহ্বল-মদির-মগ্ন,
কত বা আবেগমূঢ় তটিনী কল্লোলাকুল
রজত রসনাসম শ্যাম ধরিত্রীর, কত শান্ত
স্বচ্ছ সরোবর সৌন্দর্য্যস্বপনে ভোর
ফুল্ল কমলের, পরে পরে আঁখি-প্রান্ত হ'তে
চকিতে মিলায়ে গেল একে একে দুই দিকে।"

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও কবির বিরুদ্ধে আমাদের অনেকগুলি অভিযোগ আছে। আমাদের সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ স্থানে স্থানে ভাবের নিতান্ত অস্পষ্টতা। ভাষার মোহে কবি এমনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, যে ভাব প্রকাশের দিকে তিনি আদৌ দৃষ্টি রাখেন নাই।

"আজিকার এই আলোড়ন
হিল্লোলে ফুটায়ে দিবে কত বিচিত্র সংগীত,
কত চিত্র, কত প্রেমবিদ্যুল্লতা সুখদীপ্ত
কম্পসার বেদন-নিগড়ে পীড়িয়া নিভৃতে
বক্ষোবাসী কত না পক্ষীরে।"

তথা—

"সভ্যতার
ছায়াবাজী ছায়াস্ফুট বিচিত্র উর্ম্মির মালা
চিত্তে চিত্তে ফিরিত না খেলাইয়া সে সময়ে?
সুনিবিড় ভাব ক'টা অবিমিশ্র সমুজ্জ্বল
রেখাবদ্ধ নরনারী-হিয়া ঘনায়ে আনিত
অন্তর্গূঢ় আকর্ষণে।"

প্রভৃতির অর্থ করিতে পাঠককে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতে হয় এবং দুর্ভাগ্য-বশতঃ এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।

আমাদের দ্বিতীয় অভিযোগ—বিরুদ্ধ অর্থবাচক শব্দের যথাতথা একত্র সমাবেশ।

"মৃত্যু-ভরা মহা চৈতন্য", "মুক্তির বাঁধন", "আশাহত নিত্য নূতন আশায়", "বজ্রদৃঢ় পুষ্পডোর", "সুতীব্র বেদনাভরা ভীষণ মধুর হর্ষ" "তাপ-ফুল্ল মন" ইত্যাদি সুগভীর অবোধ্য প্রহেলিকা! কুক্ষণে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "রৌদ্রময়ী রাতি"!

আমাদের তৃতীয় অভিযোগ—কবির "খানা" শব্দটির উপর অযথা পক্ষপাতিতা।

"কমল কোরকখানা", "স্বপন অতীতখানা", "পেলব প্রলেপখানা"—না শ্রুতিমধুর, না স্পষ্টার্থবাচক।

আমাদের চতুর্থ অভিযোগ—ছন্দসম্বন্ধে যথেষ্ট শিথিলতা। অনেকস্থলে যতিপতন ঘটিয়াছে—তদ্ভিন্ন সাধুভাষাপূর্ণ ছন্দঝঙ্কারের সঙ্গে সহসা গ্রাম্য শব্দের সম্মিলনে স্থানে স্থানে ছন্দের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য-হানি ঘটিয়াছে।

"তরু বীথিকার শাখে শাখে
বল্লরী-পল্লব-ঘেরা কালো মখমলে যেন
তখন উঠিছে জ্বলি জোনাকির চুমকিগুলা।"
"অস্ফুট কাকলি হতে মুখর জাগরণের
শত কলগীতে ক্রমে প্রভাত জাগিয়া উঠে।" ইত্যাদি।

এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও লেখকের কবিত্ব আছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বোধ হয় এই তাঁহার প্রথম রচনা—অনুকরণের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া ছন্দ ও ভাষা সম্বন্ধে আর একটু অবহিত হইলে কবি বঙ্গ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন, আশা করি এবং আশা করি বলিয়াই এত কথা লিখিলাম।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ।

দিল্লী।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

গলিতে গলিতে, বাজারে বাজারে, চত্বরে চত্বরে ও বড় বড় রাস্তায় মসজিদ, মন্দির, মঠ ও কলেজ স্থাপিত রহিয়াছে। এই সকল স্থান হইতে মানুষ তাহার ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উপকার ও সুবিধাই প্রাপ্ত হয়। এই সকল মসজিদ প্রভৃতি সত্ত্বেও নগরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সম্রাটের জুম্মা মসজিদ বিরাজ করিতেছে। ১০৬০ হিজরী (১৬৫১ খৃষ্টাব্দে) শাহজাহানের রাজত্বের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষে তাহা রক্ত প্রস্তর দ্বারা দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হয়। তাহা এত উচ্চ যে, তাহার মুয়াজ্জিনের * স্বর স্বর্গলোকবাসীদের কর্ণগোচর হয়। তাহা এত বিস্তৃত যে, একটা জগৎ তাহার ভিতর রাখা যাইতে পারে। মহম্মদের মহত্তম শ্রেষ্ঠ বিধির মর্য্যাদার ন্যায়ই তাহার বেদী উচ্চ। তাহার খিলান-গুলিতে ধর্ম্মাত্মাদের প্রশংসা-গাথা লিখিত রহিয়াছে। তাহার গম্বুজগুলির শিরোভাগ স্বর্গের গম্বুজ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তাহার মিনারগুলি স্বর্গের প্রাচীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। উন্নতমনাদের ন্যায় তাহারও দ্বার সর্ব্বদা সকলেরই নিকট উন্মুক্ত। পবিত্রাত্মাদের অন্তঃস্থলের ন্যায় তাহারও অন্তঃস্থল দানের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ রহিয়াছে। তাহার গাড়ীবারান্দাসমূহে ও কুঠুরীতে কুঠুরীতে কঠোর উপাসনা হইয়া থাকে। তাহার গৃহসংলগ্ন উচ্চ স্থান ও বেদীসমূহ হইতে সাধু ব্যক্তিরা বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার প্রাঙ্গণগুলি পবিত্রাত্মাদের হৃদয়ের ন্যায় অপবিত্রতা হইতে মুক্ত। তাহার জলাধারগুলি উন্নতমনাদের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় করুণায় পূর্ণ।

(পদ্য) তাহার প্রাঙ্গণ হইতে অন্য একরূপ করুণা পাওয়া যায়।
তাহার জলাধারে কুসরের † জল পাওয়া যায়।

---

* মসজিদে প্রার্থনা করিবার জন্য যে ব্যক্তি লোকদিগকে আহ্বান করে, তাহাকে মুয়াজ্জিন বলে।—সরকার।

† স্বর্গের সুধা-নদী।

তাহার অত্যধিক উচ্চতার জন্য স্বর্গকেও তাহার সোপানাবলীর একটা ধাপ বলিয়া মনে হয়।

চন্দ্র সূর্য্য তাহার ছায়াতলে থাকে।

তাহার গাড়ীবারান্দা বিশ্বাসীদের বেদী।

তাহা আক্‌সা ‡ মসজিদের অনুকৃতি।

উৎকৃষ্ট প্রাসাদাবলীর মধ্যে সম্রাটের স্নানাগার একটি। কি চমৎকার স্নানাগার—কেমন সুন্দর স্থানে নির্ম্মিত ও প্রমোদে ওৎপ্রোত। নববর্ষ দিনের বায়ুর ন্যায় ইহার বায়ু হৃদয়কে সতেজ করিয়া তুলে, এপ্রিলের দিনগুলির ন্যায় করুণা বিতরণ করে। ইহার উষ্ণাগারগুলি প্রমোদের উত্তেজনার মত উষ্ণতার সৃষ্টি করে। ইহার শীতলাগারগুলি ক্লান্ত শরীরে নিদ্রা আনিয়া দেয়। ইহার বায়ু নাতিশীতোষ্ণতায় স্বর্গবায়ুর সমকক্ষ। ইহার গম্বুজ স্বর্গের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইহার উষ্ণতা (সজীব দেহের) সাধারণ উষ্ণতার ন্যায় স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে। দেহের শীতলতার ন্যায় ইহার শীতলতা শরীরে বলাধান করে। সূর্য্য ইহার গম্বুজ (tower) পাইবার আশায় স্বর্গের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত বেড়াইতে থাকে। চন্দ্র তাহার শৈত্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অন্তরের সহিত ইহার কামনা করে। যে কেহ ইহার ভিতর প্রবেশ করিবে, সেই বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন প্রকার তাপমাত্রা অনুভব করিবে; সে (পার্থিব) বন্ধনের আচ্ছাদন ত্যাগ করিবে; সে সংসার-বিরাগী সাধুর ন্যায় সংসার ত্যাগ করিতে যাইবে; সে পবিত্রস্বভাব ব্যক্তিদের ন্যায় পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পথ পছন্দ করিবে। মস্তিষ্কবিকৃতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভারবোধ, crop sickness-জাত জৃম্ভন, শরীরের অবসাদ প্রভৃতি নানা রোগ এই স্নানাগারে স্নান করিলে সারিয়া যায়। মনের স্ফূর্ত্তি, মস্তিষ্কের সতেজতা, হৃদয়ের উৎসাহ ও শরীরের পবিত্রতা প্রভৃতি নানাবিধ সুখই ইহাতে পাওয়া যায়। জল ও উত্তাপের সমন্বয় করা (সর্ব্বদাই) কঠিন ব্যাপার; কিন্তু এই আশ্চর্য্যস্থলে জল ও অগ্নি একভাবে একত্র মিশিয়া রহিয়াছে। অন্য কোন স্থলই বাতাস ও ধূলা হইতে মুক্ত নহে; কিন্তু ইহা তাহাদের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য স্থল, কারণ বাতাস ও ধূলা এখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

‡ জেরুসলেমের মন্দির।

(পদ্য) এখানে জল ও অগ্নি একত্র কার্য্য করে;
বাতাস ও ধূলা দ্বার হইতে দূরে থাকে।
এখানে হম্মাম (Bath) নামক আকাশ আছে।
চন্দ্র ও সূর্য্যকে গুল ও জাম (গোলাপ ও বাটী) বলা হয়।
এ জগতে, ইহার গঠন-সমতা হইতে বিভিন্ন জিনিষ একত্র
মিশিয়া রহিয়াছে।

অল্প কথায়, দিল্লী অতি বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড সহর। ইহা রাজ্যের কেন্দ্র ও রাজধানী। বাসযোগ্য পৃথিবীভাগের পর্য্যটকেরা জগতের কোথাও এরূপ বিস্তৃত ও এত অধিক জনপূর্ণ শহরের কথা বলিতে পারিবে না। রুমের (টার্কির) স্থলতানের রাজধানী স্তাম্বুল সহর (কন্স্‌টান্টিনোপল্‌) বিস্তৃতি ও বিশালতার জন্য বিখ্যাত; কিন্তু তাহা ইহার দশমাংশের দশমাংশও নহে। কাজুয়ীন * ও ইস্পাহান শহর নামক পারশ্যের উপর রাজধানীই সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্বের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু তাহারা এই সহরের একটা পল্লীরও সমতুল্য নহে। বাগ্‌পটু ও শিক্ষিত কবিরা এবং জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা হৃদয়োন্মাদকারী পদ্য, গদ্য ও গাথাতে এই অদ্বিতীয় সহরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। সে সব বর্ণনার একটি এই—

(পদ্য) ইহা একটি প্রকাণ্ড শহর, ঠিক স্বর্গের মত,
ভারতের কেন্দ্র, রাজাদের রাজধানী।
স্বর্গের মত ইহা সুখবৃদ্ধি করে।
বসন্তকালের উদ্যানের মত ইহা চিত্তকে উৎফুল্ল করিয়া তুলে।
ইহার অধিবাসীরা (ভগবানের) প্রিয় সন্তানের মত,
শিক্ষিত, দক্ষ, চতুর ও পণ্ডিত।
তাহাদের সকলেই যুদ্ধে জয়ী ও জগজ্জয়ী;
তাহাদের সকলেরই স্বভাব পৃথিপতির গ্রাহ্য।
তাহাদের সকলেরই মর্য্যাদা ও খাঁ উপাধি আছে;
সকলেই আবু আলির † মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি;
দেবতাদের মত সকলেই ভগবানের নাম গান করে।

* তেহারাণের কিছু পশ্চিমে অবস্থিত। † আবু আলি হুসেন বিন আবদুল্লা বিন সিনা। ইনি অবিসিন্না নামে অধিক পরিচিত। ইঁহার জন্ম ৯৮০ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ১০৩৬ খৃষ্টাব্দে।—সরকার।

ক্ষত-হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ লাগাইতে সকলেই পারদর্শী,
সকলেই সময়ের দুঃখ-কষ্টাদি হইতে মুক্ত।
সকলেই ডেবিডের মত মিষ্টভাষী;
সকলেই নিজ নিজ শিল্পে ও কার্য্যে পারদর্শী।
সকলেরই মুখ ইয়ুসুফের মত,
জুলেখার * মত ভালবাসা সকলেরই আছে;
সকলের প্রকৃতি ফরহাদের † মত ও
সৌন্দর্য্যজ্ঞান শিরিণের মত।
সকলেই মনের মত লোকের সহিত মিশিয়া আছে,
সকলেই সুখের মদিরা পানে উন্মত্ত।

এই বিশাল শহরের ভিতরে ও বাহিরের চারিদিকেই পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবৃন্দের অনেকেরই সমাধি-মন্দির আছে। সে সব মন্দিরের মধ্যে সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরটিই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইহা গঙ্গার তীরে, কৈকুবাদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কিলুগড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। আমীর, মন্ত্রী, পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের—যাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলে রীতিমত খ্যাতিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই সব ব্যক্তিদের অগণ্য সমাধিমন্দিরগুলি উদ্যানাবলীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত। মৃত ব্যক্তিদের সমাধি-মন্দির লইয়া একটা ভিন্ন শহরের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। য়াহা কল্যাণের প্রকাশ মাত্র, সাধুদের সেই স্মৃতিমন্দিরের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

শহর হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত খাজা কুতুব-উদ্দীন বখ্‌তীয়র কার্কির ‡ সমাধি-মন্দির এই সকল মন্দিরের একতম। ইনি খাজা কমল উদ্দীন অহমদ মুসীর পুত্র। শুনা যায়, ফরঘনা ইঁহার জন্মস্থান। শৈশবেই ইঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্তি জন্মে। (নবধর্ম্ম প্রচারক) মহাত্মা খিজির দৈবাৎ একদিন তাঁহার পার্শ্ব দিয়া গমন করিলে ইঁহার জ্ঞানদর্পণ মার্জ্জিত ও সমুজ্জল হইয়া উঠে। এই স্বপ্নময় পার্থিব জীবনের অষ্টাদশ

* 'পোতিফার'এর স্ত্রী।

† পারস্যের অনৈক বিখ্যাত ভাস্কর। শিরিণের প্রতি ভালবাসার জন্য প্রসিদ্ধ।

‡ জন্মস্থানের নামানুসারে 'উশী' নামেও ইনি খ্যাত। জন্ম ৫৮৫ হিজরী।—সরকার।

বর্ষে ইনি খাজা মুইন-উদ্দীন চীশ্‌তীর * উত্তরাধিকারী পদ লাভ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। বগ্‌দাদে উপস্থিত হইয়া ইনি তথাকার বহু সাধুর করুণা লাভ করেন। মুলতানে আসিয়া ইনি শেখ বাহা-উদ্দীন জকারীয়ার † সহিত সাক্ষাৎ করেন। গুরু খাজা মুইন-উদ্দীন চীশ্‌তীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইনি শামসুদ্দীন আল্‌তামাসের রাজত্বকালে দিল্লী শহরে আগমন করেন। এই সদ্‌গুরু ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ-মানসে দৈবপ্রেরণাবশতঃ আজমীর হইতে দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ হইলে ভগবানের দরবারের এই উভয় সভ্যই প্রীতিলাভ করেন তাঁহারা কিছুকাল একত্র বাস করেন। কয়েক দিন পরে খাজা মুইন-উদ্দীন আজমীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু কুতবউদ্দীন দিল্লী বসবাসের জন্য মনোনীত হইলেন ও তথায় থাকিয়া জগদ্‌বাসীর মহা উপকার করিতে লাগিলেন। পরে ৬৩৩ হিজরীর (১২৩৫ খৃঃ) ‡ ১৪ই রবি-উল্‌ আওয়ল তারিখের প্রভাতে ইনি এই ক্ষণবিধ্বংসী জগৎ ত্যাগ করেন। ¶

এই অঞ্চলে আরও একটি মন্দির আছে। তাহা আলোকের প্রকাশস্বরূপ সেখ নিজাম উদ্দীন আউলিয়া * ওরফে মহম্মদ বিন অহম্মদ দানিয়েলের সমাধি-ক্ষেত্র। ৬৩২ হিজরীতে (১২৩৪ খৃষ্টাব্দে) গজনীন্‌ দেশে ইঁহার জন্ম হয়। জ্ঞানোদয় হইলে, ইনি ঘটনাক্রমে বদায়ুনে আগমন করেন ও তথায় সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা করেন। বিবাদে জয়লাভ করিয়া ইনি নিজাম—সভাসমূহের মীমাংসক উপাধি লাভ করিয়া খ্যাত হইয়া পড়েন। বিশ বর্ষ বয়ক্রমকালে ইনি অজোধন † সহরে যাইয়া সেখ ফরীদ উদ্দীন গঞ্জ-ঈ-শক্করের ‡ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, প্রকৃত অবিনশ্বরতা-ভাণ্ডারের চাবি হস্তে পাইয়া, ইনি লোকদিগকে সে পথে পরিচালনা করিবার মানসে দিল্লী গমন করেন। (আধ্যাত্মিকজ্ঞান)-অন্বেষী বহু ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করিয়া ইনি বহুল খ্যাতির অধিকারী হয়েন।

---

* জন্ম ৫৩৭ হিজরী, মৃত্যু ৬৩৩ হিজরী। (আইন ৩।৩৬১।)

† আইন-ঈ-আকবরীতে (৩।৩৬২) তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত আছে।

‡ নিয়ামুৎ-উল্লার মতে ৬০৩ হিজরী (Dorn. pt-II.5)

¶ আইন-ঈ-আকবরী (৩।৩৬৩।) ও ডর্ণের আফগান-ইতিহাসে (২।২-৫) ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত আছে।

* আইন-ঈ-আকবরীতে (৩।৩৬৫) তাঁহার জীবনী আছে।

† অন্য নাম পক-পট্টন। পঞ্জাবের অন্তর্গত।

‡ আইন-ঈ-আকবরীতে (৩।৩৬৩) তাঁহার জীবনী আছে।

তাঁহার শিষ্যবর্গ সকলেই খ্যাতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহাদের নাম— দিল্লীতে 'দিল্লীর আলোক' শেখ নশীর-উদ্দীন মহম্মদ ও আমীর খুসরু; বাঙ্গলায় সেখ আলা-উল হক ও সেখ অখি সিরাজ; চন্দেরীতে শেখ ওজি হুদ্দীন ইয়ুসুফ; মালবে শেখ ইয়াকুব ও শেখ কমল; 'ধার'-এ মৌলানা ঘিয়াস; উজ্জয়িনীতে মৌলানা মঘিস্; গুজরাটে সেখ হিসাম উদ্দীন; দাক্ষিণাত্যে সেখ বরহন্ উদ্দীন, সেখ মুন্তাখব ও খাজা হসেন। আরও অন্যান্য স্থানে তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ ও প্রতিনিধিবর্গ ধর্ম্মগুরুরূপে এদেশে বেশ সফলতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। সংক্ষেপতঃ, ৭১০ হিজরী (১৩১০ খৃঃ) ১৮ রবি উস্-সানি বুধবার প্রাতঃকালে ৯ ঘটিকার সময় এই মহাত্মা এই নশ্বর জগৎ হইতে অবিনশ্বর জগতে প্রস্থান করেন। হিন্দুস্থানের অন্য সকল সাধুর অপেক্ষা ইনিই সাধুতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের দরবারের এই সভ্য, সাধুর সাধু মহাত্মা মিরণ মহি-উদ্দীন আবদুল কাদির গিলানীর বংশধর।

গিলানী * হুসেনের বংশধর ও শেখ শিবলী † হইতে পঞ্চম অধস্তন পুরুষ। তিনি সৈয়দ। বগ্দাদের নিকটবর্ত্তী জিল নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। এই গ্রামের নামানুসারে তিনি জিলানী বা গিলানী আখ্যা প্রাপ্ত হন। ৪৭১ হিজরী (১০৭৮ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার জন্ম হয়। বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিদ্যায় তিনি তৎকালে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি সেখ আবু সৈয়দ মুবারকের ফকিরী বেশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব, বাক্যের মাধুর্য্য, বিস্ময়কর 'কার্য্য, মনোমুগ্ধকর ইন্দ্রজাল, জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে অসংখ্য লোক পার্থিব ও আধ্যাত্মিক—উভয়বিধ উন্নতির অভিলাষে তাঁহার নিকট আগমন করিত এবং দৃঢ় বিশ্বাসের বশে স্ব স্ব অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ৫৬১ হিজরী (১১৬৫ খৃষ্টাব্দে) নবতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর জগতে প্রস্থান করেন। এই গ্রন্থ লিখিবার দিন পর্য্যন্ত সার্দ্ধ পঞ্চ শত বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আজও তাঁহারা পবিত্র নাম চিরজাগ্রত রহিয়াছে এবং জগতের প্রত্যেক অংশেরই অসংখ্য লোক তাঁহার প্রতি গভীর বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিতেছে। ‡ (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত।
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* আইন-ঈ-আকবরী (৩।৩৫৭) দ্রষ্টব্য।

† আইন-ঈ-আকবরীতে আছে—'শিবলী তাঁহার গুরু-পারম্পর্য্যে পঞ্চম পুরুষ।'

‡ দ্বিতীয় খণ্ড 'অর্ঘ্যে' এই প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশিত হয়, তাহাতে কতকগুলি আপত্তিজনক ভুল থাকিয়া গিয়াছে; তাহার দুইটি সংশোধন করিয়া দিলাম।—প্রথমেই 'রাজধানী—যুক্ত প্রদেশ' স্থলে 'রাজধানী-যুক্ত প্রদেশ' হইবে। ৬১ পৃঃ ১২ ছত্রে মরকত স্থলে চুণী হইবে।

লালবাঁধ।

(ঐতিহাসিক গল্প।)

বঙ্গদেশের যাবতীয় রাজ্যের মধ্যে বিষ্ণুপুর রাজ্য অতি প্রাচীন। বিষ্ণুপুরের রাজবংশ "বাগদী রাজা" নামে অভিহিত। কিন্তু এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গদেশীয় নহেন। বিষ্ণুপুর রাজ্যে অধুনা যে সকল দেবালয়, গড় প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা হয় যে বিষ্ণুপুর রাজ্য এক সময়ে অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এ সকল ব্যতীত বিষ্ণুপুর রাজ্যের আর একটী অতীব গৌরবের বিষয় আছে। তাহা—এতদঞ্চলের জলাশয় ও দীর্ঘিকাসমূহ; ইহাদিগকে সেখানকার লোকে বাঁধ বলে। এই বাঁধগুলির বিশালতা ও সৌন্দর্য্য এবং ইহাদের স্বচ্ছ, নির্ম্মল সলিল দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

বিষ্ণুপুর রাজবাটীর সম্মুখে এরূপ একটী বাঁধ আছে, তাহার নাম লালবাঁধ; এই বাঁধ সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

মহারাজ চৈৎ সিং নামে এক রাজার রাজত্বকালে এই বাঁধ প্রতিষ্ঠিত হয় মহারাজ চৈৎ সিং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় অতি বিচক্ষণ, স্বধর্ম্মানুরাগী ও প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। দিল্লীশ্বরের নিমন্ত্রণে তাঁহাকে একবার দিল্লী যাইতে হয়। এই দিল্লী যাওয়াই তাঁহার কাল হইল। সেখানে অবস্থিতি-কালে তিনি এক যবনীর প্রেমে পতিত হন। সে যবনী অসামান্যা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিল। মহারাজ তাহাকে দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্বদেশ-প্রত্যাগমন-কালে তিনি উহার অদর্শনে জীবনধারণ দুঃসহ হইবে বিবেচনায় তাহাকে সঙ্গী হইতে অনুরোধ করেন। এই সুযোগ ও অবসর পাইয়া যাত্রার পূর্ব্বদিন ঐ যবনী সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ মহারাজাকে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইল যে, মহারাজা তাহার কোন অনুরোধ কখনও প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।

স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজা তাহার স্বতন্ত্র বাসাগার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে মহার্ঘ ও পরিপাটী বসন-ভূষণ প্রদান করিলেন। ক্রমে মহারাজা ভুলিলেন যে, সে যবনী এবং তিনি হিন্দু। তিনি রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া তাহার ভবনেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন বিষ্ণুপুরাধিপগণের সেনাপতির উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। সেনাপতিগণ রাজ-

আত্মীয়গণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইত। "সেনাপতি মহল" নামে এক বিস্তীর্ণ জায়গীর সেনাপতিগণের ভরণপোষণার্থ দান করা হইয়াছিল। সুতরাং মহারাজ রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইলেও উহাতে কোন বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয় নাই।

এই যবনীর নাম ছিল লালবাই। লালবাইয়ের অসাধারণ রূপ ও গুণের খ্যাতি রাজ্যময় ঘোষিত হইয়াছিল। বাস্তবিক লালবাই মহারাজকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার আজন্ম-সংস্কারাদি, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় স্ত্রী ও একমাত্র বংশধর গোপাল সিংকে ত্যাগ করিয়াও একদিনের জন্য দুঃখানুভব করেন নাই। লালবাইয়ের প্রখর বুদ্ধি ও অসামান্য রাজনীতি-কৌশল ছিল। বিষ্ণুপুর রাজ্যের সমৃদ্ধি, বীর্য্য ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে সংকল্প করিল যে, এ রাজ্য মুসলমানের অধীনে আনিতে পারিলে বঙ্গদেশে মুসলমানের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই সংকল্প-সাধনের জন্য সে একটী সহজ উপায় স্থির করিল।

একদিন পূর্ণিমা রজনীতে মহারাজ চৈৎ সিং লালবাইয়ের হাত ধরিয়া প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। চন্দ্রের রজত-কিরণে সমস্ত পৃথিবী হাসিতেছিল। সুমন্দ পবন নানাবিধ ফুলের গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। মহারাজ এই চন্দ্র-করোজ্জ্বল রজনীতে তাঁহার প্রিয়তমাকে অধিকতর সৌন্দর্য্যশালিনী দেখিয়া প্রেমোদ্বেলিত কণ্ঠে বলিলেন, "লাল! তোমায় আমি সুখী করিতে পারিলাম না।" লাল দেখিল, ইহাই উপযুক্ত অবসর। সে তৎক্ষণাৎ প্রেমার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "মহারাজ! এ দাসী আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আপনি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে যে স্থান দিয়াছেন, ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু মহারাজ আপনি যে দাসীকে এত অনুগ্রহ করেন, তাহার নিদর্শন ত কিছুই রহিল না। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার অভিলষিত নিদর্শনের নির্ব্বাচন ভার দিলেন। লাল পরিশেষে প্রকাশ করিল, তাহার নামে একটী বৃহৎ বাঁধ কাটান হউক এবং তাহারি নাম হউক লালবাঁধ।

তৎপরদিন প্রাতেই মহারাজ তদ্রূপ আজ্ঞা দিলেন এবং বহু অর্থব্যয়ে ও বহু লোকের পরিশ্রমে বাঁধ কাটা হইল। বাঁধ কাটাইবার হুকুমের পর হইতেই লালবাই মহারাজকে মন্ত্রণা দিল যে, বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রজাগণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে না পারিলে মহারাজ অবাধে তাহাকে ভোগ করিতে পারিবেন না। কারণ মহারাজের এরূপ ম্লেচ্ছাচরণে প্রজাগণ নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছে

এবং তাহাদের মধ্যে ঘোর অশান্তি বিরাজ করিতেছে। মহারাজ আনন্দে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেও মনে মনে ভীত হইলেন। দুইজনে বহু পরামর্শের পর স্থির করিলেন যে, নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এই বাঁধ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রাজ্যের যাবতীয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লালবাই কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করাইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। মহারাজ প্রজাপুঞ্জের অজ্ঞাতসারে তাহাদের জাতিনাশে ভীত হইয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন এবং সেই দিন হইতে পনের দিন পরে বাঁধ-প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করিলেন। ব্রাহ্মণগণ জাতিনাশভয়ে ভীত হইয়া রাজ-পুরোহিতের শরণাপন্ন হইল। রাজ-পুরোহিত তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিলেন যে, এই আকস্মিক বিপদে জননীস্বরূপা মহারাণীর শরণাপন্ন হওয়াই একমাত্র ভরসা। পরদিন প্রত্যূষে সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী মহারাণীর জয়ধ্বনি করিতে করিতে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। মহারাণী দাসীদ্বারা তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতিরক্ষার ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল।

মহারাণী মহারাজকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া গললগ্নীকৃত বাসে ও সজল নয়নে তাহাদের জাতি ও ধর্ম্ম ভিক্ষা চাহিলেন। মহারাজ ব্রাহ্মণদিগের এরূপ সাহস ও স্পর্দ্ধায় ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিবেন না বলিলেন ও যে যে ঐ দিন অনুপস্থিত থাকিবে, তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন এরূপ আদেশ দিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা সেনাপতি, মন্ত্রী ও পাত্র-মিত্রাদির সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাজের প্রাণবধের সংকল্প করিল। কিন্তু প্রভুভক্ত সেনাপতি মহারাণীর আদেশ ভিন্ন এরূপ কার্য্যে অসম্মত হইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি সম্মত না হইলে এতগুলি ব্রহ্ম-হত্যার পাপে রাজবংশ নির্ব্বংশ হইবে। কথিত আছে, ধর্ম্মপরায়ণা, তেজস্বিনী মহারাণী পতির প্রাণাপেক্ষা ব্রাহ্মণের জাতি ও ধর্ম্মরক্ষা শ্রেয়ঃ কিনা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি একবার শেষ চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এইবার তিনি মহারাজের পদধারণ পূর্ব্বক এই দুর্ম্মতি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। মহারাজ এইরূপ বারবার অনুরুদ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া মহারাণীকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন যে, যদি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহচ্যুত হয়, তথাপি তাঁহার সংকল্প অচল থাকিবে

সাধ্বী, ধর্ম্মভীতা ও রাজ্যের কুশলাকাঙ্খিনী মহারাণী দেবতার মন্দিরে তিন দিন অনশনে আদেশ প্রার্থনা করেন। এক দিন শেষ রাত্রে এই কার্য্যে দেবাদেশ পাইলেন।

বাঁধ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিন বৈকালে মহারাজ ও লালবাই একত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, গুম্‌গড়ের * ছাদের উপর মহারাণী স্বয়ং দণ্ডায়মানা। মহারাজ তাঁহার স্থির, অবিচলিত মুর্ত্তি, তাঁহার স্বর্গীয় আভায় প্রদীপ্ত মুখকান্তি ও ঐ অসম্ভব স্থানে তাঁহাকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় কৌতূহল ও ক্রোধে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মহারাণী তাঁহার বসনাঞ্চল একবার ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিয়া গুম্‌গড়ের ভিতর ঝম্প প্রদান করিলেন। মহারাজ ভূতলে পতিত হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেনাপতি সমস্ত বিবৃত করিয়া মহারাজ-প্রদত্ত জায়গীর "সেনাপতি মহল" ও যুদ্ধব্যবসায় ত্যাগ করিলেন। মহারাজ সমস্ত বুঝিয়া তাঁহার শিশু পুত্র গোপাল সিংহকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে স্বধর্ম্ম-নিরত থাকিতে প্রতিশ্রুত করাইয়া জীবলীলা সাঙ্গ করিলেন! পরে প্রজামণ্ডলী রাণীর মৃতদেহ গুম্‌গড়ের ভিতর হইতে উঠাইয়া রাজার দেহের সহিত এক চিতায় মহাসমারোহে দাহ করিয়াছিল। যে স্থানে চিতা-প্রজ্জলিত হইয়াছিল, সে স্থান অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; তাহা "সতীস্থান" নামে প্রসিদ্ধ। সধবা স্ত্রীলোকেরা আজিও সে স্থানের মৃত্তিকা বৈধব্যনিবারণের জন্য অঙ্গে মাখিয়া থাকে।

শ্রীসতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

* গুম্‌গড়—a tower of punishment; ইহার আকার একটী বৃহৎ কূপের মত। ইহার উপরিভাগে ছাদ আছে। ঐ ছাদের মধ্যস্থলে একটী মনুষ্যের নীচে যাইবার মত গর্ত্ত আছে। এই কূপের মধ্যে মাটীতে অসি, ভল্ল, বর্শা প্রভৃতি শাণিত অস্ত্র প্রোথিত থাকিত এবং বিষধর সর্প প্রভৃতিও ছিল। ঐ কূপ এত গভীর যে উহার ভিতর হইতে উপরে উঠিবার উপায় ছিল না। যাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, তাহাকে উহার ভিতর ফেলিয়া দেওয়া হইত।

ভ্রম-সংশোধন।

শুকতারার স্বপ্ন, ৪৫ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি

অশুদ্ধ—প্রতাপের মত আমার ভালবাসার নাম প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ব্রত উদ্‌যাপন

শুদ্ধ—প্রতাপের মত আমার ভালবাসার নাম "জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা" নয়; আমার ভালবাসার নাম প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ব্রত উদ্‌যাপন!

৪৬ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি "বুঝিতে না চাও" স্থলে "বুঝিতে চাও" হইবে।

জুরি।

(১)

সতীশ মল্লিককে সকলেই বড় কড়া লোক বলিয়া জানে। উহার মুখ ও চক্ষু দেখিলেই যে কেহ বুঝিতে পারিত, উহার অন্তর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দয়ামায়াশূন্য ও কঠোর। প্রতিবাসীরা বলিত, সতীশের মুখে কখন হাসি দেখে নাই। সতীশের মনে কখন কোন রঙ্গরস বা আমোদের ভাব উদিত হইত না। সে তাহা অতি ছেলেমানুষী বা ছ্যাবলাম বলিয়া মনে করিত। সতীশ কখনও কোন থিয়েটরে যায় নাই, কোনও বন্ধুর বাটীতে গান-বাজানার নিমন্ত্রণে যায় নাই, পাঁচ জনকে লইয়া আমোদ আলাপ করিত না,—বলিত মনুষ্যের মূল্যবান জীবন ঐরূপ অকর্ম্মে নষ্ট করিবার জন্য হয় নাই। সতীশের এক বিষয়ে আত্মগৌরব ছিল, সে জীবনে কখন আপনার কথা ভঙ্গ করে নাই এবং দেনা-পাওনা-বিষয়ে সকলের সহিত অতি পরিষ্কার ব্যবহার করিয়াছে। সতীশের ইচ্ছা—তাহার বাড়ীর সকলেই যেন ঠিক তাহার মত চলে।

সতীশের স্ত্রী নাই, তাহার একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথের বয়স ১৬ বৎসর। সে পিতার কঠোর-শাসনে জন্তুর মত হইয়া থাকিত, সকল প্রকার আমোদ তাহার প্রতি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বিশ্বনাথের বয়সের কোন্ যুবক একেবারে আমোদ-আহ্লাদবিহীন নীরস প্রস্তরমত হইয়া থাকিতে পারে? প্রকৃতির তাড়নায় বিশ্বনাথ পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিতে পারিল না এবং তাহার ভয়ঙ্কর পরিণাম হইল।

বিশ্বনাথ লুকাইয়া একদিন থিয়েটরে যাইল, কিন্তু তাহা গোপনে রহিল না; এক ব্যক্তি তাহার পিতাকে বলিয়া দিল। ইহাতে সতীশের ভয়ঙ্কর ক্রোধ হইল, কিন্তু চেঁচামেচী করিয়া তীব্র ভৎর্সনা করিল না, কারণ সেরূপ করা উহার স্বভাব ছিল না। গম্ভীরভাবে সংক্ষেপে বলিল, 'থিয়েটরগুল উচ্ছন্ন যাবার পথ, তুমি যদি পুনরায় যাও তোমাকে বাটীর বাহির করিয়া দিব।'

বিশ্বনাথ বাপের স্বভাব বেশ জানিত, বাপ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে নিশ্চয় করিবেন, ইহা তাহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম ছিল। এইজন্য সে এক বৎসর যাবৎ কোনও থিয়েটরের রাস্তাও মাড়ায় নাই। কিন্তু তার এক বন্ধু ঠাট্টা

করিয়া বলিল, 'কেমন জব্দ, তোমার কত সাহস আর একবার থিয়েটরে যাও দেখি।' অল্প বয়সের উত্তেজিতস্বভাব বিশ্বনাথ বন্ধুর বিদ্রুপ ও স্পর্দ্ধা সহিতে পারিল না, সেই রাত্রি সে পিতৃআজ্ঞা দ্বিতীয়বার লঙ্ঘন করিয়া থিয়েটরে যাইল। কিন্তু বলা বাহুল্য পিতার নিকট ধরা পড়িতেও বাকি রহিল না।

রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে, থিয়েটর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতেই বিশ্বনাথ দেখিল, অত রাত্রে না ঘুমাইয়া কৃতান্ত-সদৃশ পিতা দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। বিশ্বনাথের রক্ত শুষ্ক হইল, কিন্তু তখন পিতার চক্ষু এড়াইবার উপায় নাই, সুতরাং কাঁপিতে কাঁপিতে পিতার সম্মুখীন হইল।

ক্রুদ্ধ বা প্রসন্ন উভয় অবস্থায়ই সতীশের এক ভাব; গম্ভীর ও প্রশান্ত-ভাবে সতীশ বলিল, 'তুমি পুনরায় থিয়েটরে গিয়াছিলে; তোমার কাছে কত পয়সা আছে?'

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বিশ্বনাথ আপন পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিল, ভিতরের পয়সাগুলি কম্পমান অঙ্গুলী দ্বারা গুণিয়া বলিল, 'সাত-সাত-সাত আনা তিন পয়সা, বাবা।'

সতীশ একটী টাকা বাহির করিয়া পুত্রের কম্পমান হস্তে দিয়া বলিল, 'এই নাও, চলিয়া যাও, আমি তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করিলাম'। বলিয়াই পুত্রের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সতীশ বাটীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। মাতৃহীন পুত্র ক্ষণমধ্যে পিতৃহীন গৃহহীন হইল ও বন্ধুবান্ধবহীন পৃথিবীতে তাড়িত হইল।

পুত্রকে তাড়াইয়া সতীশের মনে কোন কষ্ট হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। যদিই হইয়া থাকে, তাহার বাহ্য চিহ্ন কিছুই কখন প্রকাশ হয় নাই। আফিসের কার্য্যে সে রীতিমত যাইত এবং ছুটীর দিনে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী তীর্থস্থানে বেড়াইয়া আসিত। যে কেহ পুত্রের সম্বন্ধে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিত, তাহার এক উত্তর ছিল—'সে আমার অবাধ্য হইয়াছিল, আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি।' ইহার পর ছেলের কি হইল, তাহা কখন সতীশ জানিতে চেষ্টা করে নাই। তাহার মনে এক সন্তোষ ছিল—'আমি আমার কথা রাখিয়াছি' এবং পুত্রের জন্য যদি কিছু দুঃখ হইয়া থাকে তবে তাহা ঐ সন্তোষেই ঢাকা পড়িয়াছিল।

(২)

ইহার পর সাত মাস কাটিল। হাইকোর্টের সেষণ বসিয়াছে। শেষ দিনের মকর্দ্দমায় সতীশ জুরিরূপে আহূত হইল। জাল করার মকর্দ্দমা। কোর্টের ক্লার্ক হাঁকিল, "নন্দলাল।" তৎক্ষণাৎ একটী ১৭ বৎসরের যুবক কয়েদীরূপে কয়েদীর কাঠগড়ায় আনীত হইল। উহার পরিধান ছিন্ন ও মলিন, মুখ মৃতবৎ বিবর্ণ এবং দেখিয়া বোধ হইল উপবাসী আছে। কয়েদী কাঁপিতে কাঁপিতে কাঠগোড়ার ভিতরে প্রবেশ করিল। তথা হইতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে যেমন তাহার চক্ষু জুরিদের দিকে পড়িল, অমনই সে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু কাঠগড়ার রেল দৃঢ়রূপে ধরিয়া সামলাইয়া লইল। সে কাঁপিতে লাগিল এবং তাহার মুখ একবার মৃতবৎ বিবর্ণ আবার লোহিতবর্ণ হইতে লাগিল। কয়েদী অধোদৃষ্টিতে রহিল। এই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি অপর দিকে সতীশের মুখের দিকে চাহিত, তবে দেখিত তাহার চক্ষু যেন অর্দ্ধনিমীলিত এবং মুখে যেন কালিমা পড়িয়াছে। কিন্তু ঐ বাহ্যিক চিহ্ন অবিলম্বে অদৃশ্য হইল। সতীশ সামলাইয়া লইল, হাতের উপর হাত রাখিয়া চৌকীতে ঠেসান দিয়া দৃঢ়রূপে বসিল এবং প্রস্তরের মত চক্ষু করিয়া কয়েদীর দিকে চাহিয়া রহিল, যেন উপস্থিত ব্যাপারে তাহার কোন স্বার্থ জড়িত নাই। হৃদয়ের সহিত যুদ্ধে নিশ্চয় সতীশ অসাধারণ জয়লাভ করিয়াছিল।

গভর্ণমেণ্ট পক্ষের ব্যারিষ্টর হতভাগ্য যুবকের বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আসামী দাস কোম্পানীর নিকট চাকরী করিত, উহার কর্ম্ম ছিল কেরাণীগিরি, কিন্তু মধ্যে মধ্যে উহাকে অন্যান্য অফিসে টাকা ও চেক দিয়া আসিতে হইত। প্লাণ্টার্স কোম্পানির সহিত দাস-কোম্পানির কারবার ছিল, দেনা পাওনার হিসাব মোকাবেলায় প্লাণ্টার্স কোম্পানি একখানা ৭৫৲ টাকার চেকের প্রাপ্তি অস্বীকার করিল। তখন দাস কোম্পানির অফিসে খোঁজ পড়িল; দেখা গেল, ঐ চেক ছাড়া আর কয়েকখানা চেক চেকবহি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তখন কয়েদীর উপর সন্দেহ পড়িল, কারণ যেখানে অফিসের চেকবহি থাকিত, তাহা এই কয়েদী জানিত। নারায়ণ নামে দাস কোম্পানির পূর্ব্বে এক কর্ম্মচারী ছিল, সে ভয়ানক চোর ও বদমায়েস ছিল, তাহাকে দাস কোম্পানি পুলিশে অভিযুক্ত না করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

ইহাতে সে দাস কোম্পানির প্রতি জাতক্রোধ ছিল। সেই নারায়ণের সংসর্গে এই আসামীকে প্রায় দেখা যাইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নারায়ণ ধরা পড়ে নাই। খানাতল্লাসিতে উপরোক্ত চেকের পরবর্ত্তী তিনখানা চেক এই আসামীর নিকটে পাওয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কে ঐ ভাঙ্গানী চেকের পশ্চাতে দেখা গেল, প্লান্টার্স কোম্পানির স্বাক্ষর ঠিক আসলের মত জাল করা হইয়াছে।"

কয়েদীকে জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?" সে অস্পষ্টস্বরে কি বলিল তাহা বুঝা গেল না এবং তাহার পর কাঁদিয়া চক্ষের জলে মুখ ভাসাইল।

প্রথা আছে—সেষণ আদালতে অসমর্থ আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন ব্যারিষ্টরকে বিচারক অনুরোধ করিয়া থাকেন। এইরূপে নন্দলালের পক্ষে এক ব্যারিষ্টার দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি উঠিয়া বলিলেন, "আসামী নির্দ্দোষ।"

ইহাতে সতীশ ঐ ব্যারিষ্টারের প্রতি আক্রোষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট জুরিদিগকে বলিলেন, "মিথ্যা সময় নষ্ট করা হইতেছে।" একজন জুরি বলিলেন, "আমারও বিবেচনা তাহাই বটে, কিন্তু বালকটার পক্ষ সমর্থনের জন্য একটা সুযোগ দেওয়া যাক্ না কেন।"

ইহার পর গভর্ণমেণ্ট পক্ষের ব্যারিষ্টর সাক্ষীর পর সাক্ষী উপস্থিত করিলেন। তাহাদের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইল যে, আসামী দোষী; তবে উহাকে আর একটা পাকা বদমায়েস যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে এবং সেই লোকটাই সমুদয় টাকা লইয়া পলাইয়াছে।

ঐ সাক্ষ্যগুলির খণ্ডন অসম্ভব ভাবিয়া আসামীর ব্যারিষ্টার বিচারকের মনে দয়া উত্তেজনার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "কয়েক মাস পূর্ব্বে আসামীকে তাহার পিতা বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। বাপ একজন বড় মানুষ; ছেলের অপরাধ—সে বাপের কি সামান্য কথা শুনে নাই। এখন সেই লোকটা যদি জান্‌তে পারে, তাহার অমানুষোচিত কার্য্যের কি পরিণাম হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার মনে কি ভাব হইবে, তাহা আপনারা ভাবুন। জুরি মহাশয়গণ! আমার বিবেচনা হয় ছেলের পরিবর্ত্তে সেই লোকটাকে এই কাঠগড়ার ভিতরে দাঁড় করান উচিত ছিল।"

সতীশ চক্ষু অবনত করিল।

আসামীর ব্যারিষ্টার বলিতে লাগিলেন,—"এই আসামী যখন অনাহারে মরিতেছিল, তখন এক ব্যক্তির খর্পরে পড়ে। সে ব্যক্তি নিজ স্বার্থসাধনের জন্য ইহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে ও ইহাকে খাওয়ায় এবং কোন উপায়ে ইহার চাকরী জুটাইয়া দেয়। তাহার শেখানতেই আসামী চেক চুরি করে, কৃতজ্ঞতায় বাধ্য হইয়াই এই অপকর্ম্ম করিয়াছিল। আর এই ছোকরা যে বাস্তবিক বদমায়েস নহে উহার ভদ্রবংশে জন্ম ও সেই কারণে ভদ্রবংশোচিত সম্মান-জ্ঞান আছে, তাহারও প্রমাণ আমি পাইয়াছি; উহার বাপ উহাকে অনাহারে মারিবার জন্য বাটী হইতে তাড়াইয়াছিল; কিন্তু সেই নিষ্ঠুর বাপের নাম ও ঠিকানা আমি কিছুতেই উহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারি নাই। বংশের কলঙ্ক হইবে বলিয়া সে তাহার বাপের নাম ও নিজের প্রকৃত নাম—আমি আসামীর ব্যারিষ্টার—আমাকেও বলে নাই। জুরি মহাশয়গণ! আমার আর কিছু বলিবার নাই, কেবল প্রার্থনা করি, আপনারা ঘটনা ও অবস্থাগুলি বিবেচনা করিবেন। আর এই আসামীর বাপই প্রকৃত দোষী, যদি সাক্ষীরূপে তাহাকে আনাইয়া এখানে দাঁড় করাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার মনের ক্ষোভ মিটিত।"

ব্যারিষ্টর বসিলেন। জজ জুরিদিগের নিকট সংক্ষেপে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং আশা করিলেন যে সাক্ষ্যপ্রমাণে জুরীরা তখনই "দোষী" বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন।

(৩)

কিন্তু তাহা হইল না। জুরীদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সতীশ তাহাতে যোগ না দিয়া এত টুকরা কাগজে আপন মত লিখিয়া জুরী-প্রধানের হস্তে দিল। কাগজে লেখা ছিল "দোষী"। যেন নিজের কর্ত্তব্য শেষ হইল এই ভাবিয়া সে অবিকৃতভাবে বসিয়া রহিল।

জজ জুরিদের বিলম্বে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি"? জুরী প্রধান উত্তর দিলেন, "আমরা সকলে একমত হইতে পারি নাই।" জজ বলিলেন, "তবে আপনারা পার্শ্বের কামরায় গিয়া পরামর্শ করুন।" জুরিরা উঠিয়া যাইলেন।

জুরীদের মধ্যে করুণাময় নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রৌঢ়বয়স্ক এবং

তাঁহার মুখ দেখিলে বোধ হয় প্রকৃতই তাঁহার অন্তর করুণাময়। জুরী-প্রধান তাঁহাকে বলিলেন, "আমাদের সকলের মধ্যে কেবল আপনারই বিরুদ্ধ মত। তবে এক কাজ করা যাউক না কেন, জজকে আসামীর প্রতি দয়া করিতে বলি, কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণে উহাকে দোষী বলিতে হইবে।"

সতীশ কঠোরস্বরে বলিল, "ঠিক কথা। আসামী আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, তাহার ফল উহাকে ভোগ করিতে হইবে। আর উহার ভাগ্য ভাল যে এই উনবিংশ শতাব্দী—এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই জাল করার জন্য মৃত্যুদণ্ড ছিল। অত বড় লোক মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হইয়াছিল।"

করুণাময় অত্যন্ত ঘৃণার সহিত সতীশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে সেই ভয়ঙ্কর কাল চলিয়া গিয়াছে। আর, সতীশবাবু আপনিও পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে, যে পশু এই দুর্ভাগা বালককে পৃথিবীতে আনিয়াছিল, আপনার বাপ তাহার মত ছিলেন না।" সতীশ করুণাময়ের দিকে চাহিতে পারিল না।

সকলকে সম্বোধন করিয়া করুণাময় বলিলেন, "যে পাষণ্ড এই ছেলেকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, অন্ততঃ তাহার প্রতি দয়া করিয়া ইহাকে মুক্তি দিন, নতুবা পরমেশ্বরের বিচারে সে হতভাগা ভয়ঙ্কর দণ্ড হইতে কিছুতেই নিস্তার পাবে না।"

তাহার পর সতীশের হাত ধরিয়া করুণাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ছেলে আছে কি?" সতীশ অতি নিম্ন ও ভগ্নস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ"। করুণাময়ের এই হঠাৎ আক্রমণে সতীশ প্রস্তুত ছিল না, তাহার মনের দৃঢ়তায় গুরু আঘাত লাগিল।

করুণাময় বলিলেন, "আপনি ছেলের বাপ ইহা আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হচ্চে না, যদি প্রকৃতই আপনার ছেলে থাকে, তবে মনে ভাবুন যেন এই আসামীর পরিবর্ত্তে আসামীরূপে আপনার ছেলে এখানে দাঁড়াইয়া। তাই ভাবিয়া আপনার মনে দয়া হউক।"

সতীশ বসিয়া পড়িল ও হস্তদ্বারা আপনার মুখ আবৃত করিল।

করুণাময় সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ আপনাদের সকলের নিকট আমার প্রার্থনা, এই ছেলেকে নির্দ্দোষ বলুন। উহাকে চিরজীবনের মত দাগী করিবেন না, আর একবার উহাকে পৃথিবীতে ভদ্রভাবে চলিতে দিন।

উহার পিশাচ বাপের মত আপনারা নির্দ্দয় হইবেন না। সে হতভাগা নিজের নিষ্ঠুরতা ও ঘোর অন্যায় কার্য্যের ফলভোগ করুক। আমাদের এমন কার্য্য করা উচিত নহে যাহাতে সেই হতভাগার সহিত আমাদিগকেও পরমেশ্বরের নিকট দণ্ডের জন্য দাঁড়াইতে হয়। আপনারা দয়া করুন, ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিন।”

জুরীপ্রধান। আপনি বেশ বলিতেছেন বটে, কিন্তু সতীশবাবুর মতে আমার মত। ছোঁড়াটার দোষ স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে, সুতরাং উহাকে দোষী বলিয়া মত দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। দয়া করা জজের ক্ষমতা, আমরা সেই দয়ার জন্য অনুরোধমাত্র করিতে পারি। সতীশ বাবু! আপনি অমন করিয়া বসিয়া কেন, আপনার কি অসুখ হইয়াছে।” সতীশ কোন উত্তর করিল না।

জুরীপ্রধান। সতীশ বাবুর অসুখ হইয়াছে। আমাদের এখন শীঘ্র করিয়া কাজ সারিয়া বাড়ী যাওয়া উচিত হচ্চে। করুণাময় বাবু, আমি জজকে বলি, আমাদের মধ্যে ১১ জন আসামীর দণ্ডের পক্ষে—

সতীশ জুরীপ্রধানের কথা শেষ হইতে না দিয়া অতি যন্ত্রণার স্বরে ব্যস্ততার সহিত বলিল “না না!”

জুরীপ্রধান। কি আশ্চর্য্য! সতীশবাবু, আপনাকে করুণাময়বাবু ভুলাইয়া ফেলিলেন!

সতীশ। হাঁ তাই। পরমেশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। আমিই এই বালকের পিতা। করুণাময়বাবু যাহা বলিয়াছেন, সব সত্য; আমি পিতার কর্ত্তব্য করি নাই; উহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম। আপনাদের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি, উহাকে ছাড়িয়া দিন।

সতীশের চক্ষু দিয়া জল স্রোতের মত পড়িতে লাগিল, তাহার সে কঠোর গম্ভীর ভাব কোথায় ভাসিয়া গেল। সকলে স্তম্ভিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে করুণাময়বাবু বলিলেন, “আমাদের কি মত দিতে হবে?”

জুরীপ্রধান রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে উত্তর দিলেন, “নির্দ্দোষ।”

ইহার পাঁচ মিনিট পরে বিশ্বনাথ ওরফে নন্দলাল খালাস পাইল। বলা বাহুল্য, এতদিন পরে সতীশ অন্য মানব হইল এবং সজলনয়নে কিন্তু প্রশান্তভাবে ছেলের হাত ধরিয়া বাড়ী চলিল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস।

নর্ম্মদানন্দিনীর চাট্‌নী।

১

কোন্ শ্রদ্ধা-পুদিনায়, নর্ম্মদানন্দিনী,
স্নেহ প্রীতি-শর্করায়, কন্যা আদরিণী,
হেসে হেসে, ভাল বেসে, করিলি চাট্‌নী?
কোথা লাগে লাখ টাকা? নাহি এর মুল্য;
অমৃতে মাখানো এ যে ভুবনে অতুল্য!
রসুবড়া রসে ভরা, নহে এত মনোহরা
"মেওয়ার জিলিপী" হারে! আহা, কি রঙ্গিনী,
সুন্দর, অতি সুন্দর, সুন্দর, চাট্‌নী!

২

অন্নপূর্ণা † মা আমার! যা কর রন্ধন,
তাই কি হইয়া যায় অপূর্ব্ব শোভন?
মায়ের হাতের গুণে সকলি মোহন!
রাঙা পা পরশে সোণা হইল তরণী;
হরষে বিহ্বল হ'ল ঈশ্বরী পাটনী।
তাই এত মধুভরা, তাই এত সুধাঝরা,
তাই এত মনোহরা, অপূর্ব্ব রঙ্গিনী,
সুন্দর, অতি সুন্দর, সুন্দর চাট্‌নী!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

---

* বলা বাহুল্য "রঙ্গিনী" শব্দটি "চাটনী"র বিশেষণ।

† "নর্ম্মদানন্দিনী" আমার বন্ধু-কন্যা। ইহাকে আদর করিয়া আমি "মা অন্নপূর্ণা" বলি।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু ও হিন্দুসমাজ।

তৃতীয় প্রস্তাব।

হিন্দুজাতি যাহাতে নিজের আদর্শকে ভাল করিয়া দেখিতে পারে, বুঝিতে পারে, চন্দ্রনাথ সেইজন্য ইহাকে সাধ্যমত উচ্চ করিয়াই ধরিয়াছিলেন। সত্য বটে, অত্যধিক রক্ষণশীলতা অনেক সময় জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং ভিন্ন জাতির চরিত্রে কিম্বা সমাজ-নিয়মে যদি কিছু বাস্তবিক ভাল দেখি, তাহা আমাদের চরিত্রের কিম্বা সমাজ-বিধানের অঙ্গীভূত করিতে চেষ্টা করা দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চন্দ্রনাথ বলিতেন যে, বৈদেশিক ভাব আমাদের জাতীয় জীবনে সংমিশ্রিত করিবার পূর্ব্বে আমাদের নিজস্ব যাহা কিছু আছে, সে সমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যে প্রথাগুলি আমাদের উন্নতির পক্ষে একান্ত অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি এবং তৎপরিবর্ত্তে কোন বৈদেশিক প্রথা, অথবা তদনুকরণে অন্য কোন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টিত হইতেছি, সেই সুপ্রাচীন প্রথাগুলিকে ঐরূপ পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাঁহারা বৈদেশিক ভাবগ্রহণের পক্ষপাতী, তাঁহারা উদাহরণ-স্বরূপ জাপানের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার 'অসভ্য জাপান' আর প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ কখনও একই নিয়মের অধীন হইতে পারে না। জাপানের অতীত ইতিহাসে গৌরব করিবার কিছুই নাই। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জাপান নামে মাত্র বৌদ্ধ; তাহার ধর্ম্মবন্ধন এরূপ শিথিল যে ধর্ম্মনামে অভিহিত হইবার তাহার কিছুই নাই। * জাপানীদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এখনও সমাজবন্ধন-বিহীন অসভ্যজাতির ন্যায়; এরূপ অবস্থায় যে জাপান শনৈঃ শনৈঃ পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আপন অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। আর ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাহার অনুকূল ছিল। যদি বিগত রুষযুদ্ধে তাহার জয়লাভ না হইত, তাহা হইলে সভ্য-জগতে আজ তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। তবে ইহা অস্বীকার

---

* জিজ্ঞাসু পাঠক জাপান-প্রত্যাগত যে কোন ব্যক্তি-লিখিত জাপান-সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

করিবার উপায় নাই যে, জাপানীদের স্বদেশ-প্রেম অসীম এবং ইহাই যে মুখ্যতঃ তাহার জয়লাভের প্রধান কারণ, তাহা কে না স্বীকার করিবে? জ্ঞানবিজ্ঞান-মূলক বৈদেশিক প্রভাব কেবল গৌণভাবে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে মাত্র। যে জাতি যে পরিমাণে অসভ্য ও অনুন্নত, সে জাতি সেই পরিমাণে উন্নততর বৈদেশিক সভ্যতার কবলে পতিত হয়। রোমবিজিত অসভ্যজাতি-সমূহ ও বর্ত্তমানকালে আমেরিকা-বাসী নিগ্রোগণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমেরিকার নিকটবর্ত্তী হেটী (Hayti) নামক দ্বীপ ফরাসীদিগের একটী উপনিবেশ। তত্রত্য অধিবাসিগণ (প্রধানতঃ নিগ্রো) ফরাসী আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও ভাব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। সেস্ (Sayce) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে, একজাতি স্বীয় ভষা পরিত্যাগ করিয়া যে অপর জাতির সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষা এরূপ-ভাবে নিজস্ব করিয়া লইতে পারে, তাহা এই 'হেটিয়ান'দের উদাহরণ ব্যতীত সম্ভবপর বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না। জাপান এখন য়ুরোপের জড়বাদে দীক্ষিত। ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত ভারতের সহিত তাহার সাদৃশ্য কোথায়?

তাই চন্দ্রনাথ বলিতেন যে, আমরা অধঃপতিত হইলেও আমাদের আদর্শ বড় মহান্। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে যাহা দিয়া গিয়াছিলেন, আমরা তাহার মর্য্যাদা বুঝি না, বুঝিতে চেষ্টাও করি না। পক্ষান্তরে আমরা তাহা বর্ত্তমান কালের অনুপযোগী স্থির করিয়া তাহার মুলোচ্ছেদ করিতে যত্নবান্ হইয়াছি এবং জড়বাদী য়ুরোপের আদর্শে আমাদের সমাজ গঠিত করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। এই জাতির সংস্কারকগণ বলিতেছেন যে, প্রাচীন আদর্শ খুব বড় হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা প্রাচীন কালেরই উপযোগী ছিল; এখন বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী করিয়া আমাদের সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। এবম্বিধ যুক্তির সারবত্তা মানিয়া লইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, সত্যই আমাদের সামাজিক বিশেষত্বসূচক বিধিব্যবস্থাসমুহ বর্ত্তমান কালের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে কি না। প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, হিন্দু-সমাজের বিশেষত্ব প্রধানতঃ জাতি-ভেদ ও বিধবার আমরণ ব্রহ্মচর্য্য। জাতিভেদ যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার অনুপযোগী নয়, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখা যাউক।

হিন্দুরমণীর সতীত্ব বলিতে কি বুঝায়, তাহা 'সাবিত্রীতত্ত্বে' চন্দ্রনাথ আদর্শ সতী সাবিত্রীর জীবনে দেখাইয়াছেন। এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু হইবে, নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া পিতা অশ্বপতি যখন কন্যাকে অন্য পতি মনোনীত করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন সাবিত্রী এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন :—

সকৃদংশং নিপততি সকৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপিবা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥

অর্থাৎ 'পৈতৃকাদি বিষয়ের বিভাগ-নির্ণায়িকা গুটিকা একবার মাত্র পতিত হয়; লোকে কন্যাকে একবার প্রদান করে এবং 'দান করিলাম' একথাও একবার বলে, এই তিন বিষয় এক এক বারই হইয়া থাকে। অতএব আমি একবার যাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন, অল্পায়ুই হউন, গুণবান্ হউন বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে ভিন্ন আমি অপর ব্যক্তিকে বরণ করিতে পারিব না।' এইরূপ রমণীই আমাদের দেশে পতিব্রতা সতী বলিয়া আখ্যাত হন। সাবিত্রী সতী স্ত্রীগণের আদর্শস্থানীয়া। তাই যম সত্যবান্‌কে লইতে আসিলে সাবিত্রী যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছেন, যম তখন উত্তর দিলেন :—

পতিব্রতাসি সাবিত্রি তথৈব চ তপোন্বিতা।
অতস্ত্বামভিভাষামি॥

'সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠান-সমন্বিতা। এই নিমিত্ত আমি তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছি।'

সতীত্বের, একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের এমন আদর্শ পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি ?

কিন্তু সমাজ-সংস্কারক বলিতেছেন যে, আদর্শের মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে এখন আর চলিবে না। 'সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে' এই বিধি শুনিতে বেশ বটে; কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার অবসর আছে কি না সন্দেহ। হিন্দু-বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ নানা কারণে একান্ত প্রয়োজন হইয়া

পড়িয়াছে। প্রথমতঃ, যে সতীত্বের আদর্শের দোহাই দিয়া বিধবাগণের আমরণ ব্রহ্মচর্য্যপালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সতীত্বই তাহারা অনেকস্থলে হারাইতে বসিয়াছে। দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির স্রোতে কত পতিহীনা রমণীর চরিত্রের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ফলে, ব্যভিচার, ভ্রূণ-হত্যা প্রভৃতি মহাপাপে হিন্দু-সমাজ কলঙ্কিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, গর্ভধারণক্ষমা বিধবাকে পত্যন্তরলাভে বঞ্চিত রাখায় মুসলমানগণের তুলনায় হিন্দুর আনুপাতিক সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তৃতীয়তঃ, হিন্দু-বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্যপালন যেরূপ কঠোর ও কৃচ্ছ্রসাধ্য, তাহাতে তাহাদিগকে এইরূপ নিরানন্দ জীবন-যাপনে বাধ্য করা ঘোর নিষ্ঠুরতা ও পুরুষজাতির স্বার্থপরতার পরিচায়ক। চতুর্থতঃ, বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, তাহা মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমাণ করিয়া বিধবাবিবাহের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় যে, এই কয়টাই বিধবাবিবাহের সপক্ষে প্রধান যুক্তি এবং এগুলি যদি বাস্তবিকই অখণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে হিন্দু-সতীত্বের আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াও বিধবাবিবাহ সমাজে প্রচলিত করা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জাতিভেদ-প্রসঙ্গে আমরা যেমন হিন্দু-সমাজকে অন্যান্য সমাজের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, এস্থলেও আমরা সেই পন্থার অনুসরণ করিব। কারণ সমাজ-বিজ্ঞানে তুলনামূলক আলোচনাতেই প্রকৃত তথ্যের আভাষ পাওয়া যায়।

আমরা একে একে উল্লিখিত চারিটী যুক্তির বিচারে প্রবৃত্ত হইব। প্রথম যুক্তি এই যে, প্রবৃত্তির তাড়নায় কিম্বা প্রলোভনে পতিত হইয়া পতি-বিরহিতা রমণীর পদস্খলন হওয়া সম্ভব।—যদি হিন্দু-সমাজে বিধবাগণের পক্ষে এইরূপ ভয়ের কারণ সত্য হয়, তাহা হইলে অন্যান্য সমাজে যে সকল রমণী আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করেন, তাঁহাদের পক্ষেও যে ইহা সত্য হইবে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। হিন্দু পিতা শাস্ত্রানুসারে কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য; সুতরাং হিন্দুসমাজে কুমারী কন্যা থাকিতে পায় না। (জঘন্য কৌলিন্য-প্রথায় কোন কোন সময় ইহার ব্যতিক্রম হইতে শুনা যায় বটে; কিন্তু এই প্রথা যে অতিশয় হেয় তাহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। অতএব ইহা কখনও শাস্ত্রসম্মত সমাজ-নিয়মের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।) কিন্তু য়ুরোপীয়

সমাজে কন্যাকে বিবাহিত করা পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। সেখানে পাত্র ও পাত্রীর পরস্পর মনোনয়নের উপরই বিবাহ নির্ভর করে। ফলে, তথায় বহু-সংখ্যক রমণীকে চিরকুমারী অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। গত এপ্রেল মাসে সুবিখ্যাত 'কলিকাতা রিভিউ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গে সমাজ সংস্কার'-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, য়ুরোপে শতকরা ১৫ জনেরও অধিক রমণী 'বৃদ্ধা কুমারী' অবস্থাতে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ভারতীয় খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজেও এই অবস্থা ঘটিতেছে। এ সকল সমাজে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিশ্রণ সত্ত্বেও রমণীগণ আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় সতীত্ব হইতে বিচ্যুতা না হন, তাহা হইলে কঠোর-নিয়মপালনপরায়ণা, অন্তঃপুরবদ্ধা হিন্দু-বিধবাগণই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না কেন, তাহা কি আমাদিগকে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন ?* এ সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ সারবান্ মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন :—'হিন্দু-বিধবাগণের মধ্যে দুই একজনের পক্ষে পদস্খলিত হওয়া যে অসম্ভব, এমন নহে। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। সধবাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ পাপপথে প্রলুব্ধা হয়েন। বিধবাদিগের পদস্খলনের এইরূপ বিরল দৃষ্টান্ত দেখিয়া যদি বিধবা-বিবাহ

* এখানে হয় ত কেহ বলিবেন যে, খ্রীষ্টান সমাজে কুমারীগণ কখনও বিবাহের আশা পরিত্যাগ করেন না। এই আশাই তাঁহাদিগের পবিত্রতা-রক্ষায় সহায়তা করে। কিন্তু হিন্দু-বিধবার পুনর্ব্বিবাহের যখন কোন আশাই নাই, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা দুর্ব্বলচিত্ত, তাঁহাদের কুপথগামী হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দুর্ব্বলপ্রকৃতি রমণীর অবস্থা সকল সমাজেই সমান। প্রসিদ্ধ ইংরাজী ঔপন্যাসিক জর্জ ইলিয়ট (George Eliot) 'Adam Bede' নামক উপন্যাসে হেটীর (Hetty) চরিত্রে দেখাইয়াছেন—কিরূপে পাশ্চাত্য সমাজেও ঐরূপ আশামুগ্ধা রমণী শুধু দুর্ব্বলতার জন্যই পদস্খলিতা হইতে পারে। হত-ভাগিনী বিবাহ করিয়া পবিত্র দাম্পত্যজীবন যাপন করিবারই আশা করিয়াছিল; ঘটিল কিন্তু কানীন সন্তানহত্যার জন্য দ্বীপান্তরবাস। মোপাসাঁর ছোট গল্পগুলিতেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দ্বিতীয়তঃ, য়ুরোপীয় সমাজে কোন কুরূপা রমণী যৌবনে যদি নানা কৌশলজাল বিস্তার করিয়াও কোন পুরুষকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থা না হন, তাহাহইলে তাঁহার বিবাহের আশা যে সুদূর-পরাহত, তাহা তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারেন। তখন Hope deferred **maketh the heart sick**; সে অবস্থা যে বড় আরামদায়ক নহে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার ঐ ক্ষীণ আশাটুকুও নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। তখন অধিকাংশ চির-

প্রবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা হইলে সধবাদিগের পাতিব্রত্য হইতে বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিবাহপ্রথা উঠাইয়া দিতে হয়। মার্কিণের কোন কোন ব্যক্তি এই অজুহাতে বিবাহকে ক্ষণস্থায়ী চুক্তিমাত্রে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।' অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের যে কোন আশঙ্কার কারণ নাই, তাহা অন্যান্য সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বিধবা-বিবাহের সপক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, বিধবাগণকে পুনর্ব্বিবাহিত না করায় হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। কর্ণেল ইউ. এন্ মুখার্জ্জি এই যুক্তির প্রথম প্রবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার এই মত যে বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের অন্যতম কারণ ইহা অনেক সমাজ-সংস্কারক নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমাদের এখন দেখিতে হইবে যে, হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে এবং হিন্দুজাতি ধ্বংসোন্মুখ বলিয়া কর্ণেল মুখার্জ্জি যে এক আশঙ্কাসূচক ভীষণ তূর্য্যনিনাদ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক সত্য কি না। অপ্রাসঙ্গিকতার ভয়ে আমরা প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম। এ স্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মৃত্যুর সংখ্যা যদি জন্মের সংখ্যার অধিক হয়, তাহা হইলেই জাতি 'ধ্বংসোন্মুখ' বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। হিন্দুজাতি এখনও সেরূপ অবস্থায় উপনীত হয় নাই এবং কখন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। সমাজবিশেষের সহিত তুলনায় আপেক্ষিক সংখ্যাহ্রাস কখনও ভীতির কারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ম্যালথাস্-(Malthus) প্রমুখ পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ্গণের মত এই যে, লোকসংখ্যা অপ্রতিহতভাবে অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে খাদ্যাভাব এবং তৎসহ জাতীয় দারিদ্র্য অনিবার্য্য। অতএব তাঁহাদের মতে সমাজের মঙ্গলকল্পে জন্মের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জেমস্ মিল্, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, ফসেট, মিসেস ফসেট প্রভৃতি অনেকেই এই মতের পোষ-

---

কুমারীর অবস্থাই যে এইরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা হইলে পুনর্ব্বিবাহে আশাশূন্যা হিন্দু-বিধবাগণের অবস্থা ঐ সকল চিরকুমারীগণের অবস্থা অপেক্ষা হীন কিসে? আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঘোর অদৃষ্টবাদিনী হিন্দু-রমণী বৈধব্যকে অখণ্ডনীয় বিধিলিপি মনে করিয়া পরজন্মে সৌভাগ্যবতী হইবার আশায় ইহজন্মে দেবসেবাদি দ্বারা সুকৃতি-অর্জ্জনে প্রশান্তচিত্তে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। হিন্দুর পার্থিব সুখের আশা খ্রীষ্টানের ন্যায় এক জন্মেই শেষ হইয়া যায় না। হিন্দু-বিধবার ভোগ-সুখের আশা পরজন্মে।

কতা করিয়াছেন। ম্যালথাস্ বলেন—"Some check to population must exist. * * * It is better that this check should arise from a foresight if the difficulties attending a family and the fear of dependent poverty, than from the actual presence of want and sickness." অর্থাৎ লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিপ্রতিরোধের কোন উপায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক পরিবার লোকসংখ্যাধিক্যবশতঃ দারিদ্র্যপ্রপীড়িত হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে যদি আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক হন, তাহা হইলে আশানুরূপ সুফল লাভ হইতে পারে। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ তাঁহার *Principles of Political Economy* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন :—"Poverty, like most social evil, exists, because men follow their brute instincts without due consideration." অর্থাৎ—'অন্যান্য বহুবিধ সমাজ-ব্যাধির ন্যায় দারিদ্র্যের কারণ এই যে মানুষ পরিণাম না ভাবিয়া পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে।' অতএব য়ুরোপ, আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধ মহাদেশসমূহেও যদি লোকসংখ্যার বৃদ্ধি দারিদ্র্যের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষে হিন্দুর লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার মুসলমানদিগের অপেক্ষা যদি কমই হইয়া থাকে, তাহা হইলে হিন্দুজাতি 'ধ্বংসোন্মুখ' বলিয়া কি ভীতিবিহ্বল হইতে হইবে?

আর বিধবা-বিবাহ অপ্রচলনের সহিত হিন্দুর তথা-কথিত সংখ্যাহ্রাসের সম্বন্ধ কি? হিন্দুসমাজে কোন কালেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না। পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের মধ্যেও এ সম্বন্ধে সমাজিক ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; বরং বঙ্গদেশীয় উচ্চশ্রেণীর মুসলমান-সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং হিন্দুবিধবার পত্যন্তরগ্রহণের ব্যবস্থা নাই বলিয়া যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের তুলনায় হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, এরূপ কথা যে কতদূর সঙ্গত, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর।

তৃতীয়তঃ, বিধবা-বিবাহের সপক্ষে বলা হইয়া থাকে যে, বাল-বিধবাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালনে বাধ্য করা যৎপরনাস্তি নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। ইহা যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাল-বিধবার দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়াই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহাদের পুনর্ব্বিবাহ-

প্রবর্ত্তনে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্য কোন কারণাভাবে শুধু দয়ার্দ্র বশবর্ত্তী হইয়া কোন সামাজিক বিধির উচ্ছেদ-সাধন-চেষ্টা কখনও প্রশংসনীয় হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খ্রীষ্টান সমাজে চিরকুমারীর সংখ্যা কম নহে এবং 'অসম্ভোগো জরা স্ত্রীণাং' এ কথা যদি স্ত্রীজাতিমাত্রেই প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে পত্যভাবজনিত কষ্ট কেবল হিন্দু-বিধবাকেই ভোগ করিতে হয় এবং অন্য সমাজের চিরকুমারীগণ পরম সুখে থাকেন, এরূপ যুক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত হিন্দুসমাজে বিধবাগণের সম্বন্ধে যে সকল কঠোর শাস্ত্রীয় বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যপালনে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা এই বিজ্ঞানের যুগেও শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব এতজ্জনিত কষ্ট রোগীর তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় আপাত কষ্টমাত্র। বিলাসিতা ও সংযম একত্র থাকিতে পারে না; সেইজন্যই আর্য্যঋষিগণ উক্ত বিধিব্যবস্থাদ্বারা বিধবাগণকে ভোগ-বাসনা-দমন ও পরিহার করিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। আর অধুনা হিন্দুসমাজে বিবাহের বয়স যেরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে 'বালবিধবা' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

বিধবা-বিবাহের সপক্ষে শেষ যুক্তি ইহার শাস্ত্রীয়তা। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—'হিন্দুদিগের বিবাহ-প্রথা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সহিত বিবাহ-প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হিন্দুসমাজ পুনর্ভূ পত্নীকে ধর্ম্মপত্নীর সহিত একাসনে বসায় নাই। পুনর্ভূ পত্নী চিরকালই ধর্ম্মপত্নীর অনেক নিম্নে স্থান পাইয়াছেন। পৌনর্ভব পুত্র তাহার পিতার ঔরস-পুত্রের সহিত সমানভাবে পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার পায় নাই। বশিষ্ঠ ও বিষ্ণুদায়াদের ক্রমিক তালিকায় পৌনর্ভব পুত্রকে চতুর্থ স্থান এবং যাজ্ঞবল্ক্য ষষ্ঠ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মনু লিখিয়াছেন, বিধবা-বিবাহকারী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যে অপাংক্তেয়। ইহাতেই বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুসমাজ বিধবাবিবাহের প্রতিকূল। পরাশর কলিযুগে বিবাহিতা বিধবাকে সকৃৎ বিবাহিতা রমণীর তুল্যাসন দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

পরবর্ত্তী মনীষিগণ বিধবাবিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ করিয়া দেন। আদি পুরাণই তাহার প্রমাণ। ইঁহারা নিশ্চয়ই কোন সামাজিক দোষ দেখিয়া বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।'

অতএব বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতিগণ যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেগুলি সমস্তই ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। য়ুরোপের সমাজনিয়ম যে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, তাহা বিজ্ঞমাত্রেই স্বীকার করিবেন। সেখানে একান্নবর্ত্তিতার অভাব-বশতঃ স্ত্রীলোক বিধবা হইলেই অধিকাংশ স্থলে সম্পূর্ণ আশ্রয়হীনা হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ অসহায়া রমণীর পুনর্ব্বার বিবাহ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারে বিধবা কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ ও ভ্রাতৃজায়াকে কখনও নিরাশ্রয় হইতে হয় না। অতএব যতদিন না হিন্দুসমাজে একান্নবর্ত্তিতা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যাইতেছে, ততদিন বিধবাবিবাহের কথা উত্থাপিত না হইলেই মঙ্গল।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

বিংশ শতাব্দীর মেঘ-দূত।

অথ,

বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়,
আষাঢ়স্যই পয়লা,
ভরিল গগন নবীন নীরদে,
বরণ জিনিয়া কয়লা।
"শাপেনাস্তং-গমিত-মহিমা"
যক্ষ একলা বসিয়া
কাঁদ্‌ছেন আহা, চক্ষু ফুলেছে
রুমাল ঘসিয়া ঘসিয়া।
প্রিয়ার সঙ্গে কত ভাব, আড়ি,
ঝগ্‌ড়া উঠিত পাকিয়া,
মনে হয় আর দেখেন আঁধার,
কহেন মেঘকে ডাকিয়া—
"ওগো পুষ্কর, প্রিয়ারে আমার
বিরহবার্ত্তা বোলো বোলো—
বলিতে বলিতে গিরি-কন্দর
তুষার-কণায় ছেয়ে প'ল।
প্রকোষ্ঠ হ'তে কনক-বলয়
এই দেখ ভাই ভ্রষ্ট,
হয়রান্ ভাই কুবেরের শাপে
মরণের বাড়া কষ্ট।
যক্ষগণের বাস্ত যেথায়,

যাও সে অলকা-পুরীতে ;
আজ পরবাসে সজল বাতাসে
তুমি যথার্থ সুহৃৎ হে।
ফটিকের বাটী ভরিয়া সেথানে
তরুণীরা খায় 'বারুণী'—
নহে হুইস্কি, শেরি, শ্যাম্পেন—
তা' দিয়ে পেয়ালা ভরনি।
নাস্তানাবুদ করেছে রে ভাই,
ভাল তো লাগে না জীবন,
এখন কেবল দিবস গুণ্ছি,
আষাঢ়ের পর শ্রাবণ।
পয় পয় করে বল্ছি তোমারে,
ভুলো না কথাটা ভুলো না,
হ্যাদে ধর ভাই, এই লেফাফাটা,
হারিও না আর খুলো না।
যেতে যেতে পথে, দেখ্বে কোথাও
ফলেছে জম্বু থোলো থোলো ;
ওগো পুষ্কর, প্রিয়ারে আমার
শুষ্ক মুরতি বোলো বোলো।
যাইতে যাইতে পল্লীর পথে
হয়ত পড়িবে চক্ষে,—
বঙ্গভূমির তন্বী শ্যামারা
চলেন কলসী কক্ষে ;
কারও বা মাথায় ফিরিঙ্গি খোঁপা,
ঘোমটা আধেক খসা,
কারও বা কপালে 'কাঁচপোকা'-টীপ
ভুরুর ভঙ্গী খাসা।
দেখবে কোথাও বালিকারা সব
পূজা করে হর-গৌরী,
সাম্নে দীঘিতে জল থই থই,
ডুব দেয় পাণকৌড়ী।
কোনো মেয়েটির হাসিমুখখানি
ঘাট্টি করেছে আলো,
পৃষ্ঠে এলান এক ঢাল চুল
ভোম্রার চেয়ে কালো।
দেখ্বে কোথাও অশথ-তলায়
জ্যাঠা ছেলেদের জট্লা,
হারুর সঙ্গে তুমুল তর্কে
ব্যস্ত আছেন পট্লা ;
'টু' দিতেছেন অটলচন্দ্র,
ভুলু হয়েছেন বুড়ী,
মহাসমারোহে খেলা চল্ছে সে
লুকোচুরি-হুড়োহুড়ি।
চারু ভাব্ছেন মৌলিক আমোদ
এবার 'নষ্ট-চন্দ্রে'—
তিষ্ঠান' দায় 'বার্ড্সাই' এবং
সিগারেট্টার গন্ধে ;
এঁদের মধ্যে ওস্তাদ যিনি
বংশীতে দেন ফুঁ ;
ভাঁজ্ছেন কেউ তোম্ তানা নানা,
কেউ ডাক্ছেন 'তু'।
রায়েদের বাড়ী চল্ছে বিচার,
নৈশ এবং দৈন,
শিরীষটারে এক-ঘরে' কর,
গিরীশটা কি স্ত্রৈণ!
বিদ্যাচঞ্চু কর্ছেন বসে',

'পঞ্চনদী'র ব্যাখ্যা,
বেনারাস্ গিয়ে কেমন করিয়ে
চড়েছেন তিনি এক্কা ;
বল্‌ছেন "বাপু দেখ্‌তে যদি সে
তিরিশ সালের বন্যে—
নিঃশ্বাস ফেলে চক্ষু মোছেন
অতীত কালের জন্যে।
প্রপঞ্চ এই বিশ্ব-দৃশ্য,
অনিত্য এই চরাচর,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-যৌবন
চলিয়া আস্‌ছে বরাবর।
পিঁপড়ের মত মানুষের সার
যাচ্ছে ফিরিয়া আস্‌ছে,
প্রবীণেরা পড়ে 'মোহমুদ্গর',
নবীনেরা ভালবাস্‌ছে।
যাক্ বাজে কথা, যাও পুষ্কর
অলকার সেই কক্ষে,
রুখুভুখু চুলে কাঁদিছে রূপসী,
বীণাটি ভিজিছে বক্ষে।
যাও মেঘ, ভাই যাও তুরন্ত,
অধিক আর কি বল্‌ব—
জলভরা চোখ রুমালে চাপিয়া
কতকাল বলো জ্বল্‌ব,
বড় সুখে ভাই ছিনু অলকায়,
সে এক স্বপ্ন-রাজ্য,
রোজ রোজ ভাই ভোজের ফর্দ্দ,
চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য,
জাফ্‌রান-রাঙ্গা মটন কোর্ম্মা,
চপ্‌স্, কাট্‌লেট, পোলাও,
তস্য উপরি ল্যাঙড়া আম্র
এবং রাব্‌ড়ী ঢালাও।
মিটাতাম তৃষা চাখিয়া চাখিয়া
আনারকা মিঠা শর্ব্বৎ ;
গড়্‌গড়া থেকে উড়িয়ে দিতাম
ধোঁয়ার বিন্ধ্য পর্ব্বত।
ছয়লাপ আজ ময়দান ভাই
'ইল্‌শে গুঁড়ুনি' ঝর্‌ছে—
দেবতাগুলোর মধ্যে দেখ্‌ছি
বরুণবাবুই 'খর্‌চে'।
চল্‌ছেন মেঘ, কম্ফটার্‌টি
কণ্ঠে জড়ান যক্ষ,
পাছে হয়ে' পড়ে 'নিউমোনিয়া',
হাঁস্‌ফাঁস্ করে বক্ষ।
একে এসেছেন বিদেশ বিভুঁই,
তা'তে কাছে নেই পরিবার,
রোগ হ'লে 'ম্যাও' ধরিবার
এবং একজাই পাখা করিবার।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

*. 'বাণী' পত্রিকার প্রথম বর্ষে এই কবিতাটি অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে 'অর্ঘ্যে' সম্পূর্ণভাবে বাহির হইল।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ।

দিল্লী।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

সংক্ষেপে বলিয়া যাই। প্রাচীন শহর পানিপথ শাহজাহানাবাদ হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এ শহরে আবু আলি কলন্দরের * পূজার্হ সমাধি-মন্দির আছে। এই শেখ চল্লিশ বৎসর বয়সে দিল্লী গমন করিয়া খাজা কুতব-উদ্দীন বখ্‌তিয়ারের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বিশ বর্ষকাল বৈষয়িক জ্ঞানলাভ করার পর তাঁহার ঈশ্বরানুরক্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং তাঁহার আত্মা-মুকুর উজ্জ্বলতা লাভ করে। পার্থিব জ্ঞানদায়ক পুস্তকাবলী যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়া তিনি ভ্রমণে বহির্গত হয়েন এবং তুর্কী যাইয়া শামসুদ্দীন তাব্রিজী, (আধ্যাত্মিক মসনাবিস্‌-প্রণেতা) মৌলানা জালাল-উদ্দীন রুমী এবং তথাকার আরও বহু পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদিগের সহিত বাক্যালাপ করিয়া যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হন। পরিভ্রমণান্তে দেশে ফিরিয়া তিনি পানিপথে বাস করেন। তথায় সন্ন্যাসী-জীবন যাপন করিতে করিতেই তিনি অনন্তধামে প্রস্থান করেন। তাঁহার বহু যাদু-বিদ্যাই তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন। এই আলোক-প্রকাশের সমাধি-মন্দির জগদ্বাসীর তীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। সিরহিন্দ প্রাচীন শহর। ইহা সমনাহ্‌ রাজ্যের † অধীন। সুলতান ফিরুজ শাহ তাঁহার রাজত্বকালে ৭৬০ হিজরীতে (১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে) সমনাহ্‌ হইতে পৃথক্ করিয়া ইহাকে একটি স্বাধীন পরগণায় পরিণত করেন। ইহার লোকসংখ্যা ও সৌন্দর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভগবানের দরবারের বহু প্রিয়জনের স্মৃতিমন্দির এখানে বিরাজ করিলেও, অধুনাতনকালের সাধু-দিগের মধ্যে শেখ ফরিদ-উদ্দীন সানি ও শেখ মহম্মদ মসুম কাবুলী এই নগরে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন। এই উভয় সাধুই সম্রাট্‌ শাহজাহানের সময়ে লোকদিগের পারলৌকিক পথদর্শক ছিলেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁহাদের (মুলে

---

* পানিপথের শরফ-উদ্দীন নামেই অধিকতর পরিচিত। আইন (৩।৩৬৮)তে তাঁহার জীবনী আছে।

† আইন (২।২৯৬)তে সমনাহ্‌ দিল্লী সুবার সরকার সিরহিন্দের মহল বিশেষ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা এক্ষণে পাতিয়ালার অন্তর্গত। ৩০°৭ উঃ, ৭৬°১২ পূঃ।—সরকার

আছে 'তাঁহার') উপদেশে বিশ্বাস করিয়া উপকৃত হইয়াছে। আজও তাঁহাদের (মূলে—তাঁহার) বংশধরেরা বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিয়াছেন।

সাধৌরা * ফকীর শাহ কামেশের চিরবিশ্রাম-নিকেতন। সুনামে † শেখ তৈবীর সমাধি-ক্ষেত্র আছে। তাহা এক্ষণে একটি তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। প্রাচীন শহর হান্সীতে শেখ ফরিদ-উদ্দীন গঞ্জ-ই-শকরের উত্তরাধিকারী শেখ জমাল-উদ্দীনের সমাধিমন্দির আছে। অল্পকথায়, এ প্রদেশে বিখ্যাত সাধুদিগের এত অধিকসংখ্যক সমাধিমন্দির আছে যে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। আমি সামান্য এই কতকগুলির মাত্র উল্লেখ করিলাম।

যখন মুসলমান-সাধুগণ-সংশ্লিষ্ট তীর্থক্ষেত্র-সমূহের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তখন এই প্রদেশান্তর্গত কতিপয় হিন্দু-মন্দিরের উল্লেখ করা উচিত মনে হয়। সিরহিন্দ হইতে বিশ ক্রোশ দূরে পাহাড়ের পাদদেশে ভীমাদেবী-সংশ্লিষ্ট একৎ-ভুজার (কোট ভীমা ?) মন্দির আছে। তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু-দিগের পূজা পাইয়া আসিতেছে। আলমগীরের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে (১৬৬১ খৃষ্টাব্দে) ফিদৈ খান্ কোকা নামক জনৈক প্রধান আমীর ইহাকে স্বীয় আবাসে পরিণত করিয়া ইহার নাম রাখেন পিঞ্জোর। ‡ সম্রাটের আদেশানুসারে তিনি এ স্থানের রাজাকে পৈত্রিক গৃহ হইতে দূর করিয়া দেন এবং ক্রমোচ্চ পঞ্চস্তর-বিশিষ্ট একটি মনোরম উদ্যান ও বহু চিত্তাকর্ষক গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। পর্ব্বতোদ্ভূত একটি প্রণালী এই উদ্যানে আনাইয়া তিনি তাহার নির্ঝরগুলিকে সর্ব্বদা বহমান রাখিয়াছেন। সেগুলি এক আশ্চর্য্য বিরল দৃশ্য ! 'লাল ফুলের'

---

* সাধৌরা সিরহিন্দের মহল। ইহাতে একটি ইষ্টক-দুর্গ আছে। আইন (২।২৯৬)—সরকার

† আইন (২।২৯৬)

‡ পিঞ্জোর পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত একটি শহর। ৩০·৪৮ উঃ, ৭৮·৪৭ পূঃ। ঘর্ঘরার (ঘাগ্‌গর) দুইটি শাখার সঙ্গমক্ষেত্রের উপর ইহা অবস্থিত। (ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার ২য় সংস্করণ ১১।১৮৪) থরণ্টন তাঁহার গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন যে, 'এখানে একটি বাগান আছে। তাহা জমির স্বাভাবিক 'ঢালু'তার উপরে ক্রমনিম্ন ছয়টি স্তরে সাজান।' ঔরঙ্গজেবের ধাত্রী-পুত্র ফিদৈ খান্ আজিম খান্ কোকা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তারূপে ঢাকায় অবস্থান-কালে ১০৮৮ হিজরীতে (১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে) দেহত্যাগ করেন। 'মাসির-উল-উমরা'য় (১।২৪৭) তাঁহার জীবন-চরিত আছে।—সরকার।

(অর্থাৎ গোলাপের) প্রাচুর্য্য ও মিষ্ট-গন্ধের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। গ্রন্থ-প্রণেতা একবার বসন্তকালের চির-বসন্তের এই উদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই একদিনে আলমগীরী ওজনের চল্লিশ মণ গোলাপ ফুল গোলাপ-জলের কারখানায় নীত হইয়াছিল এবং ইহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াই আসিয়াছে।

সিরহিন্দ হইতে ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন শহর থানেশ্বর বিদ্যমান। কুরুখেত (কুরুক্ষেত্র) নামক একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ইহারই নিকটে শোভা পাইতেছে। হিন্দু-গ্রন্থাবলীতে ইহাকে 'পৃথিবীর নাভিদেশ' বলা হইয়াছে এবং জাগতিক জীব-সমূহের সৃষ্টি এই স্থানেই আরব্ধ হইয়াছিল বলিয়া সে সমুদয়ে উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুরা ইহাকে পূজ্যক্ষেত্র গণ্য করে এবং ইহার সলিলে স্নান করাকে মহাপুণ্য বলিয়া মনে করে। যখনই কেন এখানে স্নান করা যাউক না, পুণ্য হইবেই। তথাপি সূর্য্যগ্রহণের দিন জগতের সকল অংশ হইতে, দেশের চারিদিক্ হইতে এবং অতি দূর দূরান্তর হইতে,—উচ্চ নাই নীচ নাই, ভদ্র নাই অভদ্র নাই, স্ত্রী নাই পুরুষ নাই—সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বজাতির লোকই এখানে একত্র হয়। তাহারা সকলেই এখানে আসিয়া অর্থই হউক আর অন্য দ্রব্যই হউক কিছু না কিছু দান করিয়া যায়, তবে তাহা কেহ প্রকাশ্যে কেহ গোপনে। অতি বড় কৃপণ হইতে শূন্যহস্ত দরিদ্র বা ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই এই দিন তাহার সাধ্যাতিরিক্ত দান করিবেই করিবে। এই প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকাটী ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক দীঘি, পুষ্করিণী ও কূপ এই শহরের চতুর্দ্দিকে ও আরও অন্যান্য স্থলে বিরাজ করিতেছে। সরস্বতী নদী এই শহরের পার্শ্ব দিয়া বাহির হইতেছে। প্রাচীন সাধুগণ-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্থানের নামই প্রাচীন পুস্তকাবলীতে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানবাসিগণের রাজা পাণ্ডব ও কৌরবেরা যেস্থানে যুদ্ধ করিয়া আত্মত্যাগের সুধাপান করিয়াছিলেন, সেই চত্বারিংশৎ ক্রোশব্যাপী ক্ষেত্র পবিত্র বলিয়া গণ্য।

রাজধানীর চল্লিশ ক্রোশ পূর্ব্বে * প্রাচীন শহর সন্তল বিরাজমান। প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র হরমন্দির † ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। প্রসিদ্ধি আছে, দিক্যালোক-প্রকাশ

* বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির ১৫৬ ডি-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে 'উত্তর' শব্দ আছে। কিন্তু তাহারই পত্রপার্শ্বে শুদ্ধ পাঠ 'পূর্ব্ব' শব্দ আছে।—সরকার।

† আইন ২।২৮১ এ আছে হরিমণ্ডল।—সরকার।

শেষ নর (অবতার) এইখানে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহার পরেই নানক-মঠ, বাবা নানকের শিষ্যবর্গ এখানে আসিয়া তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করে।

উত্তরে কুমায়ুন পর্ব্বত। তথায় স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, লৌহ, আরসেনিক, ও সোহাগা পাওয়া যায়। কস্তুরী-মৃগ 'কটাস্' গরু,* বক, চিল, টাটুঘোড়া ও বন্য-মধু তথায় সুপ্রাপ্য। তথাকার ভূস্বামীরা পর্ব্বতের দুর্গমতা ও তাঁহাদের দুর্গসমূহের অভেদ্যতা-প্রযুক্ত হিন্দুস্থানের রাজদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন না।

এই প্রদেশের প্রধান নদী দুইটি। প্রথমটি হইতেছে যমুনা। ইহার উৎপত্তি স্থল অজ্ঞাত। পর্য্যটকেরা বলেন যে, ইহা চীন হইতে উদ্ভূত হইয়া বিভিন্ন দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশ অতিক্রম করিতে করিতে 'লে' দেশে উপস্থিত হইয়াছে। শুনা যায়, এ দেশে স্বর্ণ সুপ্রাপ্য। অনেক প্রস্তরখণ্ডের এমন গুণ আছে যে, তাহারা স্পর্শমাত্র লৌহ ও অন্যান্য ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে। এরূপ প্রস্তর সহজে চিনিতে পারা যায় না বলিয়া, এদেশবাসীরা তাহাদের ছাগল, ভেড়া ও গরুর পদতলে লৌহের ক্ষুর লাগাইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে চরাইতে পাঠায়। প্রায়ই এই সব জন্তুর ক্ষুর প্রস্তর-স্পর্শে সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এ দেশের রাজার পাত্রাদি, বাদ্যযন্ত্রাদি, বাসন ও অন্যান্য জিনিষ সমস্তই স্বর্ণনির্ম্মিত।

অল্প কথায়, এই দেশ পার হইয়াই যমুনা সিরমুর রাজ্যে পড়িয়াছে। এই স্থানের রাজা নদীপথে নৌকাযোগে হিন্দুস্থানের সম্রাটদের ও তাঁহাদের আমীর ও মন্ত্রীদের বরফ উপহার দিয়া তাঁহার বশ্যতার পরিচয় দেন ও স্বীয় রাজ্য নিরাপদ করিয়াছেন। এ জন্যই উচ্চ-নীচ সকল লোকেই তাঁহাকে 'বরফী রাজা' বলে। সিরমুর শহরের নিকট হইতেই নদী পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া সমতল ক্ষেত্রে নামিয়াছে। এখানে এই উচ্ছ্বসিতা স্রোতস্বনীর তীরে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য সম্রাট শাহজাহান আদেশ করিয়াছিলেন। বড় বড় আমীরেরা ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা এখানে স্বীয় স্বীয় অবস্থা ও পদানুযায়ী গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া এক চিত্তোন্মাদক শহরের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শহর মুখলিসপুর (প্রিয় বা পবিত্র শহর) নামে খ্যাত। সম্রাট প্রায়ই এই মনোরম শহরে বেড়াইতে আসিয়া বহু প্রমোদ ভোগ করিয়া যাইতেন।

* জ্যারেট বলেন ইহা—'Yak Cow.'—সরকার।

এই স্থান হইতে রাজকীয় প্রণালী (যমুনা খাল) বাহির হইয়াছে। তাহাকে যমুনার অর্দ্ধভাগ বলা যাইতে পারে। তাহা রাজধানী শাহজাহানাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহা বহু পরগণার শস্যের উপকার করিয়া, রাজধানীর উপকণ্ঠের উদ্যানাবলীর সজীবতা প্রদান করিয়াছে, বাজার ও পথের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জন্মাইয়া রাজকীয় প্রাসাদাবলীর সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিয়াছে।

যমুনা পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া, বহু স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে করিতে শাহজাহানাবাদ শহরের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার তীরে আমীরদিগের মনোমুগ্ধকর প্রাসাদাবলী বক্ষে করিয়া দুর্গ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এখান হইতে পনের লিগ দূরে ইহা মথুরা, গোকুল ও শ্রীবৃন্দাবন শহরের পাদদেশ ধৌত করিয়া রাজধানী আকবরাবাদে (আগরা) উপস্থিত হইয়াছে। এই শহরেও সম্রাটের এবং আমীরদিগের প্রাসাদাবলী নদীতীরে শোভা পাইতেছে। তারপর ইহা এটোয়ার সুদৃঢ় নগর অতিক্রম করিয়া কল্পী শহরের পার্শ্ব দিয়া আকবরের আমলের রাজা বীরবলের জন্মস্থান আকবরপুর * শহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার তীরে রাজার উচ্চ, বিস্তৃত ও সুদৃঢ় প্রাসাদাবলী বিরাজ করিতেছে। আকবরাবাদের নিকটেই চম্বল নদ যমুনায় আসিয়া মিশিয়াছে। তারপর গণ্ডোয়ানার দিক্ হইতে আগত বেত্রা (বেটোয়া), ধসান † ও অন্যান্য নদী একে একে যমুনায় আসিয়া পড়িয়াছে। তথা হইতে মলকুসা ‡ মহলে যাইয়া যমুনা এলাহাবাদ দুর্গের পাদদেশে গঙ্গার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় নদীটি হইতেছে গঙ্গা। কেহই ইহার উৎপত্তিস্থল জানে না। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, এবং প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীতেও বলে যে, ইহা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। স্বর্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া ইহা কৈলাস পর্ব্বতে নামিয়াছে এবং তথা হইতে চীনদেশে আসিয়াছে। ফর্দোশীর 'শাহনামা'তে আছে যে, কিকৌস

---

* সামান্য গ্রাম। ৭৯২০ পূঃ, ২৬·৩১ উঃ। ইহারই নিকটে যমুনার সহিত চম্বলের সঙ্গম হইয়াছে। কানপুর জিলায় কোন তহশীলের সদর এক আকবরপুর আছে। তাহা কানপুর ও কল্পীর মধ্যপথে ও নদী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। (ইম্পিঃ গেজেঃ, ১।১৩৮)—সরকার।

† বেটোয়ার শাখানদী।

‡ কনৌজ সরকারের অন্তর্গত। (আইন ২।১৮৫) ইলিয়টের মতে মলকোঁনসা (৪।৪১৬)।

শাহের পুত্র ও অফ্রাসিয়ারের জামাতা রাজা সিয়াস্সের ¶ আবাস গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। গঙ্গা চীন ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতমধ্যস্থ বদ্রীতে (বদ্রীনাথে) উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থানকে হিমাচল বলে। হিন্দুরা মনে করে যে, পঞ্চভূতাত্মক দেহ এইখানে পঞ্চভূতে বিলীন হইলে পরকালে মুক্তি পাওয়া যায়। এ দেশের রাজা পাণ্ডবেরা সেজন্যই এইখানে তাঁহাদের নশ্বর-দেহ ত্যাগ করেন। ইহা এই পর্ব্বতেরই মধ্যে অবস্থিত। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে নদীর তীরদেশগুলি এত অধিক উচ্চ যে, তথা হইতে জল দেখা যায় না বলিলেই হয়। এখানে নৌকা-সাহায্যে নদী পারের ব্যবস্থা নাই। নির্দ্দিষ্ট স্থলসমূহে উভয় তীরের দুই বৃক্ষে মোটা মোটা দড়ি বাঁধা আছে। সেই দড়িই সেতুর কাজ করে। লোকেরা তাহারই উপর দিয়া যাতায়াত করে। সে দেশের ভাষায় ইহাকে 'ছক্কুন' * বলে। বদ্রীতে তীর্থ করিবার জন্য যে সকল লোক নানা দিগদেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া নদী-পারের জন্য ভীত হইয়া উঠে।

সংক্ষেপে বলিয়া যাই। এই নদী বদ্রী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া তথাকার রাজার রাজধানী শ্রীনগর † শহরের পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছে। তার পর ইহা হৃষিকেশ পার হইয়া হরিদ্বারে পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়াছে। যদিও পবিত্র গ্রন্থাবলীর মতে গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থল হইতে মোহনা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থলই পূজার যোগ্য, তথাপি হরিদ্বারই ইহার তীরস্থিত সকল তীর্থ অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। প্রতি বৎসর যে দিন সূর্য্য মেষে প্রবেশ করেন, সেই বৈশাখী দিনে অসংখ্য লোক এখানে আগমন করে। বিশেষতঃ যে বৎসর বৃহস্পতি কুম্ভে প্রবেশ করেন, সেই কুম্ভযোগে নানা দিগ্দেশ হইতে লোকস্রোত এখানে উপস্থিত হয়। দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই যোগ পড়ে। তাহাদের বিশ্বাস যে, এখানে স্নান, দান ও কেশমুণ্ডন করিলে পুণ্য হয় ও মৃতাস্থি জলে নিক্ষেপ করিলে মৃত ব্যক্তির মুক্তি হয়।

¶ সিয়াস তুরাণের রাজা অফ্রাসিয়ারের পক্ষ লয়েন ও তাঁহার কন্যা ফেরিঙ্গীসকে বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ চীন ও খোটান দেশ পান। কুম্ব সেই রাজ্যের রাজধানী নির্দ্দিষ্ট হয়। ম্যাকমের পারস্য-ইতিহাস ১৩০)—সরকার।

* হাণ্টার বলেন—'চিকা'। (ইম্পিঃ গেজেঃ ৮।৬৫)।

† গাড়োয়াল জিলার প্রধান শহর।

মূল্যবান উপহাররূপে ইহার জল দূরদূরান্তরে নীত হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার জল একবর্ষকাল পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিলেও দুর্গন্ধ বা বিবর্ণ হয় না। বাস্তবিকই ইহার জল অতি সুস্বাদু, পবিত্রাত্মাদের অন্তঃকরণের ন্যায় নির্ম্মল ও ভগবানের প্রিয়জনবর্গের আত্মার ন্যায় মাধুর্য্যময়। পবিত্রতা ও মিষ্টতায় ইহা কুসরের * সমকক্ষ এবং স্বাদুতা ও মনোহারিত্বে সল্‌সাবিলের † প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার যথার্থ নির্ম্মলতার জন্য ইহা সকল ধাতুর লোকেরই উপকারী। ইহার জলে বহু প্রকার উপকার পাওয়া যায়; যথা,—রুগ্নকে ইহা স্বাস্থ্য ও সুস্থতা প্রদান করে এবং বহুদিনস্থায়ী রোগসমূহের ঔষধের কাজ করে। সুস্থ ব্যক্তিকে ইহা হৃষ্টতা ও প্রফুল্লতা প্রদান করে। অপরিষ্কার পাকস্থলী ইহা পরিষ্কার করে এবং শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করে। ইহাতে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সজাগ হয়। ইহার জলের গুণে পীতবর্ণ মুখ চুনীর বর্ণ ও জাফরণ বর্ণের মুখ বেগুণে বর্ণ ধারণ করে। এইজন্যই হিন্দুস্থানের রাজারা যেখানেই থাকুন না, গঙ্গাজল পান করেন।

অল্প কথায়, এই নদী হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া সৈয়দদিগের বারহ্ ‡ পার হইয়া হস্তিনাপুর দুর্গের পাদদেশে পৌঁছিয়াছে। এই হস্তিনাপুর প্রাচীন কালে দেশের রাজধানী ছিল। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কয়েক লিগ ব্যাপিয়া ইহার অধিবাসিগণ থাকিত। তারপর এখান হইতে বিখ্যাত সহর মুক্তিসর, অনুপশহর, করণবাস, সোরাণ ও বদায়ুনের § দুর্গসমূহের পার্শ্ব দিয়া ইহা প্রাচীন শহর কনৌজে উপস্থিত হইয়া সে অঞ্চলের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিয়াছে। এখান হইতে যাইয়া সিরাজপুর, খাজা, মাণিকপুর, শাহজাদপুর ¶ ও অন্যান্য মহলের পার্শ্ব

---

* স্বর্গের সুধা নদী।

† স্বর্গের পবিত্র জলের উৎস।

‡ মজফরনগর জিলার দ্বাদশটি সমবেত গ্রাম। একটি প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশ তাহাদের অধিপতি (আইন ১।৩৯০)—সরকার।

§ গড় মুক্তিসর দিল্লী সরকারের একটি মহল। (আ ২।২৮৭) অনুপশহর যুক্তপ্রদেশের অনুপশহর-তহশীলের অন্তর্গত একটি শহর। (ইম্পিঃ গেজেঃ ১।২৯৪ ইম্পিঃ গেজেঃ ৭।৪৬৫তে করণবাসের বর্ণনা আছে। সোরোণ ৭৮.৪১ পূঃ ২৭.৫৩ উঃ।—সরকার।

¶ এ সমস্তই গেটের পপুলার এটলাস, ইণ্ডিয়া, ১০ পৃষ্ঠায় আছে—সরকার।

দিয়া ইহা এলাহাবাদ দুর্গের পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছে। এইখানে যমুনা অন্য কতিপয় নদীর সহিত আসিয়া ইহার সহিত মিশিয়াছে।

এই সঙ্গম স্থান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে বারাণসী সহর। তারপর চুণাগড় ও অন্যান্য কতিপয় মহল পার হইয়া পাটনা সহরের পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছে। পণ্যবাহী বৃহৎ নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে, এমনতর ৭২টি নদী উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতসমূহ হইতে আসিয়া একে একে ইহার সহিত মিশিয়া এমন এক গভীর নদীর সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহার তীর দৃষ্টি হয় না। এই সমস্ত নদীই গঙ্গা নাম পাইয়াছে। তার পর জাহাঙ্গীরাবাদ, * আকবরনগর (বা রাজমহল), মুকসুদাবাদ (মুর্শীদাবাদ), মির্দাদপুর, খিজিরহাটি পার হইয়া ইহা জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকার পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছে। তারপর কয়েক লিগ যাইয়াই ইহা দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে—একটি পূর্ব্ববাহী হইয়া পদ্মাবতী (পদ্মা) আখ্যা পাইয়াছে ও চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটে সমুদ্রে পড়িয়াছে। অপরটি দক্ষিণ-বাহী হইয়া তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমটি সরস্বতী, দ্বিতীয়টি যমুনা, ও তৃতীয়টি গঙ্গা। এই তৃতীয়টি তাহার সহস্র শাখা লইয়া সপ্তগ্রাম বন্দরের † নিকটে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। সরস্বতী এবং যমুনাও ঠিক এইস্থানেই সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে।

পর্য্যটকেরা বলেন যে, উৎপত্তিক্ষেত্র হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার উভয় তীর-বর্ত্তী অধিবাসীরা অসদুপায়ে জীবিকার্জ্জন করে। তাহারা কলহপ্রিয়, চোর, দস্যু, রক্তপাতী ও অত্যাচারী। ইহার জলে স্নান করিলে মানুষের দেহ পাপ-মুক্ত হয়। কিন্তু সেই পাপ জন্মান্তর-রহস্যানুসারে নিশ্চয়ই আবার মানুষ হইয়া ইহার তীরে জন্মগ্রহণ করে ও করিয়া এরূপ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

সংক্ষেপে, এই প্রদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। কৃষিকার্য্য বর্ষা ও খালের উপর নির্ভর করে। স্থানে স্থানে কূপও আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বৎসরে

---

* রেণেলের এটলাসে আছে—জনগুইরা, ভাগলপুর হইতে ১৮মাইল পশ্চিমে (২পৃষ্ঠা) হজরীহাটি মুর্শীদাবাদ হইতে ৩১মাইল পূর্ব্বে (৬পৃষ্ঠা)। মূলের খিজিরহাটি নিশ্চয়ই ভুল। তাহা হাজারহাটী হইবে। (আ ২।১৩২) আইন-ঈ-আকবরীর পর-পৃষ্ঠায় জ্যারেট ইহার বানান ভুল করিয়াছেন, লিখিয়াছেন—খিজিরখানী। মির্দাদপুর কোথায় জানা গেল না।—সরকার।

† সপ্তগ্রাম হুগলীর পুরাতন নাম। (আ ২।১২৫) সরকার। আমরা কিন্তু হুগলী সপ্তগ্রাম পৃথক স্থল বলিয়াই জানি। তবে তাহারা পরস্পরের খুবই নিকটবর্ত্তী বটে।

তিনবার ফসল হয়। ইরাণ, তুরাণ ও হিন্দুস্থানের বহুবিধ ফল ও সুগন্ধ পুষ্পরাজি এথানে বেশ সুন্দর জন্মায়। গৃহসকল উচ্চ এবং ইষ্টক বা প্রস্তর-নির্ম্মিত।

ইহার পূর্ব্বে আকবরাবাদ প্রদেশ, পশ্চিমে * লাহোর প্রদেশ, দক্ষিণে আজমীর ও উত্তরে কুমায়ুনের পার্ব্বত্য প্রদেশ। আকবরাবাদ-দিকস্থিত পলওয়াল † হইতে শতদ্রুর তীরবর্ত্তী লুধিয়ানা ১৬০ ক্রোশ; ‡ রেওরী সরকার হইতে কুমায়ুন পাহাড় পর্য্যন্ত প্রস্থ ১৪০ ক্রোশ। এ সুবায় ৮টি সরকার আছে; যথা, শাহজাহানাবাদ, সিরহিন্দ, হিসর-ফিরুজা, শাহারাণপুর, সম্ভল, বদায়ুন, রেওরী ও নারনাল। § মহল-সংখ্যা ২২৯ দুই শত উনত্রিশ। সুবার রাজার ৭৪,৬৩,৩৫,০০০ দাম বা ১,৮৬,৫৮,৩৭৫ টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত।
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-পরিচয়।

শঙ্খ। ¶

কবিই কবির ভাবে ও রসে মাতোয়ারা ও আত্মহারা হইতে পারেন, কবিই কবি-হৃদয়ের প্রকৃত বোদ্ধা। আমি ক্বচিৎ কথন ছন্দে লিখি বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার কোন পাঠকই আমাকে কবির কুসুম-আসনের সমীপবর্ত্তী হইতে দেন নাই; তবে আমি কোন্ সাহসে, কোন্ স্পর্দ্ধায় অক্ষয়-কীর্ত্তি কবির কাব্য-রস-পরিগ্রহে অগ্রসর হইতেছি? আমি আ-কৈশোর এই কবির ভক্ত ও

---

* এসিয়াটিক সোসাইটির ১৫৬ ডি-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে "পশ্চিমে লাহোর.. ......পলওয়াল হইতে" এই অংশটি একেবারেই নাই। ১৫৭ ডি-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে তাহা আছে।

† ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ার (১১।২১), আইন (২।২৭৮)—সরকার।

‡ আইন-ঈ-আকবরী-মতে ১৬৫ ক্রোশ। (আ ২।২৭৮.)।

§ আইন-ঈ-আকবরীতে নারনালের পরিবর্ত্তে কুমায়ুন আছে ও নারনাল আগ্রা সুবার একটি সরকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (আ ২।১৯৩) কুমায়ুনের রাজস্ব বাদ দিয়া ও নারনালের রাজস্ব যোগ করিয়া দেখি যে, আকবরের সময়ে দিল্লী সুবার রাজস্ব ৬১।১৯।৯৯।৬৬১ দাম বা ১৫,২৯৯,৯১১ ॥০ টাকা। (আ ২।২৮৫)—সরকার।

¶ শঙ্খ—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়।

উপাসক ; ইহার 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি' ও ভুল আমাকে চিরদিনই ভুলাইয়া আসিয়াছে। ভক্তকে তাহার ভক্তিভাজনের সন্নিহিত করিয়া দেয়, এইজন্যই আমার ভরসা হইতেছে আমার এই আলোচনা পাঠকগণ অনধিকার চর্চ্চা মনে করিবেন না। আমি অক্ষয়কুমারের কাব্যোপাসক বটি, কিন্তু তাঁহার স্তাবক নহি ; তাঁহার কবিতার যে সুর আমার কানে ও প্রাণে লাগিয়া আছে, সে সুরের অন্যথা বা ব্যত্যয় বোধ করি আমি ধরিতে পারি ; সুতরাং কেবল তাঁহার স্তুতিগানেই আমার এই প্রবন্ধটি পর্য্যবসিত হইবে না।

কবি তাঁহার এই কাব্যখানির নাম দিয়াছেন,—'শঙ্খ'। আলোচ্য কাব্যে কবি তদীয় গার্হস্থ্য-ভাবই স্ফুটনেচ্ছু ; কারণ অনেক কবিতায় তাঁহার আত্ম-আত্মীয়-বন্ধু ও সতীর্থের কথাই কবি কহিয়াছেন। 'সংসারের কূলে'-গৃহে বীণা-বেণু বা মুরজ-মুরলীর ধ্বনি বড় শুনা যায় না—সেখানে পুরন্ধ্রীবর্গের অরুণিমা-ধরের ফুৎকারে প্রত্যূষে ও প্রদোষে শঙ্খই নিনাদিত হয় ; অতএব বর্ত্তমান কাব্যের 'শঙ্খ' নামই সার্থক হইয়াছে।

শাঁক বাজাইতে গেলে প্রথমে 'ফুঁ' ভাল 'বসে' না। অক্ষয়কুমারের এই কাব্যের প্রথম কয়টি কবিতায় তাই আমরা কবির স্বকীয় সুরের সহিত সাক্ষাৎ-কার লাভ করিতে পারি নাই। 'কবি'-শীর্ষক কবিতাটি অক্ষয়কুমার খুব সম্ভবতঃ A. O'shaughnessy র 'Ode' নাম্নী কবিতার অনুকরণে লিখিয়াছেন ; তাঁহার ন্যায় উচ্চাঙ্গের মৌলিক কবির পক্ষে পরছন্দানুবর্ত্তনে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে, তিনি এ চেষ্টা কেন করিয়াছেন ? কবির স্বকীয় ভাবগুলিই আমাদের মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ, বর্ত্তমান কবিতায় কবি পরভাব-গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াই ইহা আমাদের প্রীতিকর হয় নাই।

'প্রতিভার উদ্বোধন'-শীর্ষক কবিতা হইতে কবির কাব্য স্বকীয় সুর ধরিয়াছে —তাই জমিয়াছে। তাহার পরবর্ত্তিনী সকল কবিতাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অক্ষয়কুমারের কবিতা চিরদিনই একটু বিষাদ-বিজড়িতা ছিল ; সুখের বিষয় বর্ত্তমান কাব্যে তাঁহার কয়েকটি কবিতায় একটু অম্ল-মধুর রসভাষের আভাষ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার 'আদর', 'পঞ্চদশবর্ষগত', মাণিক ও 'পূজার পর'-শীর্ষক কবিতা-চতুষ্টয়ে স্মিত হাস্যচ্ছটাচ্ছুরিত। তন্মধ্যে 'আদর', 'মাণিক' ও 'পূজার পর'-শীর্ষক কবিতাত্রয়ে হাস্যরসের সহিত বাৎসল্য ভাবের সুমধুর সংমিশ্রণ হই-

য়াছে বলিয়া প্রাগুক্ত কবিতা কয়েকটি অপেক্ষা এই তিনটী কবিতা আমাদের অধিকতর মধুর লাগিয়াছে। অক্ষয়বাবু তাঁহার সতীর্থ কবি রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়াছেন, আমরা এ প্রথার এবং সঙ্গে সঙ্গে এই মধুর কবিতাটির প্রশংসা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। কবির জীবদ্দশায় তাঁহার ও তদীয় কাব্যের প্রকৃত অর্ঘ-নির্ণয় প্রায় ঘটিয়া উঠে না। তাঁহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচার আমরা করিয়া উঠিতে পারি না। বিশেষতঃ যে কবি তদীয় যুগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কথা কবিতার বিষয়ীভূত না করিলেই সমীচীন হয়। আলোচ্য কাব্যে কবি মহচ্চরিত্রাবলম্বনপূর্ব্বক যে কয়টি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় কবি ঈশানচন্দ্র-সম্বন্ধীয় 'সনেট্'টি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হইল।

কবির ভাব ও ভাষা-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। অক্ষয়বাবুর মত নিপুণ শব্দশিল্পী দুর্লভ। ছায়া যেমন আলোকের চিরানুগামিনী, তাঁহার ভাষাও তেমনই ভাবের চিরানুবর্ত্তিনী হইয়া আছে। ভাষা ভাবোচ্ছ্বাসে ভাদ্র মাসের ভরা নদীর মত কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। চেষ্টালক্ষণ নাই বলিলেই হয়। তাঁহার যে কোন কাব্য পড়িয়া দেখুন, দেখিবেন, তিনি শব্দরত্নের অক্ষয় আকর; অথচ তাঁহার ভাষায় এমনই প্রীতিকরী প্রাঞ্জলতা আছে যে, ভাবগ্রহ-সময়ে শব্দের দ্বারা কোনই বিসংবাদ উপস্থিত হয় না। ভাবের গাঢ়তাই কথনও কথনও দুরূহতার কারণ হইয়া উঠে। তবে তাঁহার 'গায়ি' স্থলে 'গাহি', 'বনানী' ও 'জগত' প্রভৃতি শব্দ, বোধ করি, আমরণ আমার কানে খচ্ করিয়া লাগিবে।

অক্ষয়বাবুর যে ভাবৈশ্বর্য্য তাহার কথা আর কি বলিব? সে ভাবের গাঢ়তার মধ্যে আমরা ডুবিতে পারি, আমাদের সে ক্ষমতা নাই; সে পেলব ভাবকুসুম-গুলিকে স্পর্শ করিয়া আমরা যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব, আমাদের এ ভরসাও নাই। তেমন কুলিশ-কঠোর অথচ কুসুম-কোমল ভাব, তেমন হৃদয়স্পর্শী ভাব সমসাময়িক অন্য কোন কবির কাব্যে বিরল।

কবির 'ত্রয়ী'ও 'জোৎস্নারাত্রে' শীর্ষক কবিতাদ্বয় হইতে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ দুইটি পাঠ করিলে তাঁহার ভাষায় ভাবের কি সুন্দর প্রতিধ্বনি

উঠে এবং তাঁহার ভাব এই মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া কোন্ বহুদূরবর্ত্তী স্বপ্নময়লোকে বিচরণ করে, তাহা উপলব্ধ হইবে।

অক্ষয়বাবু এই বইখানিতে 'উপহার'-শীর্ষক কবিতাসমেত সর্ব্বশুদ্ধ ৪১টি কবিতা প্রকাশিত করিয়াছেন। কবিতাগুলিকে তিনি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকৃতির কবিতাগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়া কবি শ্রেণিক্রমিকতা বা ধারানুবর্ত্তিতার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানি অতীব যত্নসহকারে পরিপাটিরূপে মুদ্রিত হইয়াছে—মুদ্রাকর-প্রমাদ নাই বলিলেই চলে। ইহা গ্রন্থকার ও মুদ্রাকর উভয়েরই কৃতিত্ব-জ্ঞাপক। ১২৭ পৃষ্ঠা-পরিমিত পুস্তকের বার আনা মূল্য সুলভই হইয়াছে। কিন্তু হায়, প্রশংসক বিস্তর হইলেও কবির পারিশ্রমিক-প্রদানেচ্ছু পাঠক বড়ই দুষ্প্রাপ্য! এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ অবিলম্বেই নিঃশেষিত হওয়া উচিত। যে দেশে মাইকেল, হেম, নবীন, রবি সকলকে বিতরণের দ্বারাই সংস্করণান্তরে পদার্পণ করিতে হইয়াছে, সে দেশে ইহা হইবে কি? যাহা হউক, কবি অক্ষয়কুমার উপযুক্ত অবসরেই বহুকাল পরে আবার সাহিত্য-মন্দিরে তাঁহার শঙ্খ-নিনাদ সমুত্থিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে গীতি-কবির কোন কালেই কোন বিশেষ অসদ্ভাব ছিল না। জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেকেই গীতিকবি। এখন আমরা আর এক শ্রেণীর গীতিকবিদিগের কবিতা-সম্ভারে নিষ্পেষিত। রবীন্দ্রবাবু অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, ইহাদ্বারা তিনি ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন তাহা আমরা ভাল করিয়া এখনও বুঝিতে পারি নাই। তবে একটা বিষয় আমাদের কাছে খুবই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দ্বারা অ-কবিদিগের রবীন্দ্র-নাথকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া কবি হইবার বড় সুবিধা হইয়াছে! বর্ত্তমানে আমরা এই শ্রেণীর 'কবি'দিগের 'কবিতা'-সম্ভারে নিষ্পেষিত হইয়া আছি। দুঃখের বিষয়, তাহার উপর আবার দু' একজন উদীয়মান প্রকৃত কবিরও স্বাতন্ত্র্য এই গতানুগতিকতায় নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে! তাই আমরা এই দুঃসময়ে 'অক্ষয়' কবির অক্ষয় প্রতিভার অভিনব বিকাশে পুলকিত হইয়াছি।

পাগলের কথা।*

যেসমস্ত ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী নরনারী এ জগতে তাঁহাদের অনন্যসুলভ প্রতিভার বিকাশ-সাধনের শুভ-অবসর-লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের যত-টুকু লোকের চাক্ষুষ ছিল, ততটুকুর সহিত যতটুকু নেপথ্যবর্ত্তী ছিল, ততটুকুর বড় বিসংবাদ ছিল বলিয়া তাঁহাদের জীবনের সব কথা তাঁহারা স্বয়ং বা তাঁহাদের

* পাগলের কথা—প্রণেতা মিঃ ডি, এন, দাস, বি-এ (কেম্ব্রিজ) মূল্য এক টাকা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাসবাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

চরিতকারেরা লোক-লোচনের সমক্ষে ধরিতে সাহসী হন নাই ; ফলে সে জীবন-চরিতগুলিকে কিছুতেই কপটতা-পরিশূন্য করা যায় নাই। মনুষ্য কোনও কোনও বিষয়ে যথোচিত গুরুগম্ভীর, আবার কোনও কোনও বিষয় অযথা লঘু-চিত্ত,— উদ্ভট খেয়ালের ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র, সুতরাং মদমত্ত ফিলিপের যখন মত্ততা টুটিয়া যায়, তখন সে তাহার মত্তাবস্থার সমুদয় কার্য্যের স্বয়ংই সমর্থন করিয়া উঠিতে পারে না—তখনকার সে হাস্যকর অনুস্বার-বিসর্গগুলির বিলোপসাধন না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু যিনি কাপট্যকে ঘৃণা করেন, সত্যের প্রতি যাঁহার নিষ্ঠা আছে, তিনি তাঁহার জীবনের অনুস্বার-বিসর্গগুলির অপলাপ করিতে কুণ্ঠিত হন ; কাজেই সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষের জীবনের কথা "পাগলের কথা"ই হইয়া দাঁড়ায় বৈ কি! "পাগলের কথা" পরলোক-প্রস্থিত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দাসের সর্ব্বতোভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ আত্মজীবনচরিত। এই পুস্তকের বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র অখ্যান-বস্তু, বিচিত্র মত ও স্বচ্ছ সরলতা ইহাকে এক চিত্তবিনোদন বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে। ইহাতে শিক্ষিতব্য বস্তুব্যূহের কোনই অভাব নাই, গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাঠককে প্রীত করে, তাঁহার অনেক মতই সর্ব্বসাধারণের সমাদরযোগ্য। সকল কথাই তিনি খুলিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া জগতের অতি-বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের বিবেচনায় তিনি 'পাগল' হইতে পারেন বটে—কিন্তু তাঁহার এ 'পাগলামি'তে আমরা লাভবান্ হইয়াছি,—অনেক বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি মার্জ্জনা লাভ করিয়াছে। তবে ভাষা-বিষয়ে তিনি যে পথ ধরিয়াছেন, আমরা তাহার সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই সহৃদয় মহাত্মা আর ইহজগতে নাই, নতুবা এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বুঝাপড়া করিয়া দেখিতাম! শুধু যে ক্রিয়াপদগুলির বৈচিত্র্যবিধান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহার মত সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত 'সঙ্কম', 'জীবন-চরিত'—অর্থে 'জীবনী'. 'প্রেমময়ী মুখ' প্রভৃতি কোন্ যুক্তিবলে লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। 'স্বাভাবিক মাধুরী' ও খ্যাল' প্রভৃতির খেয়াল বরং সহ্য হয়, কিন্তু প্রাগুক্ত অপপ্রয়োগগুলির আমরা কি করিয়া সমর্থন করিব?

তবুও এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা যে প্রীত হইয়াছি, তাহা আমরা সরলভাবে স্বীকার করিতেছি। এই উপন্যাসবৎ চিত্তাকর্ষক জীবন-চরিতখানি বাঙ্গালা ভাষার এক সম্পদ হইয়া রহিল। ২৮০ পৃষ্ঠা-পরিমিত পুস্তকের একটাকা মূল্য অধিক হয় নাই। আশা করি; শীঘ্রই ইহার সু-মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

উপেক্ষিতা।

১

উপর্য্যুপরি দুই কন্যার পরে সেও কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিল, সে কি তাহার দোষ? নিয়ন্তার অমোঘ নিয়মের উপর তা'র কি কোন হাত ছিল? তবু মাতা তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন!

নামকরণ-ব্যাপারটা বিশেষ গুরুতর ব্যাপার না হইলেও ইহা হইতে পিতামাতার স্নেহের পরিমাণ কতকটা অনুভব করা যায়। এই উপেক্ষিতা অভাগিনী কন্যার নাম হইল, আর-না-কালী। পিতামাতার নিদারুণ উপেক্ষা ও বিরাগ তাহার নামের সঙ্গে চিরগ্রথিত হইয়া রহিল।

যাহারা আদরে আদরে বাড়ে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা অনাদর ও উৎপীড়নের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের বুদ্ধিবিকাশ সত্বরে হইয়া থাকে। যাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য দশ জনের চক্ষু ও হস্ত উদ্যত হইয়া আছে, তাহাদের বুদ্ধিবিকাশে বিলম্ব হইলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু যাহাদের আত্মরক্ষার ভার আপনাদের লইতে হয়, তাহাদের বুদ্ধিবিকাশে বিলম্ব হইলে চলে না।

অতি অল্প বয়সেই আর-না-কালী বুঝিল, সে নিতান্ত চোরের মত সংসারে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ন্যায্য অধিকার কোথাও নাই। তাহার জন্মের দুই বৎসর পরেই এক পুত্র-সন্তান বিজয়নারায়ণের গৃহকে আলোকিত করিয়াছিল। সুতরাং পিতামাতার সমস্ত স্নেহোচ্ছ্বাস তাহারই উপরে গিয়া পড়িয়াছিল,—আর-না-কালীর জন্য বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না।

খোকার জন্য নানাপ্রকার খেলনা আসিত, পোষাক আসিত, খাবার আসিত, আর-না-কালী দূর হইতে নীরবে তাহা দেখিত; পিতামাতা ভুলিয়াও তাহাকে কিছু অংশ দিবার জন্য ডাকিতেন না। সকল জিনিস্ চক্ষু ভরিয়া দেখিবার সুযোগও সে পাইত না। সে খোকার নিকট আসিলে মা চীৎকার করিয়া বলিতেন, "যাঁ যা ডাইনী ছেলের কাছে যাস্‌নে"। সে ভয়ে ভয়ে দূরে রহিত।

কখনও কখনও খোকা নিদ্রা গেলে যখন তাহাকে ঘরে শোয়াইয়া সকলে বাহির হইয়া যাইত, তখন এক একবার সে বালিকা-সুলভ কৌতূহলবশে ধীরে ধীরে খোকার মাথার কাছে আসিয়া বসিত। খোকাকে দেখিয়া তাহার

কখন কখন যদি তাহাকে একটু আদর করিবার ইচ্ছা করিত, তাহা হইলেই মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইত। খোকা ছোট দুটি অঙ্গুলির মৃদুস্পর্শেই চীৎকার কাঁদিয়া উঠিত, মা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিয়াই গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন। সে পাণ্ডুর মুখে ধীরে ধীরে চোরের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত এবং মাতার গালি ও তিরস্কার তাহাকে বহুদূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিত।

২

তাহাকে সংসারে পাঠাইয়া ভগবান যে ত্রুটি করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সে ত্রুটির সম্পূর্ণ সংশোধনের ক্ষমতা আর-না-কালীর ছিল না। তথাপি এই বিষম. ত্রুটির যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা সে সর্ব্বদাই করিত। সংসারের সর্ব্বত্র হইতে সে যতদূর পারিত, আপনাকে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। যেখানে অন্যান্য ছেলেরা খাবার লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিত, সেখানে সে আসিয়া ম্লানমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিত; যদি দয়া করিয়া কেহ কিছু দিতেন, তাহা হইলে তাহাই লইয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইত,—যদি না দিতেন, তাহা হইলেও রহিয়া রহিয়া বড় বড় চোখদু'টি সজল করিয়া নীরবে সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান করিত। যেখানে খেলার আমোদে অন্য সকলে উন্মত্ত হইয়া লম্ফঝম্প করিত, সেখানেও সে থামের পাশে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিত। বালক-বালিকাদের মধ্যে কেহ তাহাকে দয়া করিয়া খেলিতে ডাকিলে সে ম্লান-মুখে শুধু ঘাড় নাড়িত। পিতা অফিস হইতে আসিলে ভাই-বোন সকলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত, আর-না-কালী শুধু দরজার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া এই স্নেহোৎসব দেখিত। সে বুঝিয়াছিল তাহার কোথাও স্থান ছিল না, তাই সে কাহারও পথে দাঁড়াইতে সাহস করিত না।

এইরূপে আর-না-কালী একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। মাতাপিতার চির-উদাসীন দৃষ্টি এতদিনে তাহার উপর পড়িল। কিন্তু সে যে আরও কঠোর, আরও নিষ্ঠুর, আরও তিরস্কার-ব্যঞ্জক দৃষ্টি! সে দৃষ্টি দেখিয়া আর-না-কালী আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেল। যেন সে বড় হইয়া কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে!

একদিন গোধূলির অল্প পরে কক্ষমধ্যে পিতামাতার কথা হইতেছিল। আর-না-কালী সেই কক্ষের পাশ দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ নিজের নাম উচ্চারিত

হইতে শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। মাতা বলিতেছিলেন, "পোড়ারমুখী খেয়ে খেয়ে ত ফুলে উঠেচেন, এখন আপদ বার হ'বেন কি করে? বিয়ে ত একটা দিতে হবে।" পিতা বলিলেন, "হাঁ, দেখি এইবার চেষ্টা।" কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, আর-না-কালী আর সেখানে দাঁড়াইল না। সে সজলনেত্রে বাগানে গিয়া বকুলতলস্থ বেদীর উপর শুইয়া পড়িল। তাহার কানে, বাজিতেছিল, "আপদ বার হবেন কি করে?" সন্ধ্যার প্রথম তারকা সবে মাত্র উদিত হইয়াছিল; সেদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া বালিকার চোখে জল আসিতেছিল, মনে মনে সে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "তোমরা আমাকে উদ্ধার করিতে পার না?"

৩

অবশেষে আপদ উদ্ধার হইল। জয়নগরের কালীভূষণ রায়ের সঙ্গে আর-না-কালীর বিবাহ হইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণলোচনে আর-না-কালী পিতৃগৃহের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল। বিদায়ের ক্ষণে এই শান্ত-নিরীহ কন্যার ম্লান-শুষ্ক মুখখানি যেন পিতামাতাকে ক্ষণিকের জন্য আঘাত করিল। তাঁহারা নীরবে চক্ষু মুছিলেন।

কালীভূষণের বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর। বিবাহে তাহার বড় একটা প্রবৃত্তি ছিল না। তাহার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি বন্ধন পছন্দ করিত না। তাহার দুশ্চরিত্রতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার দিদি জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন,—যদি বিবাহ করিয়া তাহার দুশ্চরিত্র ভ্রাতা 'মানুষের মত' হয়। কালীভূষণের গুণের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় সহজে কেহ তাহাকে কন্যাদান করিতে চাহে নাই। আর-না-কালীর হৃদয়হীন পিতামাতা শুধু আপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য হতভাগিনী বালিকাকে এই দুর্ব্বৃত্তের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আর-না-কালী সেই যে শ্বশুর বাড়ী প্রবেশ করিল, আর কখনও পিতৃগৃহে ফিরিল না। দুই একবার অনুতপ্ত পিতামাতা তাহাকে লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ব্যাঘ্রীপ্রতাপা ননদিনী শ্রীমতী জয়দুর্গা ঠাকুরাণীর ভীষণ গর্জ্জনে তাহাদের "ধূলা পায়েই" বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল। শ্বশুরবাড়ী আসিয়াও আর-না-কালীর কপাল ফিরিল না। ননদিনীর ভীষণ প্রতাপে

বালিকা নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। প্রথম প্রথম সে সাংসারিক কার্য্যে জয়দুর্গাকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু প্রতি কাজেই ননদিনী হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন, "মরণ আর কি! কোন কাজের ছিরি নাই; বুড়ো বয়সেও যেন কচি খুকিটী! কোন্ নবাবের ঘরে জন্মেছিলে?"

ভয়ে আর-না-কালীর হৃৎকম্প হইত, সে কোন কাজ করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি ছিল না। ননদিনী বলিতেন, "মরণ হয় না আমার। পরের জন্য খাটতে খাট্‌তে জন্মটা গেল; রাজকন্যে এসে বাড়ীতে জুটেচেন, নড়ে বস্‌লে গতরে সয় না, গরিবের ঘরে এ আপদ কেন? হাড় কালী হ'ল, এখন মরণ হ'লে হাড় জুড়ায়!" কালীভূষণ প্রায়ই রাত্রে ঘরে থাকিতেন না। একাকিনী শয্যায় শুইয়া শুইয়া কাতরকণ্ঠে অভাগিনী ভগবানকে, ডাকিয়া বলিত, "ঠাকুর? কেন আমায় পাঠিয়েছিলে; কোথাও আমার জন্য ঠাঁই রাখ নাই!"

৪

ঠাকুর বুঝি বা কথা শুনিলেন। অবিরত শারীরিক ও মানসিক যাতনায় আর-না-কালীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। প্রত্যহ রাত্রিতে তাহার অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল; কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। কালীভূষণ যদি কোন দিন বাড়ীতে আসিতেন, সে অজ্ঞান অবস্থায়; ননদিনী সংসারকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন। আর-না-কালীও একথা কাহাকেও বলিতে সাহস করিত না; করিলেই বা কে শুনিত? ক্রমে তাহার আহারে অরুচি জন্মিতেছিল; দেখিয়া একদিন ননদিনী হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "দিনরাত অমন মুখ ভার 'করে থাক কেন বল ত? কি তোমার অস্বোয়াস্তি তাত জানিনে! দিনরাত ত দাসীর মত খাট্‌চি, আর কি কর্‌তে হবে বল দেখি? ভাইটা আগে তবু রাত্রিতে বাড়ীতে থাক্‌ত, তুমি এসে অবধি ত এক রকম গৃহত্যাগী হয়েছে! "আজকাল আবার খাওয়া দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে, আবার কি অকল্যাণ ঘটাবে জানিনে। কেন মর্‌তে 'ছেলের' বিয়ে দিতে গিয়েছিলুম! এ আপদ কোত্থেকে এসে জুট্‌লো যে!" আর-না-কালী সেইদিন হইতে জোর করিয়া ক্ষুধার অতিরিক্ত খাইতে আরম্ভ করিল।

পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন রাত্রে মুখ দিয়া অনেকটা রক্ত উঠিল।

পরদিন সকালে সে আর উঠিতে পারিল না। ননদিনী এক প্রহর বেলায় আসিয়া উঠাইলেন, "কি গো রাজকন্যে, আজ কি বিছানাতেই থাক্‌বে ?" অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে ম্লানমুখে বালিকা বলিলেন—"উঠ্‌তে পারিনি ঠাকুরঝি, বড় দুর্ব্বল।" বিদ্রুপের স্বরে ননদিনী বলিল, "তা দরকার কি উঠ্‌বার, যখন এই চাকরাণী মাগী আছে, তখন হুকুম কল্লে বিছানার কাছেই খাবার নিয়ে হাজির হবে, কষ্ট করে কাজ কি ?" বলিয়া ক্রোধে দুই হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে ননদিনী চলিয়া গেলেন। অশ্রুপূর্ণ-লোচনে আর-না-কালী একাকিনী পড়িয়া রহিল।

৫

পুত্রহীনতার পাপ-ক্ষালনের জন্য জয়দুর্গা ঠাকুরাণী কার্ত্তিকপূজার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসর ব্রতের উদযাপন; কাজেই এবার সমারোহ কিছু অধিক। জয়দুর্গা নিমন্ত্রিতগণের আদর-অভ্যর্থনা এবং লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। কালীভূষণ তাঁহার সখের থিয়েটার পার্টির অভ্যর্থনা এবং সে রাত্রির অভিনয়ের বন্দোবস্তে নিযুক্ত ছিল।

একাকিনী রুগ্ন শয্যায় শুইয়া আর-না-কালী ছটফট্‌ করিতেছিল, থাকিয়া থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ এবং মুখ নীল হইয়া উঠিতেছিল। আজ আর-না-কালীর প্রাণ যেন কেমন করিতেছিল। মা বাপকে মনে করিয়া, খোকাকে মনে করিয়া, বকুল-তলার সেই পরিষ্কার বেদীটিকে মনে করিয়া— থাকিয়া থাকিয়া তাহার চক্ষে জল আসিতেছিল। মনে হইতেছিল, জীবনে আর কাহাকেও দেখিতে পাইবে না।

রাত্রি এক প্রহরের সময় এক প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা আসিয়া আর-না-কালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছ বউ মা ?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বালিকা বলিল, "বেশ আছি"। বৃদ্ধা কিছুক্ষণ তাহার নিকটে বসিলেন; লক্ষণ তাঁহার ভাল বোধ হইল না। যাইবার সময় গোপনে জয়দুর্গাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বউমার একটু খবর রেখো, অসুখটা যেন বেড়েছে বোধ হয়।" তিক্ত হাসি হাসিয়া জয়দুর্গা বলিলেন "কিছু ভেব না দিদি, আমাদের সবাইকে না খেয়ে আর উনি যাচ্চেন না।" রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া আসিল। তখন পূর্ণ উৎসাহে নিয়ে অভিনয় চলিতেছিল, জনপ্রাণী আর-না-কালীর কক্ষের দিকে ছিল না।

যন্ত্রণা হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, ছিন্নকণ্ঠ কপোতের ন্যায় আর-না-কালী বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ব্যাকুলকণ্ঠে বালিকা বলিতেছিল, "উঃ আর কত কষ্ট দেবে ঠাকুর? কি পাপ করেছি ঠাকুর? কিছুতে কি প্রায়শ্চিত্ত হবে না?" বলিতে বলিতে মুখ দিয়া খুব খানিক রক্ত উঠিল। 'পায়ে ঠাঁই দিও ঠাকুর' বলিতে বলিতে বালিকা বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে বাপের বাড়ীর আপদ, শ্বশুর বাড়ীর আপদ—সকল আপদ একসঙ্গে চুকিয়া গেল।

কালীভূষণ তখন 'নলদময়ন্তী'র বিদূষক সাজিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মুহুর্মুহু হাস্য ও করতালি আকর্ষণ করিতেছিল এবং জয়দুর্গা ঠাকুরাণী ভ্রাতার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-কলাপ পার্শ্ববর্ত্তিনী বন্ধুবর্গের নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যাত করিতেছিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

অধ্যাত্মতত্ত্ব ও জড়বাদ।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূল কারণ কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ই এই জগতের মূল কারণ। কোন জিনিষ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রথমে মনে মনে সেই বস্তুর স্বরূপ কল্পনা করিয়া, অনন্তর ক্রিয়া দ্বারা বাহিরে সেই বস্তুর আকৃতি বিন্যাস করিয়া থাকি। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ", "একমেবাদ্বিতীয়ং", "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়", "তত্তেজোঽসৃজত", "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা", "স ইমাঁল্লোকানসৃজত", "স ঈক্ষাঞ্চক্রে স প্রাণমসৃজত"।

আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানরূপ সৎ পদার্থই অবস্থিত ছিলেন। তিনি মনে মনে আলোচনা করিলেন যে, আমি বহু হইব অর্থাৎ আমি বহুরূপ ধারণ করিয়া বাহ্য জগৎস্বরূপে প্রকাশিত হইব। যে সময়ে তিনি এইরূপ কল্পনা করেন, সে সময়ে কোন রূপ "মিষৎ" অর্থাৎ সক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না। এই কল্পনার পরে তিনি তেজঃ, প্রাণ প্রভৃতি লোকসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন।

জগৎ সৃষ্টির প্রথমে নিষ্ক্রিয়াবস্থা, তৎপরে আভ্যন্তরিক ক্রিয়া এবং তৎপরে বহিঃক্রিয়ারূপে জগতের বিকাশ। জ্ঞান নিষ্ক্রিয়, জ্ঞান স্বতঃ কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। যখন ক্রিয়াশক্তির সাহায্য লাভ করে, তখনই কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। ক্রিয়া ও জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। জ্ঞান পঙ্গু, ক্রিয়া অন্ধ। পঙ্গুর গমন শক্তি নাই, অন্ধের দর্শন শক্তি নাই। যেমন পঙ্গু ও অন্ধ উভয় মিলিত হইলে অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, সেই-রূপ জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ে মিলিত হইলেই জগৎ সৃষ্টির উপযোগী হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তি বীজস্থানীয়, এবং ক্রিয়াশক্তি ক্ষেত্রস্থানীয়; জ্ঞানশক্তিরূপ বীজ ক্রিয়াশক্তিরূপ ক্ষেত্রে সংসক্ত হইলে নানাবিধ বাহ্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। দর্শন-শাস্ত্র জ্ঞানশক্তির এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র ক্রিয়াশক্তির পোষণ করিয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানের এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র ক্রিয়ার দোষগুণ বিচার করে। দার্শনিক জ্ঞান-প্রভাবেই বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া অভীষ্টফলদায়িনী হইয়া থাকে। জৈন-দর্শনে লিখিত আছে যে—

> "ভট্ঠেণ চরিত্তাউ দংসণমিহ দিঢ়য়রং গহেয়ব্বং
> সিজ্ঝন্তি চরণরহিয়া দংসণরহিয়া ন সিজ্ঝন্তি" (প্রাকৃত)
> "ভ্রষ্টেন চরিত্রাদ্দর্শনমিহ দৃঢ়তরং গ্রহীতব্যং
> সিধ্যন্তি চরণরহিতা দর্শন-রহিতা ন সিধ্যন্তি"॥ (সংস্কৃত)

চরণরহিত হইলেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, দর্শনরহিত ব্যক্তি কখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। অতএব চরণরহিত ব্যক্তির পক্ষেও দর্শন অবলম্বনীয়। এইস্থলে "চরিত্র" "চরণ" শব্দের অর্থ ক্রিয়াপ্রধান শাস্ত্র এবং "দর্শন" শব্দের অর্থ জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র। দার্শনিক যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াবিষয়ে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি না হইলে কোন কার্য্য করা যায় না। অল্প পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে আমরা সহজেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। ঐসকল কার্য্যফলের অবশ্যম্ভাবিতাসম্বন্ধে দৃঢ়তাজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যেসকল কার্য্য সহজে করা যায় না, সেই সকল কার্য্যফলের অবশ্যম্ভাবিতাসম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় না হইলে, কোন ব্যক্তিই ঐরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া অধিকতর পরিশ্রমাদি-সাধ্য, কার্য্যফলের অবশ্যম্ভাবিতাসম্বন্ধে দৃঢ়তর নিশ্চয় না হইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি

হইতে পারে না। দার্শনিক যুক্তি প্রভৃতি ভিন্ন ঐসকল বিষয়ে দৃঢ় বা অসন্দিগ্ধ নিশ্চয়ের অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যুক্তিবিহীন ব্যক্তি কথনই চেষ্টাদ্বারা অভিলষিত ফল সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারেন না।

অনেকের মনে, বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, পূর্ব্বে এতদ্দেশে জড়বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা ছিল না। সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে যেরূপভাবে জড়তত্ত্বের আলোচনা হইতেছে, এদেশে সেরূপ আলোচনা কথনও হয় নাই। এইরূপ ধারণা, আমার বিবেচনায় ঠিক নহে। আমি বিবেচনা করি, যে, আমাদের দেশ অতি পূর্ব্ব কালে জড়তত্ত্বচর্চ্চায় সমধিক উন্নতিই লাভ করিয়াছিল। সে সময়ে জড়তত্ত্ব-জ্ঞান এরূপভাবে দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, দেশের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ পর্য্যন্ত (যাহারা বানর বা রাক্ষসাদি নামে পরিচিত) সেই জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত হইত না। সেজন্যই তথন জড়তত্ত্বের চর্চ্চাবিষয়ে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি-বর্গের অনুরাগ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং উচ্চশ্রেণীয়গণের অনুরাগ না থাকায়, কালক্রমে আমাদের দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

আজকাল আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিজ্ঞান-কৌশল দেথিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকি। তাহাদের নির্ম্মিত দুই একটী সেতু ও ব্যোমযান প্রভৃতি দেথিয়া মনে করি, যে ইহারা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। প্রকৃত পক্ষে, বর্ত্তমান সময়ে তাহারা আমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন, এই বিষয়ে সংশয় করিবার কারণ নাই, ইহা সত্য; কিন্তু পূর্ব্ব কালে আমাদের দেশ ঐরূপ বৈজ্ঞানিক কার্য্যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়া ছিল, এইরূপ আমার বিশ্বাস। রামায়ণের সেতু ও পুষ্পকরথের বর্ণনা দেথিলে কি ইহা মনে হয় না, যে বর্ত্তমান সময়ের গঙ্গা প্রভৃতি নদীর সেতু ও ব্যোমযান তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ? রামায়ণের সময়ের কিষ্কিন্ধ্যা অতি অবনত স্থান, সে জন্য রামায়ণে তদ্দেশবাসীকে বানর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই বানরগণ শীতকালের প্রারম্ভে সমুদ্রে সেতুনির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া এক বর্ষ মধ্যে তাহা শেষ করিয়াছিল। ইহা বড়ই দুঃথের বিষয় যে, পূর্ব্বকালে ভারতীয় অবনতশ্রেণীর লোকেরা যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশীয় উন্নত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্তও সেইরূপ কার্য্য করিতে

অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রামায়ণের পুষ্পকরথের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, পূর্ব্বে এ দেশে চালকের ইচ্ছানুসারে ব্যোমযান পরিচালিত হইত। কিন্তু এখনকার ব্যোমযান চালকের ইচ্ছানুসারে চালিত হয় না। রামায়ণ-পাঠে আরও একটী বিষয় অবগত হওয়া যায় যে, রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। এই সকল ঘটনা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব্বে এদেশে বাহ্য জড়বিজ্ঞানের বিশেষ রূপই চর্চ্চা ছিল। আমি শুনিয়াছি, ফরাসী-দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ আকাশপথে অবস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করার সম্বন্ধে কতিপয় প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং আশা করি যে, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ-বর্ণনায় বর্ত্তমান শিক্ষিত কোন ব্যক্তিই সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন না। বিশেষ অবধান-সহকারে বিচার করিলে সুবিবেচক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, পুরাকালে এতদ্দেশে জড়তত্ত্বের সমধিক চর্চ্চা হইয়াছিল এবং সেইরূপ চর্চ্চা বর্ত্তমান সময়ে কোন দেশেই হয় না। পূর্ব্বকালে জড়তত্ত্বচর্চ্চাবিষয়ে এদেশীয় উচ্চ শ্রেণীয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষ অনুরাগ ছিল না। এই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এদেশে ব্রাহ্মণই উচ্চশ্রেণীয়। তাঁহারা বুদ্ধিবলে সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহারা সকল শ্রেণীর লোককে কার্য্যের উপদেশ প্রদান করিতেন। বুদ্ধিবলে নূতন নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়া, সাধারণ্যে তাহার প্রচার করাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। তাঁহাদের নিকট উপদেশ লাভ করিয়া অন্যান্য লোকেরা জড়তত্ত্বসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক কার্য্য সম্পাদন করিতেন। খুব সম্ভব, সেজন্যই নানা জাতীয় বৈজ্ঞানিক কার্য্যের সুচারুরূপে সম্পাদন-অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এক এক জাতীয় বৈজ্ঞানিক কার্য্য এক এক জাতির জীবনোপায়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যেসকল লোক বৈজ্ঞানিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুসন্ধান করিতেন না। কার্য্যপ্রণালী ও তৎফল জানিয়াই তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন। প্রথমে যুক্তিসহকারে কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছিল, অনন্তর যুক্তিবিহীন কার্য্যপ্রণালী শিক্ষার আরম্ভ হয়। এইরূপ শিক্ষাপ্রভাবে, কালক্রমে বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারকগণ যুক্তি প্রভৃতি ভুলিতে আরম্ভ করিলেন; এদিকে ব্রাহ্মণগণ বৈজ্ঞানিক কার্য্যভার নিম্নশ্রেণীয় ব্যক্তিগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা ঐ বিষয়ে মনোযোগ করিলেন

না, সুতরাং সেই সময় হইতেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিসকলের বিলোপ আরম্ভ হইল এবং সময়-স্রোতের অলঙ্ঘনীয় প্রভাবে আমরা পূর্ব্বগৌরব-স্মরণের অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইয়াও পড়িলাম।

কি জন্য ব্রাহ্মণগণ জড়তত্ত্ব-চর্চ্চায় ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন? এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, অতি পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ জড়তত্ত্ব সংক্রান্ত চর্চ্চাকে অতি সাধারণ কার্য্য মনে করিতেন। কারণ, অতি নীচ ব্যক্তিগণও সেই সকল কার্য্য-সম্পাদনের অধিকারী হইয়াছিলেন। সে সময়ে জড়তত্ত্বচর্চ্চা সাধারণের কার্য্যরূপে পরিগণিত হওয়ায়, ব্রাহ্মণগণ অভিনব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-আবিষ্কারের পন্থা-উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে কার্য্য অতি সাধারণ লোকদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, সে কার্য্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের বিশেষ অনুরাগ থাকে না। ইহা বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের পক্ষে একপ্রকার স্বাভাবিক। কাজেই ব্রাহ্মণগণ সাধারণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অসাধারণ আধ্যাত্মিক চর্চ্চায় নিযুক্ত হইলেন। অতএব ব্রাহ্মণগণের জড়চিন্তা-পরিত্যাগের এই এক কারণ।

ইহাও ব্রাহ্মণগণের জড়তত্ত্বচর্চ্চা-পরিত্যাগের অন্যতর কারণ বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণগণ উচ্চ সুখাভিলাষী, তাঁহারা অবিনশ্বর সুখ এবং সর্ব্বদা দুঃখসংস্রবশূন্য দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কামনা করিতেন। তাঁহারা অস্থায়ী সুখ বা ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তিদ্বারা কৃতার্থতা বোধ করিতেন না। কাজেই তাঁহারা ঐরূপ সুখ বা দুঃখনিবৃত্তির উপায়-উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই তাঁহারা এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, যে জড়তত্ত্ব হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা ঐরূপ সুখাদি লাভ করা যায় কি না? এই বিচারে মতভেদ উপস্থিত হয়। একপক্ষ বলিলেন, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-প্রভাবে বাহ্য জড়বস্তু হইতে ঐরূপ সুখলাভ করা যাইতে পারে। ইহাদিগকে কর্ম্মবাদী বলা যায়। অপর পক্ষ বলিলেন যে, কেবল বাহ্য জড়বস্তু হইতে ঐরূপ সুখাদিলাভ করা যাইতে পারে না। একমাত্র জ্ঞানই তাহার প্রধান উপায়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াপ্রভাবে বাহ্য জড়বস্তু দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা সাধিত হইলে, বিচারদ্বারা আত্ম-জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই আত্ম-জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিত্যসুখাদিলাভ হইয়া থাকে। এই মতাবলম্বিগণকে জ্ঞানবাদী বলা যায়। কর্ম্মবাদিগণের মতের বিস্তৃত আলোচনার জন্য পূর্ব্ব মীমাংসা এবং জ্ঞানবাদিগণের মতের আলো-

চনার উদ্দেশ্যে উত্তর মীমাংসা ও সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন রচিত হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদিগণের পরস্পর মতভেদ আছে, সত্য; কিন্তু উভয় মতেই জড়তত্ত্বের মোক্ষোপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে। কর্ম্মবাদির মতে সাক্ষাৎভাবে এবং জ্ঞান-বাদির মতে পরোক্ষভাবে জড়তত্ব মুক্তির কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উভয় মতেই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদ্বারা বাহ্য জড়বস্তু হইতে একপ্রকার আভ্যন্তরিক শক্তি (অদৃষ্ট) উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি দ্বারা নিরন্তরভাবে সুখের উপভোগ হয়, ইহা কর্ম্মবাদের সিদ্ধান্ত। জ্ঞানবাদির মতে পূর্ব্বোক্ত আভ্যন্তরিক শক্তি দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা সাধিত হইলে, বিচার-প্রভাবে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অনন্তর উক্ত জ্ঞানদ্বারা নিত্যসুখাদির উপভোগ হইয়া থাকে। উভয় মতেই উক্ত আভ্যন্তরিক শক্তি-উৎপাদনে বাহ্য জড়পদার্থের হেতুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ইহা বিবেচ্য যে, বাহ্য বস্তু আভ্যন্তরিক শক্তি-উৎপাদনের কারণ হইতে পারে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করে। চার্ব্বাক ভিন্ন সকল দার্শনিকই এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। যদি এই সিদ্ধান্তই ঠিক হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম কি প্রণালীতে ফল প্রদান করে, তৎসম্বন্ধে বিচার করা কর্ত্তব্য। আমরা যতদূর অনুভব করিতে পারি, তাহাতে বুঝা যায় যে, কর্ম্ম করা মাত্রই তাহার ফল হয় না; কোন কর্ম্ম শীঘ্র ও কোন কর্ম্ম বিলম্বে ফল প্রদান করে। সুতরাং কর্ম্ম সাক্ষাৎভাবে ফলপ্রদানের কারণ হইতে পারে না; সেজন্য এইরূপ স্বীকার করা হইয়াছে যে, কর্ম্মদ্বারা একপ্রকার সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই সংস্কারের অপর নাম অদৃষ্ট। পূর্ব্বে এই সংস্কার বা অদৃষ্টকে আভ্যন্তরিক শক্তিনামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই শক্তি কর্ম্মবাদির মতে সাক্ষাৎভাবে এবং জ্ঞান-বাদির মতে চিত্তের নির্ম্মলতাসম্পাদন দ্বারা জ্ঞানোৎপাদন-ক্রমে মুক্তির কারণ।

ঐরূপ শক্তি স্বীকার না করিলে, কর্ম্ম করার বহুকাল পরে তৎফলভোগ হইতে পারে না; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তার একপ্রকার অদৃষ্ট-শক্তি উৎপন্ন হয় এবং সেই শক্তিপ্রভাবে সময়ান্তরে কর্ত্তা তত্তৎ কর্ম্ম-ফল ভোগ করেন।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে আমাদের দেশে বাহ্যজড় বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা

হইয়াছিল। অন্য কোন দেশেই এইরূপ চর্চ্চা হয় নাই। অন্যান্য দেশে বাহ্য পদার্থ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা বাহ্য-শক্তি প্রভৃতি উৎপাদনের চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু আমাদের দেশীয় মনীষিগণ যাগযজ্ঞাদি প্রক্রিয়াদ্বারা বাহ্যবস্তু হইতে আভ্যন্তরিক শক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইতিহাস প্রভৃতি পাঠে যেরূপ অবগত হওয়া যায়, তাহাতে এই বলা যাইতে পারে যে, তাহারা ঐরূপ চেষ্টা দ্বারা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। যদিও তাহাদের কৃতকার্য্যতা-সম্বন্ধে অনেকেই সংশয় করিতে পারেন, তথাপি আমি এই কথা বলিতে পারি যে, বাহ্যবস্তু হইতে বৈজ্ঞানিক যাগযজ্ঞাদি প্রক্রিয়াদ্বারা আভ্যন্তরিক শক্তি-লাভের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্য-মনীষিগণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগত হইতে অতি উচ্চস্তরে উত্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে কোনরূপ আপত্তি করার কারণ থাকিতে পারে না। আর একটী কথা এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে ইচ্ছা করি। কথাটি এই, বাহ্য জড়-চর্চ্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে আভ্যন্তরিক জড়তত্ত্বচর্চ্চার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। যোগশাস্ত্র এই বিষয়ের প্রধান সাক্ষী। যোগপ্রভাবে মনুষ্যগণ ঈশ্বরের মত অনন্তশক্তিসম্পন্ন হইতে পারিতেন। সেজন্য যোগচর্চ্চায় ব্রাহ্মণগণ বিশেষ আসক্ত হইলেন, সুতরাং বাহ্য জড়তত্ত্বচর্চ্চায় তাঁহাদের আসক্তির হ্রাস হইয়া পড়িল। বিশেষ মনোযোগসহকারে, এইসকল বিষয় বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে এ দেশে জড়বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চাই হইয়াছিল, কালবশে তাহার বিলোপ হইয়াছে এবং জড়তত্ত্ব-চর্চ্চার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্মদর্শন-চর্চ্চার সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুচরণ তর্ক-দর্শন-তীর্থ।

কোন ভারতপ্রবাসী ইংরাজের পত্র।

(নক্সা)

পাঁচ বৎসর কাল ভারত ভ্রমণ করিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি ও যেসকল বিষয় অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, আপনাদের ও সাধারণের অবগতি-হেতু অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া অদ্য তাহা সংক্ষেপতঃ বিবৃত করিতেছি। প্রথমেই আমার বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, আমার অভিজ্ঞতার ফল আপনাদের কোন কাজে লাগুক বা না লাগুক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের যে বিশেষ উপকারে আসিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ (India) দেশটি বেশ, নিতান্ত মন্দ নয়। শিকারের বেশ উপযোগী। আমি অদ্য কেবল বাঙ্গলা (Bengal) দেশের কথাই আপনাদের গোচর করিব। ভারতবর্ষে অনেকগুলি প্রদেশ আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গলা অন্য-তম। এ দেশে কোন প্রকার সংক্রামক বা সাময়িক ব্যাধি নাই। দেশের স্বাস্থ্য খুব ভাল। অনেকের স্বাস্থ্য খুব ভাল, অনেকের ভাল নয়। যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল, তাহারা বলিষ্ঠ এবং যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, তাহারা দুর্ব্বল। ইহারা অতি অপরিষ্কার দ্রব্য খায়, যথা—শাক, পাতা, গাছের শিকড় ইত্যাদি। এজন্যও অনেকের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়।

এখানকার অধিবাসীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—হিন্দু ও মুসলমান্‌ আমার বোধ হয় Hind you হইতে সংক্ষেপ করিয়া Hindu হইয়াছে এবং Myself-man হইতে Musalman হইয়াছে। এরূপ আখ্যাত হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। হিন্দুরা কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি সভ্যতা, কি আচার-ব্যবহার, সকল বিষয়েই পশ্চাৎপদ; এইজন্য বোধ হয়, কোন ইংরাজ পর্য্যটক এই হিন্দুজাতিকে লক্ষ্য করিয়া Hind you শ্লেষ ব্যবহার করিয়াছিলেন; তাহা হইতেই ইহারা এই আখ্যা গড়িয়া লইয়াছে। মুসলমানদেরও আখ্যা অত্যন্ত সম্ভ্রমসূচক ও আত্ম-গৌরব-প্রকাশক। মুসলমানেরা তাহাদের রাজত্বকালে ঐ হীন অসভ্য জাতি হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে বোধ হয় ঐ রূপ আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্যাপিও তাহাই বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ের নামের অর্থ ইহা ভিন্ন আর কিছুই প্রমাণিত হয় নাই।

হিন্দুদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য কিম্বা নিজস্ব কিছু নাই; কিন্তু আচারব্যবহার, ভাষা, সমাজ, বিবাহ, লোকমত সমস্তই পরস্পর বিভিন্ন। এমন কি তাহারা যাহাদিগকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করে, তাহাদের মধ্যেও পরস্পর ঐক্য দৃষ্ট হয় না। না হইবারই কথা; যেহেতু তাহারা বড় ধর্ম্মভীরু ও তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত Veda ভেদ। হিন্দুরা অতি মুর্খ, তাহাদের নিকট ভেদের অর্থ জানা সম্ভব নয় বলিয়া আমার বন্ধু ভারতীয় ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ও বিপুল পারদর্শী Mr. Shepherdএর নিকট জানিলাম যে, ভেদ মানে পৃথকীকরণ। এই জন্য হিন্দুরা পরস্পর পৃথক্।

হিন্দুদের মধ্যে আজকাল অনেকে কাপড় পরিতেছে; অনেকে কোট-প্যাণ্টও পরিতে শিখিয়াছে এবং আমাদের সমস্ত চালচলনও অনুকরণ করিতেছে। ইহা অবশ্য তাহাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই।

হিন্দুরা স্বভাবতই ঘোরতর কৃষ্ণকায়। ইহারা পৌত্তলিক। ইহাদের উপাস্য দেবদেবীও এই জন্য কাল,—যেমন কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদি। হিন্দুদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই, পুত্র বা কন্যা মুল্য লইয়া বিক্রীত হয়। আমার বোধ হয়, হিন্দুদের কোন পূর্ব্বপুরুষ আফ্রিকা হইতে এদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। সেইজন্য ইহারা এত কৃষ্ণকায় এবং এইরূপ পুত্রকন্যাবিক্রয় Slave-trade বা দাস-ব্যবসায়ের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।

ইহাদের ভাষা অনার্য্যজাতির ভাষার মত দুর্ব্বোধ্য। এক্ষণে ইহারা ইংরাজী, পার্সী ও আরবী ভাষার সাহায্যে একটি ভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এতদিনে ইংরাজ-শাসনে এই অনার্য্য জাতির চক্ষু ফুটিয়াছে ও নিজেদের সামাজিক অবস্থা উন্নত করিতে যত্নবান্ হইয়াছে।

হিন্দুদের আরও একটি ভাষা ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। ইহা ইতরজাতীয় একটি দুর্ব্বোধ্য ভাষা। Prof. Max Muller অনুগ্রহ করিয়া ঐ দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত 'ভেদ' নামক পুস্তকখানিকে অনুবাদ করেন; এক্ষণে সকলে সেই অনূদিত 'ভেদ'ই পড়িয়া থাকে। সে সংস্কৃত ভাষা এখন আর দৃষ্ট হয় না।

বাঙ্গলা দেশের সকলেই বড় গরীব; তাহারা এক ফার্দিংএ মোট বহে, আধ পাউণ্ডে পূর্ণ একমাস কাল সহিস, চাকর, বেহারা ও আর্দ্দালির কাজ করে; এবং তথা-কথিত ভদ্রলোকগণও এক পাউণ্ড কি দুই পাউণ্ড বেতনে দৈনিক ১২ ঘণ্টা

হিসাবে পূর্ণ এক মাস কাল আফিসে কাজ করে। সুতরাং সামান্য অর্থের বিনিময়ে যে, তাহারা সমস্ত কুকার্য্যই করিতে পারে, এ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়।

ইহারা খৃষ্টান ধর্ম্মকে বেশ বুঝিয়াছে। এজন্য ভারতবর্ষে খৃষ্টান ধর্ম্মের যেমন শীঘ্র প্রচলন হইয়াছে, অন্য কোন দেশে সেইরূপ হয় নাই। অতএব তাহারা যে বুদ্ধিমান্, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহারা এতদিন পশুর মত ছিল বটে। ইহারা অস্ত্রবিদ্যা জানেনা, এইজন্য শীকার করা ভালবাসে না; বরং বলে হিংসা করা ভাল নয়।

ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রগুণে ,অর্থাৎ ভেদের গুণে ইহারা পরস্পর অত্যন্ত অসূয়া-পরায়ণ; এইজন্য ইহারা (এবং অন্যান্য সকল ভারতীয় জাতিই) অতি সামান্য কারণে বিবাদ করে ও সেই বিবাদ-মীমাংসার জন্য আমাদের বিচারদ্বারে আসে।

ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র একখানি আছে বটে, কেবল তাহার নামোল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাতে লিখিত উপদেশের দুই একটি নমুনা দিব। "ভেদ" বলে যে, মদ্যপান ও জীবহিংসা করা উচিত নহে; অর্থ অনর্থের মূল; নিরামিষ ভোজন করাই বিধেয় ইত্যাদি। কিন্তু আমি দেখিয়াছি আজকাল অনেক হিন্দুই বিলাতী মদ্য পান করিতেছে, শীকারও করিতেছে, অর্থের জন্য লালায়িতও হইয়াছে এবং পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিতেও কিছু বাকী নাই। বোধ হয় ভারতের প্রস্তুত মদ্য ভাল নয় (আমিও জানি বাস্তবিক ভাল নয়) বলিয়া মদ্যপান নিষিদ্ধ; শীকারোপযোগী কোন অস্ত্রও দেশে ছিল না এবং ইহারা শীকার করিতেও জানিত না বলিয়া জীবহিংসা নিষেধ করা হইয়াছে, কারণ না জানিলে শীকারে অনিষ্টেরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; এতদিন ইহারা অর্থের প্রয়োজন বুঝে নাই বলিয়াই উহা অনিষ্টের মূল কথিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত পাক করিতে না জানিলে মাংসাদি খাইলে অসুখ করিবে,—তাহা অপেক্ষা না খাওয়াই বিধেয়, এইজন্য নিরামিষ-ভোজনই বিধি ছিল। এক্ষণে যে কারণে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, সেসমস্ত অন্তরায় অন্তর্হিত হইয়াছে, হিন্দুরাও আর সেই পুরাতন শাস্ত্র না মানিয়া অবশ্য স্বাধীন-বুদ্ধি-প্ররোচিত সভ্যতারই পরিচয় দিয়াছে ও দিতেছে।

হিন্দুরা খৃষ্টান আদর্শে একটি নব ধর্ম্মেরও সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা আমাদেরই স্বদেশবাসী Mr. R. M. Rae.

হিন্দুদের কথা একরকম আপনাদের গোচর করিলাম, এইবার মুসলমানদের কথা বলিয়া অদ্য প্রবন্ধ শেষ করিব।

মুসলমান্ (Myself man) বা হাম্‌বড়া জাতির আদিম নিবাস বোধ হয় ইয়ুরোপে ছিল। ইহারা সকলেই একধর্ম্মাবলম্বী, সকলেই একসঙ্গে আহার করিতে বা আদান-প্রদান করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করে না। ইহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও তেজস্বী। অবশ্য হইবারই কথা, কারণ ইহারা ইউরোপীয়; ইহাদিগকে এরূপ ধারণা করিবার আরও কারণ আছে, যেমন বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার। আমরা প্যান্ট্‌লন পরি, ইহারা প্যান্ট্‌লনের মতই (কিন্তু ঠিক নয়) এক রকম পায়জামা পরে। আমরা হ্যাট পরি, তাহারা ক্যাপ পরে; আমরা টেবিলে খানা খাই, তাহারা টেবিলের অভাবে কাপড় পাতিয়া খানা খায়; এইরূপ অনেক বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। তবে অধিকাংশই রূপান্তরিত হইয়াছে,—সে কেবল দেশ ও কালভেদে। ইহাদের বর্ণও গৌরবর্ণ। ইহারা আমাদের আফিসে আর্দ্দালী (Orderly), রন্ধনগৃহে বাবুর্চ্চি, দোকানে দর্জ্জি,—সকল বিষয়ে আমাদের নিত্যসহায়। ইহারা যে আমাদের প্রিয়তমা পত্নীস্বরূপ, একথা স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ঠিকই বলিয়াছেন। ইহারা রাজার জাতি, ভারতবর্ষে হিন্দুদের উপর অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছে; রাজার জাতির সম্মান জানে।

এজাতিও একেশ্বরবাদী। তবে তাহাদের উপাস্য দেবতার নাম প্রকাশ করে না, এইজন্য বলিতে পারিলাম না। ইহারা হিন্দুর সহিত বেশ সখ্য-ভাবাপন্ন—আগে যদিও ছিল না, তবে আমাদের শাসনের সাম্যগুণে হইয়াছে বলিতে হইবে।

ইহাদের স্ত্রীগুলিও পরম রূপবতী ও গুণবতী। এমন কি আক্‌বর দেবী নাম্নী একজন মুসলমান্ রমণী এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্য বিশেষ প্রশংসার সহিত শাসন করিয়াছিল। শেষে তাঁহার পুত্র নুরজাহানের রাজত্বকাল হইতেই মুসলমান্ রাজত্বের ধ্বংসের সূত্রপাত হয়। তাহার পর প্রায় দুইশত বৎসর এদেশে অরাজকতা ছিল। কেবল হিন্দু ও মুসলমানে যুদ্ধ হইতেছিল। এইজন্য

ডাকাতি, লুণ্ঠন ও অন্যান্য বহুল অত্যাচার সংসাধিত হইত। এ সকল কথা ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। পরে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা যখন প্রথম এদেশে উপনিবেশ ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিলেন, তখন উভয় দলই বিব্রত ও বিধ্বস্ত হইয়া রাজমুকুট ইংরাজের শিরে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইল। কিন্তু এই সংবাদে লুণ্ঠনকারীগণের স্বেচ্ছাচারে বাধা পড়িল বলিয়া তাহারা যুদ্ধাভিযান করিল। যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধের নাম পলাশীর যুদ্ধ; ভারতবাসীরা বলে হলদীঘাটের যুদ্ধ।*

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

শুধু কি সময়ে বদ্ধ রহিবে হৃদয়!
একি স্থানে একি ভাবে হে রহস্যময়,
তুমি কি আবদ্ধ আছ? যে দিকেতে চাই
তোমারি মহিমা শুধু দেখিবারে পাই।
কোথা তুমি?—আছ তুমি, অনল, অনিলে,
রবি, শশী, তারকায়, ভূধরে, সলিলে;
সর্ব্বত্র সকলভাবে রয়েছ ঘেরিয়া।
অবোধ বাহিরে দেখি, দেখি না চাহিয়া
অন্তরে রয়েছ মম অন্তরের সার
মঙ্গল-কল্যাণে ঘেরি হৃদয় আমার।
এই দয়া কর, বিভু, এ দু'টি নয়ন
পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, নেহারি যখন
যা' কিছু সম্মুখে মোর দেখি তোমাময়,
তোমারি পরশ লভে এ ক্ষুদ্র হৃদয়।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

---

* নানাকারণে এই প্রবন্ধের অনেক অংশ পরিবর্জ্জিত করিতে হইয়াছে। কি করিব, উপায়ান্তর নাই। অর্দ্ধঃ-সম্পাদক।

সন্ধ্যা।

গাথা।

আয় মা, আয় গো সন্ধ্যে—আদরিণী মেয়ে!
—রহি' রহি' দুখিনী মা উঠিতেছে গেয়ে।
নিবিড়-তিমির-রাশি
ধরায় জড়ায় আসি';
সুধীর সমীরে ভাসি'
যায় ফুলরেণু;
ভানুর কিরণগুলি
মহাঘুমে পড়ে ঢুলি',
সুখদ সুতান তুলি'
গায় গোপবেণু।

আয় মা, আয় মা সন্ধ্যে—মায়াবিনী মেয়ে!
আয় গো মায়ের বাছা! মা'র কোলে ধেয়ে।
—কাঁদিতেছে কন্যাহারা
শোকে পাগলিনীপারা,
অজস্র অশ্রুর ধারা
পড়িতেছে গলি'।
তবু সন্ধ্যা আসিল না,
আধ' আধ' ভাষিল না,
মা'র দুঃখ নাশিল না,
আহা, মা মা বলি'!

খালি ক'রে মা'র কোল চ'লে গেছে মেয়ে;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি মা'র বসি' পথ-চেয়ে!
কেহ যদি দূরে ডাকে 'মা',
অনিমিখে চেয়ে থাকে মা;
কত খাদ্য তুলে রাখে মা—
বাছনির তরে।
ও মা সন্ধ্যে, আর কিরে
এ ভবে আসিবি ফিরে?
—ডাকিবি গো জননীরে
সে সুমিষ্টস্বরে?

কে আসিবে? কোথা সন্ধ্যা অভাগিনী মা'র?
প্রতিধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে করে হাহাকার।
নদী করে ছলছল,
সিক্ত শ্যামদূর্ব্বাদল,
হিমবিন্দু টলমল
নলিনীর দলে।
আলুথালু কেশপাশ,
আলুথালু বেশবাস,
ফেলে মাতা দীর্ঘশ্বাস
পড়ি' ভূমিতলে।

বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, অস্ত গেল রবি;
গৃহদ্বারে বসি' মাতা বিষাদের ছবি।
রুধিরাক্ত শাখিশির,
রুধিরাক্ত নদীনীর,
রুধিরাক্ত ধরিত্রীর
যাহা কিছু সব!
শ্বসে বায়ু থাকি' থাকি,'
শতদল মুদে আঁখি,
বারেক কূজনি' পাখী
হইল নীরব।

হাট ক'রে ফিরে ঘরে পথিক দু'জন,
'সন্ধ্যে এল'—বলি দোঁহে চলে হনহন।
সন্ধ্যে এল শুনি', হায়,
মাতা চারিভিতে চায়;
'সন্ধ্যে এল?—আয় আয়'
—বলি' মাতা হাসে!
সে অবধি দিবাশেষে
বসে মা দুয়ারে এসে;
সন্ধ্যা হ'লে উঠে হেসে
উন্মাদ উল্লাসে!

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

কর্ম্মফল। *

কর্ম্ম জগতের জীবন। জগতের সমস্ত জড় এবং চেতন পদার্থ কর্ম্ম-নিয়মে আবদ্ধ। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র কি এক অখণ্ড কর্ম্মে আবদ্ধ থাকিয়া সমস্ত সৌরপরিবারসহ অবিশ্রাম চলিয়াছে। জগতপাতা জগদীশ্বর কর্ম্মের আকর্ষণে নিজেকে পর্য্যন্ত আবদ্ধ করিয়া সমস্ত চরাচরে কর্ম্মের মহিমা-প্রচার করিতেছেন।

সকল বস্তুরই দুইটি দিক আছে। সকল কার্য্যেরই সীমা এবং পরিণাম আছে। সীমা-পরিণাম-হীন করিয়া ভগবান কিছুরই সৃজন করেন নাই। কোনও বিষয়ের চরম কাল উপস্থিত না হইলে তাহার পরিণতি ঘটে না। এই পরিণতি আবার দুই প্রকার, জীবন এবং মৃত্যু—উত্থান এবং পতন। জগতের কর্ম্ম চরমে আসিয়া পরিণতির প্রতীক্ষা করে। সেই কর্ম্মপরিণতিকে কর্ম্মফল বলে। কর্ম্ম এবং ফল সমভাবে কার্য্য করিয়া জগতের গতি এবং পরিণতি অহরহঃ প্রচার করিতেছে। এই কর্ম্ম এবং ফলের হস্ত হইতে ভগবান নিজেকেও অব্যাহত রাখেন নাই, তাই কর্ম্মফল অখণ্ডনীয়।

এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে দর্শন-শক্তি লইয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ কার্য্যে আমরা লিপ্ত হই, যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ মান-অপমান, ছোটবড় বিবাদ-বিসম্বাদ অহরহঃ আমাদের কর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া জগতের জটিলতাময় কর্ম্মরহস্যকে আমাদের দর্শনপথের গোচর করে, যে রহস্যের অদৃশ্য শক্তি দৃশ্য জগতে অধিক ক্ষমতা বিস্তার করে, যাহার দর্শন এখনও দর্শন-শাস্ত্রের অতীত, সেই দুজ্ঞেয় কর্ম্মরহস্য তিন ভাগে বিভক্ত থাকিয়া কালের পথে যথাক্রমে তৃপ্তি, অশান্তি এবং আশা প্রদান করিয়া, আমাদিগকে জীবন এবং মরণের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। পুরাণ এবং ইতিহাস ইহারই কীর্ত্তি-প্রচারে ব্যস্ত, দর্শন এবং বিজ্ঞান ইহারই তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যাপৃত। রামচন্দ্র কোথায় রাজা হইবেন না বনে গমন করিলেন! বিধাতৃ-বিধানে সেই সসাগরাপৃথিবীর অধীশ্বর বল্কল-পরিধানে ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। দশরথের ব্রহ্ম-শাপ ফলিল, ঋষি-বালক-হত্যার

---

* গত ২৯এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার দেবালয়ের মাসিক অধিবেশনে লেখক দ্বারা পঠিত।

কর্ম্মফলে পুত্রবিচ্ছেদে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। কর্ম্মফল এইরূপে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে নিজ প্রভাব-বিস্তার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় রত।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, একজন পাপাচারী আজীবন পরস্বাপহরণ, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি দ্বারা কেবল উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে—যত পাপাচার, অনাচার কেবল তাহাকে মঙ্গলের পথেই টানিতেছে, আর একজন ভগবানে আত্মসমর্পণকারী ধর্ম্মভীরু লোক সকল প্রকার নিষ্ঠার মধ্যে আপনাকে চালিত করিয়াও দিনান্তে একমুষ্টি অন্নসংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। এ অর্থে ভগবানের বিচারের প্রতি সন্দেহ আসে—কর্ম্মফলে অবিশ্বাস জন্মে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে এই সুনিয়ন্ত্রিত ভগবানের রাজ্যে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের কারণ থাকে না। স্বেচ্ছাচারীর উন্নতি জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের কথা-প্রচার করিয়া জন্মান্তরের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটনের সাহায্য করিতেছে। বিশ্বাস-ঘাতক পাপাচারী পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে সমস্ত সুনীতিকে পদদলিত করিয়াও এজন্মে ভোগ-বিলাসে আপনার সঞ্চিত পুণ্যরাশির ক্ষয় করিয়া পথের ভিখ রী সাজিতেছে। ধনী যেমন যদিচ্ছা ব্যয়ে নিজ অর্থ নষ্ট করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়ায়, উহার দশাও সেইরূপ হইতেছে। আর ঐ ধর্ম্মভীরু দরিদ্র পূর্ব্বজন্মে কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখে নাই, তাই এজন্মে এমন নিষ্ঠার মধ্যেও এত কষ্টভোগ করিতেছে। এইখানে জন্মান্তর মানিতে হইবে। নচেৎ একজন ধনী আর একজন দরিদ্র, একজন কদাকার আর একজন পরমসুন্দর পরে পরে রক্ষা করিয়া ভগবান একদেশদর্শী স্বার্থপর আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। কর্ম্মফল মানবের সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিয়া ন্যায়-অন্যায়ের বিচারফল প্রত্যক্ষরূপে মান-বের নিকট ধরিয়া—ভগবান যে স্বার্থপর নহেন, তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। এই ন্যায়ের রাজ্যে সাম্যের আদর্শ অতীতে সমর্পণ করিয়া দিয়া, বর্ত্তমানের স্বার্থদ্বন্দ্বে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া, ভবিষ্য জীবন অন্ধকারাবৃত করিয়া, শেষে শ্মশানের পথে জীবিতের দাহ এবং মৃতের দাহ তুলনা করিতে করিতে, চিতা-শয্যা-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, কর্ম্মফলের অনুশোচনায় কাঁদিতে কাঁদিতে আমরা পরলোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াই, আমাদের রিক্ত হস্ত, বিবর্ণ দেহ, মলিন মুখ সে স্বর্গরাজ্য-প্রবেশের অধিকার-পায় না, তাই পুনরায় কর্ম্মজগতে জন্মান্তরলাভ করিয়া কৃতকর্ম্মের ফলভোগের সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন কর্ম্মে জড়িত হইতে থাকি। কর্ম্মের ফল-

ভোগের জন্য এমনই করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বিবর্ত্তনের পথে সমস্ত সৌরপরিবার-সহ পৃথিবী ভাঙ্গিয়া গড়িয়া চলিয়াছে। চন্দ্র এমনই করিয়া তেজ-রহিত, পৃথিবী এমনই করিয়া ধ্বংশের পথে প্রধাবিত। এইরূপে কত নক্ষত্র কক্ষচ্যুত, কত গ্রহ-উপগ্রহ আত্মবিকাশে নূতন জীবনের পথে আবির্ভূত। সৃষ্টি-রহস্য কর্ম্ম-রহস্যকে আরও জটিলতার পথে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে।

সংসারী ধনসঞ্চয়ের আশায় এবং পুত্র-পরিবারের সুখবর্দ্ধনের জন্য আজীবন আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়া শেষে ধন বা সুখের মুখ দেখিতে না পাইয়া যখন হা-হুতাশ করিতে থাকে, তাহার আপনার বলিবার যাহা কিছু যখন তাহার মায়া-মমতার অপেক্ষা না রাখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সংসার যখন কোনও সুখ বা আমোদে তাহাকে ভাবে না, তাহার কোনও পরামর্শের প্রতীক্ষা করে না, তখনও সে আপনার কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহভার এই অকৃতজ্ঞ সংসারের উপর রক্ষা করিয়া শান্তির অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তখনও সে ইহকালের কর্ম্মফল এইরূপে পরে পরে ভোগ করিয়া চলিয়া যাইবার কথা বিশ্বাস করে না, তখনও সে স্বার্থপর সংসারের কেনা-বেচার মধ্যে উপহাস-তাচ্ছিল্য লইয়া ঘুরিয়া মরে; শেষে তাহার দুর্ভাগ্য জীবনের যবনিকা পতন-সময়ে পরকালের কথা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠে, বিনা সম্বলে—বিনা পরিচয়ে সেই অচেনা-অজানা লোকে দীন-হীন-বেশে চলিয়া যায়। মরুভূমে মায়ামরীচিকা-দর্শনে পথিক যেমন দিশাহারা হইয়া পড়ে, সংসারে ভোগের পথে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া মানব তেমনই ঘৃণা-উপভোগ করিয়া কর্ম্মের কঠোরতা উপলব্ধি করিতে করিতে চক্ষের জলে ভাসিয়া চলিয়া যায়। কর্ম্মফল তীব্র পরিহাসে এমনই করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে মৃতের জন্য অগ্নিশয্যা রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল, এমনই করিয়া নল রাজা অদৃষ্ট পরীক্ষায় পথের ভিখারী সাজিয়াছিলেন, ধর্ম্মের আদর্শ রাজা যুধিষ্ঠিরও কর্ম্মপরীক্ষায় পরাজিত হইয়া বনবাসের কষ্টভোগ করিয়াছিলেন।

পিতামাতার সন্তানের প্রতি যে কর্ত্তব্য, স্বামীস্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের প্রতি যে কর্ত্তব্য, নিজপরিবারে নিকট আত্মীয়ের প্রতি নিজের যে কর্ত্তব্য, তাহা রিপুর তাড়নায় সকল সময় ঠিক প্রতিপালিত হয় না। তাই অপকর্ম্মের দ্বারা সংসার এমন হাহাকারে ভরিয়া যায়, বিষময় কর্ম্মফল আগ্নেয়গিরির গৈরিক

নির্ঝরের ন্যায় কেবল হলাহল উদ্গীরণ করিয়া গরল প্রবাহে পৈশাচিক অভিনয়ের সৃষ্টি করে। ভগবানের সৃষ্ট সংসার বিষপূর্ণ নহে। মানব তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া কর্ত্তব্যের অবহেলায় সংসারকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে।

পৃথিবী যেমন বহু সৌরপরিবারে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কার্য্যকারণের জটিলতা-ময় রহস্যস্তর ভেদ করিয়া অবিরত ছুটিয়াছে, মানবও সেইরূপ বহুপরিবারের মধ্যে জড়িত থাকিয়া সংসারের অনন্ত কর্ম্মের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম সকল মিলাইয়া দিয়া, আপনার গতি ও পরিণতি দর্শন করিতে করিতে হাসি ও অশ্রুকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তব্য পথে চলিয়াছে। কর্ত্তব্যের পিচ্ছিল পথে পিতা কখন সন্তানকে অতিতাড়না করিয়া কখন বা অতিমাত্র আদর দিয়া আপনার পদস্খলনের সহিত বালকের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া দিয়া, আত্মকর্ম্মের ফলস্বরূপ উত্তরকালে তাহার ভক্তি-প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইয়া দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাভোগে, জীবনের অবেলায় অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইতে দেহপাত করিতে বাধ্য হয়েন। পুত্রের নিকট যে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া, যে সংযমের আদেশে তাহার চিত্ত গঠিত করা উচিত ছিল, সে কর্ত্তব্য পালন না করিয়া যে পাপাচার করিয়াছেন, তাহার ফলস্বরূপ উত্তরকালে সেই অসংযতচিত্ত পুত্র পিতৃপরিবারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পিতাকে ভুলিয়া মায়ের কোল ছাড়িয়া, ভাইভগ্নীকে দূরে ফেলিয়া দিয়া এই নির্জ্জন সংসারে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যায়। পিতার উপদেশ, মায়ের ক্রন্দন তখন কার্য্যকর হয় না, নির্দ্দয় সংসারের নিষ্ঠুর আঘাত কেবল নিজে সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নিরাশ্রয়ে পুত্রকন্যা লইয়া বুক পাতিয়া দাঁড়ায় এবং এই বিরাট বিশ্বপুরুষের সহিত শিক্ষার অভাবে মিশিতে না পারিয়া একেলা সেই উন্মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া মর্ম্মপীড়ায় কেবল চাপিয়া চাপিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে থাকে। একদিকে পিতার ব্যর্থ কর্ম্মের বিষময় ফল পিতৃসংসারে যেমন হলাহল ঢালিয়া দেয়, অন্যদিকে তেমনই পুত্রের ব্যর্থ শিক্ষা পিতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে জীবন-মধ্যাহ্নে জীবনের খেলা ভাঙ্গিয়া মরণের ক্রোড়ে কর্ম্মফলের সমাপ্তি করিয়া বিশ্রামলাভের চেষ্টা করে। দাম্পত্য জীবনের সুখময় ভাব এইরূপে উচ্ছৃঙ্খলতায় নষ্ট করিয়া, ভোগবিলাসমাত্র

সার করিয়া নবদম্পতী উদ্দামভাবে ছুটিয়া চলে এবং পরিশেষে "শৈবলিনীর অগাধ জলে সাঁতার"-দর্শনে আত্মহারা দম্পতী, গৃহস্থ পরিবারে রঙ্গাভিনয়ের সৃষ্টি করিয়া প্রতাপ এবং শৈবলিনীর ন্যায়, ঔপন্যাসিক নায়ক-নায়িকার মত গৃহ-শান্তি এমন নষ্ট করিয়া ফেলে এবং তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। তখন তাহারা জীয়ন্তে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট কাল আত্মকর্ম্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে থাকে এবং এ পৃথিবীতে কেবল মরণের অপেক্ষায় বসিয়া রয়। কিন্তু মৃত্যুর পথেও তখন তাহার বিশ্রামের উপায় থাকে না। জন্মগত সংস্কার তাহাকে যে দুঃখের পথে টানিয়াছে, তাহার ফলভোগের জন্য আবার সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। এইরূপে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির পথে পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, আত্মীয়-পরিজনে কেবল অপকর্ম্মের আয়োজনে ব্যস্ত থাকিয়া, ধরাভরা হাহা-কারের অনুষ্ঠান করিয়া দিয়া, দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে। জগত এমনই করিয়া পশু কর্ম্মের মধ্য দিয়া কতকাল ঘুরিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

ক্রমশঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ।

আগরা।

সাম্রাজ্যের আসন আকবরাবাদ প্রদেশ।

আগরা প্রথমে বিয়ানা পরগণার অন্তর্গত একটি গ্রাম ছিল। রাজা সিকন্দর লোদী (১৪৮৮-১৫১৬ খৃঃ) ইহার মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে একটি সুন্দর শহরে পরিণত করিয়া এখানে স্বীয় রাজধানী স্থাপিত করেন।* পরে এই শহর বাদলগড় † নামে পরিচিত হয়। অবশেষে সম্রাট আকবর

---

* লোদীদিগের আগরা যমুনার বামতীরে এবং আকবরের আগরা দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। (আ ২।১৮০)

† ইলিয়টের মতে ইহা আগরার দুর্গ (৫।৪৯১) ও গোয়ালীয়র দুর্গের অংশ-বিশেষের (৫।১৩) নাম।

ইহাকে স্বীয় শাসনাধীন ভারতের কেন্দ্রস্থল জ্ঞান করিয়া এখানে এক অতি দুর্ভেদ্য দুর্গনির্ম্মাণ করেন। তদবধি এই অদ্বিতীয় বিস্তৃত বিশাল শহর আকবরাবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। পর্য্যটকেরা এরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ বা বিস্তৃত শহর অতি অল্পই দেখিয়াছেন। যমুনা এই শহরের ভিতর দিয়া চারি ক্রোশ পথ গিয়াছে। উহার উভয় পার্শ্বে বহু উচ্চ প্রাসাদ ও বহু মনোরম পল্লী নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বদেশের লোকই এখানে বাস করে। সমস্ত পৃথিবীর জিনিষই এখানে পাওয়া যায়। নানা রকম ফল, বিশেষতঃ পারশ্য ও তুর্কীস্থানের ফুটি, বহু প্রকারের ফল ও সুন্দর পাণ এখানে পাওয়া যায়। বাতাস মনোরম, এখানকার শিল্পীরা আপনাপন শিল্পে বিশেষ পারদর্শী; পাগড়ীতে ও অন্যান্য নানাপ্রকার কাপড়ে সোণা-রূপার কাযই এখানে খুব ভাল হয়। রাজ্যের অপরাপর অংশের ও দূর দেশের বণিকেরা এখানে আসিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লাভবান হয়। সংক্ষেপতঃ, এই শহরে সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারই আছে। এখানে বড় বড় সাধুর ও খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সমাধিমন্দির আছে। সম্রাট জালাল-উদ্দিন আকবর * ও শাহব-উদ্দীন মহম্মদ শাহ জাহানের † উজ্জ্বল সমাধি-মন্দির শহরের নিকটেই শোভা পাইতেছে।

বিয়ানা ‡ পূর্ব্বে একটি বড় শহর ছিল। এখানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল; তাহাতে বিদ্রোহীদের বন্দী করিয়া রাখা হইত। এখানকার আপেল (Wood-apple) ও ফুটি চমৎকার এবং আম কখন কখন ওজনে এক সের পর্য্যন্ত হয়।

শিক্রি বিয়ানার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ইহা আকবরাবাদ হইতে বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। খ্যাতনামা সাধুদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু শেখ সলিমের § কথামত সম্রাট আকবর একটি প্রস্তর-দুর্গ, সুদৃঢ় গৃহরাজি, মসজিদ-সমূহ, বিদ্যালয়সমূহ ও কতিপয় পল্লী প্রস্তুত করিয়া ইহার নাম রাখেন ফতেপুর, ও ইহাকে দেশের অন্যতম রাজধানী করেন। ইহার নিকটে একটি প্রকাণ্ড

* আগরা শহর হইতে উত্তর পশ্চিমে ৫ক্রোশ দূরে শিকান্দ্রায়।

† তাজমহলে।

‡ আজকাল রাজপুতানার ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত। আগরা হইতে ৫০মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। (ইম্পিঃ ২।৩১৮)

§ শেখ সলিম-ঈ-চিস্তী। ৯৭৯ হিজরীতে ইনি দেহত্যাগ করেন।

দীঘি আছে, তাহা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে দুই ক্রোশ, ইহা সাধারণের বহু উপকারে আসে। তাহার তীরে একটি রাজকীয় মঞ্চ, কতিপয় উচ্চ গম্বুজ (turrets), হস্তি-যুদ্ধের ক্ষেত্র ও চৌগন * খেলিবার জমি আছে। সকল আকারেরই স্তম্ভ, সূক্ষ্ম সমতল প্রস্তরখণ্ড ও গৃহ প্রস্তুত করিবার অন্যান্য উপকরণ এখান হইতে সংগৃহীত হয়।

গোয়ালীয়র একটি জনবহুল স্থল। এখানকার আবহাওয়া খুব ভাল। ইহার দৃঢ়তা ও দুর্ভেদ্যতা সর্ব্বজনপরিচিত। শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের এখানে বন্দী করিয়া রাখা হয়। ইহার অধিবাসীদের বাক্‌পটুতা, সংগীতজ্ঞদের গীত, গায়কদের চিত্ত-হরণ-ক্ষমতা ও রমণীদের সৌন্দর্য্য চিরপ্রসিদ্ধ। এই জিলার কোন কোন স্থলে লৌহের খনি আছে। এই শহরে সাধু শেখ মহম্মদ ঘাউসের † সমাধি-মন্দির আছে।

কল্‌পী যমুনার তীরবর্ত্তী শহর। এখানে বহু সাধুর সমাধিক্ষেত্র আছে। এখানকার মিছরি প্রসিদ্ধ। এখানে একটি গুহা আছে, সেখানে তাম্র ও Turquoiseএর খনি আছে। কিন্তু সেগুলিতে আয়ের অপেক্ষা ব্যয় অধিক।

মথুরা যমুনার তীরবর্ত্তী একটি প্রাচীন শহর। ইহা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ও হিন্দুগ্রন্থাবলীতে বহুমান্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার সৃষ্টি অবধিই ইহা তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অধুনাতন কালে কেশব রায়ের ‡ মন্দির বিখ্যাত ছিল, কিন্তু সম্রাট আলমগীরের (ঔরঙ্গজেবের) আদেশানুসারে ইহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ইহার স্থানে এক মসজিদের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সেনাপতি আবদু-ন-নবী খাঁ যমুনার তীরে এক সুন্দর সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করাইয়া শহরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ও অধিবাসীবৃন্দের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। এই স্থান

* হকি বা পোলো খেলা।

† ৯৭০ হিজরীতে (১৫৬২ খৃঃ) যিনি দেহত্যাগ করেন। আকবরের শাসনকালে তাঁহার উপর ইঁহার প্রভূত প্রভাব ছিল। (অল বদৌনী ২।২৮, ২।৬২)। সমাধি-মন্দিরের জন্য ফরগুসন ৫৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে কেশব রায়ের মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া তৎস্থলে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হয়। (ইম্পি ১০।৫৪) ইলিয়ট এই মন্দিরের নাম লিখিয়াছেন ডেরা কেশু রায়। তাঁহার মতে ইহার নির্ম্মাতা নরসিংহ দেব বুন্দালা। (৮।১৮৪)

বিশ্রান্ত আখ্যা পাইয়াছে। শহরের মধ্যভাগে তিনি একটি উচ্চ মসজিদ * নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার খ্যাতি বাড়াইয়াছেন।

কনৌজ গঙ্গার তীরবর্ত্তী এক প্রাচীন শহর। ইহার জলবায়ু ও ফল বেশ চমৎকার। কনৌজের অন্তবর্ত্তী মাখনপুরে † খ্যাতনামা সাধু শেখ বদী-উদ্দীনের ‡ সমাধিক্ষেত্র আছে। ইনি মদর ও শাহবাজ নামেই অধিকতর পরিচিত। উচ্চ-নীচ বহু লোকেই ইহার প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। প্রতি বৎসরই স্বর্ণপতাকা হস্তে অসংখ্য লোক কত দূর দেশ হইতে আসিয়া এখানে উপস্থিত হয়। সেই সময় তাহারা এখানে নানারূপ মানত করিয়া যায়। কয়েকদিন ধরিয়া এখানে অত্যন্ত জনতা হয়। সে কেমন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই মহাত্মা সুলতান ইব্রাহিম শরকীর আমলে (১৪০১-১৪৪০) খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

এই প্রদেশে দুইটি নদী আছে। একটি যমুনা। তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। অপরটি চম্বল। তাহা মালবের অন্তঃপাতী হসিলপুর হইতে বহির্গত হইয়া আগরা হইতে প্রায় আট ক্রোশ দূরে বহিতেছে। তাহা ভদৌড় রাজ্য ও ইরিজ ¶ সরকারের মহলনিচয়ের মধ্য দিয়া গিয়া শেষে কল্‌পীর অন্তঃপাতী আকবরপুরের নিকটে যমুনায় পড়িয়াছে।

সংক্ষেপতঃ এই প্রদেশের পূর্ব্বে ঘটমপুর, উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে চন্দেরী, পশ্চিমে পলওয়াল। এলাহাবাদের অন্তর্গত ঘটমপুর হইতে (শাহজাহানাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত) পলওয়াল পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ১৭০ ক্রোশ। কনৌজ হইতে (মালবের অন্তর্গত) চন্দেরী পর্য্যন্ত প্রস্থে ইহা ১০০ ক্রোশ। ইহার সরকার ১৪টি। সেগুলি এই—আকবরাবাদ, বারী, আল্‌ওয়ার, টিজারা, ইরিজ, কল্‌পী, সতায়ুন, কনৌজ, কোল, নার্‌ওয়ার, মণ্ডলপুর (মণ্ডলের) গোয়ালীয়র ও আরও

* জুমা মসজিদ, ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। (ইম্পি ১০।৮৪)

† অধুনা কানপুর জেলার অন্তর্গত। (ইম্পি ৯।২১৫)

‡ ইঁহার জীবনী জন্য (আ ৩।৩৭০) দ্রষ্টব্য। এসিয়াটিক সোসাইটির ১৫৬ ডিঃ সংখ্যক পুঁথিতে এই যায়গায় ভুল আছে। সরকার।

¶ ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারে আছে, ইরিচ (ইম্পি ৭।২৩) অধুনা ঝাঁসি জেলার অন্তর্গত। ইহা বেটোয়ার সন্নিকট, চম্বলের নহে।—সরকার।

দুইটি। + ইহার মহল-সংখ্যা ২৬৮। ইহার রাজস্ব ৯৮ কোটি ১৮ লক্ষ দাম (২,৪৫,৪৫,০০০৲টাকা) ও ৬৫হাজার ৮শত আম।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত।
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাঁওতালপরগণার পল্লীজীবন।

১

সাঁওতালপরগণার অধিবাসিগণ অধিকাংশস্থলেই পাশ্চাত্য-সভ্যতা-ভাস্করের মোহন রশ্মিজালের পরিধিমধ্যে সম্যকরূপে নিপতিত হয় নাই; কিন্তু সভ্যতার প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকে আলোকিত এবং পাশ্চাত্য জীবনের ভৌতিক সুখের কথঞ্চিৎ অধিকারী না হইয়াও, তাহারা একরূপ বেশ শান্তিতে জীবনযাপন করিতেছে।

সাঁওতালপরগণা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় আট শত চুরাশি ফুট উচ্চে অবস্থিত, বন্ধুর ও পর্ব্বতময়। সমগ্র উত্তরাংশে বরহাইত নামক উপত্যকা ভিন্ন প্রশস্ত সমতলক্ষেত্র দৃষ্ট হয় না। দক্ষিণাংশে ক্রমশঃ অনুন্নত ভূভাগ পরিশেষে বঙ্গদেশের ন্যায় সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই বৃক্ষগুল্ম যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে শাল, পলাশ ও মোহুয়া নামক বৃক্ষই অধিক। আবলুস-বৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অশ্বত্থ, তেঁতুল ও অন্যান্য বৃক্ষও পর্ব্বতোপরি ও গ্রামের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য নহে। এ স্থানের বৃক্ষগুলি দেখিতে বড় সুন্দর, বঙ্গদেশের বৃক্ষগুলির ন্যায় বিশৃঙ্খল নহে; বনজঙ্গলের বৃক্ষগুলির মূলদেশও বেশ পরিষ্কার। সুবিস্তৃত অসমতল মাঠ, মধ্যে মধ্যে সুসৌষ্ঠব বৃক্ষরাশি, অনতিদূরে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডসকল, দূরে অথচ সন্নিকটবৎ-

---

+ আকবরের আমলে এই প্রদেশের ১৩টি সরকার; ২৬২টি মহল ও ১,৩৬,৫৬,২৬৭।/১০ টাকা রাজস্ব ছিল। অবশ্য নারনোলের হিসাব ধরিয়া এই সংখ্যা হইয়াছে। খুলাসতের মতে নারনোল দিল্লীর ও আইনী-মতে আগরার—সরকার। আইন-ঈ-আকবরীর নির্দ্দিষ্ট অবশিষ্ট বারটি সরকারের মধ্যে খুলাসতের সতায়ুন ও আইনীর বয়ানওয়ান এক বলিয়া মনে হয়, আর খুলাসতে যে দুইটি সরকারের নাম নাই, তাহাদের একটি হয়ত আইনীর শহর—সরকার। বারী বাদে অবশিষ্ট সকলগুলিই উভয় পুস্তকেই আছে। (আঃ ২।১৮২)

প্রতীয়মান পর্ব্বতগুলি, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরসমন্বিত পল্লী দেখিলে অতি নিপুণ শিল্পীরচিত চিত্রাবলি-প্রদর্শনী বলিয়া মনে হয়। পার্ব্বত্য নদীগুলি স্বভাবতঃই তন্বী ও অন্তঃসলিলা, বর্ষাগমে ধারা-সম্পাতে প্রায়ই খরস্রোতা হইতে দেখা যায়। এইরূপ কখনও ম্রিয়মাণা, কখনও বেগবতী পার্ব্বত্য তটিনীকুল নিম্নবঙ্গদেশীয় পুষ্টকলেবরা স্রোতস্বতীর বিশালতাময় ও গভীর ভাবের ব্যঞ্জক না হইলেও সাঁওতালভূমির শিলাময় গাত্রে রজতশিরার ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রামবাসী প্রকৃতির এই সুষমাময় ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া সুখে দুঃখে বেশ আছে। মনুষ্য-সমাজে অত্যুন্নত স্থান অধিকার করিবার উচ্চাভিলাষ তাহাদের হৃদয়ে কদাপি জাগরিত হয় না, অথচ কঠোর পরিশ্রম দ্বারা স্বকীয় পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী জীবিকাউপার্জ্জনপূর্ব্বক পর্ব্বাহে পল্লীজীবনোচিত আমোদ-প্রমোদে রত থাকিয়া বেশ শান্তিতে কাল কাটাইতেছে। কৃষিকার্য্যই গ্রামবাসি-গণের প্রধান জীবিকা। বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ স্থানের কৃষিকার্য্য যে বিশেষ আয়াসসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রস্তরময় ভূখণ্ড কর্ষণ করিয়া তবে উহাকে শস্যোৎপাদনোপযোগী করিতে হয়। ধান্য ও অন্যান্য ফসল অধি-কাংশ স্থলেই যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্য্যের অন্যতম সহায় গোধন কৃষকেরা সযত্নে পালন করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামে সকলেই সুস্থকায়; সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে কলেরা, বসন্ত কোন কোন বৎসর গ্রামবাসিদিগকে উৎপীড়িত করে; কিন্তু বঙ্গদেশের ন্যায় এ স্থানে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সনাতন রোগ মনুষ্যদেহকে চিরকালের মত অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে না।

সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পরিশ্রম করিতে সমর্থ, কিন্তু প্রায়ই কর্ম্মকুণ্ঠ। শস্যাদি উৎপন্ন না করে এরূপ নহে, কিন্তু উৎপন্ন ফসল উত্তমর্ণ ও ভূস্বামীকে প্রদানের পর যাহা থাকে, তাহাতে তাহাদের যথেষ্টপরিমাণে ভরণ-পোষণ-সম্পাদন হয় না। বৎসরের অধিকাংশসময়েই সাধারণ লোকেরা একবার সামান্য এক মুষ্টি অন্ন, কখনও বা কিছু "চিড়ে", অথবা অত্যল্প "ছাতু" খাইয়াই দিনপাত করে। ভাদ্র মাসে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অগ্নিতাপদগ্ধ "জনার" ভক্ষণ করিয়া দারুণ অনশনক্লেশ নিবারণ করে। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য পাকিলে কৃষকগণের কিয়দ্দিবসের জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় হয় বটে, কিন্তু ফাল্গুন মাস আসিতে না আসিতেই দরিদ্র অধিবাসিগণ উদরপূর্ত্তির জন্য চিন্তাকুল হইয়া

পড়ে। করুণাময় ভগবানের করুণা অসীম। জীবপ্রতিপালনের ব্যবস্থা তিনি সমভাবে সর্ব্বত্র করিয়া রাখিয়াছেন। এই সময়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোহুয়া-বৃক্ষে অগণিত পুষ্প জন্মে। মোহুয়া-ফুল প্রস্ফুটিত হইলে বেশ সরস হয় এবং ক্রমাগত বৃক্ষমূলে পতিত হইতে থাকে। দরিদ্র সাঁওতাল-রমণীরা সন্তানগণসহ সযত্নে তখন ইহা সংগ্রহ করে এবং সিদ্ধ করিয়া পতি ও সন্তানদিগকে ভক্ষণার্থ প্রদান করে। অবশিষ্টগুলি সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করা হয় এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্য ভিন্ন ইহা দ্বারা গো-মহিষাদির উদরপূর্ত্তি হয়। বঙ্গদেশের মত এখানে ঘাস সুপ্রাপ্য নহে—অল্পই জন্মে। ধান্যের বিচালীগুলিও গ্রামবাসিগণের ক্ষুদ্র গৃহের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং "মোহুয়া" গোমহিষাদির সম্বৎসরের প্রধান খাদ্য হইয়া পড়ে। এইরূপে "মোহুয়া" প্রত্যক্ষরূপে নহে,—গৌণভাবে গবাদি পশুর খাদ্যসামগ্রীরূপে কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিয়া কৃষকেরা জীবনোপায়ভূত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন "মোহুয়া" হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়। সাধারণ লোকেরা ইহা পান করিয়া থাকে। ইহারা বড় সুরাপান-প্রিয়। মদ্য প্রস্তুত ও ইহার ক্রয়-বিক্রয় আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইলেও ইহারা গোপনে মদ্য প্রস্তুতের জন্য এক প্রকার অপূর্ব্ব বকযন্ত্রের ব্যবহার করে এবং সময়ে সময়ে ধৃত হইয়া নির্য্যাতন ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

গ্রন্থ-পরিচয়।

দার্জ্জিলিং-ভ্রমণ। *

নামেই প্রকাশ ইহা একখানি ভ্রমণ-কাহিনী। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'প্রবাস-চিত্র' ও 'হিমালয়'-পাঠের পর আমরা এইরূপ আর একখানি মনোরম ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইরূপ ললিত-মধুর-ভাষায় পড়িয়াছি কি না, মনে পড়ে না। পুস্তকখানি এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একাসনে বসিয়া ইহার পাঠশেষ করিতে আমরা কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করি নাই। ভূমিকা-

* দার্জ্জিলিং-ভ্রমণ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দোবে প্রণীত। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

পাঠে অবগত হইলাম, গ্রন্থকার জননী বঙ্গভূমির ফলশস্যে পরিপুষ্ট হইলেও বাঙ্গালী নহেন, তবে বঙ্গভূমি দোষে মহাশয়কে আপনার করিয়া লইয়াছেন। তিনি যে ভাষায় এই গ্রন্থখানির রচনা-কার্য্য-সম্পাদন করিয়াছেন, সে ভাষায় অনেক প্রতিষ্ঠাপন্ন বাঙ্গালী লেখকেরও অধিকার আছে কি না সন্দেহ। পরিব্রাজকের যেকয়টি গুণ থাকিলে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণের সুখপাঠ্য, তৃপ্তিপ্রদ ও মনোমদ হয়, 'দার্জিলিং'এর এই নবীন-পর্য্যটকের সেই-কয়টি গুণই আছে। এই পুস্তকের পত্রে পত্রে ইঁহার পর্য্যবেক্ষণ-পটুতা, বর্ণনা-চাতুর্য্য, ভাবুকতা, সৌন্দর্য্যাসক্তি ও লিপি-কুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। এই গ্রন্থখানিতে কেবল দার্জিলিং-সহর-টুকুরই দ্রষ্টব্য বস্তু-বৃহ্যের বর্ণনা নাই। গ্রন্থকার হেমাভ-হিমকিরীট দুর্জ্জয়লিঙ্গের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী আরও অনেক কানন-কান্তার, জনপদ, প্রবাহিনী ও প্রপাত পরিদর্শন করিয়া আসিয়া তাহাদিগের মনোহারিণী বর্ণনা এই পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে পাঠকের মন বর্ণিত স্থান ও বস্তুগুলি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সুধী গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে দার্জিলিং-সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ করিয়া গ্রন্থখানির উপাদেয়তা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীখানি বাঙ্গলাভাষার ভ্রমণ-সাহিত্যের সম্পদ-বৃদ্ধি করিল। তবে গ্রন্থখানি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; গ্রন্থকার ভাষার লালিত্যের দিকে যতটা দৃষ্টি রাখিয়াছেন, শুদ্ধির দিকে ততটা দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। সেই 'সদাসর্ব্বদা' ও 'কেবল মাত্র', 'সততা' ও 'সক্ষম', 'গাহিয়া' ও 'বনানী', 'মনোমুগ্ধকর' ও 'নেত্র-মুগ্ধকর' আমাদিগের নয়ন ও মনের পীড়া জন্মাইয়াছে। 'সাহিত্য'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সম্মানিত নামসংযোগে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকারের এই অপ-প্রয়োগগুলি অধিকতর পীড়া-প্রদ হইয়াছে।

যাহা হউক, কমলেও যখন কণ্টক আছে,—কলানিধিতেও যখন কলঙ্ক আছে, তখন এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলা চলে না। আশা করি, ভবিষ্য সংস্করণে গ্রন্থকার ভাষার প্রতি অধিকতর অবহিত হইবেন। এই পুস্তকের ১৪২এর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"যেখানে দেখিবে ছাই, কুড়াইয়া লও তাই
থাকিলে থাকিতে পারে লুকান রতন।"

আমাদিগের এই কবিতাংশটী এইরূপ জানা আছে,—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,—
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

কোনটী ঠিক?

পুস্তকখানির বাহ্যসৌষ্ঠব-সম্পাদনজন্য লেখক মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছেন, অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই। খুব মসৃণ ও পুরু কাগজে বৃহদক্ষরে পুস্তকখানি অতি সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। মুদ্রাকর-প্রমাদ একান্ত বিরল। পঁচিশখানি সুচিত্রিত হাফটোন চিত্র এই পুস্তকের শোভাসম্পাদন করিতেছে। ইহা খুব শক্ত করিয়া বাঁধাইয়াও দেওয়া হইয়াছে। বাহিরে সোণার জলে গ্রন্থকারের নাম ও দার্জ্জিলিংএর একটি দৃশ্যের চিত্র ক্ষোদিত আছে। ছবিগুলির মধ্যে একখানি গ্রন্থকারের সৌম্যমূর্ত্তির আলেখ্য-অবশিষ্টগুলি দার্জ্জিলিংএর নানা স্থান ও বস্তুর চিত্র, তন্মধ্যে চারিখানি ছবি বিবিধবর্ণে রঞ্জিত। ইহাতে দার্জ্জিলিং-অঞ্চলের একখানি সুস্পষ্ট মানচিত্রও আছে। এই দীর্ঘপত্রবিশিষ্ট, একশত-ছিয়াশী-পৃষ্ঠা-পরিমিত, বহু-ব্যয়ে মুদ্রিত পুস্তকখানির মাত্র দুই টাকা বার আনা মূল্য কোনমতে অধিক হয় নাই।

বিরাম-কুঞ্জ। *

ইহা সুপ্রসিদ্ধ নাটক-লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ মহাশয়ের একখানি অনতিক্ষুদ্র গল্পের বহি। নাটক-রচনা করিয়া গ্রন্থকার যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকারের সে কৃতিত্বের পরিচয় না থাকিলেও এই "বিরামকুঞ্জে" প্রবেশ করিলে পাঠক-পাঠিকার চিত্ত বিনোদিত হইবে। গ্রন্থকারের এই পুস্তকের প্রত্যেক গল্পেরই আখ্যানবস্তু অভিনব, প্রত্যেক গল্পটিই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং প্রত্যেক গল্পেরই দেবভাষানুসারিণী মধুরিমাময়ী ভাষা আমাদের প্রীতিবিধান

*বিরামকুঞ্জ—শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ইউনিভার্সেল লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

করিয়াছে। অনেকের ধারণা এই, সংস্কৃতানুসারিণী ভাষায় গল্প-উপন্যাসাদির রচনা করিলে আদৌ সুখপাঠ্য হয় না; যাঁহাদের ধারণা ঐরূপ, তাঁহারা প্রতিভার পটুতার পরিমাণ পরিজ্ঞাত নহেন।

এই পুস্তকে পাঁচটি গল্প আছে, পাঁচটী গল্পে একশত ছাব্বিশটী পৃষ্ঠা অধিকৃত হইয়াছে, সুতরাং গল্পগুলি নিতান্ত অল্প-পরিসর নহে। এই গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথ বা প্রভাতকুমারের গল্পের মত কারু-কৌশলবিশিষ্ট না হইলেও একেবারে তদ্বর্জ্জিত নহে। আমাদের মনে হয়, "নারায়ণী"র লেখক ইচ্ছা করিলে ইহা অপেক্ষাও কৌশলপূর্ণ কথামালার রচনা করিতে পারিবেন, তবে বোধ করি, তাঁহার অভিলাষ ও অবকাশ উভয়েরই অভাব আছে। ক্ষুদ্র তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র কুন্দের মন্দ গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নন্দিত হয়। ক্ষুদ্র গল্পগুলি উপেক্ষার সহিত রচিত বা পঠিত হইবার নহে; এক একটী ক্ষুদ্র গল্পে এমন একটু সুরম্য সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় যে, একবার পড়িলে তাহার মধুরানুভূতিটুকু আমরণ পাঠকের হৃদয়ে থাকিয়া যায়। য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক গ্রন্থকার কেবল গল্প-রচনা করিয়াই বিশ্বব্যাপিনী ও চিরস্থায়িনী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ক্ষীরোদ-বাবু তাঁহার নাটকনিচয়ের রচনায় যে পরিমাণ শ্রমস্বীকার করিয়া থাকেন, গল্পগুলির রচনায় যদি প্রায় সেই পরিমাণ শ্রমস্বীকার করেন, তাঁহার শ্রম বিফল হইবে না। গল্পেও নাটকীয় সৌন্দর্য্য-বিকাশের অবকাশ পাওয়া যায় এবং গল্পেও নাটকীয় প্রতিভা স্ফূরিত হইতে পারে।

এই গল্পগুলি যে যথোচিত শ্রমসহকারে রচিত হয় নাই, তাহা এই গ্রন্থের বিবিধ অপপ্রয়োগগুলিই প্রমাণিত করিতেছে। সতর্কতার সহিত রচিত হইলে পণ্ডিতমহাশয়ের রচনামধ্যে, 'ইতিমধ্যে,' 'অহর্নিশি,' 'সক্ষম,' সাক্ষ্য-স্থলে 'সাক্ষী', প্রবিষ্ট-স্থলে 'প্রবৃষ্ট', 'গাহিলেন', 'লোকচক্ষে হইতে' 'কেবলমাত্র' প্রভৃতি ভ্রমপ্রমাদগুলি পরিলক্ষিত হইত না। মত-স্থলে 'মতো', আরও-স্থলে 'আরো' এবং কি-স্থলে 'কী' লেখকের দল বঙ্গভাষা হইতে বিসর্গকে বিবাসিত করিয়াছেন, পণ্ডিতমহাশয় অন্ততঃ প্রভৃতির স্থলে 'অন্তত' প্রভৃতি লিখিয়া কি তাঁহাদের দলভুক্ত হইতে চাহেন?

পুস্তকখানির মুদ্রণ মন্দ নহে, তবে মুদ্রাকর-প্রমাদের অভাব নাই; কাগজ বেশ, বাঁধাই ভাল এবং আটফর্ম্মা-পরিমিত পুস্তকের বার আনা মূল্য মহার্ঘ নহে।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু ও হিন্দুসমাজ।

(শেষ প্রস্তাব।)

অতঃপর হিন্দুসমাজে তথাকথিত বাল্যবিবাহ-সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই বিষয় লইয়াই এক সময়ে কবিবর রবীন্দ্রনাথের সহিত চন্দ্রনাথের তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ব্যাপার। ঘোরতর আন্দোলন-কালে পরস্পর বিজিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া মনীষিদ্বয়ের কেহই নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে সমর্থ হন নাই। সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ তখন পাশ্চাত্য আদর্শের মোহে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার 'বিলাত প্রবাসীর পত্র' পাঠ করিলে স্পষ্টই তাহা উপলব্ধ হয়। কিন্তু ক্রমশঃ যে তাঁহার হিন্দুসমাজসম্বন্ধে মতের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা তাঁহার নবপ্রকাশিত 'গোরা' নামক উপন্যাসপাঠে প্রতীয়মান হয়। এককালে 'আর্য্যামি' বলিয়া যাহার উপর বিদ্রূপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অধুনা গোরা-চরিত্রে তাহারই মাহাত্ম্য দেখাইয়া হিন্দুসমাজকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

উপযুক্ত সন্তান লাভ করিতে হইলে হিন্দু-পিতার কতটা দায়িত্বজ্ঞান, কিরূপ সংযম আবশ্যক, তাহার দৃষ্টান্ত চন্দ্রনাথ সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতির চরিত্রে দেখাইয়াছেন। এই রাজর্ষিপ্রবর সুকঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই সাবিত্রীর ন্যায় মহাতেজস্বিনী কন্যারত্ন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনকার নব্য বাঙ্গালী যে এত নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য ও দুর্ব্বল, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও মিতাচারের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। অনেকে বাল্যবিবাহকেই উক্ত কুফলসমূহের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, 'যাহারা অসংযমী তাহাদের বিবাহ যত বয়সেই হউক, তাহাদের সন্তান সুস্থকায় ও বলশালী হইতে পারে না।' অতএব হিন্দু-বালিকার বাল্যবিবাহ রহিত করিয়া যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিলেই যে সমস্ত কুফল দূরীভূত হইবে, তাহা কিরূপে আশা করা যাইতে পারে? কাজেই এইরূপ সংস্কারের পরিবর্ত্তে আমাদের চরিত্রগত দোষসমূহের আমূল সংশোধন-চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তার পর আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে এই যে, হিন্দুর সন্তানোৎপাদন-কার্য্য

ধর্ম্মসাধন বলিয়া পরিগণিত। ইহার অর্থ এই, সন্তানকে ধার্ম্মিক, সংযমী করিতে হইলে পিতাকেও ধার্ম্মিক, সংযমী হইতে হইবে। আবার পরোপকারোদ্দেশ্যে স্বকৃত কর্ম্মসমূহ সুসংরক্ষিত করিতে হইলেও সুসন্তানের আবশ্যক।* এতদ্ব্যতীত পিতৃপুরুষদের জলদানের ব্যবস্থামূলক শাস্ত্রীয় কারণ ত আছেই।

সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি প্রাচীন-মহিলা যৌবনস্থা হইলে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝায় না যে, সেকালে যুবতী-বিবাহই সমধিক প্রচলিত ছিল। সাবিত্রী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার বিবাহে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অশ্বপতির 'ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও চিন্তাকুলতা' হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এইরূপ বিবাহ তৎকালীন সাধারণ নিয়ম ছিল না, বরং তাহারই ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয়। আর শকুন্তলা তাপসী; তিনি যথায় বাস করিতেন, 'সে যে তপোবন, শান্তি-মগন', সেখানে সাংসারিক নিয়মের ব্যত্যয় হওয়াই সম্ভব। পক্ষান্তরে সীতার অতি শৈশবে বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চদশবর্ষ মাত্র। বিশ্বামিত্র মুনি যজ্ঞরক্ষার্থ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিলে রাজা দশরথ অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া বলিয়াছিলেন—'ঊনষোড়শবর্ষো মে রাম রাজীবলোচনঃ'। কবি ভবভূতি একটী শ্লোকে সদ্যোবিবাহিতা শিশু সীতার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। বীরবর অভিমন্যু ষোড়শবর্ষ বয়সে সপ্তরথী কর্ত্তৃক হত হন বলিয়া বর্ণিত আছে। তৎপূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া পত্নী উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের জন্ম হয়।

এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে বিবাহের বয়সের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। কিন্তু যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কিম্বা তৎপূর্ব্বেই যে বালিকাদিগের বিবাহ হইয়া যাইত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। চন্দ্রনাথ বলেন যে, কালক্রমে 'বিবাহের নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়' এবং 'প্রাচীনতম প্রণালী সুসংস্কৃত হইয়াই এখনকার প্রণালী হইয়াছে।' তাই গোভিল 'গৃহ্যসূত্রে' ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, দার-পরিগ্রহার্থে 'নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা' (নগ্নিকা = অঋতুমতী)।

---

* সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক বেকনও 'Of Children' নামক প্রবন্ধে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

অন্যত্র একস্থলে চন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'আমাদের বিবাহ-প্রণালী ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মপ্রধান জাতিরই উপযুক্ত প্রণালী।' এই উক্তি যে কতদূর সত্য, তাহা বাঙ্গালী সমাজ-সংস্কারক বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পায় না বটে; কিন্তু সম্প্রতি একজন ইংরাজ লেখক 'মডার্ণ রিভিউ' নামক সুবিখ্যাত ইংরাজী পত্রিকায় এক অতি সুলিখিত প্রবন্ধে ইহা স্বীকার করিয়া নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"The conjugal relation has never been deified in our religious consciousness. On the contrary it has been indirectly condemned as essentially carnal. * * * In your religion, however, the sex-relation has been idealised in a way absolutely unknown to our history and culture.' * অর্থাৎ —আমাদের ধর্ম্মভাব আমাদের দাম্পত্য সম্বন্ধকে কখনও অধ্যাত্ম জগতে আনয়ন করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়-সেবাই ইহার মূল মন্ত্র—এই অপবাদ ইহাকে বহন করিতে হইয়াছে। * * * কিন্তু আপনাদের ধর্ম্মে স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধ এরূপ উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা কখনও জানে নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মুসলমান রাজত্বে বয়স্থা কুমারী কন্যার উপর অত্যাচারীর লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইবার প্রায়ই সম্ভাবনা ছিল বলিয়া, হিন্দু-পিতা অতি শৈশবেই কন্যার বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত করিয়া ফেলিতেন। কালক্রমে হিন্দু-কন্যার বাল্যবিবাহই সমাজ-নিয়ম-রূপে পরিগণিত হইল। এবম্বিধ যুক্তি যে কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু যদিও ইহা সত্য হয়, তাহা হইলেও কি যুবতী-বিবাহের পক্ষপাতিগণ প্রমাণ করিতে পারেন যে, বিবাহ-বিধানের উক্তরূপ পরিবর্ত্তনবশতঃ হিন্দুসমাজের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে? তাঁহারা নিজেদের পক্ষসমর্থনে যে সকল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এই যে, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ। কিন্তু তাঁহারা যদি ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী হিন্দুদের বিবাহ-প্রথার সহিত বঙ্গসমাজের বিবাহপ্রথার তুলনা করিয়া দেখিতেন, তাহা

* 'Modern Review, November, 1910—The Cults of mother and of Maiden. by Mr E. Willis.

হইলে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিতেন। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে আজকাল দ্বাদশবর্ষের ন্যূনবয়স্কা বালিকার প্রায়ই বিবাহ হয় না; কিন্তু রাজপুতানা, বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কত অল্প বয়সে বালিকার বিবাহ হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তথাপি বাঙ্গালী দুর্ব্বল এবং ঐসকল প্রদেশের হিন্দুগণ সবল ও দৃঢ়কায়। শারীরিক বলে বলীয়ান্ মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে শিশুবিবাহ কিরূপ প্রচলিত, তাহা দেখাইবার জন্য কবিবর নবীনচন্দ্রের "প্রবাসের পত্র' হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি উদ্ধৃত করিলাম:—

"আমরা অপরাহ্নে নাসিকে পৌঁছি। যে পাণ্ডার বাটীতে গিয়া উঠি, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহারা পাঁচ সহোদর। পাঁচটী স্ত্রীই সুন্দরী। আমি মাথা ধুইয়া উপরে যাইতেছি, নীচে ক্ষুদ্র অগ্নিশিখার ন্যায় একটী বালিকা বসিয়া আছে। আমি তাহাকে ডাকিলে সে এক লম্ফ দিয়া আমার বুকে উঠিয়া পা দুখানি দিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া আমার মুখের উপর মুখ রাখিয়া কি বলিতে লাগিল। বুঝিলাম একটী কথা দক্ষীণা (দক্ষিণা)। তাহার নাম ভগ্ওা; বয়স ৬।৭ বৎসর; বিবাহ হইয়াছে তিন বৎসর। বালিকা দিনে শ্বশুর-বাড়ীতে, রাত্রিতে পিতার বাড়ীতে থাকে। আর একখানি ঈষৎ শ্যাম বদন" পার্শ্বের কক্ষ হইতে উঁকি মারিতেছিল। ভগ্ওাকে তাহাকে ডাকিতে বলিলাম। সে হি হি করিয়া হাসিয়া বীণার পঞ্চমে ডাকিল—"রুক্কু, ইক্রি আ।" রুক্কু আসিল। তাহার বয়স ৮ কি ৯ বৎসর হইবে। বড় সুন্দরী! তাহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আনিলে সে কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া অমনি হাত বাড়াইয়া বলিল, "দক্ষীণা।" অমনি তাহার শাশুড়ী আসিতেছে বলিয়া ছুটিয়া গেল। আমি উপরে গেলে আবার যাইয়া বলিল, "দক্ষীণা"। * * * * তাহার পর দুটীতে সিঁড়ির উপর বসিয়া কত গান গাহিতে লাগিল। আমি কাছে গেলে ভগ্ওাটী গলায় জড়াইয়া ধরে, রুক্কু পালায়। সে এ বাড়ীর পুত্রবধূ। অতএব দেখিলে ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ কিরূপভাবে প্রচলিত; শুনিলে সমাজ-সংস্কারকগণ মূর্চ্ছা যাইবেন।"

হায়! ভ্রান্ত সমাজ-সংস্কারক, এখনও কি বলিবে যে, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালীর শারীরিক অবনতির কারণ? তবে শুন; এক শত বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে দশম বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই বালিকার বিবাহ হইয়া যাইত, যখন অপেক্ষাকৃত বয়স্থা কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে হিন্দু-পিতার সমাজ-চ্যুতির ভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল, তখন বাঙ্গালী শারীরিক বলে কিরূপ বলীয়ান ছিল, তাহার প্রমাণ তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মিণ্টোর রাজকীয় পত্র হইতে দেখ। তিনি লিখিতেছেন,—

I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people, whose form I admired also. Those were slender. These are tall, muscular, atheletic figures, perfectly-shaped, and with the finest possible cast of countenance and features. Their features are of the most classical European models with great variety at the same time. *Lord Minto's Despatch, 1807, Sept. 20th.*

অর্থাৎ—এরূপ রূপবান জাতি আমি কুত্রাপি দেখি নাই। মাদ্রাজীদের দৈহিক গঠন আমার খুব ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছিল বটে; কিন্তু ইহারা তাহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তাহারা তনুকায়; ইহাদের শরীর সুদীর্ঘ, দৃঢ় পেশীবিশিষ্ট, সবল ও সুগঠিত এবং ইহাদের মুখাকৃতি ও অবয়বসমূহ অতি সৌষ্ঠবসম্পন্ন। ইহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব য়ুরোপের আভিজাত্য-সম্প্রদায়ের ন্যায়। মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তও তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ে' নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"ইদানীং এক শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যেরূপ বলবীর্য্য ক্ষয় ঘটিয়াছে, পূর্ব্বে সহস্র বৎসরেও কোন কারণে সেরূপ কিছুই হয় নাই। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যেরূপ বলবান লোক বিদ্যমান ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এদেশীয় লোকের শরীর কোনস্থলে অর্দ্ধহস্ত ও কোথাও বা একহস্ত প্রমাণ হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বলবীর্য্যের পরিমাণের ত কথাই নাই।" ১২৬ পৃষ্ঠা।

অতএব বাল্যবিবাহ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে নাই। বাঙ্গালীর শারীরিক হীনতার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। সময়ান্তরে এই বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আর একটী আপত্তি সমাজসংস্কারকগণ উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাহা এই যে, বালিকা অল্প বয়সে বিবাহিতা হইলে তাহার শিক্ষার পথ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার সমস্যার মীমাংসা হইতে এখনও বাকী আছে। রমণীগণের শিক্ষার যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই কোন কালে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা প্রদান করিলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়, তাহা লইয়াই আজ পর্য্যন্ত বাদানুবাদ চলিতেছে।

কেহ কেহ স্ত্রীপুরুষ-ভেদে শিক্ষার প্রকার-ভেদ মানিতে প্রস্তুত নহেন। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হক্‌স্‌লী (Prof. Huxley) বলেন,—

Let us have "sweet girl graduates" by all means. They will be none the less sweet for a little wisdom; and the "golden hair" will not curl less gracefully outside the head by reason of there being brains within.—*Science and Education*. *P. 73*.

ভারতবর্ষেও এই মতাবলম্বী ব্যক্তির অভাব নাই এবং বেথুন-প্রমুখ এইরূপ কয়েকজন স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারকের চেষ্টায় ভারতীয় রমণীগণকে পুরুষদের ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ভারত বিলাত নয়। স্ত্রীস্বাধীনতার লীলাভূমি পাশ্চাত্য জগতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শিক্ষাগত পার্থক্যের কোন প্রয়োজন না থাকিতে পারে। বিশেষতঃ গার্হস্থ্য সুখ ও শান্তির প্রস্রবণস্বরূপ অন্তঃপুর বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পাশ্চাত্য সমাজে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু ভারত স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সম্যক্ প্রণিধান করিয়া এই দুই জাতিকে দুই বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। পুরুষ বাহ্য জগতের সহিত সংগ্রাম করিবে, আর স্ত্রী অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া পুরুষের সহায়তা করিবে এবং তাহাদের হৃদয়-নিহিত স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি স্বর্গীয় বৃত্তিনিচয়ের প্রকাশে "পৃথিবী-ললামভূতা, সর্ব্বসুখ-পরিপ্লুতা" করিয়া তুলিবে। ইহাই হিন্দু-আদর্শ এবং এই আদর্শ যে ভ্রান্ত নহে, তাহা বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী টলষ্টয়ের মত হইতে সম্যক প্রতীত হয়। তিনি বলিতেন যে, ভগবান্ পুরুষদের জন্য নিয়ম করিয়াছেন যে তাহারা পরিশ্রম করিবে এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য আর এক স্বতন্ত্র নিয়ম করিয়াছেন এই যে, তাহারা মাতৃত্ব-পদ গ্রহণ করিবে। * অতএব স্ত্রী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র

* Tolstoy declared almost as a protest against the so-called equality of the sexes, which has been increasingly insisted upon here, ever since Mill wrote his SUBJECTION OF WOMEN—that God made one law for man, the law of labour and another for woman, the law of maternity.— E. Willis in the 'Modern Review' for Nov. 1910.

যখন বিভিন্ন, তখন শিক্ষাও স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য—বৃত্তিসমূহের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি-সম্পাদন করিয়া মানুষকে কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী করা। অন্তঃপুরই যখন স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র, তখন যাহাতে সে স্বীয় কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে, এইরূপই শিক্ষা তাহাকে প্রদান করা প্রয়োজন।

এখন দেখা যাক, হিন্দু-বালিকার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ তাহার প্রয়োজনীয় শিক্ষার অন্তরায় কি না। সত্য বটে, বিবাহিতা হিন্দু-বালিকার স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিবার আর সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় যে বৈদেশিক ভাষা ও তৎসাহায্যে গণিত-বিজ্ঞানাদি-শিক্ষায় ভারতীয় বালক ও যুবকবৃন্দের মস্তিষ্ক নির্য্যাতিত হইতেছে, তাহা যে অস্মদ্দেশীয় বালিকাগণের পক্ষে একেবারে অনুপযোগী ও নিষ্প্রয়োজন, তাহা কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন? বিবাহের পরই হিন্দুবালিকার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এই শিক্ষার আলয় স্বামিগৃহ। একান্নবর্ত্তী হিন্দুপরিবার বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং প্রথমেই নববধূকে স্বামীর পরিবারের উপযোগী হইতে শিক্ষা করিতে হয়। অল্প বয়সে বিবাহ না হইলে এইরূপ শিক্ষা কখনও সম্ভবপর হয় না। অতঃপর অন্যান্য শিক্ষার সূচনা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা এখন যাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলি, তাহা হিন্দুরমণীগণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সুতরাং বাল্য-বিবাহ যদি এই তথাকথিত উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহাতে আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। অন্তঃপুরই হিন্দু-বালিকার বিদ্যালয় এবং পিতা কিম্বা স্বামী তাহার গুরুর স্থান অধিকার করেন। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি জগন্মান্যা ভারতীয় বিদুষীর দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়। আবহমানকাল হইতে অন্তঃপুরেই বালিকার সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়েও এমন কোন সামাজিক পরিবর্ত্তন হয় নাই, যাহাতে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে।

বস্তুতঃ, উল্লিখিত যে কয়টি প্রথার সংস্কারে আমাদের শক্তি নিয়োজিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, সেগুলি যে বাস্তবিক আমাদের জাতীয় উন্নতির অন্তরায়, তাহা এখন পর্য্যন্ত কোন সংস্কারকই প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। এরূপস্থলে সামাজিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন-চেষ্টা যে শুধু অনাবশ্যক তাহা নহে, পরন্তু

সমূহ অনিষ্টকর। দেখিতে হইবে যেন সংস্কারের অন্তরালে সংহার গুপ্তভাবে লুক্কায়িত না থাকে। এসম্বন্ধে কবিবর রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলেন—

"আমাদের হিন্দুসমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে, বহু সহস্র বৎসরে হিন্দুজাতি যে অটল আশ্রয়ে বহু ঝড় ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর কিছু গড়িয়া উঠিবে কিনা, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভর দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে আমাদের যাহা আছে, নিশ্চিন্তমনে তাহার বিনাশ-দশা দেখিতে পারিব না।" *

এরূপ আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তাহা কোন্ চিন্তাশীল স্বদেশহিতৈষী অস্বীকার করিবেন? পাশ্চাত্য মোহ এখনও আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। প্রতীচ্য উন্নত ও দিগ্বিজয়ী; আর আমরা অধঃপতিত ও তাহার পদানত। এই বৈষম্যের কারণ কি, তাহা ভবিষ্য ঐতিহাসিক নির্দ্ধারণ করিবেন। আমরা কিন্তু আর কিছু না পাইয়া সমাজের স্কন্ধেই সমস্ত দোষ চাপাইতে চেষ্টিত হইয়াছি। আমরা মানিয়া লইয়াছি যে, য়ুরোপ যে সমাজ-নিয়মের অধীনে থাকিয়া এত বড় হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান কালে সর্ব্বত্র সর্ব্বজাতির উপযোগী। ইহার ন্যায় ভ্রমপূর্ণ ধারণা আর নাই এবং ইহারই ফলে আমরা সমাজকে ক্রমশঃ বিনাশের মুখে নিক্ষেপ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে আমার একটী গল্প মনে পড়িতেছে। কোন গ্রামে এক কৃষকের একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, কৃষক সন্তানটীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, তাহার মস্তকের ব্রহ্মতালু ধুক্ ধুক্ করিতেছে'। সে আর কখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে দেখে নাই; সুতরাং সদ্যোজাত শিশুর মস্তিষ্কের ঐরূপ স্বাভাবিক স্পন্দনে ভীত হইয়া গ্রামের মণ্ডলের নিকট গমন করিল এবং সন্তানের ব্রহ্মতালুর অবস্থা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া কিংকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিল। সুবিজ্ঞ মণ্ডল মহাশয় তাহাকে বলিলেন—'ছেলের মাথায় হাতুড়ী দিয়ে একটা পেরেক মেরে দিগে যা।' অল্পক্ষণ পরেই কৃষক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, পেরেক মারা হইয়াছে, কিন্তু ছেলেটীও সেই সঙ্গে মারা গিয়াছে। তখন মণ্ডল মহাশয় উত্তর করিলেন—'আরে বেটা, মরেছে ত কি হ'য়েছে? মাথার ধুক্‌ধুকনি ত সেরেছে।'

* 'ভাণ্ডার', মাঘ, ১৩১২, ৩২৬ পৃঃ, 'বিলাসের ফাঁস'-শীর্ষক প্রবন্ধ।

আমাদেরও অধিকাংশ সমাজ-সংস্কারই কি ঐ রকমের নয়? অনেক সময় আমাদের কোন সামাজিকপ্রথানিহিত একটী সামান্য দোষ দূর করিতে গিয়া সেই প্রথাটীকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হই। এই অত্যধিক সংস্কারপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইলে অচিরেই যে আমরা হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের পথে আনিয়া ফেলিব, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আর সম্প্রতি চারিদিকে সমাজ-সংস্কারের যেরূপ ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুসমাজের ভাগ্যে যে কি আছে, তাহা কে বলিতে পারে? তাই যিনি হিন্দুসমাজ-সংরক্ষণকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই স্বদেশপ্রাণ চন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া আজ যে কয়টী কথা বলিলাম, জানি না সেগুলির কোন মূল্য আছে কি না।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

পাষাণী।

অবনীনাথের সহিত শৈলবালার যখন বিবাহ হইয়া গেল, তখন সকলেই অনেক দিন ধরিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিল। আনন্দিত হইল না কেবল রমেশ।

রমেশ ও শৈলদের বাড়ী ঠিক পাশাপাশি; দুই পরিবারেই খুব আত্মীয়তা। শৈলবালা রমেশের মাকে পিসিমা বলিত, সে ছেলেবেলা তাহার মায়ের সঙ্গে প্রায়ই রমেশদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিত।

রমেশের বয়স তখন ষোল বৎসর, সবেমাত্র বাঙ্গালা নভেল সে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; ভালবাসা জিনিসটা কি, তখনও ঠিক স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই, তবে একটু অস্পষ্ট আভাষ পাইয়াছে মাত্র। এমন সময়ে সে একদিন শৈলবালাকে দেখিল। দেখিয়াই ভাবিল—শৈল কি সুন্দর!

একদিন শৈলকে একা পাইয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"শৈল তুমি আমায় ভালবাস?"

শৈল ছেলেমানুষ; সে জানিত মা বলিয়া দিয়াছেন, সকলকে ভালবাসিতে হয়, তাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"বাসি।"

মুগ্ধ রমেশ ভাবিল—আজ আমি ধন্য! জগতে আজ আমার মত সুখী কে?

যৌবনে বাসনার উন্মেষণের সহিত শৈলের দেবী-প্রতিমাখানি রমেশ আপনার মানস-স্বর্গে আনিয়া বসাইল; মনে মনে চারি বৎসর ধরিয়া অনেক আকাশ-কুসুম রচনা করিল। সহসা একদিন শুনিল, শৈলের বিবাহ; কিন্তু তাহার সহিত নয়। প্রথমে ইহা তাহার বিশ্বাস হইল না; তাহার হৃদয়ের শৈল কি অন্যের হইতে পারে?

কিন্তু একদিন গবাক্ষদ্বার হইতে রমেশ যখন দেখিল, অবনীনাথ মহা ধুম-ধামের সহিত বিবাহ করিতে আসিল, তখন বুঝিতে পারিল তাহার আশা-ভরসা ফুৎকারে তাস-গৃহের ন্যায় ভাঙ্গিয়া গেছে।

রমেশ ভাবিল শৈল ত আমার কাছে একদিন স্বীকার করিয়াছিল যে, সে আমাকে ভালবাসে; আমি তাই ভালবাসিয়াছিলাম, তাহাতে আমার দোষ কি? আর শৈলের দোষই বা কি, সেও ত পিতামাতার অধীন—শৈল কি বুঝে নাই, আমি তাহাকে ভালবাসি! তবু ত সে বিবাহের পূর্ব্বে একবার দেখা করিতে পারিত! তাহা হইলে দুজনে মিলিয়া খানিক কাঁদিতাম! কিন্তু শৈল ত কৈ একবারও আসিল না—এত উপেক্ষা কেন? তবে কি শৈল আমাকে ভালবাসে না? রমেশ আর ভাবিতে পারিল না, তাহার মাথা ঘুরিয়া আসিল।

এমন সময় শৈলের ছোট ভাই আসিয়া ডাকিল, "কি রমেশদা, আমাদের বাড়ী যাবে না, বর এসেছে যে?" রমেশ বিকৃতকণ্ঠে কহিল—"না, আমার অসুখ করেছে।"

সুরেন সে অদ্ভুত স্বর শুনিয়া আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না, ধীরে ধীরে পলাইল।

সময়ে সকলই যায়। রমেশের হৃদয়ের ক্ষতও অনেকটা সারিয়া আসিল; সে শৈলবালাকে অনেকটা ভুলিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু যাহা ভবিতব্য, যাহা হইবার, মানুষের সাধ্য কি তাহার গতিরোধ করে!

একদিন রমেশ নিবিষ্ট-চিত্তে গতমাসের জমাখরচাদির পর্য্যালোচনা করিতেছে, এমন সময় ডাক-পিয়ন একখানি চিঠি দিয়া গেল। রমেশ চাহিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর। তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিল, একখানি ছোট চিঠি ও ফটো।

এঁকি! এ কাহার ফটো? এত শৈলবালারই ছবি! তবে কি শৈল তাহাকে এখনও ভালবাসে—এখনও ভুলিতে পারে নাই! রমেশ তাড়াতাড়ি চিঠিখানি পড়িয়া দেখিল; শৈল লিখিতেছে—

"রমেশদা' পিসিমা (রমেশের মা) এই ছবিখানি চাহিয়াছিলেন, তাই পাঠাইলাম"—ভালবাসে ত এত সঙ্কোচ কেন? "রমেশদা' সেদিন আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতেছিলে, শুনিলাম, একবার ঢুকিলে না কেন?" তবে কি শৈল তাহাকে যাইতে বলিয়াছে? ইহার চেয়ে আর বেশী কি প্রকাশ করিবে!

রমেশ ছবিখানির দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। দেখিল, শৈল আর সে শৈল নাই, আরও শতগুণে সুন্দর হইয়াছে। যৌবনের নববিকাশের সহিত পূর্ণাঙ্গী শৈলবালার দেহলতার উপর আনন্দ-হিল্লোল তরঙ্গায়িত, নয়ন-কমল ঢলঢল করিতেছে।

রমেশ ছবির দিকে চাহিয়া চাহিয়া আত্মহারা হইয়া গেল! এতদিনের বিস্মৃত, লুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আবার জাগিয়া উঠিল।

প্রবল তরঙ্গাঘাতে পূর্ব্ব হইতেই রমেশের হৃদয়ের তটভূমি জর্জ্জরিত হইয়াছিল, এবার এক আঘাতেই ভাঙ্গিয়া গেল, আর বাধা মানিল না। রমেশ শৈলবালার সহিত দেখা করিবে ঠিক করিল, কিন্তু কি বলিয়া দেখা করিতে যাইবে? অবনীনাথ যদি জিজ্ঞাসা করে ত কি বলিবে? লুকাইয়া যাইবে? অবনীনাথের দ্বারবান-সুরক্ষিত গৃহে লুকাইয়া যাওয়া ত একেবারে অসম্ভব! রমেশ ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, শৈলকে একখানি চিঠি লিখিল।

রমেশদার এই অপূর্ব্ব প্রেমপূর্ণ চিঠি পাইয়া শৈলবালা শিহরিয়া উঠিল। অবনীনাথকে দেখাইলে মহা অনর্থ হইবে জানিত, তবু অবিশ্বাসিনী হইল না; অবনীনাথকে দেখাইল। রমেশদা'কে যাহা যাহা লিখিয়াছিল, তাহাও বলিল।

অবনীনাথ সে চিঠি পাইয়া মনে মনে খুব রাগিল। প্রকাশ্যে শৈলবালাকে হাসিয়া বলিল, "একটু মজা করিতে হইবে।"

অবনীনাথ রমেশকে পিছনকার বাগানের দরজা দিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া একখানি চিঠি শৈলবালাকে দিয়া লেখাইয়া পাঠাইয়া দিল। শৈল অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে লিখিল।

মুগ্ধ রমেশ জালে পড়িল। গভীর নিশীথে অবনীনাথের বাগানের সম্মুখে যন্ত্র-চালিতবৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

অবনীনাথ রমেশের অপেক্ষায় একটি ছোট ঝোপের অন্তরালে লুকাইয়াছিল। রমেশকে দেখিতে পাইয়া নিঃশব্দে পাদুকা উন্মোচন করিয়া সবলে আঘাত করিল।

রমেশ এ অপূর্ব্ব প্রেম-সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রহৃত হইয়া কুক্কুরবৎ পলাইল।

অস্পষ্ট আলোকে দুজনে দুজনকেই চিনিল।

অবনীনাথের পিতা যথেষ্ট ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহা বলিয়া অবনীনাথের কখনও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে নাই। চিত্র, কাব্য ও সঙ্গীতাদি সুকুমার কলাবিদ্যাগুলির অনুশীলনে তাহার জীবনের অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে সেগুলি যেন তাহার প্রাণের একমাত্র সাধনা হইয়া দাঁড়াইল; তাহাতেই তাহার তৃপ্তি, তাহাতেই তাহার আনন্দ, তাহাতেই তাহার সুখ।

অবনীনাথ যখন দেখিল, তৈলচিত্রঅঙ্কনে অনেকটা সিদ্ধহস্ত হইয়াছে, তখন তাহার ভাস্করকার্য্য শিখিবার বড় সাধ হইল। বৎসর কতক ধরিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর কাটিয়া অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। কত শিব, কত দুর্গা, কত উর্ব্বসী, কত মেনকা গড়িল।

একদিন ভাবিল শৈলবালার একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি রচনা করিবে; দেখিবে জীবন্ত মূর্ত্তির সহিত কতকটা মিল রাখিয়া করিতে পারে, কতটা স্বাভাবিক হয়।

অবনীনাথ দৈব-প্রেরণার কোন্ কুক্ষণে শৈলের শৈলমূর্ত্তি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল জানি না। মাসখানেক ধরিয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির মুখখানি গড়িল। তাহার পর একদিন জীবন্ত মূর্ত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিল অবিকল মিলিয়াছে, অনেক করিয়া দেখিয়াও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য বাহির হইল না। দেখিল জীবন্ত শৈলবালার মুখখানি কে যেন মন্ত্রবলে পাষাণ করিয়া দিয়াছে।

হৃষ্টমুখ অবনীনাথ যতই মিলাইয়া দেখিতে লাগিল, যশের আলোক ততই প্রদীপ্ত হইয়া যেন তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে আলোক

দেখিয়া অবনীনাথ বিভোর হইল; ভাবিল, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রদর্শনী তাহার এই মূর্ত্তির অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

ক্রমে অবনীনাথ এক প্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিল। সেই মূর্ত্তিখানি শেষ করা তাহার যেন জীবনের একমাত্র ব্রত, একমাত্র সাধনা।

নিজের মূর্ত্তি-রচনা হইবে শুনিয়া শৈলবালার প্রথম খুব আগ্রহ হইয়াছিল। যত দিন যাইতে লাগিল, তত সে আগ্রহ কমিয়া আসিতে লাগিল। এখন সে প্রাণহীন পুত্তলিকাবৎ স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়; যে অঙ্গটি গড়িবে, অবনীনাথ তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া প্রস্তরে কাটিয়া লয়, তাহার পর নিঃশব্দে চলিয়া যায়। স্বামী আপনার মনে সমস্ত দিনরাত একা বসিয়া সেটিকে কাটিয়া ঘসিয়া সুন্দর করিয়া তুলে।

এইরূপ করিয়া অনেকদিন কাটিয়া গেল, অনিদ্রায় ও অসময়ে আহারে অবনীনাথ ক্রমে শীর্ণ হইয়া আসিল। মস্তকস্থিত তৈলহীন কেশগুলি দীর্ঘ হইয়া জটার আকার ধারণ করিল। শৈলবালা দেখিল, এক পাষাণময়ী পিশাচিনী তাহার স্বামীর প্রেম তাহার অজ্ঞাতে কখন নিঃশেষে কাড়িয়া লইয়াছে।

এখন স্বামী আর মুখ তুলিয়া চাহেন না, বাক্যালাপও এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। স্বামী তাহারই পাষাণমূর্ত্তির ধ্যানে নিবিষ্ট, সমাধিগত। শৈলবালা দেখিল যেন সে পাষাণমূর্ত্তিখানি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া গগনস্পর্শী পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়া দুজনের মাঝে কখন নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে অন্তরাল বড়ই কঠিন—প্রায় দুর্ভেদ্য।

শৈলবালা কি করিবে কিছু ঠিক করিতে পারিল না। কি করিয়া উন্মাদবৎ স্বামীর চেতনা ফিরাইয়া আনিবে, কি করিয়া স্বামীর ভালবাসা আবার বুক ভরিয়া পাইবে ইহাই তাহার একমাত্র ভাবনা হইল। সে চিন্তা তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বড়ই ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

শৈলবালাও ক্রমে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া শুকাইতে আরম্ভ করিল।

অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর শৈলের সে শৈলমূর্ত্তিখানি, অবনীনাথ একদিন শেষ করিল। ইহার উপর তাহার যেন জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছিল, আজ

সে নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। সিদ্ধকাম যোগীর আনন্দালোক তাহার নয়নে ফুটিয়া উঠিল।

শৈলবালা দেখিল, স্বামীর সমাধি-সাধনা আজ শেষ হইয়াছে। ধীরে ধীরে তাহার মর্ম্মরমূর্ত্তির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। অবনীনাথ তাহার মুখপানে অনেক-দিন পরে চাহিল দেখিয়া তাহার চিন্তাক্লিষ্ট ওষ্ঠাধরে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

অবনীনাথ তাহাকে দেখিয়া ভাবিল—ওকে? বোধ হয় শৈল—না শৈল ত নয়! শৈলের হাসিতে আরও সরলতা ছিল, আরও মাধুর্য্য ছিল, এ যেন কঠোর, শুষ্ক, প্রাণহীন। নয়নদ্বয় কোটরগত, মুখমণ্ডল বর্ণবিহীন। তাহার প্রাণপ্রতিমা শৈলের অনুরূপ শৈল ত ঐ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সহিত ত ইহার কিছুই মিলে না? তবে পাষাণ প্রতিমাখানি কি তাহার শৈলের অনুরূপ হয় নাই?

তাহা কখনই হইতে পারে না। অবনীনাথের ত বেশ মনে আছে—দুখানি মুখ অনেকবার মিলাইয়া দেখিয়াছিল। তাহার পাষাণপ্রতিমাখানির কিছু দোষ থাকিতে পারে না। তবে কি ও শৈল নয়? তবে শৈল গেল কোথা?—যাক্ শৈল যথায় যাইবে যাক্, তাহার আর অত ভাবিবার সময় নাই। অবনীনাথ তুলিকাদ্বারা স্বাভাবিক রঙ্গে মর্ম্মরমূর্ত্তিখানিকে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিল।

প্রায় সাতদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত আঁকিল। তাহার পর শৈলের পার্শিসাড়ি-খানি আনিয়া পরাইল। মস্তকে সুগন্ধ কেশতৈলযুক্ত চূর্ণকুন্তল দিয়া, হস্তে শঙ্খ-বলয় পরাইয়া সাজাইল। তাহার পর একটু দূরে সরিয়া গিয়া দেখিল কেমন দেখায়। এবার অবনীনাথের মনে হইল শৈল ত কোথাও যায় নাই, নির্ণিমেষে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। ঐ ত শৈলবালার দেহ-সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে।

ভ্রান্ত অবনীনাথ মূর্ত্তির পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া বিভোর হইয়া রহিল। ক্রমে সে দৃশ্য, সে সৌরভ তাহাকে মাতাইয়া তুলিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। অধরপুটে একটি ব্যাকুল চুম্বন লইয়া প্রস্তরমূর্ত্তির পানে ছুটিয়া গেল এবং মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিল; কিন্তু তাহাতে বড় ব্যথা পাইল, বুকে বড়

লাগিল! সে আঘাত পাইয়া অবনীনাথ বুঝিল, মর্ম্মরমূর্ত্তি বড় কঠিন, নির্ম্মম প্রাণহীন। ক্ষুণ্ণমনে বসিয়া পড়িল।

এত করিয়াও কৈ মর্ম্মরের কঠিনতা গেল না। এত করিয়াও ত শৈলের সুগোল দেহলতায় কোমলতা আসিল না! এ যে বড় পরুষ, এ যে বড় কঠোর! তবে কি মর্ম্মরে কোমলতা আসিতে পারে না? না—পারে বৈ কি! অবনীনাথ ত পুরাণের অনেক সঞ্জীবনী-বারির কথা শুনিয়াছে, পাষাণী অহল্যাও ত আবার মানুষ হইয়াছে। পুরাণ-কথিত সঞ্জীবনী-বারি কি আর কোন শৈল-উৎস হইতে উঠে না? রামচন্দ্রের পদধূলির মত ধূলা কি আর এখন কোথা নাই? কেন থাকিবে না? জগতে কত কি আছে, মানুষ কি তাহার সকলের সন্ধান জানে?

অবনীনাথ ঠিক করিল যে সে সন্ধান করিবে, পাষাণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

মুগ্ধ অবনীনাথ এবার উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং অসীম অধ্যবসায়ের সহিত পাষাণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা আরম্ভ করিল। পাশ্চাত্য অনেক বিজ্ঞান-পুস্তক সংগ্রহ করিল, অনেক যন্ত্র কিনিল। তাহার পর অনেক দিন ধরিয়া অনেক রকম চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। কোনওমতে জীবনীশক্তি-উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করিতে পারিল না।

অবনীনাথ সে উপায়ে বিফলমনোরথ হইয়া ভাবিল, আমাদের যাহা কিছু সম্পূর্ণ নিজস্ব, তাহা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান কোথা হইতে পাইবে! পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের আশ্রয় লওয়া বৃথা। জীবনী-শক্তি-উৎপাদনের বিষয় যদি কিছু উল্লেখ থাকে, তবে তন্ত্র ও পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থেই থাকিবে। কিন্তু পুরাণ-তন্ত্রাদির ক্রিয়াদি শিক্ষা করা তাহার নিজ বিদ্যায় কুলাইবে না, শিখিয়া করিতে গেলে তাহা ত এক জীবনে অসম্ভব! অবনীনাথ অনেক সাধুর, অনেক সন্ন্যাসীর যোগবলে বহু অসাধ্য সাধনের কথা ত অনেকবার শুনিয়াছে; তাঁহারা কি আর এই শক্তির কথা জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন,—এক সাধক যোগী পাইলেই তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

অবনীনাথ এবার সন্ন্যাসীর বেশধারী কোনও লোক দেখিলেই তাহাকে

জীবনীশক্তি-উৎপাদনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। অধিকাংশ লোকই তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিত, কেহ কেহ বা বুঝাইয়া বিরত করিবার চেষ্টা করিত। প্রবহমানা নদীর বেগের মুখে কোনও বাধা পড়িলে যেমন নদী স্ফীত হইয়া সর্ব্ববাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিতবেগে বহিয়া যায়, সেইরূপ এইসকল বাধাবিঘ্ন পাইয়া অবনীনাথ আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। অবনীনাথ বুঝিল, এরা মূর্খ, কিছু জানে না, বুঝে না, এরা কি করিয়া বলিবে? যদি এখানে তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ সাধকের দর্শন না পাওয়া যায়, সে হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে কন্দরে অন্বেষণ করিয়া দেখিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিবে।

ঠিক এমনই সময়ে একদিন এক সন্ন্যাসী অবনীনাথের বাড়ীর সম্মুখের পতিত জমির উপর বটবৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসীর দিব্য সৌম্য মূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি-ভূষিত। সন্ন্যাসী সম্মুখে একটি কুণ্ডে হোমাগ্নি জ্বালিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার নয়নদ্বয় মুদ্রিত,—তিনি ধ্যাননিমগ্ন।

সন্ন্যাসীর স্নিগ্ধ ও উদারমূর্ত্তি দেখিয়া অবনীনাথের অনেকটা আশা হইল! ভাবিলেন, ইনি হয় ত জানিলেও জানিতে পারেন। অবনীনাথ একদিন তাহাকে জীবনী-শক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ন্যাসী ধ্যানে নিমগ্ন, কোনও কথা কহিলেন না। অবশেষে অবনীনাথকে বদ্ধপরিকর দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"জীবনী-শক্তি-উৎপাদন করা বড়ই শক্ত ব্যাপার, তবে অসম্ভব নহে। আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন আসিও, সব বলিয়া দিব। তৎপূর্ব্বে আর, আমায় বিরক্ত করিও না।"

আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রি। আকাশ ঘনঘোরাচ্ছন্ন। থাকিয়া থাকিয়া দিগ্বিদিক ক্ষণিক আলোকিত করিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে। সন্ন্যাসীর আজ্ঞানুযায়ী আজ অবনীনাথ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গঙ্গাস্নান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসীর সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি, বাম পার্শ্বে ত্রিশূল ও কমণ্ডলু;—দক্ষিণ দিকে একটি বৃহৎ তীক্ষ্ণধার ছুরিকা।

সন্ন্যাসী অবনীনাথকে দেখিয়া বলিল,—"বৎস! এ বড়ই কঠিন ব্যাপার; তুমি হয় ত ভয় পাইবে?—পারিবে না।" অবনীনাথ বলিল, "আপনি যাহা

করিতে বলিবেন, তাহা যতই কঠিন হউক না কেন আমি প্রাণপণ করিয়া দেখিব পারি কি না—নিশ্চয়ই পারিব।"

সন্ন্যাসী দেখিলেন, অবনীনাথের নয়ন হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার স্থির দীপ্তি বাহির হইতেছে। তখন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তবে বলি শুন বৎস! তুমি জ্ঞানী, তুমি বোধ হয় জান, এক জগদীশ্বর ছাড়া আর কেহই এ পৃথিবীতে নূতন শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না। জগতে নূতন শক্তির উৎপাদনও নাই, পুরাতন শক্তির বিনাশও নাই। মানুষ নূতন শক্তির উৎপাদন করিতে অসমর্থ। মানুষের কার্য্য কেবল একটি শক্তির গতিকে অন্য দিকে লইয়া যাওয়া—শক্তির রূপান্তর করা মাত্র। বৈদ্যুতিক শক্তিকে যেমন যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্ত্তন করা যায় এবং যান্ত্রিক শক্তিকে আবার বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, তেমনই পূর্ব্বে একটি শক্তি না থাকিলে আর একটি শক্তির উদ্ভব হয় না। জীবনীশক্তির বেলাও তেমনই। শুধু ঈশ্বর ছাড়া আর কেহই জীবনীশক্তি উৎপাদন করিতে পারেন না। তবে মানুষ একটা জীবনীশক্তিকে আর একটা জীবনীশক্তিতে পরিবর্ত্তন করিতে পারে মাত্র। তুমি যদি তোমার পাষাণ-মুর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আর একটি প্রাণ আবশ্যক। বৎস! তাই বলিতেছিলাম এ কার্য্য বড়ই কঠিন, তুমি পারিবে না।"

"প্রভু! আমায় বহুদূরে আনিয়াছেন, আর ফিরাইবেন না! কি করিয়া হইবে, আপনি তাহার উপায় নিশ্চয়ই জানেন; আমায় বলিয়া দিন, আমি করিব। আমার প্রাণ চান ত তাহাই দিতে এখনই প্রস্তুত আছি। কি করিতে হইবে বলুন—আর আমায় সন্দেহে রাখিবেন না"—গদগদকণ্ঠে এই বলিয়া অবনীনাথ সন্ন্যাসীর পা'দুখানি জড়াইয়া ধরিল।

সন্ন্যাসী অবনীনাথকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "উঠ বৎস! যখন তুমি এতদূর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তোমায় বিরত করা উচিত নহে, তবে শুন এখন সব উপায় তোমায় বলিয়া দিতেছি। এই যে ছুরিকা দেখিতেছ, ইহা আমি মন্ত্রপূত করিয়া রাখিয়াছি। এই ছুরিকা হস্তে যে ঘরে তোমার পাষাণ-মুর্ত্তি আছে, সেই ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রবেশ করিবামাত্র মুর্ত্তির মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে, আর কোনও দিকে মুখ ফিরাইতে পারিবে না। মুর্ত্তির দক্ষিণদিকের পাদপীঠের কাছে একটি মনুষ্যমুর্ত্তি শয়ান আছে, আমি

যোগবলে তাহাকে নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছি ; তুমি তাহার দিকে অগ্রসর হইবে। দেখিও খুব ধীরে ধীরে প্রবেশ করিবে। বাম হস্তে তাহার বাম বক্ষঃস্থল কোথায় অতি সন্তর্পণে স্পর্শের দ্বারা অনুভব করিবে, দৃষ্টি ফিরাইতে পারিবে না। খুব ধীরে ধীরে স্পর্শ করিও, দেখিও তাহার মোহনিদ্রা না ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর তোমার দক্ষিণ হস্তের এই ছুরিকা সবলে তাহার বক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিবে, যেমন করিয়া ক্ষোদন-যন্ত্র ব্যবহার কর,—দেখিও যেন দ্বিতীয় বার আঘাতের আর প্রয়োজন না হয়। তাহার পর সেই ক্ষতমুখ হইতে রক্ত লইয়া তোমার পাষাণ-মূর্ত্তির বক্ষে ও ললাটে লেপন করিয়া দিবে, দেখিবে তোমার পাষাণ-মূর্ত্তি সঞ্জীবিত হইয়াছে। এই লও ছুরিকা, তোমার ললাটে মন্ত্রপূত হোমাগ্নি-শিখার টীকা পরাইয়া দিতেছি,—কার্য্য নিশ্চয়ই সফল হইবে। এখন রাত্রি একটা, আর অমাবস্যা পড়িতে অর্দ্ধঘন্টা মাত্র বাকি আছে, অমাবস্যা পড়িলে আর কিছু হইবে না। —যাও শীঘ্র যাও।"

শৈলবালা স্বামীর বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইতেছে দেখিয়া বহুক্ষণ হইল দাসদাসীদিগকে খুঁজিতে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু কেহই অবনীনাথকে খুঁজিয়া পায় নাই, তখন শৈলবালা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তাহার পর ভাবিল, স্বামী যখনই আসুন না কেন, পাষাণ-মূর্ত্তির কাছে আসিবেনই ; সুতরাং পাষাণ-মূর্ত্তির পার্শ্বেই বসিয়া থাকা ভাল। শৈলবালা স্বামীর অপেক্ষায় পাষাণ-মূর্ত্তির পার্শ্বে বসিয়া রহিল। চিন্তায় তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া বড়ই ক্লান্তিবোধ করিল, আর বসিয়া থাকিতে পারিল না ; ধীরে ধীরে সেইখানেই শয়ন করিল। তাহার পর কখন্ তন্দ্রা আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিল, শৈলবালা কিছুই জানিতে পারিল না। শৈলবালা সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ভ্রান্ত অবনীনাথ ধীরে ধীরে ছুরিকাহস্তে ঘরে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসীর কথামত পাষাণ-মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি বদ্ধ রাখিয়া শৈলবালার পানে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। তাহার পর সন্ন্যাসীর কথানুযায়ী শৈলবালার বামবক্ষঃস্থল বাম হস্তে স্পর্শ করিয়া জোরে ছুরিকা বসাইয়া দিল। সে আঘাতে শৈলবালা নিঃশব্দে জীবনত্যাগ করিল, তাহার কণ্ঠ হইতে একটুও কাতরোক্তি উঠিল না। নিদ্রিতা শৈলবালা মহানিদ্রার কোলে আশ্রয় লইল।

এবার অবনীনাথ ক্ষতস্থান হইতে শোণিত লইয়া মূর্ত্তির ললাটে ও বক্ষঃস্থলে মাখাইয়া দিল। তাহার পর পাষাণ-মূর্ত্তির হাত ধরিয়া টানিয়া দেখিল, মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ জীবনহীন। বার বার রক্ত লইয়া মাখাইল, কিন্তু পাষাণ-মূর্ত্তি জীবিত হইল না, যেমন নিশ্চল, নিষ্পন্দ, প্রাণহীন ছিল, সেইরূপই রহিয়া গেল।

অবনীনাথ এবার কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তাহার রচিত পাষাণীকে আজ জীবিত দেখিবে বলিয়া, তাহার সমগ্র জীবনের সাধনাকে আজ সার্থক করিবে বলিয়া অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কৈ সে আশা ত তাহার মিটিল না! তবে কি সন্ন্যাসী ভণ্ড, না তাহার নিজের কোন ত্রুটী হইয়াছে? অবনীনাথ এবার কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না, তাহার মাথা ঘুরিয়া আসিল।

সহসা তাহার মনে হইল পাষাণ-মূর্ত্তির বামপার্শ্বের বক্ষের ভিতর যদি এই শোণিত প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে মূর্ত্তিটি হয় ত সঞ্জীবিত হইলেও হইতে পারে। ছেদনী হইলে এখনই হয়, কিন্তু মন্ত্রপূত ছুরিকা না হইলে ত কার্য্য হইবে না। তখন অবনীনাথ ঠিক করিল, এই ছুরিকাদ্বারা বক্ষঃস্থল ঈষৎ বিদীর্ণ করিয়া জীবন-শোণিত প্রবেশ করাইয়া দিবে।

অবনীনাথ পাষাণ-মূর্ত্তির বক্ষে ছুরিকাদ্বারা ঈষৎ আঘাত করিল। পাষাণ-মূর্ত্তির গাত্রে একটু দাগও বসিল না। ছুরিকার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া গেল। অবনী-নাথ দেখিল এত ধীরে আঘাত করিলে কিছু হইবে না, তখন ছুটিয়া আসিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির বক্ষে ভগ্ন ছুরিকাদ্বারা সবেগে আঘাত করিল। পাষাণমূর্ত্তিখানি সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না; পাদপীঠচ্যুত হইয়া সশব্দে ভূতলে পড়িয়া শতধা চূর্ণ হইয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে একটা উচ্চ অট্টহাস্যের রোল চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। অবনীনাথ গবাক্ষ-দ্বার হইতে সভয়ে চাহিয়া দেখিল। বোধ হইল, বটবৃক্ষের উচ্চশাখা হইতে শব্দ আসিতেছে। বটবৃক্ষের অগ্রভাগ তাহার ঘর হইতে দেখা যায়।

উন্মত্ত অবনীনাথ আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, বটবৃক্ষের তলায় সন্ন্যাসী নাই। শুধু বাঘছাল, কমণ্ডলু, ত্রিশূল পড়িয়া

রহিয়াছে, হোমাগ্নি শিখাও নির্ব্বাপিতপ্রায়; আর হোমকুণ্ডের পার্শ্বে শুভ্র কৃত্রিম গুম্ফ ও শ্মশ্রু পড়িয়া রহিয়াছে।

আবার সেই অট্টহাস্য—এবার আর বটবৃক্ষের উপর হইতে নহে। অবনীনাথ সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল; দেখিল,—অদূরে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল; অবনীনাথ সেই ক্ষণিক আলোকে তাহাকে চিনিল, সে রমেশ। তখনও তাহার গাত্রের স্থানে স্থানে ছাই রহিয়াছে।

অবনীনাথ ছুরিকাখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। কিন্তু রমেশ অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল, আর দেখিতে পাইল না।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

নিবেদন।

১

(আমি) সকল বাঁধন ফেলেছি ছিঁড়িয়া
(মোরে) তোমার বাঁধনে বাঁধিতে;
(আছি) প্রাণের বাসনা মরমে পীড়িয়া
(তব) প্রীতির সাধনা সাধিতে।

২

(ওগো) অবশ হইয়া আসে জাগরণ
(দুটি) ধেয়ান-ক্লান্ত নয়নে;
(শেষে) শ্রান্তি বহিয়া আসে রে স্বপন
(মোরে) ভুলাতে অলস শয়নে।

৩

(দাও) ঘুচিয়ে ভ্রান্তি, মুছিয়ে আঁধার;
(দাও) শ্রান্তি দলিয়া চরণে;
(দাও) উড়ায়ে যতেক কুহেলি ধাঁধার;
(দাও) জনম জাগায়ে মরণে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দল ও মাদল।

(জনশ্রুতিমূলক গল্প।)

বিষ্ণুপুরাধিপ মহারাজা চৈৎসিংএর * অকাল-মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র গোপাল সিং রাজপদে অধিরোহণ করেন। তিনি স্বধর্ম্মচ্যুতিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিয়া অন্তিম শয্যায় তাঁহার পুত্রকে স্বধর্ম্মনিরত থাকিতে প্রতিশ্রুত করাইয়াছিলেন। মহারাজ গোপাল সিং বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিষ্ণুপুর হিন্দুদেবদেবীর মন্দিরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি নিজ রাজ্যস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে প্রতিশ্রুত করাইয়া নিষ্কর ভূমিদান করিয়াছিলেন। এখনও বাঁকুড়া জেলার অধিবাসিগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে যাওয়াকে গোপাল সিংএর বেগার-খাটা বলে।

মহারাজ গোপাল সিং প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মন্দিরে যাইয়া পূজাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। পরে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত রাজকার্য্যাদি করতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর রাজধানীর প্রত্যেক অভুক্ত ব্যক্তিকে আহার করাইয়া নিজে ৺মদনমোহন জীউর প্রসাদ গ্রহণ করিতেন।

রাজার প্রকৃতি-অনুযায়ী প্রজাপুঞ্জের প্রকৃতি গঠিত হয়। ক্রমে যুদ্ধাদি আসুরিক প্রকৃতি লোকের মন হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল এবং অধিবাসিগণ ক্ষমাশীল ও হিংসাদ্বেষাদিশূন্য হইয়া উঠিল; ফলে তাহারা যুদ্ধব্যবসায় সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেল। এজন্য রাজ্য সম্পূর্ণ অরক্ষিত হইয়া উঠিল। সেনাপতি রাজ্যরক্ষা সুকঠিন দেখিয়া বারম্বার মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। প্রত্যেক বারই মহারাজ ৺মদনমোহনের দোহাই দিতে লাগিলেন।

বহুদর্শী, প্রাচীন ও যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। অকস্মাৎ একদিন সংবাদ আসিল যে, শের সাহা নামক পাঠান-সেনাপতি বিংশতি সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্যসহকারে বিষ্ণুপুর-রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। বঙ্গদেশের গৌরবস্থল, প্রকৃতির লীলাভূমি বিষ্ণুপুর-রাজ্যের উপর মুসলমানদিগের লোলুপ দৃষ্টি বহুকাল হইতে পড়িয়াছিল। এক্ষণে

* অর্ঘ্য—অগ্রহায়ণ-সংখ্যার "লালবাঁধ"-প্রবন্ধ দেখুন।

উপযুক্ত অবসর পাইয়া পাঠানেরা বঙ্গদেশে মুসলমান-প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ রাজ্যময় পরিব্যাপ্ত হইবামাত্র সকলেই ভয়ে মুহ্যমান হইল। মহারাজ গোপাল সিং মদনমোহনের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া এক সহস্র যোদ্ধাও পাইলেন না। যাহারা যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল, তাহারা যুদ্ধবিদ্যা ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি বহুকালের অযত্নে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি দেখিলেন মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু প্রাণ দিলেও রাজ্যরক্ষা অসম্ভব। তিনি শের সাহের গতিরোধ করিতে অক্ষম, এমন কি রাজপ্রাসাদ রক্ষা করাও অনিশ্চিত। তিনি দুর্গপরিখা জলে পূর্ণ করিয়া তোরণদ্বারসমূহে সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। সুদৃঢ় প্রস্তরনির্ম্মিত তোরণদ্বারগুলিকে "সহস্র নালী" বলিত। সেগুলি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহার উপরে সহস্র যোদ্ধা শত্রুপক্ষের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে পারিত। এরূপ একটি তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ লুপ্ত গৌরবের সাক্ষ্যস্বরূপ এখনও বিদ্যমান আছে। তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল ও শিল্পচাতুর্য্য প্রশংসনীয়।

রাজ্য আক্রান্ত, ধন, মান ও প্রাণনাশ অবশ্যম্ভাবী, রাজ্যচ্যুতি অনিবার্য্য, কিন্তু মহারাজ গোপাল সিং ভয় ও চিন্তাশূন্য। তিনি একমনে দেবতারাধনায় নিযুক্ত। তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর, স্বর্গীয় প্রভায় প্রদীপ্ত।

উপর্য্যুপরি দশ দিনের অবরোধের পর একদিন রাত্রে সেনাপতি মহারাজকে বলিলেন যে, তৎপরদিন মুসলমানের গতিরোধ অসম্ভব। প্রাণভয়ে ভীত, শঙ্কিত ও বিপর্য্যস্ত প্রজাবর্গ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। এই সংবাদে তাহাদের মধ্যে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তাহাদের করুণ আর্ত্তনাদ ও কাতর দৃষ্টি মহারাজকে বিচলিত করিল। মহারাজ স্নানান্তে শুচি হইয়া মদনমোহনের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু মহারাজ মন্দির হইতে বাহির হইলেন না। এদিকে মুসলমানেরা ভীষণ আক্রমণে প্রতি দণ্ডে দুর্গ-প্রাচীর ভাঙ্গিতে লাগিল। জয়োল্লাসে স্ফীত হইয়া মুসলমানগণ দ্বিগুণ উদ্যমে উপর্য্যুপরি আক্রমণ করিতে লাগিল। প্রতি আক্রমণে বিষ্ণুপুর-সৈন্যগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেনাপতি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, মহারাজ বাহ্যজ্ঞানশূন্য

হইয়া দেবতাপূজা করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, দুইচক্ষে ভক্তি-অশ্রু দর্ দর্ ধারে প্রবাহিত। সে দৃশ্য দেখিয়া সেনাপতি রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম ও বার্দ্ধক্যহেতু সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুর্গবাসিগণের মধ্যে হাহাকার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আশার শেষ ক্ষীণ রেখাটিও অন্তর্হিত হইল। সেনাপতির মূর্চ্ছার সংবাদে সংক্ষুব্ধ জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় দুর্গাধিবাসিগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড হইয়াছিল। প্রভাতে নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় দুর্গাধিবাসিগণ আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই বিপদ্‌ভঞ্জনের নাম করিতে লাগিল। অকস্মাৎ অর্দ্ধমৃতপ্রায় অধিবাসিগণের কর্ণে ভীষণ অশনিপাতের শব্দ প্রবেশ করিল। তাহারা মুসলমানের দুর্গপ্রবেশ আশঙ্কা করিয়া পলায়নতৎপর হইল। রাজপ্রাসাদস্থ প্রাঙ্গণে আসিয়া তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে যুগপৎ স্তম্ভিত হইল। তাহারা দেখিল, মূর্ত্তিমান স্কন্দবীরতুল্য এক ব্রাহ্মণ-যুবক দুইটী কামান হইতে মুহুর্মুহু শত্রুপক্ষের উপর অনল উদ্গীরণ করিতেছেন ও মুসলমানেরা হতাহত হইয়া পলায়ন করিতেছে। পরে প্রভাতের আলোকে তাহারা দেখিল, সেই যুবক অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং মুসলমানের মৃতদেহে যুদ্ধভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে।

তখন মদনমোহন দেবের জয়ধ্বনি করিতে করিতে সেই সমবেত জনসংঘ মন্দিরে যাইয়া দেখিল যে, মহারাজ তখনও সেরূপভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া ধ্যানমগ্ন আছেন। তাহারা জয়বার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর করিতে যাইয়া দেখিল যে, মহারাজ মূর্চ্ছিত হইয়াছেন।

এই কামান দুইটীর নাম দল ও মাদল। মাদল এখনও সেইস্থানে প্রোথিত আছে। বড় বড় পুরাতত্ত্ববিদ্যাবিশারদগণ কামানদ্বয় কি ধাতুতে নির্ম্মিত তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। সেই কামানের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি অসাধারণ। উহার ভিতর ভল্লুকেরা শাবক প্রসব করিত। লর্ড কর্জ্জন উহার মুখে সীসা ঢালিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কথিত আছে, দল নামক কামানটী এখনও লালবাঁধের ভিতর আছে। হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড় উহার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়ায় অপবিত্রতার ভয়ে উহা লালবাঁধের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

শ্রীসতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কর্ম্মফল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পৃথিবী যে অপকর্ম্মের বোঝা লইয়া চলিয়াছে তাহা নিবারণের উপায় নাই। সংস্কার এই সকল অপকর্ম্মের মূল। জন্মগত সংস্কারে মানব কতকগুলি ধারণা লইয়া কর্ম্মগত ও জ্ঞানগত সংস্কারের সহিত তাহাকে জড়িত করিয়া যে পশুকর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাকে নিরোধ করিয়া নির্ব্বাণমন্ত্রসাধনের সময় এ জগৎ কবে পাইবে—কখনও পাইবে কি না তাহা বলিবার সাধ্য নাই।

জন্মগত সংস্কারে মানব জন্মিয়াই কতকগুলি ধারণা মনের মধ্যে লইয়া বসে, ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়ায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মগত সংস্কার তাহার পূর্ব্ব সংস্কারকে জড়াইয়া তাহার জীবন-রহস্য আরও জটিল করিয়া তোলে এবং এই দুই সংস্কারের ভ্রান্ত ধারণাসকল তাহার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ফেলিয়া আর একটি জ্ঞানগত সংস্কারের সৃষ্টি করে। এইরূপে রিপুর প্রভাব তাহাকে সংস্কৃত করিতে করিতে তাহার জন্ম, কর্ম্ম এবং জ্ঞান কেবল পুনর্জ্জন্মের পথেই তাহাকে টানিয়া লইয়া চলে। জন্ম যে কেবল দুঃখভোগের কারণ, তাহা যতদিন না বুঝিতে পারা যায়, যতদিন পৃথিবীর কর্ম্ম পৃথিবীতেই রাখিয়া যাইবার কথা মনের মধ্যে উদিত না হয়, ততদিন সংস্কার দূর হয় না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রূপ, রস, গন্ধ, যেভাবে জীবকে অহরহ সংস্কৃত করিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার অপ্রতিহত ক্ষমতা সহজে অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায় না, তাই প্রবৃত্তির নিরোধ সহজে ঘটে না। এই সংস্কারের—এই মায়ার হাত হইতে জগতকে মুক্ত করিবার জন্য একদিন বুদ্ধদেব কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য এই মোহ দূর করাইবার জন্য একদিন মুদ্গর উঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"বাণী, সে—

"মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং"—

রূপ মুদ্গরাঘাত কেবল ক্ষণিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল মাত্র, জগতের মোহ তাড়াইতে সমর্থ হইল না। রিপু মোহনরূপে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া মুক্তির পথ নষ্ট করিয়া যাইতেছে। এই মোহ এবং ভ্রান্তি কতদিনে দূর হইবে কে বলিতে

পারে? তাই বলিতেছিলাম নির্ব্বাণমন্ত্রসাধনের সময় জগতের অদৃষ্টে আছে কি না, তাহা বলিবার সাধ্য নাই। যদি কখনও সে সময় আসে তাহা জগৎকে লইয়াই আসিবে। জড়জগতের অস্তিত্ব রাখিয়া জীবজগত নির্ব্বাণ লাভ করিবে না। যে অণু পরমাণু জড় ও চেতনে মিশ্রিত, তাহা একসঙ্গে একেবারে নির্ব্বাপিত হইবে। একটি রাখিয়া আর একটি চলিয়া যাইবে না। সে চন্দ্রলোক বা ধ্রুবলোকের অবস্থা সত্যলোক কবে পাইবে তাহার গণনা করা মানববুদ্ধির অতীত। তাই বলিতেছিলাম সংস্কার দূর হওয়া বড় কঠিন।

ঐ যে বৃদ্ধা জরা-জীর্ণ দেহে কর্ম্মগত সংস্কারের বশে যে শুদ্ধাচারের ব্যবস্থা করিতেছে, উহা কেবল অব্যবস্থা নহে,—উহা "শুচিবাই" নামে এক প্রকার বায়ুরোগের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডই রোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে যে কর্ম্ম সাধারণকে অতিক্রম করিয়া চলে তাহাই উন্মত্ততার অভিধান প্রাপ্ত হয়। সংস্কার কতরূপে সংসারকে আলোড়িত করিয়া চলিতেছে, তাহারই উল্লেখে ঐ বৃদ্ধার কথা বলিতেছি। ঐ যে বৃদ্ধা নিজেকে শুচি করিবার জন্য দশ বার কাপড় ছাড়িতেছে—হাত ধুইতে ধুইতে হাতের চামড়া উঠাইয়া ফেলিতেছে, কলসী কলসী গঙ্গাজল যাহার পরিশুদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, ঐ সংস্কারগত কর্ম্ম—ঐ বিশুদ্ধির নামে বিষম ভ্রান্তি, উহাকে উহার পুত্রকলত্র হইতে দূরে রাখিয়া, উহার চিত্ত তমসাবৃত করিয়া দিয়া উহাকে কর্ম্মের নামে যে অপকর্ম্ম করাইতেছে, তাহার নির্ব্বাণ কতদূরে, কোথায় সাধিত হইবে কে বলিতে পারে? বৃদ্ধা পরকাল চিন্তায় সকলকে পর করিয়া যে ভাবে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, যে সংস্কারে শঙ্কিতঅন্তরে নির্ব্বাণের পথ খুঁজিতেছে, তাহা কেবল তাহার কর্ম্মফলরূপে জন্মান্তরের অপেক্ষা করিয়া তাহার কৃতকর্ম্মের যন্ত্রণা বাড়াইয়া দিতেছে। ঐ যে বেশ্যা লজ্জাভয় ভুলিয়া, মাথার কাপড় ফেলিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহাকে দেখিয়া তুমি চমকিত হইয়া উঠিয়াছ, যে রূপের ডালায় বিলাসের সামগ্রী পূর্ণ করিয়া কেবল ভালবাসার কৃত্রিম ব্যবসায়ে জগতকে ঠকাইয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিতে করিতে চলিয়াছে, উহার বিলাসের সংস্কার যে অশান্তি প্রদান করিতেছে, তাহা বর্ণনার অতীত। যে সময় হাহাকারে উহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সে সময়ে কৃত্রিম হাস্যকোলাহলে উহাকে

মাতাইতে হইবে। সংস্কারের বশে সুখের ভ্রান্ত ধারণায় ঐ বেশ্যা আজ বিড়ম্বিত। বেশ্যার জ্ঞানগত সংস্কার তাহার কর্ম্মফলকে উজ্জ্বল করিয়া দিলেও সে মোহের হস্ত হইতে নিজেকে পরিত্রাণ করিতে পারিল না। এইরূপে রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ জগতের সহিত ইন্দ্রিয়-বিনিময়ে জগতকে অতৃপ্ত করিয়া, কর্ম্মকে কর্ম্মনাশায় নিক্ষেপ করিয়া যে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার বিষময় ফল শ্মশানের চিতাভস্ম। এই শ্মশান-চিতায় কর্ম্মফলের পরিসমাপ্তি করিয়া এ জগত কবে নির্ব্বাণ লাভ করিবে, তাহা অদৃষ্ট তিমিরে আচ্ছন্ন—তাহা বলিবার সাধ্য নাই।

এ প্রচ্ছন্ন মানবতত্ত্ব বুকে করিয়া, এই মহাকর্ম্মনাটক বিয়োগের অশ্রু লইয়া, বিপদের বজ্র মাথায় করিয়া নূতন নূতন দৃশ্যপটের মধ্য দিয়া এই সংসার-নাট্যশালায় নিত্য অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। এই অসীম কর্ম্মকাণ্ডে অনন্ত অসংখ্য যোগী পরিভ্রমণ করিয়া নির্ব্বাণের আশায় সমস্ত জীবজগত মথিত করিয়া চলিয়াছে বটে, কর্ম্মফল খণ্ডন করিয়া জন্ম ও জরার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া জীবজগত তপস্যা করিতেছে বটে, পাপের প্রতিরোধের চেষ্টায় কত দেবহৃদয় কত উপদেশ ছড়াইয়া দিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু সংস্কার উন্মত্তভাবে কর্ম্মের পর কর্ম্মের যোজনা করিয়া, ব্যর্থ কর্ম্মের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া জীবজগতকে এমন ভুলাইয়া দিতেছে যে, ভ্রান্তি অপনোদনের কোনও উপায় থাকিতেছে না। এই ভ্রান্তি বুকে করিয়া কত পরস্বাপহারী, ... মহন্তা, কত মত্তে ধরার উপর ধারা বহাইয়া চলিয়াছে, কত বিশ্বাসঘাতকতা, কত অতিথি-বিনাশ ধারাধাহী কর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছে, সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল-পীড়নে কত হাহাকার ধরা পরিব্যাপ্ত করিয়া এমন করিয়া ছুটিয়াছে যে শত কুরুক্ষেত্র, শত সহস্র লঙ্কাকাণ্ড জগতকাণ্ডের এ গতি ঘুরাইয়া কর্ম্মফলের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে সক্ষম হইবে না।

তাই বলিয়াছি কর্ম্ম এবং ফল অখণ্ডনীয়। জগতে আসিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। নিজের জন্য হউক আর পরের জন্য হউক, পরার্থ আশায় হউক আর স্বার্থ লালসায় হউক কর্ম্ম করিতেই হইবে। এই কর্ম্ম যতদিন লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, ততদিন কর্ম্মের সার্থকতা থাকে ; আর যখন কর্ম্মের আকর্ষণী শক্তি চলিয়া যায়, কর্ম্ম কেবল আলোচনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তখন কর্ম্ম

হইতে অবসর গ্রহণ না করিয়া কর্ম্মের নামে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করা উচিত নয়। পণ্ডিতগণ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে সাংসারিক কর্ম্ম হইতে এইজন্যই অবসর লইতে বলিয়াছেন। কারণ তখন সংসারের সকলে ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া সেই প্রবীণ বহুদর্শী কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয় না। বিভিন্ন কর্ম্মপ্রণালী বিভিন্ন রূপে চালিত হইয়া সেই প্রবীণকে অতিক্রম করিয়া চলিতে চায়। সৃষ্টির প্রত্যেক জন্তুকে স্বাধীনভাবে চালিত করিবার চেষ্টায় স্বভাব সর্ব্বদা যে কার্য্য করিতেছে, তাহার শক্তির প্রক্রিয়ায় প্রবীণকে তখন হটিতে হয়। যদি সেই সময় সেই প্রবীণ গৃহী সকলকার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা না করিয়া, এ সংসারে পার্থিব খেলার শেষ করিয়া ইহকালের কর্ম্মের উপর পূর্ণচ্ছেদ দিয়া, পরলোকের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য পণ্ডিত-সমাজের উপদেশ মস্তকে লইয়া অগ্রসর হয় তবে আর তাহার কষ্ট থাকে না। কিন্তু সংসার-মায়ায় আবদ্ধ, বহু পুরাতন স্মৃতিবিজড়িত সংসারকে ভুলিবার শক্তি বৃদ্ধ খুঁজিয়া পায় না, অথচ সংসারও আর তাহাকে চায় না, সেইজন্য তাহার দুঃখের আর অবধি থাকে না। কর্ম্ম নিজ সীমা-নির্দ্দেশে পরে পরে ছেদ টানিয়া গিয়াছে, কিন্তু কর্ম্মী ছেদ টানিতে প্রস্তুত নহে, তাই শৃঙ্খলের পর শৃঙ্খলের সৃষ্টি করিয়া নিজেকে তাহাতে জড়াইয়া ফেলে। জীবনের পথে সংযমকে লইয়া না চলিলে নিবৃত্তি আসে না, নিবৃত্তি-শিক্ষা ভিন্ন কর্ম্মশৃঙ্খল ছেদন করা যায় না। পার্থিব জীবনের পূর্ণ পরিণতি যখন চিতা-শয্যা, তখন এই পরিণতির পথে কর্ম্ম-জীবনের পরিসমাপ্তির জন্য প্রস্তুত না হইলে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হইবে। যেখানে একদিকে বিয়ের বাজনা অন্য দিকে মরার কান্না, একদিকে শোক অন্য দিকে সুখ সেই প্রহেলিকাপূর্ণ পৃথিবীতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি-ধর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়া যিনি বলিতে পারেন—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"।

তিনিই মুক্ত, তিনিই কর্ম্মফলের অতীত। তাঁহার কর্ম্মে আর বন্ধন থাকে না, সে কর্ম্মের ফলে আর তাঁহাকে দুঃখভোগের জন্য পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় না। অর্জ্জুনকে ভগবান এইরূপ কর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছিলেন,

বুদ্ধদেব এই কর্ম্মফলেই নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। অতএব মানবকে এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া, দম্ভ-অভিমানের পরিণাম যে চিতাভস্ম তাহা মানবজীবনে প্রস্ফুটিত করিয়া দিতে সচেষ্ট হইয়া, অত্যাচার-উৎপীড়ন সংযত করিবার চেষ্টা দ্বারা পৃথিবীর কর্ম্মের পরিসমাপ্তির জন্য, নিষ্কাম ভাবে চিতানল-পন্থায় নির্ব্বাণলাভ করিবার নিমিত্ত—

"চল ভাসি মানবের সাধিয়া মঙ্গল,
আনন্দে গাইয়া হরে মুরারে কেবল"।

শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ।

এলাহাবাদ

বিস্তৃত প্রদেশ এলাহাবাদ।

হিন্দু গ্রন্থাবলীতে ইহা প্রয়াগ ও ত্রিবেণী নামে অভিহিত হইয়াছে। সম্রাট আকবর গঙ্গা ও যমুনার মধ্যপথে এক সুদৃঢ় প্রস্তরদুর্গ ও উৎকৃষ্ট প্রাসাদরাজি নির্ম্মাণ করিয়া ইলাহাবাগ্ নামে এক শহরের পত্তন করেন। সম্রাট শাহজাহান স্বীয় রাজত্বকালে ইহার নাম ইলাহাবাদ (এলাহাবাদ) রাখেন। এই দুর্গের পাদদেশে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম হইয়াছে। আবার দুর্গ হইতে একটি নদী বহির্গত হইয়া ইহাদের সহিত মিশিয়াছে। তাহার নাম সরস্বতী। এইজন্যই এইস্থানকে ত্রিবেণী বলে। হিন্দু গ্রন্থাবলীতে কিন্তু এখান হইতে সরস্বতীর উৎপত্তির উল্লেখ নাই। দুর্গের ভিতরে অক্ষয় বট নামে এক অতি প্রাচীন বৃক্ষ আছে। হিন্দু শাস্ত্রাবলীর মতে এই বৃক্ষ চিরকাল এইখানে রহিয়াছে এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশানুক্রমে ইহা কাটিয়া ফেলা হয় ও এক লৌহ আচ্ছাদনী দিয়া ইহার কাণ্ডভাগ ঢাকিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় এই

আচ্ছাদনীর নিম্নভাগ হইতে আবার ইহার মাথা গজাইয়াছে এবং তাহা বেশ উচ্চও হইয়াছে।

সংক্ষেপে বলিয়া যাই, হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, এই স্থল বহু প্রাচীন এবং তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শীতকালে সূর্য্য যে দিন মকররাশিতে প্রবেশ করেন, সেই মকর-সংক্রান্তিতে জগতের সকল দিক্ হইতেই অগণ্য লোক এখানে আসিয়া উপস্থিত হয় ও একমাস অবস্থান করিয়া প্রতিদিন শাস্ত্রমত স্নান করে। সকলেই গরীব-দুঃখীকে সাধ্যমত দান করে। তাহারা প্রত্যেকেই সম্রাটকে একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ (কর) প্রদান করে। এইখানে পঞ্চভূতে মিশিয়া যাওয়া বহু পুণ্যের ফল মনে করিয়া পূর্ব্বে অনেক লোকই এখানে করাতের তলে মাথা পাতিয়া দিত (অর্থাৎ করাত দিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিত)। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইহাতে তাহারা চিরমুক্তি পাইবে ও পরলোকে অভিলষিত ফলভোগ করিতে পাইবে। শাহজাহানের আমলে এই প্রথা রহিত হইয়াছে।

বেনারস—হিন্দুগ্রন্থাবলীর বনারসী (বারানসী); এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিতা বরুণা ও অসি নদীদ্বয়ের মধ্যপথে অবস্থিত বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। কাশী-নামেও ইহা পরিচিত। ইহা একটি প্রাচীন শহর। যে অংশে ইহার লোকের বাস, তাহা ঠিক্ ধনুকের মত, আর ইহার পাদদেশবাহিনী গঙ্গা যেন ধনুকের ছিলা। মহাদেবের (বিশ্বেশ্বরের) অধিষ্ঠান বলিয়া অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ইহা তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহা বিদ্যার ভাণ্ডার, পণ্ডিতদের সঙ্গমস্থল, হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানপিপাসুদের বিদ্যালয়। লব্ধজ্ঞান ও সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ ও অবস্থাজ্ঞ ও বাক্পটু বেদপাঠকেরা এখানে বাস করেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা জ্ঞানার্জ্জন ও শিক্ষা-সমাপ্তির জন্য নিকট ও দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে আসিয়া উপকার ও মাধুর্য্য লাভ করেন। বহু সন্ন্যাসী ও সাধু ব্যক্তি ভগবানের চরণ-চিন্তার জন্য পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করিয়া এখানে আসিয়া বাস করেন ও (রিপুচয়ের প্রকোপ হইতে) শরীরকে মুক্ত করিবার জন্য প্রতিনিয়তই দাসপ্রভুর (ভগবানের) নিকট প্রার্থনা করেন। এই উপায়েই পরলোকে মুক্তি পাওয়া যায় বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ আছে। বৃদ্ধ ও (পার্থিব সুখে) ব্যর্থমনোরথ ভগবৎ-সেবকেরা জীব-স্রষ্টার চরণ-

তলে আত্মমন সমর্পণ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন।

ইহার নিকটে গঙ্গার তীরে একটি স্থান আছে। যখনই বৃহস্পতি সিংহ-রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন নদীর মধ্যভাগে এক পাহাড় দেখা দেয় ও সেইরূপ অবস্থায় একমাস কাল অবস্থান করে। অনেক লোকেই (তথায়) ভগবানের পূজা করে। এই আশ্চর্য্য দৃশ্য ভগবানের প্রসাদেই ঘটে।

চুণারা (চুণার) এক প্রস্তরদুর্গ। তাহা এক পাহাড়ের উপরে অবস্থিত।* উচ্চতা ও দৃঢ়তায় তাহা অদ্বিতীয়। গঙ্গা তাহার পাদদেশ দিয়া বহিয়া যায়। ইহার নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে এক (অসভ্য) জাতির বাস আছে। তাহারা আপাদ-মস্তক উলঙ্গ। তীরন্দাজি ও শিকার করিয়া তাহারা জীবিকা আহরণ করে।†

কালিঞ্জরের প্রস্তর-দুর্গ গগনস্পর্শী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহার উৎপত্তির কথা কেহই জানে না। দুর্গের মধ্যে কয়েকটি পূর্ণ-স্রোতা নদী, অনেকগুলি দীঘি ও কালভৈরবের‡ (শিবের) মন্দির বিরাজ করিতেছে। এই দেবতা-সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনী শুনা যায়। ইহার নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলে আবলুস কাঠের ও বন্য ফলের গাছ আছে। এই জঙ্গলে অনেক বন্যহস্তী ধরা হয়। ইহার নিকটে একটি লোহার খনি আছে। অনেক জায়গায় হীরার টুকরা পাওয়া যায়। এখানকার অধি-বাসীরা অনেক সময়েই তাহা প্রাপ্ত হয়।

জৌনপুর একটি প্রকাণ্ড শহর। সুলতান ফিরোজশাহ স্বীয় রাজত্ব-কালে ইহার পত্তন করিয়া তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সুলতান মহম্মদ ফখর-উদ্দীন

* পাহাড়টি বালু-প্রস্তরের। তাহা গঙ্গার দিকে বাহির হইয়া আসিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ভূমি অপেক্ষা তাহা স্থানে স্থানে ৮০ হইতে ১৭৫ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। (ইম্পিঃ ২।০৩৬)

† সম্ভবতঃ গণ্ডজাতি। কিন্তু ইম্পিঃ গেজেটিয়ারের মতে মির্জাপুর জিলায় কোলজাতি বাস করে, গণ্ডজাতি নহে। চুণার মির্জাপুর জিলার অন্তর্গত।

‡ যে স্থানে মন্দির, তাহার কিছু উপরিভাগে একটি দীঘি আছে। পাথর কাটিয়া সেটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। দীঘির অপর দিকে প্রস্তরগাত্রে কালভৈরবের এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। সে মূর্ত্তির শিরস্ত্রাণ হইতেছে সর্প। সেই শিরস্ত্রাণে চন্দ্র অঙ্কিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিটি ৩০ ফুট উচ্চ হইবে। (ইম্পিঃ গেজ ৩।৩৩৬)। আইন (২।১৫৯) দ্রষ্টব্য।

জুনার * নামে ইহার নামকরণ করেন। শহরটি বিদ্রোহপরায়ণ জিলার অন্তর্গত বলিয়া তিনি দুর্গাধিপতিকে বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধার্থ সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকিতে এবং রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে আদেশ করেন।

সংক্ষেপে বলিয়া যাই। সমগ্র প্রদেশটিরই জলবায়ু বেশ সুন্দর। এখানে নানা রকমের ফল ও ফুল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ফুটি ও আঙ্গুর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। কৃষির অবস্থা বেশ ভাল। জোয়ারী ও বাজরা পাওয়া যায় না। ঝোনা ও সিরকুল † ও অন্যান্য বহু প্রকারের বস্ত্র এখানে সুন্দর বোনা হয়।

গঙ্গা ও যমুনা এখানকার প্রধান নদী। গোমতী, সরযূ, বরুণা এবং অন্যান্য নদীও আছে।

জোনপুরের অন্তর্গত সিংঝোলি হইতে দক্ষিণ (কৈমুর) পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ১৬০ ক্রোশ। গঙ্গার তীরবর্ত্তী চৌসাঘাট হইতে ঘটমপুর পর্য্যন্ত বিস্তার ১২০ ক্রোশ। ইহার পূর্ব্বে বিহার সুবা, পশ্চিমে আকবরাবাদ সুবা, উত্তরে অযোধ্যাসুবা, দক্ষিণে বন্ধুগড় (বান্দা) অবস্থিত। ইহার সরকার ১০টি। ‡ সেগুলি এই—এলাহাবাদ, বেনারস, জোনপুর, চুণার, কালিঞ্জর, খুরা § মাণিকপুর ও আরও ৯টি সরকার। ইহার মহল-সংখ্যা ২৪৭ দুই শত সাতচল্লিশ। এই প্রদেশের রাজস্ব ৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৬ হাজার দাম (৯৪,০১,৫২৫৳ টাকা)।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত।
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* ঘিয়াস-উদ্দীন তুঘলক ও মালিক রজব দুই ভাই ছিলেন। জুনা ঘিয়াস-উদ্দীনের এবং ফিরুজ রজবের পুত্র। (অল্ বদৌনী ১।৩০২) শহর পত্তনের কাহিনীর জন্য (ইলিয়ট ৩।৩০৭) দ্রষ্টব্য।

† দুই রকম সূতী কাপড়। আইন (১।৯৫)।

‡ আইনমতে দশটি। যাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে, ঐ সাতটি, আর বাকি তিনটি এই—গাজিপুর, ভঠঘোরা, কররা। আকবরের আমলে দশটি সরকার, ১৭৭টি মহল ও রাজস্ব ৫৩,১০,৬৯৫।৵১৫ ছিল। (আঃ ২।১৬০)

§ ফতেপুর জিলার অন্তর্গত কোড়া। (আ ২।১৬৭)।

বিবেক।

প্রহরী ধনীর গৃহে আলোক জ্বালিয়া,
সতর্ক পাহারা দেয় শর্ব্বরী জাগিয়া;
অজ্ঞান-তমিস্রা-মগ্ন অন্তর-ভবনে,
বিবেক বর্ত্তিকা জ্বালি' জাগে সঙ্গোপনে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

বিবাদ।

সুখ কহে,—"দেখ দুঃখ আমার কারণ,
জগতের নরনারী করে অন্বেষণ।
সতত করিয়া ঘৃণা তোমার নামেতে,
নিশিদিন ধায় পাছে আমারে লভিতে।"
দুঃখ কহে,—"আমি যদি না রহিতাম হেথা,
বল দেখি এত মান পেতে তুমি কোথা?"

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ত্রিলোক।

পরের হর্ষ বিনাশি' যে করে
পূর্ণ আত্মোদর,
পশুর অধম রাক্ষস সেই,
নিরয় তাহার ঘর।
আত্মজীবন কুশলে রাখি'
ঘুচায় পরের ক্লেশ,—
স্বনামধন্য মানব সে যে
মর্ত্ত্য তাহার দেশ।
যে করে পরের অশ্রু মুছা'তে
আত্মজীবন-দান,
পুণ্য-জনম দেবতা তিনি
স্বর্গ তাঁহার স্থান।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

জীবন সিংহ।

(শিখ-চিত্র)

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত-বর্ষ পূর্ব্বে স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য আত্মদান করিয়া যে মহাত্মা শিখদিগের প্রাণে আত্মবিসর্জ্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলেন, তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি আজও পঞ্জাবের গৃহে গৃহে—হৃদয়ে হৃদয়ে কীর্ত্তিত হইতেছে। অন্যায় অবিচারে তাঁহার পবিত্র শির স্কন্ধচ্যুত হইয়াছে শুনিয়া তৎপুত্র বীরেন্দ্রকেশরী গোবিন্দ সিংহ যখন সমবেত শিখমণ্ডলী মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'আমার এই শিখমণ্ডলী মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যে আপনার বিপদ তুচ্ছ করিয়া মোগলের কবল হইতে গুরুমুণ্ড আনিয়া দিবে?' তখন হীন ঝাড়ুদারবংশীয় জীবন রঙ্গ্‌রেটে নতশিরে নব গুরুর আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তড়িদ্‌গতিতে মোগলের দৃপ্ত রাজধানী দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। মাখন সাহা নামক জনৈক পদস্থ শিখ সেই সময়ে তথায় অবস্থান করিতেন। জীবন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনিও তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রধানতঃ তাঁহারই কৌশলে জীবন গুরুমুণ্ড উদ্ধার করিয়া * সত্বর আনন্দপুর প্রস্থান করেন।

জীবনের হস্তে পবিত্র পিতৃশির সন্দর্শন করিয়া গোবিন্দ এরূপ পুলকিত হইয়া উঠেন যে, তিনি সাগ্রহে তাঁহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠেন—'রঙ্গ্‌রেটে গুরুকে বেটে'। † সেই দিন হইতে রঙ্গ্‌রেটেদের বংশগৌরব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পূর্ব্বে তাহারা চণ্ডালের ন্যায় অস্পৃশ্য ছিল এবং হীনবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। কালক্রমে তাহাদের অনেকেই সে হীনবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষি ও অশ্বপালনে রত হয়। কিন্তু তখনও তাহারা যে অস্পৃশ্য, সেই অস্পৃশ্যই ছিল। কিন্তু জীবনের কার্য্যে তাহাদের সে জাতিগত হীনতা যেন লোকে মুহূর্ত্ত মধ্যে একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল। তখন হইতে

---

* পরে অপর একজন শিখ কৌশলক্রমে তেগ বাহাদুরের মুণ্ডহীন দেহটাও উদ্ধার করিয়া অতি সংগোপনে ভস্মীভূত করে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত 'গুরুগোবিন্দ সিংহ' গ্রন্থের ৩৭।৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† রঙ্গ্‌রেটেরা গুরুর পুত্র।

তাহারা গুরুর প্রিয় শিষ্য বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে লাগিল। গুরুও যেন তাহাদের বংশহীনত্ব লুক্কায়িত রাখিবার উদ্দেশ্যে জীবনের নামের শেষে ক্ষাত্র-ধর্ম্ম-সূচক সিংহ উপাধি যুক্ত করিয়া দিলেন। গুরুর কৃপায় ও আপনার অসম সাহসিকতার ফলে জীবন রঙ্গ্‌রেটে জীবন সিংহ হইয়া উঠিলেন।

জীবন আশাতীত পুরস্কার পাইয়া গুরুপদে আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তখন হইতে গুরুপদসেবাই তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে তিনি ছায়ার ন্যায় গুরুর অনুবর্ত্তী হইতেন; সর্ব্বকার্য্যে গুরুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। প্রসিদ্ধ ভিঙ্গালীর যুদ্ধে তিনি গোবিন্দের একতম প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহারই ন্যায় বন্ধুবর্গের সহায়তা-প্রভাবেই গোবিন্দ সে যুদ্ধে বিজয়শ্রীকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই ন্যায় ভক্ত অনুচরবৃন্দ গুরুর জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল বলিয়াই গুরু মোগলের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া পার্ব্বত্য রাজন্যবর্গকে বশীভূত করতঃ এক বিশাল শিখরাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোবিন্দের চরণাশ্রয় পাইয়া জীবন সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলেন, দেবদেবীর আরাধনা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, গোবিন্দ-চরণই তাঁহার একমাত্র আরাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দের ভাগ্যলক্ষ্মী একান্তই চঞ্চলা হইয়া উঠে। সেই সময় মোগল রাজশক্তি পার্ব্বত্য রাজন্যবর্গের সহায়তায় সুদৃঢ় মুখওয়াল দুর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক গুরুর বিক্রম খর্ব্ব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু সিংহবীর্য্য গুরুকে সহসা পদানত করা যুক্ত-সংহতির পক্ষেও সহজসাধ্য হইল না। ক্রমাগত সাতমাসকাল যুদ্ধ করিয়া গোবিন্দ তাহাদের গতি প্রতিহত করিতে লাগিলেন, কিন্তু অসংখ্য-সৈন্য বিপক্ষদিগকে একেবারে পরাভূত করা অসম্ভব দেখিয়া, গোবিন্দ শেষে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বিপক্ষদল সাগ্রহে দুর্গাবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল।

দুর্গমধ্যে যে সামান্য আহার্য্য ছিল, তাহাতে কয়েকদিন মাত্র চলিল। শেষে খাদ্যের একান্ত অভাব হইতে লাগিল দেখিয়া সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে কত বুঝাইলেন; কিন্তু ক্ষুৎকাতর অনুচরগণ তখন তাঁহার কোন কথাই গ্রাহ্য করিল না। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একযোগে

দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু জীবন সিংহ প্রমুখ মাত্র চল্লিশটি অনুচর কোনমতেই তাঁহার সাহচর্য্য ত্যাগে সম্মত হইলেন না। গোবিন্দ তাঁহাদেরই সাহায্যে নির্ভর করিয়া মোগলের সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং গুপ্তভাবে দুর্গ ত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য দুর্গ চমকৌড়ে উপস্থিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধায়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। সেখানে তাঁহার কতিপয় সৈন্য পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত ছিল। এখন অনেকে আসিয়া দলে যোগ দিতে লাগিল।

এইসকল অপ্রীতিকর সংবাদ শ্রুত হইয়া মোগলেরা দ্বিগুণ তেজে সে দুর্গও আক্রমণ করিল। কিন্তু গোবিন্দ ভীত হইবার লোক ছিলেন না; আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মোগলেরা আক্রমণ করায় গোবিন্দ বিশেষ বলবৃদ্ধি করিতে সমর্থ না হইলেও, মুষ্টিমেয় সৈন্যই তাঁহার নিকট অজেয় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। সম্মুখ যুদ্ধে মোগল-শক্তি দমিত করা অসাধ্য হইলেও, গোবিন্দ অচিরেই মোগলদিগকে আক্রমণ করাই ঠিক করিলেন। তাঁহার সে প্রস্তাব শুনিয়া শিখেরা পরমাহ্লাদে গায়িয়া উঠিল—'শ্রীবাহি গুরুজীকী ফতহ্'।

সমস্ত শিখসৈন্য একযোগে মোগলদিগকে আক্রমণ না করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। প্রথম দল দুর্গ ত্যাগ করিয়া মোগল-হত্যায় প্রবৃত্ত হইলে আর একদল যাইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিল। তাহারা একটু ক্ষীণবল হইলেই আবার একদল সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। এইরূপে দলের পর দল অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। গোবিন্দ একটি উচ্চ স্থান হইতে সে যুদ্ধক্রিয়া দেখিতেছিলেন। পার্শ্বে তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রও উপস্থিত ছিলেন। সে যুদ্ধব্যাপার সন্দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলে, গোবিন্দ স্বয়ং তাঁহাদের যুদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। বালকদ্বয় সে যুদ্ধে যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়া রণভূমে চির নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। তখন গোবিন্দ স্বয়ং কালান্তক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বীরতেজে বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সে আক্রমণে মোগলেরা প্রথমে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু অল্প সময় মধ্যেই তাহারা কতকটা সংযত হইয়া গুরুর দিকে অধিকতর বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। গুরুর জীবন ক্রমেই অতীব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। ভক্ত ও বীর জীবন সিংহ তাহা লক্ষ্য করিলেন। ভাবিলেন—'মরিতেই ত' বসিয়াছি;

আমাদের মৃত্যুতে তত ক্ষতি নাই। গুরুর জীবন রক্ষা পাইলে শিখজাতির উন্নতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। আমার এই ছার জীবন দিয়া গুরুর জীবন রক্ষা করিব।' সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া তখনই তিনি কতিপয় ব্যক্তির সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। গুরু ত' তাহা শুনিয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং প্রথমে কোন ক্রমেই সে প্রস্তাবে মত দিলেন না। কিন্তু যখন শিখেরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, যখন তাঁহাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অপেক্ষা বাঁচিয়া থাকাই তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ, তিনিই শিখ জাতির মেরুদণ্ড,—তাঁহার মৃত্যুতে শিখজাতির যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তখন আর গোবিন্দের কোনই আপত্তি রহিল না। জীবনসিংহও আর মুহূর্ত্তমাত্র ব্যয় না করিয়া গুরুর স্থান অধিকার করিলেন; গুরু সেই অবসরে সরিয়া গেলেন। মোগলেরা জীবনকে গুরু ভ্রম করিয়া ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। গোবিন্দ সরিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন না। সৈন্যদের ন্যায় আপনিও বিপুলতেজে মোগল-নাশে ব্যাপৃত রহিলেন। তাঁহার সে আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া, মোগল সেনাপতিদিগের একজন হত ও অপরে বিষমভাবে আহত হইলেন।

এদিকে জীবন বীরতেজে মোগলদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রু হনন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পসংখ্যক সহায় লইয়া কতক্ষণ আর তিনি যুঝিবেন! মোগলেরা চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। গুরুর সমযোগ্য বীরত্ব দেখাইয়া জীবন দিলবারপতি মহাত্মা মান্নার ন্যায় শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ক্লান্ত হইয়া রণভূমেই চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। জীবন স্বীয় জীবন দিয়া গুরুর জীবন রক্ষা করিলেন।

এই সময় চতুর্দ্দিক্ রজনীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। গোবিন্দ যখন দেখিলেন, জীবন সিংহ মৃত এবং শিখদিগের প্রায় সকলেই হত হইয়াছেন, তখন আর বৃথা কালবিলম্ব করা অনাবশ্যক বুঝিয়া, মাত্র পঞ্চজন সহচর সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে পলাইয়া গেলেন।

তার পর—তার পর কয়েক বৎসরের কঠোর সাধনার ফলে মুক্তসরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়া গোবিন্দ যখন চমকৌড়ে স্বীয় পুত্রদের

সমাধি-মন্দির স্থাপন করেন, তখন সেই সঙ্গে মুক্তাত্মা জীবন সিংহেরও স্মৃতি-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। কালের সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া সে মন্দির আজও দণ্ডায়মান আছে। যখন কোন তীর্থ-যাত্রী বা পরিব্রাজক এই বীরতীর্থ চমকৌড়ে উপস্থিত হন, তখন তথাকার অধিবাসীরা পরমাগ্রহে মন্দিরটি দেখাইয়া বলে—এইখানে সেই বীর-প্রধান জীবন সিংহ গুরুর জন্য জীবন দান করিয়া অক্ষয় স্বর্গ-লাভ করিয়াছেন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাঁওতালপরগণার পল্লীজীবন।

[২]

সাঁওতালদিগের অন্যপ্রকার কিছু বিলাসিতা আছে, এরূপ বোধ হয় না। ইহাদের পরিচ্ছদ কদর্য্য। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েতর পুরুষগণ সাধারণতঃ অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় কালযাপন করে। সঙ্গতিশালী ধনী গৃহস্থের পরিচ্ছদও আমাদের বঙ্গদেশীয় একজন সামান্য ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট। গায়ে সামান্য একটী কোর্ত্তা, পায়ে নাগরাই জুতা, পরিধানে অর্দ্ধমলিন আজানু-দৃঢ়বদ্ধ বসন, হস্তে বংশযষ্টি, ইহাই একজন সাঁওতাল ভূমিনিবাসী ভদ্রলোকের চিত্র। রমণীগণ দেশজাত স্থূলবস্ত্রে সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া পরিধান করে। কিন্তু, কি পুরুষ, কি স্ত্রী কাহারও পরিচ্ছন্নতা বোধ কিছুমাত্র নাই। সাধারণ লোকে সচরাচর স্নানাদি করে না, বস্ত্রাদিও অনেক দিবস পরে একদিন ধৌত করে। বিবাহাদি বিশেষ কোনও ক্রিয়া-উপলক্ষে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত করিয়া লাল, পীত অথবা নীলবর্ণে রঞ্জিত করে; এরূপ একখানি কাপড় পুনরায় পরিষ্কৃত না হইয়া দুই তিন মাস ক্রমাগত পরিহিত হইয়া থাকে। এদেশে অবগাহনের বিশেষ অন্তরায়ও আছে। অনেক স্থানেই এক প্রকার জলকষ্ট বলিলেই চলে। গ্রামের মধ্যে একটী কূপ থাকিলে, অথবা নিকটে সামান্য জলাশয় (বাঁধ) থাকিলে পল্লীবাসিনীগণ তথায় আসিয়া জল লইয়া যায়। কৃষকগণ তথায় গবাদিকে জলপান করায় এবং স্নানাদি করিয়া থাকে। এরূপ বাঁধ সর্ব্বত্র থাকে না। পুষ্করিণী-খননও এই পার্ব্বত্য প্রদেশে যে দুরূহ ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। পার্ব্বত্য নদীগুলির অবস্থা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে গ্রামের

সন্নিকটে এইরূপ নদী আছে তথায় গ্রামবাসিগণ নদী হইতেই জলসংগ্রহ করে। পল্লীবাসিনীগণ একত্র দুই তিনজন বালুকাময় কলস রাখিয়া ক্রমাগত মৃত্তিকা উত্তোলন করিতেছে এবং সেই উৎখাত স্থানে সঞ্চিত জলদ্বারা কলসপূর্ণ করিতেছে,—এইরূপ দৃশ্য এই সকল নদীমধ্যে সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক দিকে উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে বহমানা বিশালতোয়া গঙ্গানদী ও অন্য দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিতা বরাকরনদী ভিন্ন সাঁওতালপরগণার অপর কোনও নদী অতিক্রম করিতে নৌকা বা ভেলার সাহায্য কদাপি প্রয়োজন হয় না। অনেকেই নৌকা কি পদার্থ জানে না। আমরা জানি, ইংরাজী বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর এদেশবাসী দুই একটী বালককে নৌকা কিরূপ দ্রব্য ইহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

এ দেশে শিক্ষাবিস্তার অতি অল্পই হইয়াছে। অশিক্ষিত লোক সাধারণতঃ সরলস্বভাব। কিন্তু, যাহারা বাঙ্গালীদের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কোথায়ও বা স্বাস্থ্যসংস্কারের ব্যপদেশে, কোথায়ও বা কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্গসন্তানগণ বঙ্গমাতার সমতলক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের সঙ্গমক্ষেত্র সাঁওতালভূমিতে আসিয়া বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন। সাঁওতালপরগণার সর্ব্বত্রই অল্পাধিক বাঙ্গালীর বাস থাকিলেও, স্বাস্থ্যসংস্কারোদ্দেশে দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানেই অধিকাংশ বঙ্গবাসী আসিয়া বাস করে। আমাদের বাঙ্গালীজাতির একটী বিশেষত্ব এই যে, আমাদের চরিত্রের বৈদ্যুতিকক্রিয়া বড় প্রবল; আমাদের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণও, অসভ্য হউক বা বর্ব্বর হউক, ত্বরায় চতুরতাতড়িতাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীপ্রধান দেওঘর ও তৎনিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণ বাঙ্গালীবাবুর মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্য না হউক, তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে শিখিয়াছে। যাহা হউক, যাহারা সহরে সর্ব্বদা যাতায়াত করে এরূপ গ্রামবাসিগণের ভিতরে একটু সরলতার অভাব হইলেও আমরা একটু দূরে সরিয়া গেলেই গ্রাম্যরমণী ও কৃষাণবালকের অকপটভাব দর্শন করিয়া হৃদয় জুড়াইতে পারি। এস্থানের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ দৃঢ়কায় হইলেও খুব সাহসী বলিয়া বোধ হয় না। উচ্চ নীচ, স্ত্রী পুরুষ, সকলেই ভূতের ভয় করে এবং প্রেতযোনির পূজা বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে করিয়া থাকে।

সাঁওতালভূমি প্রধানতঃ সাঁওতালনামক অসভ্যজাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইলেও ইহারা এস্থানের আদিম ও সমগ্র অধিবাসী নহে। সাঁওতালপরগণার উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজমহল-পর্ব্বতাভ্যন্তরে পাহাড়িয়া জাতি বাস করে। ইহারাই অতি প্রাচীনকাল হইতে এস্থানে বাস করিয়া আসিতেছে। সাঁওতালগণ রাঁচি, মানভূম, বীরভূম ও মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রথমে বাস করিত, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, ইহাদের স্থায়ী বাসস্থান প্রায়ই থাকিত না। ইহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পরিভ্রমণশীল একপ্রকার যাযাবর জাতির মত ছিল, অবশেষে রাজমহলের নিকটবর্ত্তী উর্ব্বর স্থানসমূহে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা-উপার্জ্জন করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে জাতির নামানুসারে সাঁওতালপরগণা জেলার নামকরণ হইয়াছে, তাহারা অনেককাল পর্য্যন্ত ব্রিটীশরাজের অপরিজ্ঞাত ছিল। ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়াও পাহাড়িয়াগণ ও সাঁওতালগণ দামানি-কো অর্থাৎ রাজমহাল পর্ব্বত ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কিরূপ জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, তাহা অতঃপর বিশেষভাবে বর্ণনীয়।

রাজমহল, গড্ডা, জামতাড়া, ও দুমকার অধীনস্থ স্থানসমূহেই সাঁওতাল অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। অন্যান্য অংশে অল্পসংখ্যক সাঁওতাল বাস করে। দেওঘর উপবিভাগের অধীনে সাঁওতাল নাই বলিলেও চলে। সাঁওতাল ভিন্ন বিভিন্নজাতীয় অধিবাসী সাঁওতালপরগণার সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ, ছত্রী ও লালাকায়স্থভিন্ন ভূঁইয়া, কাহার, কুরি, ধানুক, গোয়ালা, বেনে, নৌয়া (নাপিত), রাজওয়ার, পরিগ, মেতুরী, কেওট, ডোম, হাড়ি, চামার, মুসহার, শুঁড়ি, তৈলী, নৈইয়া, কোল, বাউরী, সুখলকাণ্ডা রাজওয়ার, দোসাধ, তাতেয়া অঘোরী ও পাশীজাতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন অল্পসংখ্যক মিয়াজাতি (মুসলমান) কোন কোনও স্থানে বাস করে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের প্রভাবে সর্ব্বত্র সাঁওতাল ও অন্যান্য জাতিগণ খ্রীষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু রাঁচী ও অন্যান্য-স্থানের অসভ্য অধিবাসীদের ন্যায় ইহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষপাতী নহে। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সর্ব্বদা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে অভিলাষী। উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুগণ তাহাদিগকে বিশেষ সহানুভূতির চক্ষে না দেখিলেও তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকের মতাবলম্বী হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে ঘৃণা করে না। অসভ্য হইলেও

ইহাদের সংস্কারের দৃঢ়তা ও জাতীয়তা আছে, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে একজন ইংরাজ লেখক বলেন, সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াগণের মধ্যে যাহারা হিন্দুধর্ম্মমুগ্ধ না হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই পাদ্রিগণের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। ভুঁইয়া প্রভৃতি ষড়্‌বিংশতি প্রকার জাতির মধ্যে প্রথমোক্ত একাদশ জাতি বিশুদ্ধ হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ব্রাহ্মণ, ছত্রী ও কায়স্থগণ ইহাদের জলগ্রহণ করিয়া থাকে। ভুঁইয়াগণ দ্রাবিড়ীজাতিভুক্ত। কালক্রমে ইহারা হিন্দুধর্ম্মাচারী হয় ও বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহারা সাঁওতালপরগণা আক্রমণ করিয়া স্থানে স্থানে বিশেষ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে বীরভূমের পাঠানদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। বীরভূমের রাজারা এই বিদ্রোহাচারী প্রজাগণকে অধীনতায় রাখিবার জন্য স্বকীয় অধিকারভুক্ত স্থান-সমূহে শান্তিরক্ষা ও সামরিক সাহায্য প্রদান সর্ত্তে কোথায়ও বা নিষ্কর কোথায়ও বা সামান্যমাত্র কর ধার্য্য করিয়া, তাহাদিগকে ঘাটওয়ালী নামক সম্পত্তি প্রদান করেন। অতঃপর সাঁওতালপরগণা ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর ১৮১৪ সালের ২৯ আইন দ্বারা দেওঘর উপবিভাগের প্রায় সমস্ত ভূমি ঘাটওয়ালী সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং ঘাটওয়ালগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আংশিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়। এই ঘাটওয়ালদিগের মধ্যে অনেকেই ভুঁইয়া জাতি, কিন্তু ইহারা রাজপুতবংশাবতংস বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। ইহারা সকলেই হিন্দুদিগের আচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নিম্ন-শ্রেণীয় জাতির আচারব্যবহার তাদৃশ প্রশংসনীয় নহে। আহারবিহার-সম্বন্ধে ইহারা কোনরূপ সুরুচির পরিচয় প্রদান করে না। সুখলকাণ্ডা রাজওয়ার জাতি বিড়ালের মাংস পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করে। দোসাধজাতি ভীষণ চৌর-প্রকৃতি। ইহারা তস্করবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ করা কোন প্রকারে হেয় মনে করে না এবং তাহাদের জীবনোপায় কি জিজ্ঞাসা করিলে অম্লান-বদনে "পেসা—চুরি" স্বীকার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ছত্রী ও কায়স্থগণ মৎস্য মাংস আহার করিয়া থাকে, হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য কখনও ব্যবহার করে না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

ঝঞ্ঝা।

ভাঙিল নিমেষে রঙ্গ-মহল,
নিবিল গোধূলি গোলাপ পাটল,
লুকোচুরি শেষ কিরণ-হুরীর;
মণির 'মিনার' মেঘের পুরীর
কোথায় গেল রে মিলা'য়ে!

হেরি নৈর্ঋতে মথি'ছে মরুৎ;
ঊর্দ্ধশুণ্ড দিগ্গজ-যূথ,
পন্নগ-শিখা স্ফুরৎ প্রতাপ
গুরু গর্জ্জৎ জলদ-কলাপ
জ্বলে কি দীপক জ্বালা'য়ে!

ওঠে উল্লোল, বিদ্রোহ-দোল,
মত্ত-নটন-মন্থন-রোল,
কোটি-কোদণ্ড-টঙ্কার-রব
বাজে পটতাল, রুদ্রোৎসব
নীল মেঘাদ্রি দোলা'য়ে।

লুটিল বালুকা-কুহেলী-আঁচল,
ছুটিল তটিনী ক্ষিপ্ত উতল,
ফুৎকারে কা'র চূর্ণ ভূ'পাড়?
অম্বর ভরি' ওকি তোলপাড়
ওঠে চরাচর কাঁপা'য়ে!

কোন্ মোহিনীর বিজয়-চমূর
অযুত তুরীর বিচিত্র সুর
বাজে উতরোল, আলোর আখর
লিখিল গগনে কোন্ যাদুকর
অনলের ফুল ছড়া'য়ে?

এমনি উজল ক্ষণিকা-খেলায়,
খণ্ড-প্রলয়-দীপ্ত জ্বালায়
রহিয়া রহিয়া সহিয়া সহিয়া
আছি গো অসাড় পাষাণ হইয়া
—আশার দীপালী নিভা'য়ে।

দখিণ-বায়ুর বিলোল-বিলাস,
লতিকা-বিতানে যূথিকার বাস,
নীবার-নিকরে দিবার কিরণ
আর তো তেমন মাতায় না মন
শোভার পশরা সাজা'য়ে।

নাই সে মোহিনী পৌর্ণমাসীতে
চিত্রা-রোহিণী-চাঁদের হাসিতে;
নীহারিকা-পথে মনোহারিকার
ফোটেনা সীঁথির রতন-বিথার
জ্যোতির সেতার বাজা'য়ে!

কে খুলে নিল সে হাসির মুখস?
নিরখি' পৃথ্বী বিকৃত বিরস—
করে চুরমার সুখ-ফুলদান,
ফুরা'ল শুক্র আলোর তুফান,
এল কজ্জল ঘনা'য়ে।

ঢাকিল মসীতে মানস-কানন,
গ্রাসিল যা' কিছু আঁখি-রঞ্জন,
আঁধারে বিধুর ধূ ধূ করে মাঠ
কপিশ-আকাশে উদাসীন ঠাট
কে আছে স্তব্ধ দাঁড়া'য়ে?

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মার্ব্বল পাথরের পাহাড় ও মদন-মহল।

১

জব্বলপুরের অদূরস্থিত সুন্দর নর্ম্মদা-প্রপাতের জলরাশি কিয়দ্দূরে ভীষণ বেগে বহিয়া পরে সমতল স্থানে উপনীত হইয়াছে, সুতরাং তথায় স্রোতোবেগ কম হওয়ায় নৌকাযোগে বিচরণের বেশ সুবিধা। দর্শকমাত্র, বিশেষতঃ ইংরাজেরা, এই স্থানে নর্ম্মদার উপর নৌকা-ভ্রমণ করিতে আসেন। নর্ম্মদার এই দুর্ব্বল-স্রোত অংশের দৈর্ঘ্য এক মাইল হইবে এবং উহার সমুদয় স্থান দেখিয়া ফিরিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। নৌকায় উঠিবার ঘাট ভৃগুমুনির আশ্রম হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। তথায় সাধারণের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্ট নৌকা ও তাহার চালক রাখিয়া দিয়াছেন। নৌকার ভাড়া আমার ১৷৷৹ দেড় টাকা লাগিয়াছিল। এই এক মাইল সমতল অংশের কোন দিকেই বাহিরে যাইতে পারা যায় না, কারণ জলরাশি এক দিকে উপরিস্থ প্রস্তরস্তর হইতে এই সমতল অংশের উপর পতিত হইতেছে, অন্য দিকে এই সমতল অংশ হইতে নিম্নস্থ প্রস্তর-স্তরে পতিত হইতেছে। এই সমতল অংশের বিস্তার তাদৃশ অধিক নহে এবং সর্ব্বত্র সমানও নহে, ২০৷২৫ হইতে কোথাও কোথাও বোধ হয় শত হস্ত পর্য্যন্ত; কিন্তু এই অল্প বিস্তৃতির পরিমাণে গভীরত্ব অত্যন্ত অধিক; শুনিলাম স্থানে স্থানে ৮০ হস্ত গভীর। যেরূপ সকল গিরি-নদীর হইয়া থাকে, এখানকার জল অতি নির্ম্মল, উপর হইতে ভিতরে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। নৌকা-বাহকেরা তাহাদের নিমজ্জন-কৌশল দেখাইবার জন্য জলে কিছু ফেলিয়া দিতে বলে। মধ্য-নদীতে জলে কোন ক্ষুদ্র দ্রব্য, এমন কি, সিকি দুয়ানি, ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ নৌকা-বাহকেরা ডুব দিয়া তাহা তুলিয়া ফেলে। ইহা বেশ দেখিবার বিষয়, তবে উদ্ধৃত মুদ্রা উদ্ধারকারীর প্রাপ্য হয়। জল মৎস্যে পূর্ণ। দশ সের পর্য্যন্ত ওজনের বড় বড় মৎস্য আছে।

নৌকায় উঠিবার ঘাট হইতে কিয়দ্দূরে যাইলে জব্বলপুরের বিখ্যাত 'মার্ব্বল-রক' দৃষ্ট হয়। তথায় দুই পার্শ্বে উচ্চ অমল শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তরের শৈল, তাহার মধ্যে কুল-কুল-নাদিনী তরঙ্গিনী,—ইহা যে কি সুন্দর দৃশ্য, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। বোধ হয় পৃথিবীতে অন্যত্র এরূপ দৃশ্য নাই

মর্ম্মরশৈল-মালা একেবারে জল হইতে সমভাবে উঠিয়া উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদের মস্তকোপরি মাটি পড়িয়া উদ্ভিজ্জ জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু নদী-পার্শ্বস্থ গাত্রে কুত্রাপি কোন রেখাও নাই, সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ বিমল—কোন কোন স্থানে ঈষৎ নীলাভ বা "আশ্‌মানী" বর্ণ; কিন্তু অধিকাংশ স্থান তুষার-শুভ্র। নদীর কোন কোন অংশ নিতান্ত সংকীর্ণ, অথচ উভয় পার্শ্বস্থ গিরি অতি উচ্চ, এরূপ স্থান দিয়া নৌকা যাইবার সময় মনে হয় যেন মস্তকের উপর প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল। শৈলগাত্রের গঠন নানা স্থানে নানারূপ। কোথায় বোধ হয় যেন হাত দিয়া মাথম লেপিয়া পর্ব্বত করিয়া রাখা হইয়াছে। কোথায় বা কিয়দংশ সচ্ছিদ্র, ঠিক যেন মধুখ-চক্র। দুই এক স্থানে হস্তি পদ-চিহ্নের ন্যায় গঠন। অধিকাংশ স্থান অতি-মসৃণ এবং এক স্থান এত মসৃণ যে, তাহার নাম হইয়াছে "বানর-স্খলন" বা "Monkey Slip", অর্থাৎ সে স্থানে আরোহণ বানরেরও অসাধ্য। দুই পার্শ্বে এইরূপ বিচিত্র-গঠন ধবল মর্ম্মর-শৈল, মধ্যে কল্লোলিনী নদী—বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে নৌ-বিচরণ করিতে করিতে দিবালোকেই এই দৃশ্যের শোভাতে মন মোহিত হইয়া যায়; আবার পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রকিরণে সেই শোভা অপূর্ব্বরূপে পরিবর্দ্ধিত হইলে বোধ হয় বা মর্ত্ত্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোন পরী-স্থানে উপনীত হইয়াছি; অথবা প্রকৃতি-দেবী, যেন নর-শিল্পকে তাচ্ছল্য করিবার জন্যই, বা সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান তাঁহার নিয়ম-বন্ধন-রহিত অন্য সমুদয় যথেচ্ছ সৃষ্টির ভাব পরিত্যাগ করিয়া, বিশেষ যত্নের সহিত এই অতুল রমণীয় লীলা-স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন।

এই মর্ম্মর-শৈল-নদীর ঘাটের অদূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। তাহাতে কয়েক ঘর দরিদ্র গৃহস্থের বাস। নিকটে অজস্রপ্রাপ্য বিবিধ বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তর হইতে ইহারা দেবতা, পুত্তলিকা ও অন্য নানা প্রকার গঠন প্রস্তুত করে এবং প্রথমে অধিক দর চাহে বটে কিন্তু স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে। ইহাই ইহাদের একমাত্র জীবিকা। যাঁহারা এখানে আসেন, তাঁহারা এই স্থানের স্মৃতিচিহ্নরূপ কোন-না-কোন দ্রব্য ইহাদের নিকট হইতে ক্রয় করেন। আর এ প্রদেশে আসিলে ইহাদের নিকট হইতে কিছু ক্রয় করাও উচিত, কারণ কবে কে আসিয়া কিছু কিনিবে, সেই আশায় এই দুঃখী লোকেরা এতদূর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পর অনুসন্ধানে জানিলাম, প্রস্তরের

গঠনে ইহাদের এত কম উপার্জ্জন হয় এবং উহা এতদূর কষ্টসাধ্য কার্য্য যে, অন্ততঃ দানোদ্দেশেও কিছু ক্রয় করা উচিত। একটী স্ত্রীলোককে দেখিলাম, প্রস্তর ঘষিতে ঘষিতে তাহার অঙ্গুলির চর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে। আমি এখানে শিবলিঙ্গ সহিত একটী শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দির ক্রয় করিলাম।

অতঃপর জব্বলপুরাভিমুখে প্রতিগমন করিতে লাগিলাম। ৪ মাইল আসিবার পর (অর্থাৎ জব্বলপুর হইতে ৬ মাইল দূরে) বাম দিকে এক উচ্চ গিরিশিখরের উপর জৈনদিগের পরেশনাথের এক মন্দির দৃষ্ট হইল। দূর হইতে মন্দিরটী অতি সুন্দর দেখাইল। কিন্তু পর্ব্বতের তলদেশ হইতে মন্দিরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সর্পগতিবিশিষ্ট সোপানরাজিই বিশেষ চক্ষু আকর্ষণ করে। 'সর্প-গতি' বলিলাম—তাহার কারণ, যাঁহারা পর্ব্বত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, পর্ব্বতের গায়ে সরলভাবে পথ প্রস্তুত করিতে পারা যায় না, ক্রম-নিম্ন ভাবের সুবিধা দেখিয়া সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া বক্রগামী ঊর্দ্ধমুখ পথ প্রস্তুত করিতে হয়। ভারতবর্ষে জৈনধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা অতি অল্প; কিন্তু তাঁহারা মহা ধনী ও ধর্ম্মোৎসাহী; সেই কারণে হউক বা তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রথামতই হউক, পর্ব্বতশৃঙ্গে ও অন্য কোনরূপ দুর্গম স্থানে সুবিধা পাইলেই তাঁহারা ব্যয়ের দিকে কোন দৃষ্টি না করিয়া তথায় তাঁহাদের উপাস্য দেব পরেশনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই তাঁহাদের এইরূপ মন্দির দৃষ্ট হয়।

জব্বলপুরের দিকে আর তিন মাইল যাইবার পর অর্থাৎ জব্বলপুর হইতে তিন মাইল দূরে মদন-মহলের পথ আরম্ভ হইয়াছে। এই পথের মুখ হইতে কিছুদূর যাইবার পর আর গাড়ী চলে না, পদব্রজে যাইতে হয়। এই স্থান হইতে মদন-মহল এক মাইল দূরে এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ঐ পাহাড়ের উচ্চতা এক সহস্র ফুট। স্থানীয় গ্রামস্থ এক ব্যক্তিকে যৎকিঞ্চিৎ দিবার স্বীকার করিয়া আমার পথ-প্রদর্শক করিলাম। কিছু বালুকা-পথ ভাঙ্গিবার পর পাহাড়ে উঠিতে হয়। উঠিবার পথ নিতান্ত কদর্য্য ও ক্লেশকর। কোথাও ভগ্ন, কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন, স্থানে স্থানে প্রস্তরখণ্ড বিকীর্ণ—কষ্টে মৃদুগতিতে তৎসমুদয় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলাম। মদন-মহলকে দূর হইতে দেখিতে পাইবার উদ্দেশে উৎসুক হইয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

কিন্তু যতক্ষণ না মদন-মহলের একেবারে সম্মুখে গিয়া পৌছিলাম, ততক্ষণ উহা দৃষ্টিগোচর হইল না। তাহার কারণ, চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এত গিরি-শৃঙ্গ ব্যাপ্ত যে, তৎসমুদয় দূর হইতে মদন-মহলকে একরূপ সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মদন-মহলের ন্যায় কোন প্রাসাদ যে পর্ব্বতোপরি আছে, তাহা দূর হইতে কিছুতেই অনুভব করিতে পারা যায় না। স্থানটী অতি নির্জ্জন, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন কোন দস্যুদলপতি বা কোন বিদ্রোহীদলের নেতা গোপন-বাসের জন্য এই বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মদন-মহল হিন্দু রাজাদের সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরাজদের অধিকারের পূর্ব্বে জব্বলপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ নিকটস্থ সাগর প্রদেশের রাজাদের অধীন ছিল। তাঁহারা যখন জব্বলপুর বিভাগে দরবার ও প্রজাদের মামলা মোকদ্দমা বিচারাদি করিতে আসিতেন, তখন মদন-মহলে বাস করিতেন ও সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভা ও কাছারী করিতেন। মদন-মহল প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল বাটী, আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি উচ্চ। বাটীটির প্রধান আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহার পূর্ব্ব ভাগের ভিত্তি মৃত্তিকার ভিতর নাই। মৃত্তিকার উপর দুই বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পরস্পর কিছু ব্যবধানে দণ্ডায়মান, উহাদের তলদেশ ও উপরি-দেশ অসমতল। এই দুই প্রস্তরের উপর আর এক বৃহৎ প্রস্তর কেবল আল্‌গাভাবে সাজান আছে, কোনও মশলা দ্বারা সংযুক্ত নহে। এই উপরিস্থ প্রস্তরের উপর মদন-মহল বাটী গাঁথা হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়, এই তিন খণ্ড প্রস্তরের যে কোনটী সহজে নড়িয়া সরিয়া যাইতে পারে এবং তখনই এই আকাশ-ভিত্তি বাটী ভূমিসাৎ হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৌশল ও হিসাবের সহিত এই বাটী প্রস্তুত হইয়াছে যে, কত কাল হইয়া গেল, কত ঝটিকা ও বজ্রাঘাত উহার উপর দিয়া গিয়াছে, কত ভূমিকম্প উহাকে কাঁপাইয়াছে, কিন্তু মদন-মহলের কোনও হানি হয় নাই।

মদন-মহলের উত্তরে এক বৃহৎ প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে পংক্তি করিয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ আছে। যখন রাজা মদন-মহলে বাস করিতেন, তখন তাঁহার কর্ম্মচারী ও ভৃত্যেরা ঐ গৃহগুলিতে থাকিত। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাজকীয় পাকশালা ও রাণীদের স্নানাগার অবস্থিত এবং অন্যের অলক্ষ্যে অন্তঃপুরিকাবর্গের তথায় যাইবার জন্য মদন-মহল

হইতে মৃত্তিকার নিম্ন দিয়া সুরঙ্গপথ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় নিতান্ত ভগ্ন দশায় আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মদন-মহলের কোন ভগ্ন স্থান হইতে এক তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তাহাতে প্রকাশ যে, নয় লক্ষ টাকা মদন-মহলের কোন স্থানে মৃত্তিকা-নিম্নে প্রোথিত আছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত নানা অনুসন্ধানেও সেই গুপ্ত ধন বাহির হয় নাই।

বলা বাহুল্য, দেশের অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তির ন্যায় মদন-মহল এক্ষণে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। নিজ মদন-মহল বাটীটি গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃতাবস্থায় রাখিয়াছেন, কিন্তু বহির্ব্বাটী ও অন্যান্য অংশ অযত্নে ও কালচক্র-পেষণে ক্রমে ধরাশায়ী হইতেছে। মদন-মহলে কোন অধিবাসী নাই, উহা সদা উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে, যে কেহ উহার ভিতর যাইতে পারেন, কেবল রাত্রিবাসের ইচ্ছা হইলে স্থানীয় কর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হয়। কিন্তু রাত্রিবাস করিতে হইলে সশস্ত্র ও সুরক্ষিত হইয়া থাকার বন্দোবস্ত করা উচিত, কারণ এই বিজন পার্ব্বত্য স্থানে সকল প্রকার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং বিপদ ঘটিলে নিকটে কোন সাহায্য পাইবারও আশা নাই।

বহু দূর হইতে মনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই, সুদীর্ঘ বক্র পাহাড়ে সঙ্কীর্ণ পথ, পথের ধারে সর্ব্বত্র পাহাড়ের অসংখ্য স্তূপ ব্যাপ্ত, উহাদের জন্য পথ অতি সামান্য সামান্য অংশ পরিমাণে ক্রমে ক্রমে চক্ষের সম্মুখে বাহির হয় এবং সর্ব্বশেষে বহু শতাব্দীর পুরাতন, অদৃশ্য নির্জ্জন গুপ্ত পরিত্যক্ত ভয়াবহ অট্টালিকা—এইরূপ স্থানে যাইলে মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়? তদুপরি আবার এই মদন-মহলের সহিত এক ভীষণ কাহিনী সংযুক্ত আছে, তাহা বিস্ময় ও লোমাঞ্চকর।

২

মদন-মহলের নামকরণ-সম্বন্ধে নিম্নরূপ জনশ্রুতি শুনিলাম: যে রাজার সময় মদন-মহল নির্ম্মিত হয়, তিনি তাঁহার স্থপতিপ্রধানকে অনুমতি করিলেন, এমন এক বিচিত্র কৌশলবিশিষ্ট গঠন কর, যেরূপ কেহ কখন দেখে নাই। স্থপতি-প্রধান কোনরূপ সম্পূর্ণ নূতন কৌশল ভাবিয়া পাইলেন না; অবশেষে উপস্থিত বুদ্ধিবলে সম্মুখে পতিত তিন খণ্ড অসংলগ্ন প্রস্তরের উপর ভিত্তি

স্থাপিত করিয়া এই মদন-মহল নির্ম্মাণ করিলেন। রাজা যথার্থই এক অপরূপ নূতন গঠন দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্থপতিকে তাঁহার যে পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা, তাহা চাহিতে বলিলেন। স্থপতি-প্রধান বলিলেন, আমি ধন সম্পত্তি চাহি না, কারণ তাহা অস্থায়ী, আমার প্রার্থনা আমার নামে এই বাটীর নামকরণ হয়, তাহাতে আমার নাম চিরস্মরণীয় হইবে এবং তাহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হইবে। রাজা সন্তোষের সহিত তাহাই স্বীকার করিলেন। স্থপতির নাম ছিল মদন, সুতরাং তাহা হইতে এই বাটীর নাম হইল মদন-মহল বা মদন-কৃত বাটী।

মদন-মহলের নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে আর একটী অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। তাহা উপন্যাসে বর্ণনার উপযুক্ত, কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই, সুতরাং সরল প্রকারে আমি যেরূপ পারিব সেইরূপ বলিব।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী ঘোন্দ দেশে তলব বংশীয় এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার নাম বুধবাহন। তাঁহার সময় ঘোন্দ রাজ্য অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিল এবং প্রজাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার সীমা ছিল না। রাজার গুণে ও সুশাসনে প্রজারা তাঁহার একান্ত ভক্ত ছিল। রাজার দুই পুত্র, পুত্রেরা সে কালের রাজোপযুক্ত শস্ত্রবিদ্যায় এমন পারদর্শী হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ-প্রাসাদের প্রকৃত শ্রী ছিলেন রাজকুমারী তারিণী। তাঁহার যেমন নিরুপম সৌন্দর্য্য, তেমনই বিদ্যাবুদ্ধি। পিতার রাজ্যের সমুদয় ব্যক্তি তাঁহাকে দেবীর ন্যায় সম্মান করিত এবং ভারতের সমুদয় রাজপুত তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে, এই চিন্তায় বহুদিন হইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর রাজকুমারীর জন্মদিনে তাঁহার জন্মতিথির পূজা হইত। ষোড়শ বর্ষে পদার্পণের দিন মহা সমারোহে রাজকুমারীর জন্মতিথি-উৎসব হইল। তখন রাজ-জ্যোতিষীরা রাজাকে জানাইলেন, এক্ষণে কুমারীর বিবাহের যোগ্য বয়স হইয়াছে। তাঁহাদের উপদেশ মত রাজা বুধবাহন ভাট দ্বারা ভারতময় সকল রাজা ও রাজকুমারকে নিজ রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন এবং প্রচার করিলেন যাঁহাকে তিনি উপযুক্ত বোধ করিবেন, তাঁহাকে নিজ কন্যারত্ন সম্প্রদান করিবেন।

রাজা বুধবাহন নিমন্ত্রিত রাজগণের জন্য যতদূর পারিলেন আয়োজন

করিলেন—রাজপ্রাসাদ ও অন্য বিস্তর অট্টালিকা সজ্জিত করিলেন এবং তদ্ব্যতীত শত শত রাজোপযুক্ত রেশমী শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কিন্তু রাজকুমারী তারিণীর অলোকসামান্য গুণ ও সৌন্দর্য্যের সৌরভ এত ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহাতে এত রাজা ও রাজপুত্রেরা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, রাজা বুধবাহন স্থান সংকুলান করিতে পারিলেন না। কয় সপ্তাহ যাবৎ রাজধানীতে প্রতি-দ্বন্দ্বীদের অস্ত্র-পরীক্ষা ও দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ এবং আমোদ-আহ্লাদের স্রোত চলিল।

পরিশেষে রাজমন্ত্রীরা খান্দেশের রাজা গিরণকে রাজকুমারীর উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। এই খান্দেশের রাজার রাজ্য সম্পত্তি প্রভৃতি রাজা বুধবাহনের ন্যায় ছিল, কিন্তু তাঁহার বয়স কিছু অধিক হইয়াছিল এবং দেখি-তেও তিনি সুপুরুষ ছিলেন না। এ কারণে রাজা বুধবাহন আপত্তি করিয়া তাঁহার মন্ত্রীবর্গকে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা পুনরায় ঐ খান্দেশের রাজাকেই স্থির করিলেন এবং বিবাহের দিন নির্দ্দেশ করিয়া রাজ্য-মধ্যে ঘোষণা করিলেন। তখন অন্যান্য রাজা ও রাজপুত্রেরা ভগ্নমনা হইয়া ক্রমে চলিয়া গেলেন। বিবাহের এখনও কয়েক দিন বাকী ছিল। রাজা গিরণ প্রতিদিন ভাবী শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন; রাজপ্রাসাদে প্রমোদের সীমা রহিল না।

কিন্তু সেই প্রমোদের আকাশের কোণে একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিল। রাজা ও মন্ত্রীরা যাহা স্থির করিলেন, কন্দর্পদেব গোপনে তাহার বিপর্য্যয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজা গিরণ তাঁহার অনেকগুলি পারিষদ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফুলনাথ। ইনি রাজ-গায়ক। ইঁহার সঙ্গীত যেমন মধুর ছিল, তেমনই ইনি অতি সুন্দর যুবা পুরুষ ছিলেন এবং কথাবার্ত্তাতেও তেমনই সুরসিক ছিলেন। ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিরণ ভাবী শ্বশুরালয়ে যাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, অতি অল্পকাল মধ্যেই ফুলনাথ, রাজা বুধবাহন ও রাজ-প্রাসাদের অন্য সকলের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন হইয়া উঠিলেন। তৎকালের আচারমত গায়ক ফুলনাথ প্রত্যহ রাজান্তঃপুরে যাইয়া সঙ্গীত দ্বারা রমণীদের মনোরঞ্জন করিতে অনুরত হইলেন এবং ইহাতেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

কুমারী তারিণী অচিরে ফুলনাথের রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং

যুবা ফুলনাশ্বও তাঁহাকে দেখিয়া পৃথিবীর অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে গোপনে তাঁহাদের মিলনেরও অসদ্ভাব হইল না। তখন উভয়ে উভয়ের চির-প্রেম অঙ্গীকার করিলেন। যৌবনকালের নব-প্রেম অন্ধ ; কাহাকে ভাল-বাসা উচিত, কি হইতে কি হইবে, এ বিবেচনা তখন থাকে না ; প্রেম হইলেই হইল, তাহাতে যে ফল বা যে পরিণাম হয় হউক। ইঁহাদের পক্ষেও তাহাই হইল। ক্রমে বিবাহের দিন নিকটে আসিতে লাগিল। তখন রাজকুমারী কি উপায়ে ফুলনাশ্বের সহিত রাজবাটী হইতে পলাইতে পারেন, তাহার উপায়-চিন্তা হইতে লাগিল। শীঘ্র সুবিধাও হইয়া উঠিল। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্ব-রাত্রিতেই রাজপ্রাসাদে মহা ধূমধাম, চতুর্দ্দিকে গীতবাদ্য ও ভোজন হইতে লাগিল, ক্রমে সুরাস্রোত প্রবাহিত হইল। সকলেই আমোদপ্রমোদে বা নেশায় মগ্ন, কে কাহাকে দেখে, ঠিক নাই। ফুলনাশ্ব সেদিন অসুখের ভাণ করিয়া রাজ-সভায় আসেন নাই। গাঢ় নিশীথে রাজকুমারী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজবাটীর বাহিরে আসিলেন এবং এক অশ্বারোহী—ফুলনাশ্ব—তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজকুমারীর পলায়ন-সংবাদ রাজবাটীতে প্রচারিত হইল। রাজা তখন ক্রোধে, ক্ষোভে ও লজ্জায় অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কুড়িজন অশ্বারোহী-সহ স্বয়ংই পলাতকদিগকে ধরিতে বাহির হইলেন। এদিকে পলাতকদিগের কি দশা হইল ? রাজকুমারী তারিণী চিরকাল অন্তঃপুরে বাস করিয়াছেন এবং ফুলনাশ্ব বিদেশী ; উভয়ের কেহই পথ চিনেন না। তাহার পর সে রাত্রি ঘোর অন্ধকার। তাঁহারা পথ হারাইয়া সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকালে দেখিলেন, তাঁহারা নিকটস্থ এক পাহাড়ের উপর উপনীত হইয়াছেন। শ্রান্ত হইয়া তাঁহারা এক ক্ষুদ্র গুহায় আশ্রয় লইলেন এবং অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে দূর হইতে মহা অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল এবং তাহাতে ফুলনাশ্ব ও তারিণী উভয়েই জাগিয়া উঠিলেন। ফুলনাশ্ব অসি নিষ্কোশিত করিয়া গুহামুখে দণ্ডায়মান হইলেন। যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, কুমারী তারিণী সেই দিকে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াই শিহরিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ, আমরা মরিলাম, মরিলাম, ঐ বাবা আস্ছেন।" কিন্তু পরক্ষণেই ফুলনাশ্বের দিকে চাহিয়া তাঁহার চক্ষুর ভীষণ ভাব দেখিয়া রাজকুমারী কাঁপিয়া উঠিলেন ;

পিতার জীবন-রক্ষার জন্য তিনি ফুলনাথের পদে পতিত হইয়া তাঁহার অসি কোষবদ্ধ করিবার জন্য নিতান্ত কাতরতার সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ফুলনাথ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রণয়িনীর কথা রাখিতে বাধ্য হইলেন, যতক্ষণ রাজকুমারী পিতার রোষ নির্ব্বাণের জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবেন, ততক্ষণ ফুলনাথ অস্ত্রধারণ করিবেন না।

এইরূপ কথা হইতে হইতেই বুধবাহন আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি বাহির হইতেছিল। ফুলনাথ ও নিজ কন্যার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা প্রথমে হঠাৎ একটু স্থগিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার অসি ভীষণবলে ফুলনাথের মস্তকে নিপতিত হইল। ফুলনাথ ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন, আঘাত সাংঘাতিক হইল। হঠাৎ এইরূপ ভয়ানক ব্যাপারে রাজকুমারী একেবারে নিস্পন্দ ও নিশ্চল হইয়া গেলেন। পরে যখন পিতা কন্যাকে তীক্ষ্নস্বরে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতে বলিলেন, তখন রাজকুমারীর জ্ঞান হইল। রাজকুমারী হৃদয়-ভেদী ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পরক্ষণে নিজেই যেন ফুলনাথকে হত্যা করিয়াছেন এইভাবে রাজকুমারী আপন শিরে ও বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং রক্তাক্ত মৃতদেহের উপর পতিত হইয়া অতি করুণভাবে—যেন ফুলনাথ জীবিত—ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বুধবাহন কন্যাকে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। তখন রাজকুমারী উন্মাদিনীপ্রায় হইয়া উঠিয়া পিতাকে আক্রমণ করতঃ একটানে তাঁহার শ্মশ্রু উৎপাটন করিলেন এবং তাঁহার মুখে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন। ইহাতে অচিরে রাজার ধৈর্য্য লুপ্ত হইল। তিনি নিদারুণ বলের সহিত পদাঘাতে কন্যাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অভাগিনী কুমারী তারিণী গুহার অপর দিকের পাষাণখণ্ডে আহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন এবং যখন তাঁহাকে তুলিতে যাওয়া গেল, তখন দেখা গেল, প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছে! রাজপরিবারের সুখশান্তি ও লক্ষ্মী ক্ষণকালের কাণ্ডে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল!

এই শোচনীয় কাণ্ডের পর হইতে রাজার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইত্যগ্রে তিনি অতি সদয় ব্যক্তি ছিলেন, প্রজারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভাল বাসিত। কিন্তু এক্ষণে রাজা নির্ম্মমরূপে সকলের উপর অত্যাচার করিতে

লাগিলেন। চক্ষের জলে প্রজাবর্গের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিন বৎসর পরে হঠাৎ এক দিন প্রাতে রাজাকে রাজ-প্রাসাদে দেখা গেল না, তাঁহার আর কোন অনুসন্ধানও পাওয়া গেল না। সকলে ভাবিল, তিনি মনের যন্ত্রণায় নিকটস্থ কোন জঙ্গলে বা হ্রদে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মনসার রাজা হইলেন। কিন্তু তাঁহার নানা চরিত্রদোষ ছিল, সে কারণে পূর্ব্বকালের সঞ্চিত রাজ-ভাণ্ডার তিনি শীঘ্র রিক্ত করিলেন এবং দশ বৎসরের মধ্যে রাজ্য ছারখার করিয়া ফেলিলেন। রাজ্যের এক এক অংশ করিয়া ক্রমে শত্রুদের হস্তগত হইতে লাগিল, তাহা উদ্ধার করিবার জন্য অকর্ম্মণ্য মনসারের কোন ক্ষমতা ছিল না। অবশেষে তাঁহার প্রজারাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মনসার চিন্তায় জীবন্মৃত হইলেন।

এইরূপ অবস্থায় কি করা যাইবে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রীবর্গের সহিত মনসার নিতান্ত বিষণ্ণ মনে এক রাত্রিতে প্রাসাদে পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ও অতি শীর্ণ যোগীপুরুষ কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া রাজবাটীর দ্বারে আসিলেন এবং রাজার সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। যোগীকে রাজার সম্মুখে আনা হইল। যোগী বলিলেন—"মহারাজ, আপনি যদি আমার ইচ্ছামত এক স্থানে আমাকে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে এত ধন দেখাইয়া দিব যে, তাহাতে আপনি আপনার রাজ্য স্বচ্ছন্দে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।" বলা বাহুল্য, মনসার তৎক্ষণাৎ যোগীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যোগী তখন রাজ-কোষ-গৃহের ভূমির একখানি প্রস্তর তুলিতে বলিলেন। মনসার তাহা তুলিয়া দেখিলেন, নিম্নে এক গুপ্ত গৃহ, তাহা স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদিতে যেন জ্বলিতেছে। মনসার মহা আহ্লাদিত হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন অর্থাৎ যোগীর প্রদর্শিত স্থানে তাঁহার কথিত মত অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, এই যোগী আর কেহই নহেন, ইনি ভূতপূর্ব্ব রাজা বুধবাহন। যে স্থানে পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে স্বহস্তে স্বীয় প্রিয়তমা কন্যা তারিণীকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর স্থানেই এই অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল এবং এই মদন-মহল সেই অট্টালিকা। বুধবাহন যে মহা পাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় নিরন্তর অবর্ণনীয় অশান্তি ও

প্রচণ্ড অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল, ঈশ্বর-চিন্তায় সেই অসহ্য যন্ত্রণা কিয়ৎ পরিমাণে কমিতে পারে বিবেচনা করিয়া তাঁহার কন্যার এই অন্তিম শয়নস্থলে বুধবাহন তাঁহার জীবনের স্বল্প অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আর এই গিরিশিখরের উপর বসিয়া বুধবাহন স্বীয় জীবনকালমধ্যেই তাঁহার বংশনাশ ও তাঁহার পৈতৃক রাজ্যনাশ দেখিয়া গেলেন।

বুধবাহনের মৃত্যুর পর হইতে মদন-মহলের ভগ্নাবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। নিকটস্থ গ্রামবাসীদের নিকট শুনিলাম, এখনও বুধবাহনের পাপভারগ্রস্ত অশান্তিপূর্ণ প্রেতাত্মা জনশূন্য মদন-মহলে ও নিকটস্থ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতি রাত্রে বিচরণ করে এবং যে দিন বুধবাহন সেই ভয়ানক কাণ্ড করিয়াছিলেন, প্রতি বৎসর সেই দিন রাত্রিতে মদন-মহলে সেইরূপ বিকট চীৎকার, ক্রন্দন ও বিলাপ প্রভৃতি শুনা যায়।

এই ভীষণ কাণ্ডপূর্ণ প্রাচীন মদন-মহল দেখিতে পাঠকের কৌতূহল হয় না কি?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস।

সাহিত্যের কথা।

সাহিত্যের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সাধুতা-সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সন্দিহান হওয়া উচিত নয়। দূষিত বায়ু, দূষিত জল, বিষাক্ত আহার্য্য যেমন সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়, বিকৃতরুচি লেখকের রচনাবলিও সেইরূপ পরিবর্জ্জনীয়, আবার এমন অনেক লেখা আমাদের সাময়িক সাহিত্যে স্থান পায় যাহা শ্লীলতা হিসাবে নিষ্কলঙ্ক হইলেও কেবল রাবিসের স্তূপ জমা করিতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে এবং সেগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকেই প্রস্তুত আছেন। ফরাসি দার্শনিক কোঁৎ এই Intellectual sanitation বা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য য়ুরোপের সমস্ত প্রধান প্রধান সাহিত্য হইতে বাছিয়া প্রায় আড়াই শত পুস্তকের একটি তালিকা

প্রস্তুত করিয়া সুশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ফরাসি একাডেমীও (Academy) সেদিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর পাইল না। এমন অবস্থায় সাহিত্যে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। কে কাহার কথা শুনে ?

আমাদের সভ্যতার সমস্ত কৃত্রিম আবরণ ভেদ করিয়া আদিম বর্ব্বর মানুষটি যে সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রকট হইয়া দেখা দেয় ইহাতে শিহরিয়া উঠিবার কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু সমাজে সময়ে সময়ে এই বর্ব্বরতা সভ্য আসরে স্থান পায় ও পরিপুষ্টি লাভ করে। সমাজের রুচি নানা কারণে আপনা আপনি পরিবর্ত্তিত হয়, কোনও ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুদয়ের অপেক্ষা করে না, কোনও সুতীব্র সমালোচকের (censor) শাসনদণ্ডের ভয় করিতে হয় না। রাজাজ্ঞায় স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হয় না, পরন্তু রুদ্ধ হইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া দেয়। পরিণাম সব সময়ে শুভ হয় না।

রাষ্ট্রীয় শান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোনও কোনও রাজ্যে censor বা রাজকীয় সমালোচক পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। এই রাজ-কর্ম্মচারী সকল সময়ে যে বিশেষ সাবধানতার পরিচয় দিয়া থাকেন, এমন কথা বলা যায় না। ১৮৬৪ সালে প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক ডুমা "The Mohicans of Paris" নামক এক খানা নাটক রচনা করেন ; প্রথম অঙ্কে একটা ষড়যন্ত্রের বর্ণনা ছিল ; সাহিত্যের ভাগ্য-বিধাতা একজন রাজকর্ম্মচারী মনে করিলেন যে, এই অঙ্কে নিশ্চয়ই সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত কল্পিত হইয়াছে। উক্ত নাটকের অভিনয় বন্ধ হইল। ডুমা সম্রাটকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহার এক অংশের ইংরাজি অনুবাদ এইরূপ—

Sire,

Thirty years ago there were—and there still are,—three men at the head of French literature. These were Victor Hugo, Lamartine and myself.

I am the most popular of the three. Translated into almost all the languages, my works have been as far as steam and coal could carry them. The reason of my populariy is clear : the one

is a thinker, the other a dreamer and I am but a vulgariser. ইহার অর্থঃ—৩০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এখন পর্য্যন্ত ফরাসি সাহিত্যের শীর্ষদেশে তিন জন সাহিত্যিক অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা হইতেছেন ভিক্টর হুগো, লামার্টিন এবং আমি (ডুমা)। এই তিন জনের মধ্যে জনসমাজ আমার উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগী। আমার প্রণীত পুস্তকসমূহ প্রায় সমুদয় ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে এবং বাষ্পীয় রথ ও পোতের সহায়তায় তাহারা যতদূর যাইতে পারে, ততদূর গিয়াছে। যে জন্য আমি জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছি, তাহা এই,—ভিক্টর হুগোর রচনায় চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা আছে, লামার্টিনের রচনা কল্পনা-বহুল, কিন্তু আমার রচনা সাধারণ লোকের রুচির অনুগামী।

ডুমার মতে তাঁহার যদি কিছু দোষ থাকে সেটা কিছুই নয়, তিনি যে Vulgariser এই তাঁহার দোষ। তাঁহার এই বর্ব্বরতার জন্য তাঁহাকে দোষ দিতে হয় দাও, কিন্তু তাঁহার প্রতি রাজদ্রোহিতার কলঙ্ক আরোপ করিয়া তাঁহার নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের উপযুক্ত হইয়াছিল কি? সম্রাট যখন প্রথম পারিসে পদার্পণ করেন তখন হইতে ডুমার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট পরিচয় হইয়াছিল।

রাজকর্ম্মচারীর আদেশই বাহাল রহিল। এই অত্যন্ত সতর্ক রাজপুরুষ অন্তর্বিদ্রোহের আশঙ্কায় স্বাধীন চিন্তা যথাসম্ভব দমন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় শক্তিকে প্রবল করিতে পারেন নাই। সাত বৎসরের মধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়নের, তথা সমস্ত বোনাপার্টি বংশের গৌরবসূর্য্য সেডানক্ষেত্রে অস্তমিত হইল।

সাধারণ প্রজাতন্ত্র আরম্ভ হওয়ার পর হইতে গত ৪০ বৎসরের মধ্যে ফরাসি সাহিত্যের কণ্ঠরোধের আয়োজন করিতে হয় নাই। আজ কাল কয়েকজন মনীষী সাহিত্যিক শ্লীলতা ও সুরুচির পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফরাসি সাহিত্যকে সুসংযত ও মার্জ্জিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

ইংলণ্ডে দোকানদারেরা ও লাইব্রেরীওয়ালারা এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদিগের মতে যে পুস্তক মন্দ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার বিক্রয় বা প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। গভর্ণমেণ্টের আদেশ এ বিষয়ে

কিছুই প্রচারিত হয় নাই। দোকানদারেরা ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া পুস্তক প্রচার-সম্বন্ধে যাহা করা উচিত তাহাই করিবে। লাইব্রেরীওয়ালারা একমত হইয়া এই মর্ম্মে নিম্নলিখিত সার্কুলার জারি করিয়াছেন।

(১) কোন উপন্যাস অন্ততঃ এক সপ্তাহ আমাদিগের নিকট পাঠার্থ প্রদান না করিলে তাহা প্রচারিত হইবে না।

(২) কোন আপত্তিকর বা সন্দেহজনক পুস্তক দেখিলে অবিলম্বে পরস্পরকে জানাইতে হইবে।

(২) আমাদের সমিতির তিন জন সদস্য যদি কোন পুস্তককে সন্দেহজনক বলেন, তাহা হইলে তাহার প্রচার বা বিক্রয় বন্ধ করিতে হইবে।

১৯১০ সালের জানুয়ারি মাস হইতে এই ইস্তাহার অনুযায়ী কার্য্য কয়েকজন বড় বড় দোকানদার করিতেছেন। উক্ত সনের এপ্রিল মাসের "Contemporary Review" পত্রিকায় একজন প্রসিদ্ধ লেখক ইহার উপকারিতা-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; উহার এক অংশের মর্ম্ম এইরূপ—

"এক্ষণে দেখা যাউক, পুস্তক-প্রকাশকগণের এই সমিতি প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যে কিরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। টাইমস্ (Times) সংবাদপত্রের সমালোচক ব্যতীত অন্যান্য সংবাদপত্রের সমালোচকগণ যে কয়েকখানি উপন্যাসের প্রশংসা করিয়াছিলেন, এই সমিতির কবলে পড়িয়া তাহাদের প্রচার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। টাইমস্ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট টাইম্‌স বুক ক্লব (Times book club) উক্ত ইস্তাহারের অন্যতম স্বাক্ষরকারী বলিয়া যে উহাতে উক্ত উপন্যাস গুলির নিন্দা বাহির হইয়াছিল, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। তাহার পর দেশের লোক সমিতির এইরূপ কার্য্যের বিরুদ্ধে গোলযোগ উত্থাপিত করিলে সমিতি ঐ সকল পুস্তকের কয়েকখানি পুনরায় প্রচারিত করিলেন। তখন সেগুলির স্তুতিবাদ এবং বিজ্ঞাপনও বাহির হইতে বাকী রহিল না!

এক্ষণে প্রকাশকগণের উপর এই ইস্তাহারের ফল কিরূপ ফলিতে পারে, তাহা বিচার করা যাউক। ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা নির্ব্বাচনার্থ প্রদত্ত পুস্তকগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিবেন। কোন্ প্রকারের পুস্তক লাইব্রেরীতে গৃহীত হইবে বা হইবে না, তাহা প্রকাশকেরা ভালরূপেই জানেন, কারণ তাঁহাদের লাভ করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহাদের ইঙ্গিত-অনুযায়ী গ্রন্থ-

কারগণ লাভজনক পুস্তক-রচনাতেই প্রবৃত্ত হইবেন। এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পুস্তক-বিক্রেতাগণের এই সমিতি এবং রাজকীয় গ্রন্থ-নির্ব্বাচকের মধ্যে কার্য্যতঃ অতি সামান্য প্রভেদই বিদ্যমান। এইরূপ বাঁধা-ধরা নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ হওয়াতেই বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের রঙ্গালয়সমূহ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। এরূপ বাঁধা-ধরার ভিতর পড়িলে সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাধীনমতের অভিব্যক্তিপূর্ণ, সরল ও সঙ্কোচহীন পুস্তক বাহির হইবে না এবং সাহিত্য লোকের রুচি ও প্রয়োজনারূপ হইয়া পড়িবে।"

বাঙ্গালা সাহিত্যে সমাবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার একটা ধূয়া উঠিয়াছে। এ কার্য্যের ভার লইবেন কে? পরিষৎ, না দোকানদার?

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ।

অযোধ্যা

মনোরম সুবা অযোধ্যা।

আউধ একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন শহর। হিন্দু-গ্রন্থাবলীতে ইহা রাজা রাম-চাঁদের জন্মস্থান অযোধ্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সমুদ্রে সেতু-বন্ধন, অসংখ্য বানর ও ভল্লুক সৈন্যসহ লঙ্কা-গমন, তদ্দেশ্বরাজ রাবণ-নিধন, রাবণের বন্দিনীরূপেও যিনি তাঁহার সতীত্ব ও পাবিত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই স্ত্রীর উদ্ধার-সাধন-ব্যাপার সর্ব্ব-জন-বিদিত। রামায়ণ ইতিহাসে তাঁহার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কার্য্যাবলীর বিবরণ আছে। রাজা রামচাঁদের জন্মস্থান বলিয়া ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। ইহার এক ক্রোশ দূরে ঘাঘর (গোগ্‌রা বা ঘর্ঘরা) নদী সরযুর * সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যার দুর্গের পাদদেশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। শহরের প্রান্তে লোকে ধূলা ঝাড়িয়া তাহার ভিতর হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করে। শহরের অভ্যন্তরে প্রভু আদমের (তিনি ভগ-

* আইন-ঈ-আকবরীকার ভুলক্রমে লিখিয়াছেন, 'সে নদী'। (২।১৭১)

বদ্-শান্তিসুখ ভোগ করুন) পুত্র শিশ (শেঠ) এর ও ধর্ম্মপ্রচারক আয়ুধ (জোব) এর সমাধি-মন্দির আছে। উভয় মন্দিরই মুসলমানদিগের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত।

রতনপুরে কবীরের * স্মৃতি-মন্দির আজও বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি সুলতান সিকন্দর লোদীর আমলে বারাণসীতে অবস্থানকালে দাসপতির (ভগবানের) প্রতি প্রগাঢ় ও আত্যন্তিক অনুরাগের প্রভাবে সেই পার্থিব শহর হইতে আধ্যাত্মিক রাজধানীর পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন)। হিন্দী কবিতাবলীতে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যে সকল রহস্য এবং ধর্ম্মতত্ত্বের সার ও গূঢ় সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সকলই উচ্চনীচ সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের মনে তাঁহার স্মৃতি চির জাগরূক রাখিয়াছে।

বহ্রেচ সরযূ-তীরবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড প্রাচীন শহর। ইহার উপকণ্ঠ সকল মনোরম। এখানে সুলতান মহম্মদ ঘজনীর আত্মীয় সলর মসোদ † এবং সুলতান ঘিয়াস-উদ্দীন তঘলক শাহের ভ্রাতা ও সুলতান ফিরুজ শাহের পিতা রজব সলর ‡ এর সমাধি-মন্দির আছে। দূরবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে লোক সকল দলে দলে স্বর্ণ-পতাকা হস্তে এস্থানে তীর্থ করিতে আসিয়া সমবেত হয়। সকলেই মন্দিরদ্বারে বহুল উপহার প্রদান করিয়া যায়।

এই শহরের নিকটেই ডোকোন গ্রাম। সেখানে অনেক দিন ধরিয়া তাম্র-মুদ্রার টাকশাল ছিল।

উত্তর দিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতসমূহ হইতে বহুপণ্যই নর, ছাগ ও পার্ব্বত্য অশ্বের পৃষ্ঠে চাপাইয়া আনা হয়। স্বর্ণ, তাম্র, শীশ, কস্তুরী, 'কটাস', মধু, চক অম্ল (কমলার রস ও লেবু একত্র সিদ্ধ করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়), 'জিডোয়ারি'

---

* কবীরের আবির্ভাব কাল—১৩৮০ হইতে ১৪২০ খৃষ্টাব্দ। হণ্টারের মতে তাঁহার সমাধি-মন্দির গোরখপুর জিলায় অন্তর্গত মঘর গ্রামে অবস্থিত। তাহা ২৬.৪২ উঃ, ৮৩.৭১ পূঃ। (ইম্পিঃ গেজেঃ ৯।১৩৯)

† সলর—সিপহ-সলর বা সেনাপতি। মস্‌দ—মাহ্মুদের ভাগিনেয়। ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে ইনি বহ্রেচে হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধে হত হইয়া 'ধম্য যোদ্ধা' (ঘাজী) বলিয়া সম্মান পাইয়াছেন। আ (২।১৭২)। ইলিয়ট (২।৫১৫))এ ইঁহার জীবন-কাহিনী দ্রষ্টব্য।

‡ ইনি ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। (ইলিয়ট ৩।২৭৩)

(zedoary হিন্দী কচুর ', বেদানা, শুষ্ক আদা, লঙ্কা মরীচ, রঞ্জন (amber),* কাচের অলঙ্কার, বাসন পত্র, মোম, পশমী-বস্ত্রাদি, বাজপক্ষী, terul, লবণ, আসাফিটিদা (Asafœtida) রাজকীয় শ্বেত শিকারীপক্ষী, চড়ুই শিকরে ও অন্যান্য বহুবিধ পণ্য এখানে বিক্রয়ার্থ আসে। † সময়ে সময়ে এখানে অত্যন্ত ও অসংখ্য জনতা হয়; সর্ব্বদিক্ হইতেই বণিকবর্গ ক্রয় ও লাভের আশায় এখানে আসেন।

নিমথর ‡ একটি প্রকাণ্ড প্রসিদ্ধ দুর্গ। গোমতী নদী ইহার পাদদেশ দিয়া যাইতেছে। ইহার নিকটে ব্রহ্মার নামে উৎসর্গীকৃত একটী দীঘি আছে। § ইহার জল ফুটিতেছে এবং সেথানে এমন ঘুর্ণী আছে যে, কেহই তাহাতে ডুব দিতে পারে না। তাহাতে যাহা ফেলিবে, তাহাই দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহা একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া গণ্য। অনেক পবিত্র হিন্দুগ্রন্থই ঘুর্ণায়মান্ স্বর্গের পরিবর্ত্তন, কালের পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবাদি-প্রভাবে অস্তিত্ব হারাইয়াছে। কৃত-বিদ্য ভগবদ্-সেবকেরা তাঁহাদের মানসিক জ্যোতিঃ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বাহুল্য-প্রভাবে সেই সকল গ্রন্থ এই দীঘির তীরে আবার নূতন ভাবে প্রাকাশিত করিয়া জগদ্বাসীকে প্রদান করেন।

ইহার নিকটে আর একটি দীঘি আছে। তাহা হইতে একটি উত্তম স্রোতস্বিনী বাহির হইয়া গোডী (গোমতী) নদীতে পড়িয়াছে। এই স্রোতস্বিনীর বিস্তার এক গজ এবং গভীরতা চারি আঙ্গুল। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ইহার তীরে বসিয়া মন্ত্রপাঠ ও পূজা করিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি প্রভাবে বালুর উপরে মহাদেব-মুর্ত্তি হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া লোকহৃদয়ে বিস্ময় আনিয়া আবার তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য হন। ইহার জলে চাল ও অন্য কোন দ্রব্য ফেলিবামাত্রই সে সমুদয় অন্তর্হিত হইয়া যায়—তাহাদের চিহ্নমাত্রও থাকে না।

* এসিয়াটিক সোসাইটীর ১৫৬-ডি সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে ভ্রমক্রমে 'ও উদিক-ঈ-হিন্দী' লিখিত হইয়াছে।

† আইন (২।১৭২) মতে পর্ব্বতবাসীরা বিনিময়ে শ্বেত ও রঙ্গীন বস্ত্রাদি, amber, লবণ, asafaetido, অলঙ্কার, কাচের ও মাটীর পাত্রাদি লইয়া যাইত।

‡ সীতাপুর জিলায় অন্তর্গত। সীতাপুর হইতে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পবিত্র তীর্থ, অনেক মন্দির ও দীঘি আছে।' (ইম্পি ১০.৩৩৬)

§ আইন-এ 'ব্রহ্মাবর্ত্ত-কুণ্ড' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহার নিকটে চর্ম্মতী * নামে একটী স্থান আছে। সেখানে হোলি-উৎসবের সময় অগ্নিশলাকাসমূহ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠে।

লক্ষ্ণৌ গোমতীর তীরবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড শহর। ফকির সেখ মিনা এখানে চিরনিদ্রা উপভোগ করিতেছেন। সূর্য্যখণ্ড একটি পবিত্র স্থল। দূর দেশ হইতে লোকসমূহ এখানে আসিয়া থাকে।

বিলগ্রাম শহরের জলবায়ু বেশ মনোরম। এখানকার বহু অধিবাসীই তীক্ষ্ণ-ধী ও সঙ্গীতজ্ঞ। এখানে একটী কূপ আছে ; তাহার জল ক্রমান্বয়ে ৪০ দিন পান করিলে জ্ঞান ও দেহসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষেপতঃ, এই প্রদেশের সর্ব্বত্রই জলবায়ু সুন্দর, ফলফুল পর্য্যাপ্ত, কৃষি উৎকৃষ্ট ; বিশেষতঃ এখানকার সুখদাস, বদ্রকীর ও ঝঞ্জুয়া † চালের ন্যায় আর কোন চালই এমন সাদা, তেজওয়ালা, সুগন্ধ ও সুস্বাদু নহে। শালি ধান হিন্দুস্থানের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা তিন মাস আগে বপিত হয়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে নদী সকলের জল উপছাইয়া উঠে ও সমস্ত দেশ জলে ডুবিয়া যায়। যেমন জল বাড়িতে থাকে, শালিধান তেমনি লম্বা হইতে থাকে। যদি ধান জন্মিবার পূর্ব্বেই জল উপছাইয়া উঠে, তবে সে বৎসর আর শালিধান হয় না। বন্য মহিষ এখানে সংখ্যাতীত। যখন সমতল ও মরুভূমিসমূহ জলে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন বন্য জন্তুরা লোকাবাসে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করে এবং দেশবাসীরা তাহাতে শিকার করিবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

সরযু, ঘাঘর (ঘর্ঘরা), সৈ, গোমতী ও রুডী (রাপ্তি ?)ই এখানকার প্রধান নদী।

গোরখপুর সরকার হইতে কনৌজ পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ১৩০ ক্রোশ ‡ এবং (এলাহাবাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী) সধুর ¶ হইতে উত্তর দিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত প্রস্থ

* আইন (২।১৭৩)এ চর্ম্মতী—'চরামিতী' রূপে লিখিত হইয়াছে।

† আইনে (২।১৭১) মতে 'সুখদাস, মদথর, ঝানোয়া' চাল। যেমন দ্রব্যাদির মূল্যতালিকা আছে, তথায় (১।৬২) কিন্তু সুখদাস ও ঝিন্‌ঝু চালের উল্লেখ আছে।

‡ আইন মতে ১৩৫ ক্রোশ।

¶ আইন (২।১৭০) মতে সিধপুর। জ্যারেট ইহার অবস্থান কোথায় ঠিক করিতে পান নাই। কিন্তু ইলিয়ট 'সন্দহুর' নামক এক স্থলের নাম করিয়াছেন। তাহাও অযোধ্যার বরবাংকি জিলার অন্তর্গত সিদ্দৌর শহর এক। (ইম্পি ১২।৪১৩)

১১৫ ক্রোশ। ইহার পুর্ব্বে বিহার সুবা, পশ্চিমে কনৌজ, উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, ও দক্ষিণে মানিকপুর। ইহার সরকার পাঁচটি, মহল ১৯৭টি। সরকার পাঁচটি এই—আউধ, গোরখপুর, বহ্রেচ, খৈরাবাদ ও লক্ষৌ। এই সুবার রাজস্ব ২৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪০ হাজার দাম * (৬৬,১৩,৫০০৲ টাকা)।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত।
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাত্‌কোট।

তামসী শর্ব্বরী, গত সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর,
সূচিভেদ্য অন্ধকার আবরি' ধরায়;
দেবতার কোটী চক্ষু নিশ্চল ভাস্বর—
জ্বলিতেছে অতি উর্দ্ধে ভেদি' তমিস্রায়।

২

হিল্লোলিত তরুশীর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি,
মধ্যে রাত্‌কোট অদ্রি, উচ্চ সানুদেশে
দুর্ভেদ্য বিরাট দুর্গ,—অন্ধকার চিরি'
দাঁড়াইয়া ব্যোমপথে দৃপ্ত দৈত্যবেশে।

৩

বহে না সমীর; শুধু সুদূর প্রপাতে
ঝর্ঝরিছে ক্ষীণকণ্ঠে করুণ কাহিনী;
পর্ব্বতীয় প্রতিধ্বনি ঘাত-প্রতিঘাতে
ধ্বনিছে বিচিত্র সুর; সুষুপ্ত মেদিনী।

---

* আকবরের আমলে উক্ত পাঁচটি সরকারই ছিল। কিন্তু মহল-সংখ্যা ছিল ১৩৩ ও রাজস্ব ছিল ৫০,৪৩,৯৫৪।০ (আঃ ২।১৭৩)।

এই রাত্‌কোট দুর্গে নিমগ্ন নিদ্রায়
রাজদ্রোহী ভ্রাতৃদ্বয়—নির্ম্মম পাষাণ;
ইষ্টমন্ত্র জপে রত মুকুল রাণায়
অলক্ষ্যে হানিয়াছিল শানিত কৃপাণ।

৫

চোহান সুজার কন্যা কুমারী চন্দনে,
বন্দী করি' রাখিয়াছে রাত্‌কোট-চূড়ে;
ভুলাইতে চাহে পাপী পাপ-প্রলোভনে,
ক্ষিপ্ত পিতা প্রতিহিংসা বক্ষে ল'য়ে ঘুরে।

৬

উঠিতেছে গিরি-গাত্রে লতা-গুল্ম ধরি',
ক্রোধান্ধ চোহান সুজা দন্তে তরবার;
পিছে কুম্ভ রাণা সহ এক এক করি'
উঠিছে মিবার সৈন্য—শৌর্য্যে দুর্ণিবার।

৭

দাঁড়া'য়ে প্রাকার-শীর্ষে হেরে চারিধার,
দীপ্ত প্রতিহিংসা-জ্বালা জ্বলিছে নয়নে;
একে একে, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে আবার
নামিতেছে জনহীন দুর্গের প্রাঙ্গণে।

৮

সহসা সঙ্কেত-ধ্বনি—গভীর গর্জ্জন,
বাজিল পটহ-ভেরী সমর-ঘোষণা।
দেবতার রোষ-রুদ্ধ ভৈরব নিঃস্বন
বলিল, "পাপীর কভু নাহিক মার্জ্জনা"!

৯

আঘাতে আঘাতে চূর্ণ রুদ্ধ কক্ষদ্বার,
চকিতে পশিল কক্ষে উন্মত্ত চোহান;
সভয়ে চাহিল দোঁহে, চক্ষু মুছিবার
পেল না সময়,—স্কন্ধে পড়িল কৃপাণ।

১০

ভূতলে লুটায় দোঁহে; প্রান্তরে প্রান্তরে
অঙ্কিত কলঙ্ক-রেখা—রক্ত-প্রস্রবণ;
গায়িলেন ভট্ট কবি প্রফুল্ল অন্তরে,—
"ধর্ম্মের বিজয় চির, পাপীর পতন।"

শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ।

মোগল-চিত্র। *

শাহজাহানের বিচার-নৈপুণ্য।

সম্রাট শাহজাহান তদীয় সাম্রাজ্যে যাহাতে বিচার-কার্য্য নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। একবার বাদসাহের এক সৈনিক এক হিন্দু কেরাণীর রক্ষিতা তরুণী ক্রীতদাসীকে বলপূর্ব্বক নিজের নিকট রাখিয়াছিল। কেরাণী এজন্য দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিল। দরবারে বিচারের সময় সৈনিক বলিল, এই তরুণী ক্রীতদাসী আমার। ক্রীতদাসীও কেরাণীর সাহচর্য্য ত্যাগ করিবার অভিলাষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল, "আমি সৈনিকের নিকটই থাকি"। মকদ্দমা জটিল দেখিয়া বিচারকেরা উহা খাস সম্রাটের নিকট বিচারার্থে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট শাহজাহান তখন ক্রীতদাসীকে স্বীয় প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর একদিন লিখিবার সময় সম্রাট সেই ক্রীতদাসীকে দোয়াতের কালীতে সামান্য একটু জল দিতে বলিলেন; সে এই কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিল। সম্রাট বুঝিলেন, যে ক্রীতদাসী দোয়াতে এত কৌশলে জল ঢালিতে পারে, সে নিশ্চয়ই কেরাণীর অধিকারে ছিল; সিপাহীর নিকট থাকিলে সে কখনই এত নিপুণভাবে কালীতে জল মিশাইতে পারিত না। কি করিয়া দোয়াতের কালীতে জল মিশাইতে হয়, হিন্দু কেরাণীই ইহা তাহাকে শিখাইয়াছিল। বিচার শেষ হইল। সম্রাট ক্রীতদাসীকে হিন্দু কেরাণীর নিকট ফিরিয়া যাইতে এবং সৈনিক পুরুষকে রাজ-কার্য্য হইতে অপসারিত ও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে আদেশ দিলেন।

* নিকোলাস মেনুসী-লিখিত "Storia do Mogor" হইতে গৃহীত।

তরবারি অপেক্ষা লেখনীর শক্তি অধিক।

সম্রাট শাহাজাহানের রাজত্বকালে একবার এক সৈনিক রাজসরকার হইতে বেতন লইতে গিয়াছিল। রাজসরকারের যে কেরাণীর উপর বেতন দিবার ভার সে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল বলিয়া সৈনিক পুরুষের বেতন পাইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। এই সামান্য বিলম্বের জন্য সৈনিকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় এবং সে ক্রুদ্ধ হইয়া বেতনদাতা কেরাণীকে বলে 'তরবার দিয়া তোমার দাঁতগুলা গুঁড়া করিয়া দিলেই উচিত কার্য্য হয়।' কেরাণী এ কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া সৈনিকের হস্তে তাহার প্রাপ্য বেতন প্রদান করিল এবং তাহার পর তাহাকে বিদ্রূপচ্ছলে বলিল, 'তুমি তরবার দিয়া যে কাজ না করিতে পার, তাহার চেয়ে বেশী কাজ আমি এই কলমের সাহায্যে করিতে পারি।' তাহার পর কিছু দিন যায়, এই শ্লেষপরায়ণ মসীজীবী একদিন এক আশ্চর্য্য কার্য্য করিল। সৈন্যগণের বেতনের খাতায় কোন্ সৈনিকের কিরূপ আকৃতি তাহার বিবরণ লেখা থাকে। খাতার যেখানে এই ক্রুদ্ধ সৈনিকের আকৃতির বিবরণ লিখিত ছিল, কেরাণী মহাশয় সেইখানে লিখিয়া দিলেন, 'এই সৈনিকের সম্মুখের দুইটি দাঁত ভাঙ্গা।' মোগল বাদসাহদিগের সময়ে সৈনিকদের শরীরে কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার এবং তাহার সহিত মিলাইয়া বেতন দিবার আদেশ ছিল। তাহার পর কয়েক মাস অতিবাহিত হইল এবং সেই সৈনিক পুরুষ পুনরায় বেতন লইতে আসিল। কেরাণী তখন বেতনের খাতা খুলিল এবং তাহার নাম বাহির করিয়া তাহার আকৃতির বিবরণ পাঠ করিয়া দেখিল, —যেরূপ লেখা আছে তাহার চেয়ে আগন্তুক সৈনিকের দুইটি দাঁত বেশী। কেরাণী তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিল "তোমার ত সম্মুখের দুইটি দাঁত ভাঙ্গে নাই, খাতায় যে লেখা আছে, তোমার সাম্নের দুইটি দাঁত ভাঙ্গা। আমি তোমায় কিরূপে বেতন দিব?" সৈনিক-পুরুষ তখন মহা ফাঁপরে পড়িল। তাহার দাঁত কখনই ভাঙ্গা ছিল না বলিয়া সে কত তর্ক তুলিল, কত প্রতিবাদ করিল, কিন্তু ফল কিছু হইল না, বেতন মিলিল না। আর উপায়ান্তর নাই; এখন তাহার বেতন এবং চাকরী উভয়ই নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। অগত্যা সে তাহার সম্মুখের দন্তদ্বয় বলপূর্ব্বক উৎপাটিত করিয়া আসিয়া তাহার বেতন লইয়া গেল।

প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ।

অন্তঃপ্রকৃতির মত বহিঃপ্রকৃতিও প্রাণময়ী। তাই তাহার প্রতি কম্পনে, প্রতি ঝঙ্কারে, প্রতি ছন্দে আমাদের হৃদয়ে অতুল ভূমানন্দের সঞ্চার হয়। পরন্তু, অন্তঃপ্রকৃতি বিচিত্র হইলেও, তাহা বিশেষজ্ঞের মনোরঞ্জক, তাহা নিখিলকে তুল্য পরিমাণে আনন্দ ও প্রীতি বিলাইতে পারে না। কারণ, তাহা লোচনগ্রাহিনী নয়, তাহার সৌন্দর্য্য গুপ্ত। সে সৌন্দর্য্য পাঠ করিতে হইলে, আমাদের মানস-নেত্রের প্রয়োজন, কিন্তু তাহার দৃষ্টি তরলা এবং মাত্র মধুগ্রাহিণী হইলে চলিবে না। আর এই যে বাহ্য-প্রকৃতি, এই রৌদ্রের মায়া, গাছের ছায়া, কাননের মর্ম্মর-গান, ঝরণার কলতান এবং আকাশের নীলিমা ও মধুজার মধুরিমা—ইহা দেখিতে-বুঝিতে ও অনুভব-উপভোগ করিতে হইলে না ঘুমাইয়া চোখ-দুটি খুলিয়া রাখা ভিন্ন আমাদিগকে আর বিশেষ কিছু আয়োজন করিতে হয় না। মনোবিজ্ঞানের মত প্রকৃতির বিজ্ঞান জটিল নয়। তাই আমার ছয় মাসের শিশুও চাঁদ দেখিলে কান্না ভুলিয়া যায়। প্রমাণের আবশ্যকতা আছে কি? শিশুর চাঁদ ধরিবার আব্দারও চিরপ্রসিদ্ধ।

আমার ত মনে হয়, সরল বিষয়ের উপরে—অর্থাৎ সাধারণ এবং নিত্যদৃষ্ট বিষয় লইয়া কবিতা রচনা করিলে, তাহা যত শীঘ্র কবিত্ববোধ-শক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলে, কঠিন মনোবিজ্ঞানকে তত শীঘ্র উপলব্ধ করানই কঠিন। এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদের কঠোর পরিশ্রমও পরাভূত। এমন শক্তি চাই—এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি চাই—যাহা প্রথম সৃষ্টির মূল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করে, যাহা আক্ষুদ্রবৃহৎ তাবৎ পদার্থেই কার্য্য এবং কারণের অনুসন্ধান করে! তাহার পর যখন মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি তাহার আয়ত্ত হইয়া যায়, তখন সেগুলিকে গুছাইয়া, শ্রেণীবদ্ধ—শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহাদের উপরে মাধুর্য্যের 'রসান' দিয়া, পেলবতার 'পালিস' দিয়া কবিতারাণীর অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।

কিন্তু এই বহিঃপ্রকৃতি! ইহার গীতি, গন্ধ, রূপ ও স্পর্শ শুধুই যে শিক্ষিতের

নিকটে উপভোগ্য, তাহা নয়; পরন্তু নিরক্ষর সভ্যতা-বর্জ্জিত কৃষকেরাও এ সৌন্দর্য্যের জন্য পাগল। ইহার আকাশ, ইহার বাতাস, তাহাদিগকেও 'কবি করিয়া তুলিয়াছে। তাহারাও গাইয়াছে—

"সূর্য্যিমামা পুবের চালে উঠ্‌লে গাব গীত।"
"আঁজ্‌লা-ভরা রাঙ্গা জুবা সাদা ভাঁটির ফুল,
শিশির ভেজা দুর্ব্বোগুলো মুক্তোর সমতুল।"
"আমের ডালে মুকুল দোলে থোপা কচিপাতা।
"লোণা জলে সোণা জলে ঢেউ লেগেছে গায়"—প্রভৃতি।*

এই সকল নিরক্ষর কবির এমন ভাবোচ্ছ্বাসের কারণ;—ইন্দ্রজালময়ী বহিঃপ্রকৃতি। এ প্রকৃতির ভিতরে লূতার সূতার মত এমন কোন জটিলতা নাই, যাহা দর্শকের সৌন্দর্য্যবোধশক্তিকে বাধা দিতে পারে, যাহা তাঁহার রসগ্রাহিতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে! ইহা সরল, সহজ ও সুন্দর। তাই প্রকৃত কবির শিল্পরম্য ভাষার কৌশলে, ছন্দের অনায়াসগামিতায় এবং উপমার মাধুর্য্যে ইহার স্বাভাবিকতা হীরকের মত মার্জ্জিত হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে, মোমের উপরে যেমন কোন কিছুর চিহ্ন অল্পায়াসেই অঙ্কিত হইয়া যায়, পাঠকের প্রাণের উপরেও তেমনই অবিলম্বে একটি গভীর স্পষ্ট রেখা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।

রূপের ভিখারী হইতে না পারিলে, প্রকৃতির কবিতা হয় না। তুমি বলিবে রূপের ভিখারী ত' সকলেই! সুন্দর বয়ান, তরল নয়ান এ সকল কাহার না ভাল লাগে? পাহাড়, নদী, আকাশ—এ সব কে না দেখিতে চায়? কিন্তু আমি এমন-রূপের ভিখারীর কথা বলিতেছি না। কাল ভুরু, কাল তারা 'ভরা পেটে'ই ভাল লাগে আর প্রকৃতির ছবি ছুটীর দিনে অবসর-রঞ্জনের জন্য খুবই চমৎকার! কিন্তু রূপের জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পার কি? তুমি পার না—কবি পারেন।

কিন্তু সকলেই প্রকৃতির ছবি সমানভাবে আঁকিতে পারেন না। কারণ, সকলেই প্রকৃতির কবি নন। এ সম্বন্ধে আমি গত বৎসরের 'অর্চ্চনা'য় "রমণী ও রবীন্দ্রনাথ" নামক প্রবন্ধে কিছু বলিয়াছি। সুতরাং এ বিষয় লইয়া আর বেশী কিছু বলা বাহুল্য।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩১১।২য় সংখ্যা—"নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা" দেখুন।

প্রকৃতির কবিতা দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর কবিতায় আমরা প্রকৃতির যে ছবি দেখিতে পাই, তাহা অবিকল স্বভাবানুকারী। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতায় প্রকৃতির নগ্নরূপ দেখিতে পাই না—প্রকৃতির সহিত কবির প্রাণের কল্পনা-চিত্রও তাহাতে অঙ্কিত দেখি! অল্প কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, প্রথম-খানি ফোটো এবং দ্বিতীয়খানি আলেখ্য।

প্রথম শ্রেণীর কবিতা,—যেমন রবীন্দ্রনাথের—

"আমি ভালবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জ্জনে
চকাচকির ঘর।
যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।
কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে
দু'একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধ্যে বেলায় ভিড়ে।"

এটুকু পড়িলে প্রকৃতির সমস্তরূপ যেন চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা,—যেমন বিহারীলালের—

"অসীম নীরদময়;
ওই গিরি হিমালয়!
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি;
ব্যেপে দিগ্ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।
বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে!

কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার!
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার!"

ইহাতে হিমালয়ের প্রকৃত রূপ নাই; কিন্তু যাহার জন্য হিমালয়ের গৌরব—হিমালয় দর্শন করিলে যে বিষয়ের জন্য আমাদের প্রাণ স্তম্ভিত হইয়া যায়,—সেই গভীরতাই কবির ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কেবল প্রকৃতির হুবহু ফোটো তুলিলে বা তাহার আলেখ্য অঙ্কন করিয়া নিবৃত্ত হইলেই কবি-প্রতিভার প্রশংসা করিব না। যিনি অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বহিঃপ্রকৃতির মিলনসাধন করিতে পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। প্রকৃতির লীলায়িত গতি, তাহার আলোক, তাহার আঁধার বিচিত্র বটে,—কিন্তু ইহার সহিত যখন আমাদের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ইতিহাসকে পাশাপাশি অঙ্কিত দেখি, তখন আমাদের প্রাণও সহমর্ম্মিতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। "প্রকৃত কবি যিনি, তিনি বাহ্যজগতের শুধু উপরিভাগ—শুধু আবরণমাত্র দেখিয়া তাহাই চিত্রিত করিয়া ক্ষান্ত হন না। জগতের মূল কারণ মধ্যে—তাহার মূল সত্য মধ্যে—অন্তর্জগতের গূঢ়তম স্থানে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হয়।"* আমরা পরে দেখাইতেছি, যে রবীন্দ্রনাথেরও এ শক্তির অভাব নাই।

আমরা আগেও অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, যে প্রকৃতি-বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ বঙ্গসাহিত্যে পূর্ব্বেও কেহ ছিলেন না এবং এখনও কেহ নাই। প্রকৃতি-বর্ণনাকালে, আমরা রবীন্দ্রনাথের শব্দসম্পদের সহিত যথার্থরূপে পরিচয়লাভের অবসর পাই। পরন্তু, প্রকৃতির প্রতি কবির ভক্তি যে কত প্রগাঢ়, তাহা তাঁহার আত্ম-উক্তিতেই সপ্রকাশ। তিনি বলিতেছেন—

"তোমার বীণায় কত তার আছে
কত না সুরে।
আমি তারি সাথে আমার তারটি
দিব গো জুড়ে!

* * *

---

* ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। 'সমালোচনা'-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

তার পর হতে নিশীথে প্রাতে
তব বিচিত্র শোভার সাথে
আমারো হৃদয় জ্বলিবে, ফুটিবে,
দুলিবে সুখে।
মোর পরাণের ছায়াটি পড়িবে
তোমার মুখে!"

কবি প্রকৃতির দিকে চাহিয়া বলিতেছেন—

"রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়
তরু-মর্ম্মরে, ছায়ায়, খেলায়।
কি মুরতি তব নীলাকাশ-শায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি!"

কার্লাইল, কৃষক-কবি বার্ণসের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, **How his heart flows out in sympathy over universal Nature! * * * he dwells with a sad and oft-returning fondness in these scenes of solemn desolation; but the voice of the tempest becomes an anthem to his ears; he loves to walk in the sounding woods, for it raises his thoughts to *Him that walketh on* the wings of the wind."** † কিছুমাত্র অত্যুক্তি না করিয়া, এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের উপরেও প্রয়োগ করা যায়। কার্লাইল বলিয়াছেন, "বার্ণসের শ্রবণে ঝটিকার আরাবও সঙ্গীতের মত আসিয়া বাজিত।" রবীন্দ্রনাথও বলিতেছেন—

"ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী।
* * * *
বাহিরে চঞ্চলা তুই প্রমত্ত মুখরা
শাণিত অসির মত ভীষণ প্রখরা,
অন্তরে নিভৃত স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর,—
দীপহীন রুদ্ধদ্বার অর্দ্ধ রজনীর

† **Essays by Thomas Carlyle: Burns: Chapman and Hallis Edition. P. 2.**

বাসর ঘরের মত নিসুপ্ত নির্জ্জন ;—
সেথা কার তরে পাতা সুচির শয়ন ?"

যে কবির চক্ষু বেগভীষণা ঊর্ম্মি-চঞ্চলা ফেণান্বিতা পদ্মার অন্দর-কক্ষে বাসর-ঘরের মধুর শয়নের সন্ধান করে, তাঁহাকে ধন্যবাদ !

"১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধ হারা

* * *

ধাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন উদ্ধবেগে
অনন্ত আকাশে !

* * *

সে পূর্ণ উদাত্তধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্ত্তে অখণ্ড মূর্ত্তি ধরি
হউক বাহির !"

এখন বার্ণসের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া দেখুন !

আমরা আগেই বলিয়াছি, যে রবীন্দ্রনাথ 'ক্যামেরা' হাতে করিয়া প্রকৃতির সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান নাই। পরন্তু, প্রকৃতির পরিদৃশ্যমান অনন্ত-বিস্তৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানবের মনোবৃত্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাজান চিত্রশালায় আমরা ফোটোর সংখ্যা অনেক দেখি বটে, কিন্তু সেখানে আলেখ্যেরও অভাব নাই। তিনি নিজে, একখানি অপ্রকাশিত পত্রে লিখিয়াছিলেন :—"আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে'—এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণ লতা তরু গুল্ম, এই জলধারা, এই আবর্ত্তন, এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত আকাশপূর্ণ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্য্যায়, এ সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্ত-চলাচলের যোগ রয়েছে।" *

* স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত "কাব্যগ্রন্থে"র ভূমিকা। পত্রাঙ্ক ।৵০।

বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির সুন্দর সমন্বয় দেখি—"সমুদ্রের প্রতি" নামক কবিতায়। কবি বলিতেছেন—

"আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব, ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তার—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই।"

রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুকে আদি জননীরূপে দেখিয়াছেন। তাই প্রবহমান নীলোর্ম্মিবাহু মেলিয়া ধবল বালুকাবিতানকে আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল বসুন্ধরা সিন্ধুর সন্তান। সেই আলিঙ্গন-প্রয়াসের মধ্যে তিনি স্নেহালু মাতৃহৃদয়ের শাশ্বত আভাস দেখিলেন। এই ভাব লইয়া সাগরের গভীর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে তিনি যে নবকল্পনামুক্ত অগাধ ব্যাকুলতা, অপ্রমেয় প্রেম এবং অনন্ত অনুভূতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাহা সন্তানের মাতৃবন্দনার মত পাঠকের সহমর্ম্মিতা আকর্ষণ করে। বহিঃপ্রকৃতিতে মানবপ্রকৃতিসুলভ ভাব-সত্ত্বার এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, আমরা অন্যত্র খুব অল্পই দেখিয়াছি।

প্রকৃতির কবিতায় একটু বিশেষত্ব আছে। প্রকৃতির এই শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি-খানি, ঘাসের এই সবুজ লাবণ্য, নদীর এই পাদপচ্ছায়াসুপ্তা দুগ্ধধবলা বালুকাভূমি আকাশপ্রান্তে ঐ ধূমধূসর গিরিরেখা, এই সমস্তই আমাদের মনোহরণ করে। কিন্তু আমাদের মত লোকে ঘোমটা খুলিয়া প্রকৃতির মুখের যে টুকু দেখিতে পায়, কবিরা তাহার চেয়ে অনেক বেশী দেখেন। আমরা প্রকৃতি-দর্শনজনিত আনন্দের ভিতরে যে ভাবটুকু ধরিতে পারি না,—তাঁহারা সেটুকু অনায়াসে ধরিয়া ফেলেন এবং সেই ভাবের অসমীতা কবির কাব্যের ভিতরে—ছন্দে, ঝঙ্কারে ও শব্দমাধুর্য্যে সঙ্কীর্ণ না হইয়া, সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতির ভিতরে সাধারণের অন্বেষ্য যেটুকু—কবির অন্বেষ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক। তাই শুধু ফড়িং লাফাইতেছে, ব্যাং ডাকিতেছে এবং নদী বহিতেছে বলিলেই প্রকৃতির কবিতা হইল না। সমালোচক এখানে মুখভার করিয়া বলিবেন, ফড়িং যে লাফাইতেছে, তাহা ত' আমরা ছেলেবেলায় দিগম্বরবেশেও

দেখিয়াছি এবং এখনও নাকে চশ্‌মা লাগাইয়া দেখিতেছি, কারণ ফড়িং মশায় অদ্যাবধি তাঁহার লম্ফত্যাগকার্য্য ছাড়েন নাই,—কিন্তু কবিবর! আমি আর তুমি যদি একই দেখিলাম, তাহা হইলে তোমার সাদা কাগজ কাল করিয়া লাভং? বাস্তবিক, প্রকৃতি-ঠাকুরাণীর এই 'বসত বাড়ী'খানি বড় সামান্য নয়। কিছুমাত্র কৌতুক না করিয়াই আমি বলিতে পারি যে, সকালে, ভোরের আলোয় যে কুঁড়িগুলি ফুটিবার সেগুলি যখন ফুল হইয়া ফুটিয়া ওঠে, যে হাওয়াটুকু বহিবার তাহা যখন কুসুমসুরভিসুন্দর আনন্দ লইয়া বহিতে থাকে এবং বাল-ভানু-প্রদ্যোত-রম্য প্রভাতের এই বিশ্বসভায় যে পাখী গাইতে বসিয়াছে সে যখন গলা ছাড়িয়া গান গাইয়া ওঠে; তখন আমরা এক দিব্য ভূমানন্দের আভাস পাই এবং সমস্ত জগতকে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া ভালবাসিতে চাই। আবার আতপ-তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন ঝিলিক্ মারিয়া, অগ্নিবাণ বর্ষণ করিয়া উত্তপ্ত বাতাস বহিয়া যায়, খাল-বিলের জল যখন শুষ্ক, গাছের পত্রছত্রের তলায়, শীতল ছায়ায় দেহ লুকাইয়া ঘুঘু-মিথুন যখন দুপুরের অলস রাগিনীর সহিত করুণ সুর জুড়িয়া দেয়,—তখন আমাদের আলস্য-শিথিল প্রাণের ভিতরটাও কেমন হা-হা করিয়া ওঠে। গৈরিকবসনা সন্ধ্যার স্বল্প ছায়ালোকের আবর্ত্তনে যখন সূর্য্য অবসর লইতেছে, দিনের প্রদীপ নিবিয়া যাইতেছে, পাখীর দল নিভৃত কুলায়ে ফিরিয়া যাইতেছে, তখন আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রের উপরে যেন একটা বৈরাগ্যের আসন বিস্তৃত হইয়া যায়। আবার রজনীতে, চাঁদের আলোয় সর্ব্বমানবের প্রাণে প্রেমের শতদল বিকশিত হইয়া ওঠে এবং তমা অমায় মানব-চিত্ত ভীতি-বিক্ষোভিত হইয়া যায়। সময়-বিশেষে, প্রকৃতির বর্ণ-তূলিকা বিভিন্ন রেখা টানিয়া দেয়। কখনও দুঃখ, কখনও সুখ, কখনও আনন্দ এবং কখনও শোক। পরন্তু এই রহস্যময় অবস্থাবৈচিত্র অনায়াসেই মানবের অন্তঃপ্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার সহিত তুলিত হইতে পারে এবং সেইজন্যই প্রকৃতির কবিতা লিখিতে বসিলে, তাৎকালিক মনোভাবও কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে হয়। প্রকৃতিতে আমরা আমাদের প্রাণের সাড়া পাই। তাই কবিতাতেও তাহা চাই।

"আজকে নবীন চৈত্রমাসে পুরাতনের বাতাস আসে
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।

মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে যে সব ব্যথা
এই জীবনে নাইক তাহার হেতু।

* * * *

আজ্‌কে হৃদয় যাহা কহে মিথ্যা নহে সত্য নহে
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ!
খুলে গেছে কেমন করে আজি অসম্ভবের ঘরে,
মর্চেপড়া পুরোণো কুলুপ।
সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে যজ্ঞশালায় বীণা বাজে,
ফেনিয়ে ওঠে নীল সাগরের ঢেউ।
মর্ম্মরিত তমাল-ছায়ে ভিজে চিকুর শুকায় বায়ে
তাদের চেনে চেনে না বা কেউ!
শৈলতলে চরায় ধেনু রাখাল-শিশু বাজায় বেণু
চূড়ায় তারা সোণার মালা পরে।
সোনার তুলি দিয়ে লিখা চৈত্রমাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্ব্বধন তরে!

* * * *

ছায়ায় আজি তরুর মূলে ঘাসের পরে নদীর কূলে
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—
দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান!"

এখানে স্বপ্নসম্ভবা প্রকৃতির একটি কল্পনামধুর চিত্রের সহিত আমাদের কামনা ও বাসনার কেমন একটি লীলায়িত বহির্বিকাশ দেখা যায়!

আবার রবীন্দ্রনাথের "বধূ" ও "সোণার তরী" প্রভৃতি কবিতায় মানবের মর্ম্মযাতনা-প্রকাশকালে প্রকৃতি আপনি আসিয়া কেমন সাহায্য করিয়াছেন!

অন্য কবিতায়—

"আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে,
বাঁকা পথের ডাইন পাশে, ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।

কে জানে এই গ্রাম,
কে জানে এর নাম,
ক্ষেতের ধারে মাঠের পারে বনের ঘন ছায়ে!
শুধু আমার হৃদয় জানে সে ছিল এই গাঁয়ে!

* * * *

এই দীঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাক্-নামে তার জানে পরিচয়।
এই পুকুরে তারি
সাঁতারকাটা বারি,
ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ-লেখাময়!
এই গাঁয়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয়!

রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রকৃতির ফোটো তুলিয়াছেন, সেখানেও তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, বঙ্গসাহিত্যে এমন কবি কেহ নাই। আমরা এখানে দু'-একটি কবিতার স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"কৃষ্ণপক্ষে আধ্‌খানা চাঁদ
উঠ্‌ল অনেক রাতে,
খানিক কালো খানিক আলো
পড়্‌ল আঙিনাতে।

* * *

ওরে কোথাও নাই রে হাওয়া,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা;
বালুতটের পাশে নদী
কালীর বর্ণে আঁকা।
বনের পরে চেপে আছে
কাহার অভিশাপ,—
ধরণীতল মূর্চ্ছা গেছে
লয়ে আপন তাপ।"

অপর কবিতায়—

"সূর্য্য গেল অস্তপারে,—
লাগ্‌ল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণতরী।
শেষ বসন্তের সন্ধ্যা-হাওয়া
শস্যশূন্য মাঠে
উঠ্‌ল হা হা করি।"

অন্যত্র—

"দীঘির জলে ঝলক্ ঝলে
মানিক হীরা,
শর্ষেক্ষেতে উঠ্‌চে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে,
কত গাছের ছায়ে ছায়ে,
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে!"

আর এক স্থানে—

"নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বহিছে নগ-নদী"

অনাবশ্যকবোধে আর তুলিলাম না। উদ্ধৃত অংশেই কবির গুণপনা ছত্রে ছত্রে সপ্রকাশ। তাই বলিয়াছি, প্রাকৃতিক চিত্রাঙ্কণী-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথে যেরূপ বিকশিত হইয়াছে, অন্য কোন বঙ্গীয় কবিতে তেমন দেখিতে পাই না।

পরন্তু, বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে, রবীন্দ্রনাথ বর্ষাবর্ণনার যেরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে বর্ষা-বর্ণনাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী এবং তাহা পাঠকালে পাঠকের চিত্তকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। তিনি যখন সহজ ও সরল কথায় বলেন—

"দেখ চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে"—

তখন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যেন পুঞ্জমান জলদজালজড়িত আকাশ-স্পর্শ-স্পর্দ্ধিত বিপুল গিরি-স্তোম ভাসিয়া ওঠে! সহজ কথার এমনই ক্ষমতা!

আবার, তিনি যখন সিন্ধুকল্লোল গম্ভীর ভাষায় বলেন—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা!
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে,
নিখিল চিত্ত-হরষা
ঘন-গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা!"—

তখন কি তোমার স্তম্ভিত হৃদয়ের অভ্যন্তরে দর্দ্দুর ঝিল্লীমন্দ্রমন্দ্রিতা বর্ষাধারা-বিপ্লাবিতা সরসা প্রকৃতির একটি সজলস্নিগ্ধ মূর্ত্তির ছায়াপাত অনুভূত হয় না?

আর একস্থানে, কবি অল্প পরিসরে বর্ষার একটি সম্পূর্ণ রূপ দু'কথায় আঁকিয়া তুলিয়াছেন—

"ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে ক্লিষ্ট কপোত
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে!"

আমাদের আর স্থান নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেখনী-সম্বরণ করিতে হইল। কিন্তু এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা না করিলে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হইবে না।

যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত, তাঁহারা জানেন বোধ হয় যে, এই শ্রেণীর প্রকৃতি-বর্ণনা আমাদের সাহিত্যে আগে ছিল না। মধুসূদন বা হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র প্রকৃতিকে এমনভাবে আপনাদের কাব্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। মধুসূদনের "মেঘনাদ বধ"-কাব্যে "সীতা ও সরমা"র কথোপকথন প্রভৃতি স্থানে সুন্দর প্রকৃতি-বর্ণনা আছে, তাহা অস্বীকার্য্য নয়। কিন্তু আমি এখানে 'লিরিকে'র প্রকৃতি-বর্ণনার কথা বলিতেছি।

শুনিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ স্বর্গগত কবি বিহারীলালের শিষ্য। বহু বর্ষের পুরাতন "ভারতী"তে যখন রবি-প্রতিভা ফুটি-ফুটি করিতেছে, তখন তিনি যে সকল কবিতা প্রকাশ করিতেন, সেগুলিতে তাঁহার স্বভাবসুলভ মৌলিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সূক্ষ্মানুভূতিতে তাহাদের ছন্দ ও ভাবপ্রবাহের অন্তরালে বিহারীলালের বীণার রিঞ্জিনী পাওয়া যাইতে পারে। ইহার জন্য তাঁহার গৌরব খর্ব্ব হইতে পারে না। আনকোরা নূতন কেহ দিতে পারে না। ফ্রাউডের মতে "মৌলিকতা দেখাইতে গেলে তাহার একটা আদর্শও চাই।" কারণ, **No single mind in simple contact with the facts of nature could have produced a Pallas, a Medonna or a Lear."**

আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতি-বর্ণনশক্তিও কিয়ৎ পরিমাণে বিহারীলালের নিকটে ঋণী। কবিতার আধুনিক সুরের আরম্ভ বিহারীলাল হইতে এবং এই সুরে প্রকৃতির গান বিহারীলালেও অভাব নাই। উদাহরণ,—"মধ্যাহ্ন সঙ্গীতে"—

চরাচরব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়,

দিগ্‌দিগন্তর উদাস মূরতি
উদার স্ফূরতি পায়।
বিমল নীল নিথরশূন্য
শূন্য—শূন্য—শূন্য—অগম শূন্য ;
দূর—অতি দূর দু'পাখা ছড়িয়ে
শকুন ভাসিয়া যায়।

* * *

নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম্।
নত-মুখ ফুল ফল।
নত-মুখী লতা নেতিয়ে প'ড়েছে
স্তবধ সরসীজল,
শান্ত সঞ্চরণ, শান্ত অরণ্যানী,
মূক বিহঙ্গম, মূঢ় পশু-প্রাণী
'ঘুঘুঘু—ঘুঘুঘু' কাতরা কপোতী
করুণা করিয়ে গায়।

* * *

স্তবধ ভুবন, স্তবধ গগন,
প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত!
একটুও নাহি বায়!"

অল্প কথায়, দুপুরের একখানি ফোটো!

বিহারীলালের এই প্রকৃতিবর্ণনশক্তি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আরও মার্জ্জিত, আরও সুন্দর এবং আরও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ছবিগুলি জগতের শ্রেষ্ঠতম চিত্রকরগণের যত্নলিখিত আলেখ্যের সম্মুখেও উজ্জ্বল থাকিবে এবং সম্ভবতঃ বৃদ্ধ কালের ছায়ায় তাহার সুচিরস্থাপিত বর্ণসমাবেশের উপরে কখনও রজনীর ম্লানিমা অর্পিত হইবে না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সাঁওতাল-পরগণার পল্লীজীবন।

সাঁওতালগণ ও সাঁওতালপরগণার নিম্নশ্রেণীর অধিবাসিগণ মৎস্য ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। সাঁওতালগণ কুক্কুট, গো, শূকর, গোসাপ, এমন কি নানাপ্রকার সর্পের মাংস পর্য্যন্ত আহার করে। আমি কোনও সাঁওতাল মাঝির মুখে শুনিয়াছি, গত বৎসর সে নিজে চারিটা বাঘ মারিয়াছিল এবং সকলে তৃপ্তির সহিত তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল। সাঁওতাল, ধানুক প্রভৃতি ইতর জাতি ছাগ ইত্যাদি পশুর মাংস ভিন্ন চর্ম্ম পর্য্যন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া খাইয়া থাকে। সাঁওতালগণ ধনুঃশরের ব্যবহারে সুনিপুণ; সাঁওতালের "কাঁড়বাঁশ" পশুপক্ষী কেন মানবজাতিরও ভীতি উৎপাদন করে। ১৮৫৬ সালের সাঁওতাল-বিদ্রোহে এই সাঁওতালী অস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ইংরাজ-অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছিল। ইহাদের সুদূরব্যাপী লক্ষ্য, শর-পরিচালনের ক্ষিপ্রতা দেখিলে পৌরাণিক যুগের আগ্নেয়, বারুণ, পাশুপত ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতির পরিচালন-বিষয়ক বিবরণ আমাদের কাল্পনিক বলিয়া অনুভূত হয় না। আজিকালি সাঁওতালগণ বেশ শান্তপ্রকৃতি হইয়াছে; তাহারা বনজঙ্গলে বৃক্ষতলে এক্ষণে আর আজীবন বাস করে না; একত্র দলবদ্ধ হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পল্লীগঠন করিয়া বাস করিতে শিখিয়াছে এবং ইংরাজ-আইনের বশ্যতা যথেষ্টপরিমাণে স্বীকার করিয়াছে। অতি দূরবর্ত্তী পল্লীবাসী সাঁওতালগণও বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারে। প্রত্যেক পল্লীতে একজন প্রধান ব্যক্তি বা মোড়ল আছে, ইহাকে "গ্রামমাঝি" বলে। গ্রামমাঝি গ্রামবাসীদের উপর যথেষ্ট আধিপত্য করে এবং অধিকাংশ স্থানেই বিশেষ অবস্থাপন্ন। সামাজিক জীবনে সাঁওতালগণ পরাধীনতা হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত।

একজন গ্রামবাসী কোন প্রকার অপরাধ করিলে গ্রামবাসিগণ প্রথমতঃ গ্রামমাঝির সহিত একত্র মিলিত হইয়া ঐ বিষয়ের মীমাংসা করে; সাধারণতঃ তাহারা আইন-আদালতের আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক নহে। সামাজিক স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্তশাসন ইহাদের বড় আদরের সামগ্রী বলিয়া মনে হয়। এক একটি গ্রামএক একটি সাধারণতন্ত্র (common-wealth)। ইংলণ্ডের আদিম স্যাক্সন

অধিবাসীদের সহিত ইহাদের সামাজিক শাসন-প্রণালীর তুলনা হয়। এই গেল সাঁওতাল অধিবাসীদের কথা। অসভ্য পাহাড়িয়াগণ ইহাদের অপেক্ষাও অধিকতর স্বাধীনচেতা। প্রকৃত প্রস্তাবে, পাহাড়িয়াগণ অদ্যাবধি পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আগষ্টাস ক্লেভল্যাণ্ড সাহেব পাহাড়িয়াগণের প্রধান ব্যক্তিদিগকে উৎকোচ ও নানাপ্রকার প্রলোভনে বাধ্য করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু "দামানীকো" নামক পাহাড়িয়াদের ক্ষুদ্ররাজ্যে তাহাদের আধিপত্য তথনও অক্ষুণ্ন ছিল 'এই "দামানীকো" রাজমহল পর্ব্বত ও তন্নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দশ শত বর্গমাইল বিস্তৃত ভূমিখণ্ড, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের তুলনায় অতি নগণ্য হইলেও বহুকালাবধি বঙ্গদেশের পরাক্রান্ত বিজেতাদের হস্ত হইতে প্রকৃতপক্ষে স্বকীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। পাহাড়িয়াগণ এখনও পর্ব্বতের উপরে এবং বনজঙ্গলেই বাস করে, অন্য জাতির সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছা করে না। সাঁওতালগণ সাঁওতাল-পরগণার অন্যান্য অধিবাসিগণের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, কৃষিকর্ম্মের দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা সদা সন্তুষ্টচিত্ত এবং বড় অপরিণাম-দর্শী। ভবিষ্যতের জন্য ইহারা শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রায়ই রাখে না। খাদ্যাদির অভাব হইলে বনের পশুপক্ষী ধরিয়া ভক্ষণ করে।

পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে, সাঁওতালগণের খাদ্যাদিগ্রহণ ও সামাজিক আচার-ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত না হইলেও খ্রীষ্টান ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুত্বের পক্ষপাতিত্বই ইহারা করিয়া থাকে। প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ বাইবেলোক্ত ধর্ম্ম-প্রচারে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কালপ্রভাবে ও তাঁহাদের প্রয়াসপ্রভাবে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সাঁওতালের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলেই সাঁওতালপরগণার অন্যান্য ইতর শ্রেণীর লোকের ন্যায় প্রেতযোনির পূজা করিয়া থাকে। কত বিভিন্ন প্রকারের প্রেতযোনি সাঁওতালপরগণায় সাগ্রহে পূজিত হয়, তাহার বিবরণ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ না হইলেও যে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিম্নে এই বিবরণ দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। বোঙ্গাবোঙ্গি—সাঁওতালদের প্রধান দেবতা। মৃত্তিকা দ্বারা একটি উচ্চ স্থান নির্ম্মাণ করিয়া, চারিটি স্তম্ভের উপর একটি ছাদ প্রস্তুত করে।

তন্নিম্নে দুইটি প্রস্তরখণ্ডে সিন্দূর লেপন করিয়া স্থাপিত করে। পর্ব্বাহে ইহার নিকটে মহাসমারোহ ও কোলাহল করিয়া উৎসব করে।

২। কুদরাকুদরি—গোয়ালাদের গৃহদেবতা। বিবাহোপলক্ষে ইহারা ইহার নিকট ছাগবলি দিয়া কায়মনোবাক্যে পূজা করে।

৩। গরভুকুমার—ইনি দ্বিতীয় প্রকারের অনুরূপ দেবতা।

৪। হরিণা ঠাকুর—ইনি সাঁওতালপরগণার দেশপূজ্য দেবতা। এতদ্দেশ-বাসী ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণও অতি ভক্তিসহকারে এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এই দেবতার স্থানে বার্ষিক ব্রাহ্মণভোজন হয়। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ইহার নামোচ্চারণপূর্ব্বক জলপান করাইলে তাহার মৃত্যু হয় না—সাঁওতালপরগণার অধিবাসিগণের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। প্রশ্ন করিলেই ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিও বিগত বৎসরের অন্ততঃ তিন চারিটি সর্পদষ্ট ব্যক্তির এইরূপে জীবনলাভের বিবরণ প্রদান করিয়া থাকে।

৫। দুবে—হরিণাঠাকুরের শ্রেণীর দেবতা।

৬। ডানভূতা—ধানুক ও ছুতার জাতি ইহার পূজা করে। ইনি অতি প্রভাবসম্পন্ন দেবতা। কথিত আছে, এই দেবতা যাহার গৃহে থাকেন, সে ইচ্ছা করিলেই নির্ব্বিঘ্নে অপরের যে কোনও অনিষ্ট করিতে পারে। এই দেবতা এক বর্ণের ছাগে পরিতুষ্ট হন।

৭। কারুদান — ডানভূতার তুল্য দেবতা।

৮। বাঘোওয়া—গোয়ালাজাতি ইহার পূজা করিয়া থাকে। বিবাহোপলক্ষে ইহার নিকট ছাগবলি দেওয়ার প্রথা আছে।

৯। দেওয়ান গোঁসাই—সকল জাতিই ইহার পূজা করে। যত্নপূর্ব্বক ইহার পূজা করিলে যে কোনও মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। গ্রামের নিকটস্থ কোনও বনপ্রদেশে ছাগবলি দিয়া ইহার পূজা করিতে হয় এবং সেই স্থানে রন্ধনাদি করিয়া সকলে একত্র সমবেত হইয়া ভোজন করিবার প্রথা আছে।

১০। সতিদান—মুসহরগণ ইহার পূজা করে। গ্রামের নিকটবর্ত্তী প্রকাণ্ড বৃক্ষমূল এই দেবতার স্থান। ইনি শূকর-বলিতে পরিতুষ্ট।

১১। রাঙ্গাধারী—গোয়ালা, ছুতার, তৈলী প্রভৃতি জাতি ইহার পূজা করে। বার্ষিক ছাগবলি না পাইলে ইনি কুপিত হন।

১২। মন্‌সা—গোয়ালারা ইঁহার পূজা করে। ইঁহার সন্তোষার্থ মেষবলি দিতে হয়।

১৩। চমরদানো—চামার জাতি ইঁহার পূজা করে। বৎসর বৎসর ছাগ-বলি দিয়া ইঁহার পূজা করা হইয়া থাকে।

১৪। সাঁপৌওয়া—গোয়ালারা ইঁহার পূজা করে। মধ্যে মধ্যে দধিদুগ্ধ প্রদান পরিয়া এই দেবতার পরিতুষ্টি সাধন করিতে হয়।

১৫। রাহু—দুসাধজাতির প্রধান দেবতা। প্রতি মাঘ মাসে ইঁহার উৎসব হয়। উপাসকগণ একটি গর্ত্ত খনন করিয়া উহা অগ্নিদ্বারা পূর্ণ করে। তৎপরে প্রধান উপাসক "চটিয়া" ঐ অগ্নির উপর দিয়া নগ্নপদে গর্ত্ত পার হয়, ক্রমান্বয়ে দর্শকবৃন্দও তাঁহার অনুসরণ করে। কথিত আছে, তরবারির শাণিত মুখের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উপাসকগণ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি ও অর্ঘ্য প্রদান করে।

১৬। জিয়ামাতা—সকল সম্প্রদায়ের সাঁওতালেরাই এই দেবতার পূজা করে। ইঁহাকে কৃষ্ণছাগী প্রদান করা হয়; প্রধান পূজক উহা গ্রহণ করে।

১৭। বিশাচেঁড়ি—গোয়ালারা পারাবত-বলি দিয়া ইঁহাকে পূজা করে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

ফরাসী-ইতিহাসের একটি চিত্র *

[মেরী এন্টয়নেট্]

আজ একশত বৎসরের অধিক হইল, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। রুসো, ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি মনীষিগণ নূতন বাণী প্রচার করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন; প্রতীচীর ভাব-রাজ্যে নূতন আলোক প্রদান করিয়া মানব-হৃদয়ের অনেক অন্ধ সংস্কার দূরীভূত করিয়া এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সে আজ অনেক দিনের কথা। আমরা সেই সময়ের একটি চিত্র পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। সে চিত্র আর কাহারও নয়—ষোড়শ লুইএর পত্নী সাম্রাজ্ঞী মেরী এন্টয়নেটের। ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত-লেখকেরা তাঁহার জীবনের করুণ মর্ম্মস্পর্শী বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী এমনই অসম্পূর্ণ ও অসংযতভাবে বর্ণনা

* সঙ্কলন।

করিয়াছেন যে, তন্মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত, কোন্‌টি অতিরঞ্জিত, তাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরে মেরী এণ্টয়নেট জন্মগ্রহণ করেন; অসীম-প্রতিভা-সম্পন্না রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা ইঁহার জননী। কথিত আছে, মেরীর জন্মগ্রহণকালে বিসুবিয়স্ নামক প্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি ভীষণ অগ্ন্যুদ্গার করিয়াছিল এবং তাঁহার আকৃতি রাজসভাস্থ গণকের ভীতির ও সমস্যার কারণ হইয়াছিল। মেরীর আলেখ্য দেখিলে সুন্দরী রমণী বলিয়া ভ্রম জন্মে; কিন্তু তাঁহার জীবনচরিত-লেখকেরা বলেন যে, সাম্রাজ্ঞীর জন্য তাঁহার আলেখ্য অতি-রঞ্জিত ও দোষশূন্য করিতে হইয়াছিল; কারণ তাঁহার ক্ষুদ্র চক্ষু, মাংসহীন দীর্ঘ মুখ ও স্থূল ওষ্ঠাধর নারী-সৌন্দর্য্যের প্রধান অন্তরায় ছিল। পঞ্চদশ লুই গূঢ় রাজনীতিক উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত তাঁহার পুত্রের সহিত পঞ্চদশ বৎসর-বয়স্কা মেরীর বিবাহ দেন। বিবাহের পর মেরীর বালিকা-সুলভ চপল প্রকৃতির একটুও পরিবর্ত্তন হয় নাই; মেরিয়া থেরেসা তাঁহার কন্যাকে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন, সদুপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি জীবনে কখনও মাতৃবাক্যের মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া কিরূপে দীনভাবে পঞ্চদশ লুইএর জীব-লীলা সাঙ্গ হয়, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। অল্প বয়সে ষোড়শ লুই রাজা হন। অকস্মাৎ অনাহুত রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার প্রকৃতিগত হেয় কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। প্রয়োজনীয় রাজকীয় কার্য্যে ব্যস্ত না থাকিয়া তিনি স্বনির্ম্মিত 'কামারশালা'য় অতি তুচ্ছ কর্ম্মকারের কার্য্যে দিবসের অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন এবং সেই প্রকার ধূলি-লিপ্ত অপরিষ্কৃত পরিচ্ছদে হয় ত রাজসভায় কিম্বা রাজ্ঞী-সকাশে উপস্থিত হইয়া সকলের বিরাগভাজন হইতেন। লুইএর বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই, কিন্তু তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বোধ হয়, মেরীর জন্মভূমির প্রকৃতিগত ব্যবহারের জন্য কিম্বা সম্রাটের অনুপযুক্ত সামান্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত উভয়ের দাম্পত্য প্রণয়বন্ধন দৃঢ় হইবার অবসর পায় নাই। ঐতিহাসিক লেখকগণ সম্রাটের গার্হস্থ্য-জীবন বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে লুই বিলাসী, সংযমী ও একটু নির্ব্বোধ

প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু যত গোল করিয়াছে, মেরী এন্টয়নেটকে লইয়া ; তাঁহার চরিত্র এমনই জটিল ও অসংযতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, মনে হয় তিনি ইচ্ছা করিলে সুদক্ষভাবে সাম্রাজ্য-চালনে সম্রাটকে অনেকটা সহায়তা করিতে পারিতেন এবং ভবিষ্যতে প্রজাদিগের বিদ্বেষবহ্নি ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইবার সহায়তা না করিয়া সময়ে অনেকটা নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেন।

মেরী যখন লুইকে বিবাহ করিয়া দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত হইলেন, তখন রাজ-সভাস্থ অনেক যুবক তাঁহার প্রিয়পাত্র হইবার জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ রাজপরিষদেরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কি প্রকারে মেরী স্বীয় হৃদয়ের অনাদৃত প্রেম এক বিদেশী যুবককে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা একটি সামান্য ঘটনা হইতেই জানিতে পারি। কোন সময়ে এক অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর গৃহে মেরী আহুত হইয়াছিলেন, সেই সময় কাউন্ট ফার্‌সেন্‌ নামক এক যুবকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কাউন্ট ফার্‌সেন্‌ অজাতশ্মশ্রু ঊনবিংশবর্ষীয় সুইড্‌ যুবক ; তিনি কার্য্যোপলক্ষে ফ্রান্সে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মহদন্তঃকরণ ও উন্নত চরিত্রের জন্য তিনি পারিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকটে শীঘ্রই পরিচিত হন এবং রাজকীয় উপাধি লাভ করেন। প্রথম আলাপে কাউন্ট ছদ্ম-বেশিনী মেরীকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু কেমন এক ভাগ্যচক্রে সেই অপরি-চিতার সঙ্গে তাঁহার গাঢ় আলাপ হইয়া গেল! এই ঘটনার পর কাউন্ট কিছুদিন ছদ্মবেশিনীর কোন সংবাদ বা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাইলেন না। একদিন কাউন্ট রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত হইয়া সম্রাটের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত, এমন সময় শুনিলেন—কে যেন পরিচিত সুরে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, তিনি আর কেহই নহেন, তাঁহার সেই পূর্ব্ব-পরিচিতা ছদ্মবেশিনী! তিনি সাম্রাজ্ঞী মেরী।

ইহার পর কাউন্টের সহিত মেরীর বন্ধুত্ব গাঢ়তর হইল। প্রথম আলাপের পর মেরী তাঁহাকে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় গ্রহণ করিলেন। এই বন্ধুত্বে মেরীর পূর্ব্ব-প্রকৃতিগত চাঞ্চল্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এখন তাঁহাকে স্থিরা, গম্ভীরা, রাজ্যশাসননিপুণা প্রকৃত সাম্রাজ্ঞী বলিয়াই মনে হইত। রাজসভাস্থ চাটুকারদিগের স্বার্থে আঘাত পড়িতেছে এবং তাহাদের কুটিলচক্রে এক বিদেশী

যুবকের দ্বারা ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা হইতেছে দেখিয়া তাহারা মেরী ও কাউণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সেই ষড়যন্ত্রে লুইএর ভ্রাতা কাউণ্ট দি প্রেভেন্স বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মেরীর অপবাদ রটাইতে মুক্তকণ্ঠ হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে এই ঘটনা লুইএর কর্ণে পৌঁছিল, তিনি মেরীর প্রকৃতি জানিতেন; কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া তিনি মেরীকে একটু সাবধান করিয়া দিলেন। কাউণ্ট ফারসেন্ ঘটনা-চক্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মেরীর সহিত প্রকৃত বন্ধুত্বের ফলে যে জনসাধারণের কঠোর দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পতিত হইতে পারে, তাহা তিনি একটুও চিন্তা করেন নাই। এমন রাজ্ঞীর ভবিষ্যৎ সুখের জন্য, অপবাদে মুক্তকণ্ঠ প্রকৃতি-পুঞ্জের নির্ম্মম সমালোচনার হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কাউণ্টকে ফ্রান্স ত্যাগ করিতে হইল।

তখন ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত দুর্ব্বল আমেরিকা তখন কার্য্যক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিতেছে। ইহা দেখিয়া বিভিন্ন দেশের যে সকল বীর স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষার্থ আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ফরাসী-দেশস্থ লাফেটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাউণ্ট ফারসেন্ লাফেটের সহযাত্রী হইলেন। সেখানে কাউণ্ট বহু বীরোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে যদি তিনি বীরের মত যুদ্ধশয্যায় শয়ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভবিষ্যতে এরূপ ঘৃণিতভাবে জীব-লীলা সাঙ্গ করিতে হইত না—ষ্টকহল্মের প্রকাশ্য রাজপথে উত্তেজিত জনসঙ্ঘের দ্বারা নৃশংসভাবে খণ্ডবিখণ্ড হইতে হইত না। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! কাউণ্ট সসম্মানে ফ্রান্সে ফিরিলেন। সম্রাট বীরত্বের আদর করিতেন; সুতরাং এখন তিনি কাউণ্টকে অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

তখন ফরাসীর রাজনীতিক আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন। একখণ্ড ক্ষুদ্র কাল মেঘ অতর্কিতভাবে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া ভবিষ্যতে যে ফ্রান্সের সমগ্র রাজনীতিক আকাশ আচ্ছন্ন করিতে পারে, আর ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের সঙ্গে প্রাণ-ঘাতী বিদ্যুৎস্ফুরণ রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিতে পারে, তখন

কেহ তাহা তিলমাত্র অনুভব করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে কালের গর্ভে যাহা নিহিত ছিল, তাহা অচিরে সংঘটিত হইল। উত্তেজিত জনসঙ্ঘ 'বাস্তিল' উড়াইয়া, সপরিবারে পলায়িত লুইএর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ফার্সেন্ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অনন্ত কালের গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া সম্রাট সপরিবারে বন্দী হইয়া ভার্সিলেসে আনীত হইলেন। তার পর কি হইল, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন। তবে অনেকেরই মতে মেরী এণ্টয়নেট্ প্রকৃত সাম্রাজ্ঞীর মতই সগৌরবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

শ্রীবঙ্কুবিহারী গুপ্ত।

প্রার্থনা।

এসেছে বহিয়া এ যে তোমার পরশ,
হয়েছে মলিন প্রাণ সজীব, সরস।
আনন্দ-অমৃতধারা লভিতেছি প্রাণে,
হয়েছে জগৎ পূর্ণ তব নাম-গানে।
দয়াময়! অতি দীন, তবু দয়া করে'
ভাসাইলে কি আনন্দ-অমৃত-সাগরে!
অতি দীন, তবু পূজা করিছ গ্রহণ,
যা' কিছু আনিয়া তোমা করি নিবেদন
লও তুলে, কভু নাহি চলে যাও দূরে.
আমি ভুলি, কিন্তু তুমি যতনে আদরে
সদা ডেকে লও কাছে, এত তব দয়া!
স্মরিলে চোখের জল উঠে উথলিয়া!
অতি ক্ষুদ্র—ভুলে যাই! কৃতজ্ঞতা-ভরে
প্রণমি' আশ্রয় মাগি ও চরণ'পরে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ।

বিহার।

চির-বসন্ত-সেবিত * সুবা—বিহার বা পাটনা।

এই প্রদেশের রাজধানী পাটনা গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড শহর। প্রায় সমস্ত বাড়ীই টালী বা খাপরাইলের ছাদ-যুক্ত।

এই শহরের ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে, পাহাড়ের পার্শ্বে গয়াতীর্থ। স্বর্গগত পুর্ব্বপুরুষদিগের আত্মার পিণ্ডদানার্থ হিন্দুরা এখানে নানা দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া থাকে। বিশেষতঃ সূর্য্য যখন ধনুরাশিতে থাকেন, সেই চল্লিশ দিন বহু লোক এখানে বাস করিয়া মন্ত্রপাঠ পুর্ব্বক পিণ্ডদান করে। এই কাযকে তাহারা ধর্ম্মকর্ম্ম মনে করে এবং ইহাতে তাহাদের নিজেদেরও পুণ্য হয়—প্রেতাত্মাদেরও মুক্তি ঘটে। ইহার নিকটে মার্ব্বেল পাথরের মত এক প্রকার পাথরের খনি † আছে। তাহাতে অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

মুঙ্গের জিলায় গঙ্গার ধার হইতে পাহাড় পর্য্যন্ত একটি প্রস্তর-প্রাচীর প্রস্তুত হইয়াছে। এই জিলায় পাহাড়ের ধারে মহাদেবের নামে পবিত্রীকৃত ঝাড়খণ্ড ‡ বৈজনাথ (বৈদ্যনাথ)। যাহারা জিনিসের কেবল বহির্দ্দেশ মাত্র দেখিতে অভ্যস্ত, তাহারা এখানে একটা আশ্চর্য্য ও রহস্যময় ঘটনায় বড়ই গোলমালে পড়ে। সেটা এই—এই মন্দিরে একটা বট গাছ আছে, কেহই তাহার উৎপত্তি-স্থান ঠিক করিতে পারে নাই। মন্দিরের কোন সেবকের অর্থাভাব ঘটিলেই সে পান-ভোজন ত্যাগ করিয়া, ¶ এই বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া তাহার অভাব পুর্ণ করিবার জন্য মহাদেবের পূজা করিতে

---

* বিহার শব্দের সহিত পারসী 'বাহার' শব্দের অনেকটা রূপ-সাদৃশ্য থাকায় কৌতুক করিয়া বিহারের বিশেষণ 'বাহার (বসন্ত) সেবিত' লেখা হইয়াছে।

† আ (২।১৫২) মতে—'বিহার সরকারের অন্তর্গত রাজগড় গ্রামের নিকটে'।

‡ আ (১৩৪০) মতে—ঝাড়খণ্ড ও ছোটনাগপুর একই স্থান। ঝাড়খণ্ডী নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে।

¶ এরূপ ভাবে অর্থ-সংগ্রহ ব্যাপার 'ভারতীয় দণ্ডবিধি'-অনুসারে অবৈধ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

থাকে। দুই তিন দিন পরে এই বৃক্ষ হইতে একটি পাতা পড়ে। এই প্রার্থীকে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ দিবার জন্য তাহাতে হিন্দী অক্ষরে জগতের যে কোন খণ্ডের কোন এক লোকের নামে অদৃশ্য লেখকের এক আদেশ-পত্র লেখা থাকে। আদিষ্ট ব্যক্তির বাস বৈজনাথ হইতে ৫০০ লিগ দূরে হইলেও সে পত্র দেখিয়া সে ব্যক্তির নিজের, তাহার সন্ততিবর্গের, স্ত্রীর, পিতার ও পিতামহের নাম, কোন্ দেশের কোন্ পাড়ায় বাড়ী, তৎসম্বন্ধে আরও অনেক সত্য সংবাদ জানিতে পারা যায়। প্রধান পুরোহিত পৃথক্ এক খণ্ড কাগজে সেই পত্রের অনুরূপ এক আদেশপত্র লিখিয়া সেবককে প্রদান করেন। ইহাকে 'বৈজনাথের হুণ্ডী' বলে। সেবক সেই পত্রের নির্দ্দেশমত যথাস্থানে যাইয়া আদিষ্ট লোককে সেই পত্র প্রদান করে। আদিষ্ট ব্যক্তি কোনরূপ চাতুরী বা প্রতারণা না করিয়াই অর্থ প্রদান করে। একবার এক ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থকারের নিকট 'বৈজনাথের হুণ্ডি' লইয়া আসিয়াছিল, তিনি তাহা শুভাদৃষ্টের সূচক মনে করিয়া অর্থদানে ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিয়াছিলেন।

এতদপেক্ষা আরও আশ্চর্য্যকর ব্যাপার—এই তীর্থক্ষেত্রেরই একটি গুহা-সম্বন্ধীয় ঘটনা। প্রধান পুরোহিত বৎসরে একবার মাত্র—শিব-ব্রতের (শিবরাত্রির) দিন সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে খানিকটা মৃত্তিকা লইয়া আসেন। মন্দিরের প্রত্যেক সেবককেই তিনি সেই মৃত্তিকা একটু একটু করিয়া ভাগ করিয়া দেন। যথার্থ শক্তিমানের (অর্থাৎ ভগবানের) শক্তি-প্রভাবে সেবকদিগের পুণ্যের পরিমাণানুপাতে সেই মৃত্তিকাখণ্ড স্বর্ণখণ্ডে পরিণত হয়।

ত্রিহুট বহুকাল হইতেই হিন্দু-শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠান হইয়া রহিয়াছে। ইহার জলবায়ু চমৎকার। এখানকার দধি একমাস পর্য্যন্ত অবিকৃত ও সুস্বাদ থাকে। কোন গোয়ালা দুধে জল মিশাইলে অদৃশ্য জগতের প্রভাবে তাহার কোন না কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এখানকার মহিষ এতদূর বলবান্ যে, ব্যাঘ্রও তাহাদের শিকার করিতে পারে না। বর্ষাকালে অত্যধিক জলের জন্য নানাবিধ হরিণ ও ব্যাঘ্র দলবদ্ধ হইয়া লোকাবাসে আশ্রয় লয়। লোকেরাও তাহাদের শিকার করিয়া আমোদ লাভ করে।

চম্পারণ জিলায় জমীর চাষ না করিয়াই মাস (কলাই ?) ডালের বীজ বপন করা হয় এবং কৃষকদের পরিশ্রম-ব্যতিরেকেই তাহা জন্মিতে থাকে। এখানকার জঙ্গলে লম্বা (লঙ্কা ?) মরিচ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে।

রোটাস-দুর্গ এক উচ্চ দুর্গম পাহাড়ের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরিধি চৌদ্দ ক্রোশ। এখানে চাষবাস হয়। এখানে অনেক স্বতঃ-উৎপন্ন ঝরণা আছে। চারহাত মাত্র মাটি খুঁড়িতে না খুঁড়িতেই ইহার সর্ব্বত্রই জল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে ত্রিশতাধিক হ্রদের সৃষ্টি হয়, আর ঝরণাগুলি কর্ণ ও নয়নের তৃপ্তিসাধিকা হইয়া উঠে।

সংক্ষেপতঃ, এ প্রদেশে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম পড়ে; শীতকালাদি কিন্তু বেশ নাতিশীতোষ্ণ; গরম তুলার জামা প্রভৃতি দুই মাস পরেই অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে। বর্ষা ছয় মাস থাকে। নদ-নদীর আধিক্যবশতঃ সারা বৎসরই দেশ শ্যামল ও সিক্ত থাকে। এখানে ভীষণ বাত্যা আদৌ হয় না, 'লু'ও বহে না। কৃষির অবস্থা খুব ভাল, বিশেষতঃ শালি ধান চমৎকারিত্বে অদ্বিতীয়। গরীব লোকে মটরের মত এক রকম ডাল—খেসারি খাইয়া থাকে; তাহাতে তাহাদের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। আক যথেষ্টপরিমাণে ও বেশ ভাল রকমই জন্মে; পান, বিশেষতঃ মঘী পান সুস্বাদু, সুগন্ধ ও সুমিষ্ট, তাহার রংও বেশ, দাগ কিম্বা চিড় * তাহাতে একটুও থাকে না। ফল পর্য্যাপ্ত; বিশেষতঃ কাঁঠাল এত বড় হয় যে, একজন অতি কষ্টে তাহা বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। মচকন্দ † নামে এক রকম অত্যন্ত সুগন্ধ ফুল জন্মে। তাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাহা দেখিতে ধুতুরা ফুলের মত। দুধ খুব ভাল ও শস্তা। ঘোটক ও উষ্ট্র তেমন সুপ্রাপ্য নয়। হাতী বেশ ভাল ও অসংখ্য। খাসী বেশ ভাল, কিন্তু এত বেশী মোটা হয় যে, অতি কষ্টে তাহাদের চলিতে ফিরিতে হয়। লোকে 'চারপায়' করিয়া তাহাদের বহিয়া লইয়া যায়। এখানকার তোতা ও শিকরে পাখী বিখ্যাত। খেলার ধরণও এখানে অনেক রকম

* আ (২।১৫১) মতে Thin in texure.

† সংস্কৃত muchakunda. যদুবাবু উত্তরবঙ্গে এই ফুল দেখিয়াছেন। ইহার পাপড়ি-গুলি ধুতুরার পাপড়ি অপেক্ষা বেশী পুরু ও মুখের কাছে বেশী ফাঁক। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য আশ্চর্য্যজনক।

আছে। এখানে নানারকমের কাপড় বোনা হয় ও শিল্পি-করা কাচের জিনিষ প্রস্তুত হয়।

এখানে নদ-নদী অনেকগুলি। তন্মধ্যে গঙ্গাই প্রকাণ্ড। শোন্-নদ দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়াছে। ইহা, জোহিলা * ও নর্ম্মদা নদী গড়ের নিকটবর্ত্তী শরবন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নর্ম্মদা দাক্ষিণাত্যের দিকে গিয়াছে। শোন্ ও জোহিলা এইদিকে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। সরযু উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী পাহাড়-শ্রেণী হইতে আসিয়া মেলেরের † নিকটে গঙ্গায় পড়িয়াছে। গণ্ডকও উত্তর পর্ব্বতপুঞ্জ হইতে আসিয়া হাজিপুরের নিকটে গঙ্গায় পড়িয়াছে। যেই ইহার জলপান করে, সেই গলগণ্ড (goitre) রোগে আক্রান্ত হয়; তাহা ক্রমশঃ নারিকেলের মত বড় হইয়া উঠে; তাহাকে জোঘোদ ‡ বলে; এ রোগ বিশেষতঃ ছেলেদেরই হইয়া থাকে। ইহার তীরে ¶ চল্লিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত শালগ্রাম পাওয়া যায়; তাহা কাল পাথরবিশেষ—ভগবানের বিগ্রহবিশেষ বলিয়া গণ্য। এই শালগ্রাম নানা রকমের হয়। প্রত্যেক রকমই ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ও পুজিত হয়।

কর্ম্মনাশা নদী দক্ষিণ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আসিয়া চৌসার 'ফোর্ডের' কাছে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। ইহার জল খারাপ বলিয়া বিবেচিত। এই নদী পার হইবার সময়ে যাহাতে ইহার জল কোনক্রমে গায়ে না লাগে—সেজন্য লোকে সাবধান হয়, দক্ষিণ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে পুনপুন্ নদ আসিয়া পাটনার নিকটে গঙ্গায় পড়িয়াছে। শুনা যায়, পাটনা শহর পর্য্যন্ত বাহাত্তরটি স্রাব্য নদী উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক হইতেই আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে।

---

* আ (২।১৫০) মতে 'গড়ের নিকটবর্ত্তী একটি শর-ক্ষেত্র হইতে শোন্, নর্ম্মদা ও জোহিলা উৎপন্ন হইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটির ১৫৬ ডি-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে 'জোহিলা'র বদলে 'চলা' (Chala) নাম লিখিত হইয়াছে। জোহিলা শোনের বামদিক্‌বাহিনী শাখানদী। (ইম্পি গেজে ১৩।৫২) গড় জব্বলপুর জিলার অন্তর্গত একটি শহর, তাহা গড়মণ্ডল রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। (ইম্পি গেজে ৫।১২)

† 'আ'র মতে 'শোন্ মেলেরের নিকটে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে।' খুলাসৎ-কার ভুল করিয়াছেন; সরযু (গোগ্‌রা) ছাপরার নিকটে পড়িয়াছে, মেলেরের নিকটে নহে। (ইম্পি গেজে ৫।১০৯)

‡ বিহারে এই রোগকে ঘোঘা বলে।

¶ 'আ' মতে শোনের তীরে, কিন্তু জেরেটের টীকার মতে গণ্ডকের তীরে।

গড়ী * হইতে রোটাস পর্য্যন্ত এই সুবার দৈর্ঘ্য ১২০ ক্রোশ এবং ত্রিহুত হইতে উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী পাহাড়পুঞ্জ পর্য্যন্ত ১১০ ক্রোশ। পূর্ব্বদিকে বাঙ্গলা, পশ্চিমে এলাহাবাদ ও অযোধ্যা, উত্তরে ও দক্ষিণে তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার সরকার—হাজিপুর, মুঙ্গের, চম্পারণ, সরণ, ত্রিহুত, রোটাস্ ও অপর কয়েকটি—এই ৮টি ও মহল ১৩০টি এবং রাজস্ব ৩৮ কোটি ৭ লক্ষ ৩০ হাজার দাম † (বা ৯৫, ১৮, ২৫০৲ টাকা)।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাঁড়ের প্রতিহিংসা। ‡

বিদেশী গল্প।

ভাঁড় ও বাজীকরের হৃদয়যুগল দুশ্ছেদ্য প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। আমি তাহাদের সর্ব্বপ্রথমে বোলোনা সার্কাসে দেখি এবং আমার এইখানে বলা উচিত যে, উহাদের ব্যায়ামাভিনয়ের ন্যায় এমন ভীতি-উৎপাদক ও হৃদয়-স্তম্ভন-কারী অভিনয় ইহার পূর্ব্বে আর আমি কোথাও দেখি নাই। প্রথমে কতিপয় সাধারণ ক্রীড়া চাতুর্য্যের সহিত অভিনয় করার পর, বাজীকর শিবিরের ছাদতলে আরোহণ করিল। বাজীকরের মাংসল, বলব্যঞ্জক ও সর্ব্বত্র তুল্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত অবয়ব এবং আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন-যুগল ও ঘনকুঞ্চিত কেশকলাপ তাহার অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতেছে। অনুক্রমণিকা-পাঠে অবগত হইলাম,

---

* তেলিয়াগড়ী—সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত, রাজমহল পাহাড় ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী একটি গিরিবর্ত্ম। (ইম্পি গেজে ১৩, ২৩৬)

† আ (২।১৫৩) মতে সরকার সাতটি, (উপরিলিখিত ছয়টি ও বিহার—এই সাতটি), মহল দুই শতটি এবং রাজস্ব টাকা ৫৫, ৪৭, ৯৮৫/৫ গণ্ডা। অষ্টম সরকার পাটনা।

‡ ফরাসী হইতে অনূদিত।

তাহার নাম পেয়োলা; দক্ষিণ ইটালীবাসীদিগের আকৃতি-প্রকৃতির সহিত তাহার আকৃতি-প্রকৃতির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য ছিল। যখন সে তাম্বুর ছাদতলে আরোহণ করিল, তখনও তদভিমুখে নিক্ষিপ্ত বিদ্যুতালোক-সাহায্যে আমরা তাহাকে বেশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহাকে তখন যেন মূর্ত্তিমান য়্যাপোলো (Apollo) বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছিল। ভাঁড়ের নাম জিয়োভ্যানী। সে এমন করিয়া সাজিয়াছিল যে,তাহাকে অতি কুৎসিত দেখাইতেছিল; বিশেষতঃ তাহার ঘনশ্বেতপাউডার-অনুলিপ্ত মুখমণ্ডলের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়টি আমার নিকট ভারী হাস্যোদ্দীপক ও কিম্ভূত-কিমাকার ঠেকিতেছিল।

পেয়োলো যতক্ষণ তাহার ক্রীড়ার প্রথমাংশ অভিনয় করিতেছিল, ততক্ষণ জিয়োভ্যানী বিবিধ বিকট মুখভঙ্গি করিয়া ও তাহার সহচরের ক্রীড়াসমূহের অনুকরণ করিতে গিয়া অসংখ্য 'আছাড়' খাইয়া, দর্শকবৃন্দকে আমোদিত করিতেছিল। তাহার পর যখন পেয়োলো শিবির-শীর্ষে উঠিল তখন জিয়োভ্যানীও শিবিরের ছাদ হইতে বিলম্বিত রজ্জু-সংলগ্ন এক কাষ্ঠখণ্ডে আরোহণ করিল। কোনরূপ দৈবদুর্ঘটনার ভয়ে নিম্নে একটি জালও 'খাটান' হয় নাই; কিন্তু পেয়োলো সেই অত্যুচ্চ স্থান হইতে অকুতোভয়ে উচ্চপদ নিম্নশির হইয়া নিম্নে নিপতিত হইতে লাগিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে দর্শকগণের ভীতিব্যঞ্জক চীৎকার ও প্রশংসা-সূচক করতালির শব্দে শিবির-তল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কিন্তু যদি জিয়োভ্যানী তাহার ঐন্দ্রজালিক বলবত্তা-সহকারে তখন পেয়োলোকে উভয় হস্তে জাঁকড়িয়া ধরিয়া ফেলিতে না পারিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই পেয়োলোর রাজীকর-জীবনের পর্য্যবসান হইত। পেয়োলো ও জিয়োভ্যানী এই অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিল এবং তাহারা কয়বৎসর যাবৎ উহা অতি সাফল্যের সহিত অভিনয় করিতেছিল। তাহারা উভয়ে পৃথক হইলে উভয়েরই উদরান্ন-সংস্থান দুরূহ হইয়া পড়িত। এজন্য তাহাদের দুই জনের একত্র অবস্থান নিতান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

পেয়োলো ও জিয়োভ্যানী সিসিলী-দ্বীপবাসী। এটনা আগ্নেয়গিরির পাদদেশস্থিত একটী পল্লী উভয়েরই জন্মভূমি। যখন তাহারা এক স্থান হইতে অপর স্থানে বিজয়োৎসাহে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময় একবার

তাহাদের জন্মভূমিসন্দর্শনের সংকল্প হয় এবং তদনুসারে তাহারা স্বদেশে গমন করে এবং সেখানেও তাহাদের সেই অপূর্ব্ব ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিতে থাকে। সেই সময়ে ক্রীড়াবিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দের মধ্যে রোজিতা নাম্নী এক তরুণী তাহাদের উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে সময় যুবকদ্বয় অর্থোপার্জ্জন-মানসে তাহাদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে, তখন তাহাদের গ্রামের নিকটে রোজিতার পিতার এক ক্ষুদ্র দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল। সেইজন্য তখন এই দীনাবস্থ যুবকদ্বয় উক্ত বালিকার পাণিপীড়নাশা দুরাশা বিবেচনা করিয়াছিল।

কিন্তু এক্ষণে তাহাদের অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন তাহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও যশ অর্জ্জন করিয়া গৃহাগত হইয়াছে। সুতরাং এখন রোজিতার পিতা ইহাদের দুইজনের সহিত আলাপ-পরিচয় রাখিতে বড়ই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন এবং রোজিতাও ইহাদিগকে তাহার পুরাতন বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিতেছে।

অল্প দিনের মধ্যে দুইটি যুবকই রোজিতার প্রেমে পাগল হইয়া উঠিল। রোজিতার পিতা, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তাঁহার দুহিতা যাহাকেই মনোনীত করুক না কেন, তাহাকেই তাঁহার কন্যা-সম্প্রদানে সম্মত ছিলেন।

জিয়োভ্যানী ও পেয়োলো উভয়েই দেখিতে অনিন্দ্যসুন্দর, কিন্তু ভাঁড়কে মাঝে মাঝে কিম্ভূত-কিমাকার সাজিতে হয়। এদিকে যে বাজীকর, সে সকল সময়ই শোভান্বিত; সেজন্য রোজিতার চিত্ত সহজেই পেয়োলার দিকেই সমাকৃষ্ট হইল। উভয়ে উভয়ের মনোভাব অবগত হইবার অব্যবহিত পরেই পেয়োলো ও রোজিতার দুই হাত চিরদিনের জন্য এক হইল।

এই ঘটনার পর জিয়োভ্যানী খুবই বিমর্ষ হইল বটে, কিন্তু পরিশেষে উহা বিধাতার কার্য্য ভাবিয়া সে যেন কতক আশ্বস্ত হইল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় হাসিখুসি করিতে লাগিল।

একদিন রোজিতা তাঁহার স্বামীকে বলিল, "জান—আমার ভারী ভয় করে, জিয়োভ্যানী হয় ত কোন্ দিন আমাদের একেবারে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। সে চলিয়া গেলে আমরা কি করিব? তোমাকে ত আর আমি অপরের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিব না।"

পেয়োলো কহিল, "সে আবার আশস্ত হইয়াছে, বোধ হইতেছে; সুতরাং আমাদের আর সে ভয় করিবার দরকার নাই।"

বেশ নিরুদ্বাটে কালাতিপাত হইতে লাগিল। অংশিযুগল পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক বেড়াইতে লাগিল। এখন জিয়োভ্যানী প্রত্যহ প্রত্যুষে একাকী কোথায় চলিয়া যাইত এবং তাহার ভাবগতিক দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত যে, সে এখন একাকী থাকিতেই ভালবাসে।

এইভাবে কিছুদিন গেল, অবশেষে বোলোনা সার্কাস হইতে একদিন এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল,—"সুবিখ্যাত জিয়োভ্যানী ও পেয়োলোর সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যায়ামাভিনয় আরও লোমহর্ষকভাবে অভিনীত হইবে। পেয়োলো অদ্য শিবির-শীর্ষ হইতে চক্ষু বাঁধিয়া নামিয়া আসিবে।" ফ্লোরেন্স ও ভিনিস্ নগরী হইতে অসংখ্য লোক এই সাহসের খেলা দেখিতে আসিল।

যেদিন এই ক্রীড়া প্রদর্শিত হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, সেদিন প্রভাতে জিয়োভ্যানী তাহার অভ্যাসমত প্রাতঃভ্রমণে গমন করিল। সে নগর অতিক্রম করিয়া চলিল। পরিশেষে, নগরোপকণ্ঠস্থিত এক কুটীর-দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং তাহার পকেট হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া কুটীরদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে আর একজন শ্রমজীবীর বেশধারী লোক সেই কুটীরে প্রবেশ করিল। কুটীরাভ্যন্তরে বলোনা সার্কাসের দৃঢ়রজ্জু বিলম্বিত কাষ্ঠখণ্ডের মত কুটীর-ছাদতল হইতে একটি অল্প পরিসর কাষ্ঠখণ্ড ঝুলান রহিয়াছে! তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই।

লোকটা তাহার শ্রমজীবীর বেশ উন্মোচন করিয়া ফেলিলে ভিতরের বাজীকরের সাজ বাহির হইয়া পড়িল। সে তখন ছাদতলে উঠিয়া গেল এবং জিয়োভ্যানী দারুখণ্ডে আরোহণ করিল। তখন তাহারা সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে বোলোনা সার্কাসের সেই সুবিখ্যাত ব্যায়ামক্রীড়া অভিনয় করিল। খেলা শেষ হইলে, জিয়োভ্যানী সেই লোকটাকে কহিল—"প্রিট্রো! আজ তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল। এখন হইতে তুমিও পেয়োলোর ন্যায় ইহা অভিনয় করিতে পারিবে। আজ হইতে তোমার সৌভাগ্যের সূত্রপাত

হইল। এখন তোমাকে কেবল প্রতিশ্রুত হইতে হইবে যে, যাহাই ঘটুক না কেন এবং যেখানেই আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হউক না কেন, তুমি এমন ভাব দেখাইবে যে, তোমায় আমায় যেন পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎ বা আলাপ-পরিচয় হয় নাই। আমাদের উভয়ের এই সম্মিলন এ পর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং এ পর্য্যন্ত কেহই আমাদের এই গোপন 'আখড়াই' প্রত্যক্ষ করে নাই। তুমি যদি এখন এ সকল বিষয়ে নীরব থাকিতে সম্মত হও, তাহা হইলে ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার প্রতি নিশ্চয়ই সুপ্রসন্না হইবেন।" লোকটা কহিল, "কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইতেছি যে, যে ক্রীড়া পেয়োলো অত সুন্দরভাবে অভিনয় করিতে পারে, তাহা তুমি আমায় কেন এত কষ্টস্বীকার করিয়া কেন শিখাইলে ?"

জিয়োভ্যানী সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিল,—"পেয়োলোর অসুখ-বিসুখ হওয়া ত বিচিত্র নয় ?

"ভাল, তা' যেন হইল; কিন্তু এ ব্যাপারটি এত গোপন রাখিবার চেষ্টা কেন ?"

"পেয়োলো ইহা জানিতে পারিলে ঈর্ষান্বিত হইতে পারে।"

যে রজনীতে প্রাগুক্ত অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সে রজনীতে আমি সার্কাসে সমুপস্থিত ছিলাম। যখন পেয়োলো চক্ষুঃ বাঁধিয়া শিবির-শীর্ষে আরোহণ করিল, তখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু যাহারা সতত পেয়োলো ও তাহার সহচরের এই অভিনয় দর্শন করিত, তাহারা প্রশান্তভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "বিপদের কোন সম্ভাবনাই নাই, জিয়োভ্যানী ও পেয়োলো এই ক্রীড়া অভিনয় করিয়া অব্যর্থ কৌতুক হইয়া পড়িয়াছে।

পেয়োলো পড়িতে লাগিল! জিয়োভ্যানী যেমন হস্ত-প্রসারণ করিত, তেমনই হস্তপ্রসারণ করিল; কিন্তু অদ্য হতভাগ্য পেয়োলো জিয়োভ্যানী কর্তৃক ধৃত না হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় তাহার বাহুযুগলের মধ্য দিয়া গলিয়া ভূমিতে নিপতিত হইল! একটি গুরু গম্ভীর শব্দ সমুত্থিত হইল। প্রত্যেক দর্শকই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

পেয়োলোর প্রাণহীন দেহ ভূমিতে পড়িয়া রহিল। জিয়োভ্যানী হতাশার আতিশয্যে দোদুল্যমান দারুখণ্ড হইতে নিম্নে নিপতিত হইল। অতদূর হইতে

লাফাইলে যে তাহার অস্থিসমূহ চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে, তাহার তখন সে জ্ঞান রহিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহার শারীরিক কোন ক্ষতিই হইল না।

সকলেই বলিতে লাগিল, "আহা! ইহাতে জিয়োভ্যানী কেবল যে তাহার বন্ধু ও অংশীদারকে হারাইল, তাহা নহে; ইহাতে তাহারও সর্ব্বনাশ হইল। আর কি কখন কাহারও দ্বারা পেয়োলোর অভাব পূরণ হইতে পারিবে?" এই অপঘাতের জন্য কেহ-জিয়োভ্যানীকে দোষ দিল না।

রোজিতা কিছুই বলিল না; কেবল জিয়োভ্যানীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জিয়োভ্যানী তাহার চোখে চোখ মিলাইতে পারিল না। অতর্কিতভাবে তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া গেল।

দুই মাস পরে রোমক সমাচারপত্রসমূহে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইল:—

"হতভাগ্য পেয়োলো এবং তাহার অংশী ও মিত্র জিয়োভ্যানী-প্রদর্শিত সেই বিশ্ববিখ্যাত ব্যায়ামাভিনয়টি আর একবার প্রদর্শিত হইবে। জিয়োভ্যানী সৌভাগ্যক্রমে এক বাজীকরের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তিনি মৃত পেয়োলোর সেই ক্রীড়াটি অভিনয় করিতে সমর্থ। আগামী বুধবার বাজীকর প্রিন্ট্রো শিবির-শীর্ষ হইতে সেই লোমহর্ষণ ঝম্ফ প্রদান করিবেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট চক্ষুঃবন্ধন করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই, সুতরাং এবার আর চক্ষুঃ বাঁধা হইবে না।"

পেয়োলোর বিধবা পত্নী তাঁহার পিতৃসদনে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া দোলনায় প্রশান্তভাবে নিদ্রিত শিশু সন্তানটির দিকে ঝুঁকিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা! তুমি যখন বড় হ'বে, তখন আমি তোমার কাছে একটা ভাঁড়ের হিংসার কথা বলব।" তখন রোজিতার সুন্দর ইতালীয় নেত্র-যুগল যেন কোনও অতীত অশুভ-স্মরণে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

দানে দীন।

হাফেজ পরমানন্দে
নিত্য নূতন বন্দনা-গানে
প্রেয়সীয়ে তা'র বন্দে ;
বিভোর সে কবি বলিল উঠিয়া,—
"রক্ত কপোলে যে তিল ফুটিয়া,
ওই তিলের তরে দিতে পারি আমি
বোখারা-সমরখন্দে,"—
শুনি' সেই কথা তৈমুর সাহ
কবিরে ডাকিয়া কয় ;—
"গেছে বহু প্রাণ অর্থও বহু
করিতে ছুটিরে জয়,
একি কথা কবি!—পার অকাতরে
দিয়ে দিতে ছুটি শ্রেষ্ঠ নগরে!
তোমার নিকটে রাজ্য আমার
এত কি তুচ্ছ হয়!"
কবি কহে, "ওগো বাদসাহ-রাজ!
যাহা কিছু আছে দামী,
সুন্দর-তরে খরচ করিয়া
চিরকাল ফিরি আমি ;
হয়ে গেছে এই আমার স্বভাব,
তাই এ দৈন্য, মেটে-না অভাব,
শোভার লাগিয়া সন্ন্যাসী তাই—
ফিরি যে দিবস্যামী।"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

ভক্তের ভগবান।

ভক্তি যে কি রহস্যময়ী, তাহা বলিতে পারা যায় না। জ্ঞানের হেতু আছে, কিন্তু ভক্তির হেতু নাই। শাস্ত্র-পাঠে, বিদ্বানের সংসর্গে, প্রকৃতির পর্য্যালোচনায় এবং বুদ্ধির পরিচালনায় জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু রাশি রাশি পুস্তক পাঠ কর, ভক্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং ভক্তিমার্গে নানা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সৎসঙ্গে আর সকল লাভ হয় বটে, কিন্তু ভক্তি লাভ হয় না। যদি কেহ আমায় বলে "আমায় ভালবাস বা আমায় ঘৃণা কর," তাহা আমার পক্ষে যেমন অসম্ভব, দেবতা-বিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে ভক্তি করিতে বলিলে তাহাও সেইরূপ অসম্ভব হয়। ভক্তি যে কিসে হয় বা কাহার প্রতি হয়, তাহার নির্দ্দেশ করাও অসম্ভব। ভক্তি লইয়া মানব জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার পাত্র ও প্রকার পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেই ভক্তি কোথাও বা বেগবতী হইয়া প্রস্রবণের ন্যায় হৃদয় ভেদ করিয়া মৃদু স্রোতে ভক্তের মনপ্রাণ ভাসাইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয় ও অমৃত বিতরণ করে। কোথাও বা উহা কঠিন আবরণে আবরিত থাকায় প্রথমে তাহার অস্তিত্বের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। অকস্মাৎ সেই আবরণ অপসৃত হইলে ভক্তির মধুময় উৎস মহাবেগে উত্থিত হইয়া আনন্দ-বারিতে চারিধার প্লাবিত করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যেমন নদ্যন্তরে পতিত হইয়া উহার কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া এক মহানদীর আবির্ভাব করে, সেইরূপ মানবহৃদয়ে ভগবদ্-স্থাপিত ভক্তিস্রোত সৎসঙ্গাদির সহযোগে পরিপুষ্ট হইয়া মহানদীর রূপ ধারণ করে এবং মধুর লহর তুলিয়া মধুরভাবে নৃত্য করিতে করিতে মধুময়স্রোতে দিগ্ দিগন্ত মধুময় করিয়া তুলে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য সৎসঙ্গপ্রসঙ্গে শ্রুত একটি গল্প নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমীর খাঁ নামক জনৈক পাঠান সৈনিকের কার্য্য করিত। সৈনিকদের প্রায় অবকাশ মিলে না। বহুদিনের পর আমীর বহুবার আবেদন করিয়া ছুটি পাইয়াছে। আমীরের মনপ্রাণ স্বগৃহাভিমুখে, আত্মীয় স্বজনের দিকে, পরিচিত বস্তু ও ব্যক্তির দিকে ছুটিয়াছে। আমীর দেশে যাইবে; প্রাণে তাহার আর

আনন্দের সীমা নাই। কত কি ভাবিতেছে, কত কি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে বাটী যাইবে, সহর হইতে ভাল ভাল দুই একটা জিনিসপত্র কিনিয়া লইতে হইবে। আমীর এলাহাবাদের বাজারে বাহির হইল।

দুই একটি দ্রব্য ক্রয় করা হইলে পর, আমীর ইতস্ততঃ করিতে করিতে এক চিত্রকরের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানে নানাপ্রকার চিত্র দোদুল্যমান রহিয়াছে। আমীর দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিত্রগুলি দেখিতে লাগিল। একখানি চিত্রের উপরে তাহার দৃষ্টি পতিত হওয়ায় সে অনিমেষনেত্রে তাহা দেখিতে লাগিল। সে অনেকক্ষণ এইভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে পর দোকানদার বলিল, "কি সেখ জী তস্বির চাই নাকি ?" আমীরের চমক ভাঙ্গিল। আমীর সেই চিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এখানি কাহার তসবির ?" দোকানদার বলিল, "শ্রীকৃষ্ণজীর।"

"তিনি কোথায় থাকেন ?"

"মথুরা বৃন্দাবনে।"

আমীর মূল্য দিয়া ছবিখানি ক্রয় করিয়া লইল। ছবিতে কদম্বমূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গিমঠামে বাঁশরীহস্তে দণ্ডায়মান। আমীর আবার কিয়ৎক্ষণ ছবিখানি প্রফুল্লনেত্রে অবলোকন করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"ছবিখানি কার ?" "কোথায় থাকেন ?"

"আমি ত বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের—থাকেন মথুরা বৃন্দাবনে, তুমি দেখা করিতে যাবে নাকি ?"

এই বলিয়া দোকানদার ঈষৎ হাস্য করিল। আমীর কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিল না, তসবিরখানি লইয়া চলিয়া গেল। বাসায় যাইয়া স্বদেশে যাইবার জন্য গাঁটরি বাঁধিল। কেবল সেই ছবিখানি বাহির করিয়া রাখিল। তাহার পর স্বদেশে যাইবার জন্য আমীর গাঁটরি-গুটরি সমস্ত অশ্বপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ছবিখানি হস্তে লইয়া বাহির হইল। যাইতে যাইতে ছবিখানির দিকে ঘন ঘন দেখে, আর কি এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাহার চিত্ত ভরিয়া যায়! আমীর মাঝে মাঝে কোন-স্থানে বিশ্রাম করিবার সময়ে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হাঁজী এ কার তসবির ?" সকলেই বলিল, "শ্রীকৃষ্ণের"; "কোথায় থাকেন" "মথুরা বৃন্দাবনে"। আমীরের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, দোকানদার তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া

ঠিকায় নাই। অকস্মাৎ আমীরের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমীর মনে মনে স্থির করিল, "বাটী না যাইয়া মথুরা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশে যাইব।" আমীরের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। আমীর মথুরাভিমুখে যাত্রা করিল। রাস্তায় যাইতে যাইতে পূর্ব্ববৎ ঘন ঘন ছবিখানি দেখিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতে লাগিল।

আমীরের অশ্ব আপন মনে চলিয়াছে; আমীর আপনার ভাবে আপনি বিভোর। বিহঙ্গগণ মধুর কলনাদে দিক মুখরিত করিতেছে, সে সঙ্গীত আমীরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না। যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সঙ্গীত তাহার প্রাণমন মাতাইয়া তুলিয়াছে, সে তাহাতেই মগ্ন। রাজমার্গের উভয়পার্শ্বস্থ প্রকৃতির শোভা আমীরের নেত্রপথে পতিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার অনুভূতি হইতেছে না। আমীর আজ এক কি অপূর্ব্ব রূপসাগরের সুষমা-অবলোকনে একেবারে তন্ময় হইয়া আছে! ক্রমে আমীর মথুরাধামে আসিয়া উপস্থিত। আমীরের প্রাণ উছলিয়া উঠিল। সে সাগ্রহে লোকদিগকে তসবিরখানি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—

"মহাশয়েরা এটি কাহার প্রতিমূর্ত্তি?" সকলেই বলিল শ্রীকৃষ্ণের। কেহ বলিল, "লোকটা মুসলমান কিনা তাই জানে না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে।" তাহার পর আমীর যখন জিজ্ঞাসা করিল "ইনি কোথায় থাকেন?" তখন কেহ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "লোকটা পাগল হে"; কেহ বা বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "মুসলমানের বুঝি কৃষ্ণভক্তি জেগেছে।" কেহ বা বলিল, "হবেও বা হয়ত একজন ভক্ত।" আমীর পুনঃপুনঃ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় কেহ বা বলিল, "এখানেই আছেন, তিনি সব জায়গায়ই থাকেন, খুঁজিয়া লও না বাপু।" আমীরের প্রাণে আঘাত লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "হায়! হায়! এত পথ আসিলাম, সব বৃথা হ'ল।" কিয়ৎক্ষণ পরে আমীর দেখিল—যমুনার ধারে কতকগুলি বালক ক্রীড়া করিতেছে। সে ভাবিল, "বালকেরা সরল-প্রকৃতি, ইহাদের জিজ্ঞাসা করি, ইহারা নিশ্চয়ই বলিয়া দিবে।" আমীর বালকদিগের নিকটে যাইয়া বলিল, "ভাই সকল, এই শ্রীকৃষ্ণ কোথায় থাকেন?" ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিতে লাগিল। একটা দুষ্ট বালক বলিল, "শ্রীকৃষ্ণ এই যমুনার ভিতরে থাকেন"। আমীরের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমীর

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিয়া যাইব?" বালক বলিল, "ঘোড়াশুদ্ধ জলের ভিতরে গিয়া পড়।" আমীর আর দ্বিরুক্তি করিল না; ঘোড়ার সহিত যমুনার জলে ঝম্প প্রদান করিল। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াটি জলের উপর ভাসিয়া তীরে আসিয়া উঠিল ও এক বৃক্ষের তলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন বালকেরা সেই দুষ্ট বালককে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ্‌দেখি কি কর্‌লি, বদ্‌মাইসি করিয়া একটা লোককে খুন কর্‌লি, ছি! ছি! ছি! একটা মহাপাপ কর্‌লি।"

এদিকে আমীর জলমগ্ন হইয়া দেখিল—সম্মুখে এক সুরম্য বৃহৎ অট্টালিকা এবং তাহার দ্বারদেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। আমীরের হস্তে সেই তসবির। সে একবার তসবিরখানি দেখে আর একবার ভগবানের দিকে দেখে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিয়া তসবির দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আরে ছি! লোকটা না দেখিয়া ছবি আঁকিয়াছে।" এই বলিয়া সে এক লম্বা সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ভগবান তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপু তুমি এখানে কি করিতে আসিয়াছ?" আমীরের চমক ভাঙ্গিল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "হুজুর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে কি ছিল? ফেলিয়া দিলে কেন?"

"আজ্ঞে আমার হাতে আপনার একখানা তসবির ছিল।"

"ফেলিয়া দিলে কেন?"

"আজ্ঞে লোকটা আপনাকে না দেখিয়াই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে—কিছুই হয় নাই! তাই ফেলিয়া দিলাম।" ঠাকুর আবার হাস্য করিয়া বলিলেন, "এখন কি চাই বল।"

আমীরের সর্ব্বশরীর শিথিল হইয়া আসিতেছে, সে মাতোয়ারা—আপন ভাবে আপনি মাতোয়ারা। জড়িতস্বরে বলিল, "আজ্ঞে কি চাহিব? কিছু ত চাহিতে আসি নাই। আমার চাহিবার ত কিছু নাই।" ভগবান বলিলেন, "তাহা হইবে না, তুমি যখন আমার এখানে আসিয়াছ, তোমায় কিছু লইতেই হইবে, অতএব তুমি কিছু চাও।"

"আজ্ঞে কি চাহিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।" এই বলিয়া আমীর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "হুজুর একটা কথা বলিব?" "বল—যা' চাহিবে তাই দিব।"

আমীরের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে প্রেমগদগদস্বরে আবার বলিল, "হুজুর আপনাকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড় আকুল হইয়াছিল, ভাগ্যক্রমে দেখা হইয়াছে। প্রাণে বড়ই আনন্দ হইয়াছে, সে যে কি আনন্দ তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। আমার প্রার্থনা, আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলেই আপনার এই মোহিনী মূর্ত্তি যেন আমার সম্মুখে দেখিতে পাই।" ভগবান বাঁধা পড়িলেন। "বৎস তাই হইবে"—এই বলিয়া ভগবান মধুরগতিতে অগ্রসর হইয়া আমীরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আমীর সংজ্ঞাহারা। আমীরের আমীরত্ব, মুসলমানত্ব, সৈনিকত্ব সকলই অপসৃত হইল। আজ আমীর দেববাঞ্ছিত যোগিগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভগবানের মোহন আলিঙ্গনে আবদ্ধ। ধন্য বিশ্বাসের মহিমা! ধন্য ভক্তি-বল! ধন্য ভগবানের অনুগ্রহ! আমীর সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখে যে, সে নদীমূলে বৃক্ষমূলে স্বীয় অশ্বপার্শ্বে দণ্ডায়-মান। আমীরের এই বিচ্ছেদেও প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সে অমনই ভগবানকে স্মরণ করিল। ভক্তবৎসল ভগবান তখনই দেখা দিলেন। আমীর দেখিল, আর কেহ দেখিল না। ভক্ত ও ভগবান এই মোহনলীলা করিতে লাগিলেন।

আমীরকে দেখিবামাত্র বালকেরা তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল। সেই দুষ্ট বালক উৎসুকভাবে বলিল, "সেখ জী শ্রীকৃষ্ণ জীর সহিত মুলাকাৎ হইয়াছে কি?"

"হাঁ জী আপনারে কৃপায় আমি কৃতার্থ হইয়াছি।" এই বলিয়া আমীর বালকের পদধারণ করিতে গেল। কি যেন এক অদৃশ্য শক্তির তাড়নে বালক বিশ পদ হটিয়া পড়িল! তখন আমীর উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া বালকদের আলিঙ্গন করিতে লাগিল। বালকেরা মাতিয়া গেল। হরিধ্বনিতে দিক্ নিনাদিত হইতে লাগিল। যমুনাতটে মহামহোৎসব উপস্থিত হইল। হরি হরি বলিয়া বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গও যেন নাচিতে লাগিল। ভক্তি ও বিশ্বাসের জয় ঘোষিত হইল। নিষ্কাম প্রেমের পতাকা উড্ডীন হইল। ভক্ত ও ভগবানকে লইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিল।

স্বর্গীয় ভূতনাথ ভাদুড়ী।

বিড়ম্বনা।

(কোনও বন্ধুর ডায়েরী ও পত্রাংশ হইতে সঙ্কলিত।)

১২ই বৈশাখ। লেখকজাতির বন্ধুরা চিরকালই কিছু 'উপরি' পাইয়া থাকেন। আমাকেও আমার বন্ধুদের প্রাপ্য বস্তু হইতে বঞ্চিত করা ভাল দেখায় না, সুতরাং আজ আমার নবপ্রকাশিত 'সমাজচিত্র' বন্ধুদের নিকটে পাঠাইয়া দিলাম।

আধুনিক সমাজ ও তাহার বিষময় পরিণাম শব্দ-চিত্রে চিত্রিত করিয়া 'সমাজ-চিত্র'-নামক "এলবাম"ভুক্ত করিয়া জগতের সম্মুখে পাঠাইলাম। কি জানি ইহাতে যদি সমাজের চেতনা হয়; সাহেবীয়ানার অনুকরণ-রোগ কিছু উপশম করিতে পারি।

তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন, 'চিকিৎসক আপনার রোগ ভাল কর'। আমি যদি নব্যতন্ত্রের সমাজকে সত্যসত্যই ঔষধ দিতে এত ব্যস্ত, তবে বেথুন কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্তা রায় সাহেবের পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছি কেন ?—ওটা কি জানেন মৃত পিতার অনুরোধরক্ষার্থ। রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় বনে গিয়াছিলেন, আর আমি এইটা করিতে পারিব না!

ইহাতে আমার মনে কতটা কষ্ট হইয়াছিল লোকে কি বুঝিবে—তাহারা ভাবে টাকাই বুঝি বড়।

* * * * * * *

১৫ই বৈশাখ। প্রায় সকল বন্ধুদের নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে। সকলেই তিনখানা চিত্রই খুব স্বাভাবিক হইয়াছে লিখিয়াছে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

তবে নবীন, রাজীব ও সুবোধের চিঠি বড়ই অদ্ভুত রকমের।

নবীনের বিশ্বাস, আমি আমার 'পার্ব্বতীচরণের' চরিত্রটা আমাদের উভয়ের বন্ধু কুমুদকে আদর্শ করিয়া রচনা করিয়াছি; সে তাহাকে আবার এই মর্ম্মে একটা পত্রও লিখিয়াছে।

রাজীবের মতে আমার 'নিবারণচন্দ্রের' চরিত্রটা আমাদের আফিসের বড় বাবুর exact photograph. পুস্তকস্থিত প্রত্যেক নিবারণচন্দ্রের পাশে

সে আমাদের আফিসের বড়বাবুর নাম লিখিয়া একখানা বই তাঁহাকে ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছে।

সুবোধ বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, আমি রায় সাহেবকে মিষ্টার ডাট্ নাম দিয়া mercilessly expose করিয়াছি। রায় সাহেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে তাহার নাকি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

সত্য বলিতে কি, আমি কাহাকেও আদর্শ করিয়া রচনা করি নাই। বন্ধুদের এ অদ্ভুত সংবাদ শুনিয়া আমার বড়ই হাসি পাইল। হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না—হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। সমস্তরাত্রি আহ্লাদে ঘুম হইল না। Byronএর একটা line যেন কাণের কাছে সর্ব্বদাই বাজিতে লাগিল—I woke one morning and found myself famous.

* * * *

১৬ই বৈশাখ। আজ সকালবেলা কুমুদের চিঠি পাইলাম, দেখিলাম নবীনের চিঠি পাইয়া সে বড়ই রাগিয়া গিয়াছে। তাহার চরিত্র লইয়া আমার উপহাস করিবার কোনও ক্ষমতা আছে কিনা দেখিবার জন্য শীঘ্রই আদালতের আশ্রয় লইবে বলিয়া শাসাইয়াছে।

আমার 'পার্ব্বতীচরণ' এতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ হইল, কিন্তু আসন্ন বন্ধু-বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন রহিয়া গেল। তবে ভাবিলাম, কুমুদকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া একটা চিঠি লিখিলে পর আপদ ঘুচিয়া যাইবে।

আজ ক্ষুণ্নমনে আফিসে গেলাম।

আফিসে যাইবামাত্র বড়বাবু আমার হাতে একখানি কাগজ দিলেন, তাহাতে লেখা—"Your services are no longer required"; নীচে বড় সাহেবের স্বাক্ষর। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি একটি ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমারা নভেল লিখিয়া যাহাতে দেশের উন্নতি করিবার জন্য বেশী সময় পাও, সাহেব তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।" যাক্ বেশ হইয়াছে, আমি আর একমাস চাকরী করিতাম বই ত নয়! কোনও মতে একটা মাস চালাইতে পারিব—তাহা হইলেই হইল।

মনটা কিন্তু বড়ই বিমর্ষ হইয়া গেল। চাকরী গিয়াছে বলিয়া নয়—কি জানি কি একটা অজানিত আশঙ্কায়।

বাড়ী ফিরিয়া দেখি টেবিলের উপর একখানি চিঠি রহিয়াছে। হস্তাক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম, রায় সাহেবের লেখা। মনটা যেন কেমন হইয়া গেল—খুলিতে সাহস হইল না। হাত কাঁপিতে লাগিল।

অবশেষে সাহসে ভর করিয়া খুলিতে হইল। দেখি—প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন, "তোমাকে পরমাসেই আমার জামাতা করিয়া আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু"—আর পড়িতে পারিলাম না, মাথা ঘুরিয়া আসিল; সমস্ত জগৎ-সংসার আমার সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধু লেখাগুলা যেন সজীব হইয়া আমার চোখের সাম্‌নে ঘুরিতে লাগিল। ঠিক এমনই সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, রায় সাহেব, কুমুদবাবু এবং আরও দু' একজন আমার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন।

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। চাকরকে বাবু পশ্চিম গিয়াছে বলিতে বলিয়া একটি ব্যাগ-হস্তে খিড়্‌কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

যে দেশে লেখকের আদর নাই, সেখানে কি থাকিতে আছে?

*   *   *   *

আজ বহুদিন হইল, এই সুদূর প্রবাসে আসিয়াছি। পুরাতন স্মৃতির বন্ধনটা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে; শুধু একটা শোক, একটা ব্যথা এখনও ভুলিতে পারি নাই। কেবল মনে হয়—

ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
দিন দিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে!

আহা! একমাস পরে যদি বইখানি ছাপাইতাম!

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

সম্পদের সুখ।

[গাথা]

চিনিবাস চর্ম্মকার
ধারে না দুঃখের ধার ;
দিন আনে, দিন খায় ,
তুড়ি দিয়ে টপ্পা গায় !
পেলারাম পোদ্দার
অস্থি আর চর্ম্মসার ;
গিনি গুণে গুণে কাবু,
প্রায় খেয়ে মরে সাবু !

২

একদা দেখেন তিনি
হাটে জুতা বেচে 'চিনি'।
'ভাল ত রে চিনিবাস ?'
'এ যে বাবু—সর্ব্বনাশ !'
মৃদু হাসে পেলারাম,
'চিনু' করে পেরণাম।
'চিনিবাস বৎসরে
কত টাকা আন ঘরে ?'
'বৎসরে ? হরি হরি !
দেখিনি হিসাব করি।
দিন আনি, দিন খাই,
আজি আনি, কালি নাই।'
'দিনে কত রোজগার ?'
'কত আর, কত আর ?
চলে যায় সংসার,
কাহারো ধারি না ধার।'

ভাবে পেলা, 'চিনু দুঃখী
তবু দেখি নহে রুক্ষী।
সন্তোষের পুরস্কার
নাহি কিছু বেচারার ;
দিব আমি শত গিনি।
'এই লও ওহে চিনি
একশো মোহর গুণে !'
চিনু হতভম্ব শুনে !
'দাও বাবু কোন্ গুণে ?'
'তোমার অবস্থা শুনে।
রেখো টাকা করে যত্ন।'
চিনু ভাবে, 'এত রত্ন
এইমত এক ঠাঁই
বুঝি কুবেরেরো নাই !
কি আমার শুভাদৃষ্ট !'
ঘরে ফিরে হ'য়ে হৃষ্ট।

৩

যখন পশিল ঘরে,
রাজ্যের ভাবনা ধরে !
'কে কখন্ দেবে ফাঁকি,
এত টাকা কোথা রাখি ?'
বাগানে খুঁড়িয়া গর্ত্ত
লুকায়ে রাখিল অর্থ ;
নাহি মুদে আঁখিপাত
দুশ্চিন্তায় সারারাত।

এইরূপে কত রাত
অনিদ্রায় অতিপাত।
সন্দেহ হইল ঘোর—
প্রতিবেশীমাত্রে চোর।
কেহ তা'র ঘরে এলে,
সব কাজ-কর্ম্ম ফেলে,
বাগানে দেখিতে ছুটে,
নিলে কি না যব লুটে!
তুড়ি মেরে টপ্পা তা'র
শুনেনাক কেহ আর।
বিড়াল মিঞাউ করে,
চিনু ভয়ে কেঁপে মরে!
সর্ব্বদাই মুখ ভার,
দেহ অস্থিচর্ম্মসার!
ঘুমায়ে চেঁচায়, 'চোর'!
অসুখের নাহি ওর!

আর এ জীবন বহা,
আর এ যন্ত্রণা সহা,
আর এ কম্পন বক্ষে
অসহ চিনুর পক্ষে।

৬

কপালে ফুটিল রেখা,
বদনে বেদনা-লেখা,
একদিন চর্ম্মকার
যায় যথা পোদ্দার।
'এই তব গিনি নাও,—
বাবু! মোরে ফিরে দাও,
মোর রজনীর ঘুম,
মোর তাম্রকুট-ধূম,
মোর নিরাতঙ্ক প্রাণ,
মোর তুড়ি দিয়ে গান!

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ।

বাঙ্গালা।

উৎকৃষ্ট সুবা বাঙ্গালা।

এই প্রদেশের রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীর নগর। নগরটি বেশ বিস্তৃত। কয়েক ক্রোশ ধরিয়া ইহাতে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। সপ্ত-রাজ্যের (জগতের) যাবতীয় পণ্যই এখানে পাওয়া যায়। সকল দেশ ও সকল জাতির লোকই এখানে বসবাস করে। এ দেশের আদি নাম হইতেছে বঙ্গ।

অত্যধিক জল-বন্যার গতিরোধ করিবার জন্য পুরাকালীয় রাজন্যগণ এদেশের সর্ব্বত্রই বিশ গজ চওড়া ও দশ গজ উচ্চ 'আল' (১) বা 'বাঁধ' প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই বঙ্গ ও আল শব্দযোগে সাধারণের মুখে মুখে দেশটা বাঙ্গালা আখ্যা পাইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে এদেশ নাতি-উষ্ণ হয় এবং ইহার শীত অল্প-কালব্যাপী ও নীতি-শীত। সূর্য্যের গতি বৃষরাশি ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেই বর্ষার আরম্ভ হয়। এই বর্ষা এখানে ছয় মাস থাকে। তখন জলে দেশ ডুবিয়া যায়, কিন্তু 'আল'গুলি জাগিয়া থাকে।

ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য। এখানে এত অধিক রকমের শস্য হয় যে, প্রত্যেক শস্যের এক একটি দানা একত্র করিলে অতি বড় একটা জালাও ভরিয়া যায়। একই ক্ষেতে তিনবার ধান বোনা হয় ও তিনবার ফসল হয়, আর তাহার অতি সামান্যই নষ্ট হয়। যেমন জল বাড়িতে থাকে, ধান গাছও তেমনই লম্বা হইতে থাকে, শস্যের শীষগুলি কখনও জলমগ্ন হয় না। এই গাছ আট হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এখানে জবতি (২) ও ঘল্লা-বকৃশী করের প্রচলন নাই। প্রাপ্য কর এখানে এই উপায়ে গৃহীত হয়—কৃষক দফে দফে পাই পাই করিয়া তাহার দেয় কর আট মাসের মধ্যেই শোধ করিয়া ফেলে। কৃষকেরা স্বভাবতঃই বশ্যভাবাপন্ন।

এখনকার প্রধান খাদ্য—ভাত ও মাছ। যব, গম ও অন্যান্য শস্য এখানকার লোকের রুচিকর নয়। কেবল তাহাই নয়, এদেশে রুটী খাবার রীতি পর্য্যন্ত নাই। শীতকালে তাহারা বেগুন, শাক ও লেবু একত্র পাক করিয়া একদিন রাখিয়া দিয়া তবে তাহা আহার করে। লবণ মিশাইয়া খাইতে তাহা বড়ই সুস্বাদ লাগে। এই ব্যঞ্জনটি দূর দেশেও প্রেরিত হইয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

---

(১) সংস্কৃত 'আলি' শব্দ হইতে আল শব্দ আসিয়াছে। আল—পাড়। (আ, ২।১২০ টিপ্পনী)। আজকাল বাঙ্গালায় দুই ক্ষেতের মাঝখানে যে নাতি উচ্চ পাড় (এক হাত চওড়া ও এক ফুট উচ্চ) থাকে, তাহাকেই 'আল' বলে। —সরকার।

(২) জ্যারেট বলেন—জবতি (ক) নিষ্কর ভূমি সরকার হইতে মাপিবার রীতি (বাঙ্গালায়), (খ) রাজস্বের জন্য বিশেষ কোন হিসাবে শস্য আদায় (বিহারে) [illegible] (২।১৫৩ টিপ্পনী)। ঘল্লা-বকৃশী মানে সরকার ও কৃষকের মধ্যে শস্যবণ্টন। (আ ২।১২২, ২।৩৩৮ টিপ্পনী)।—সরকার

এখানে ফল ও ফুল পর্য্যাপ্ত। এখানকার সুপারি (১) এত সুন্দর যে, তাহা চিবাইবা মাত্র মুখ লালাভ হইয়া উঠে। হীরা, মুক্তা, jaspers, ও চুনী এখানে বিভিন্ন বন্দর হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আনীত হয়।

এখানকার বাড়ীগুলি বাঁশের তৈয়ারি। এক একটা এমন সুন্দর বাঁশের বাড়ী আছে যে, তাহা প্রস্তুত করিতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছে। সেগুলি অনেক দিন টেঁকে। এখানে কোন কোন মাদুর এত সুন্দর করিয়া বোনা হয় যে, সেগুলি রেশমের চেয়েও সুন্দর দেখায়। এখানে 'শীতল পাটি' নামেও এক প্রকার মাদুর প্রস্তুত হয়।

এদেশের লোক নৌকায় যাতায়াত করে—বিশেষতঃ বর্ষাকালে। গ্রীষ্ম-কালে যাতায়াতের জন্য সুখাসন (২) ব্যবহৃত হয়। ইহার ভিতর একজন বেশ আরামে শুইয়া বা ঘুমাইতে ঘুমাইতে যাইতে পারে। তাপ ও বৃষ্টিরোধ করিবার জন্য ইহার একটা ছাদ আছে। হাতীতে চড়িয়া যাতায়াত বেশ আরামজনক। (৩) লোকে কদাচিৎই ঘোড়ায় চড়ে।

এদেশে কাযকর্ম্ম সমস্তই স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকে। (৪) স্ত্রী পুরুষ সকলেই উলঙ্গ থাকে। এদেশ হইতে বহুসংখ্যক খোজা অন্যত্র প্রেরিত হয়। তাহারা ত্রিবিধ:—প্রথম সন্দলি ও অতলসী; দ্বিতীয়, বাদামী; এবং তৃতীয়, কাফ্রী। খাসী করিয়া দিলে, মানুষ ব্যতীত আর সকল জন্তুরই উদ্ধতভাব কমিয়া যায়; কিন্তু মানুষের বেলায় এই ভাব কমা দূরে থাক, বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। এজন্যই খোজাদের বাক্য কঠোর ও তাহাদের স্বভাব ক্রোধন বলিয়া একটা কথাই জন্মিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্ণৌতি (গৌড়) একটি প্রাচীন শহর। এদেশের প্রথম রাজধানী এই।

---

(১) নোয়াখালি ইহার জন্য বিখ্যাত।

(২) আঁ (২।১২২) মতে 'সুখাসন'। সোসাইটির ১৫৬ ডি-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিমতে 'সিংহাসন'। ইহা এক রকম পাল্কী।

(৩) সোসাইটির উভয় পাণ্ডুলিপিই ভ্রমসঙ্কুল। ১৫৬-ডি গ্রন্থমতে 'কেবল উষ্ট্রে যাতায়াতই এখানে একেবারে চলে না।' ১৫৭-ডি গ্রন্থ মতে, 'তাহারা (সুখাসনগুলি) সুন্দর করিয়া তৈয়ারি করে।' উপরের অনুবাদই যদু বাবু আইন (২।১২২) মত-অনুযায়ী করিয়াছেন।

(৪) ১৫৭-ডি-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি মতে 'প্রধানতঃ কর্ম্মা সাহায্যেই কাযকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়।'

এদেশের প্রথম রাজধানী লক্ষ্মৌতি (গৌড়) একটি প্রাচীন শহর। সম্রাট হুমায়ুন কৃপা করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন; তিনি ইহার বায়ুর মধুরতা উপলক্ষ করিয়া নাম রাখেন জিন্নতাবাদ। এখানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ আছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে একটি প্রকাণ্ড দীঘি (১) আছে। ইহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্ত সহরটা জলমগ্ন হইয়া যাইবে।

শ্রীহট্ট প্রদেশ পর্ব্বতবেষ্টিত। এখানকার প্রস্তুত ঢাল বিখ্যাত। এখানকার সংতরা (২) ফলের রং কমলালেবুর মত, কিন্তু তাহা কমলা অপেক্ষা বড় ও মিষ্ট। চিনামুল (smilax glabra) এবং aloes কাঠ এখানে প্রচুর জন্মে। বর্ষার শেষে এই গাছ কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখা হয়। কিছুকাল পরে ইহার সবুজ রং বা সারবত্তা অনুমান করিয়া (৩) ইহা বাজারে প্রেরিত হয়। এখানে অনেক খোজা তৈয়ারি হয়।

ঘোড়াঘাট (৪) সরকারে রেশমী ও পাটের কাপড়, কুণ্ট ঘোড়া (পাহাড়ে টাটু), খাসী-করা জন্তু ও ভারতীয় নানরকম ফল অপর্য্যাপ্ত। সমুদ্রোপকূলে বাগলা (৫) সরকার সর্ব্বজনবিদিত। ইহার দুর্গের অনতিদূরে এক জঙ্গল আছে। প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত নদী তরঙ্গময়ী হইয়া উঠে এবং তাহা পাহাড়ের মত স্ফীত হইয়া এক আশ্চর্য্য দৃশ্যের অবতারণা করে। তাহার পর তিথি হইতে চন্দ্রমাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত জল আবার একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে।

ইহার সন্নিকটে (৬) কামরূপ। কামরূপ কাওনরু নামেও পরিচিত। এখান-

---

(১) আইন (২।১২৩)এ ইহার নাম আছে ছাটিয়াপটিয়া (chhatiapatia).

(২) জ্যারেটের মতে বাতাবি লেবু। (আ ২।১২৪ টিপ্পনী।)

(৩) "সবুজবর্ণ বা সারবত্তার তারতম্য-অনুসারে বৃক্ষগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হয়।" —আ (২।১২৫)

(৪) রেণেলের বেঙ্গল এটলাস, ৬ শিটে ঘোড়াঘাট বগুড়ার ২৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। রঙ্গপুর, দিনাজপুর এবং বগুড়া জেলার কতকাংশ এই সরকারের অন্তর্গত ছিল।

(৫) সুন্দরবনসহ হুগলী।

(৬) খুলাসৎ এই অংশে যে 'আইন'কে অতি মাত্রায় অনুসরণ করিয়াছেন, সেই 'আইন'এ কামরূপ কোচবিহারের ঠিক পরেই অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই 'সন্নিকটে' কথাটার সহজ অর্থ গ্রহণ না করিলেই চলিবে।

কার স্ত্রীলোকদের রূপ অত্যধিক ; তাহাদের মন্ত্রতন্ত্র, যাদু ও চাতুরী এমনই যে, কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। তাহাদের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—তাহারা যাদুর বলে এমন সব বাড়ী তৈয়ারি করে যে, সে সব বাড়ীর ছাদ ও থামগুলি সবই মানুষগুলি দিয়া তৈয়ারি। এই মানুষ-গুলি বাঁচিয়া থাকে—মরে না, কিন্তু তাহাদের নড়িবার-চড়িবার বা এমন কি নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিবার ক্ষমতা থাকে না। মেয়েরা যাদুর বলে পুরুষদের পশু-পক্ষী সব বানাইতে পারে, আর এই পুরুষদের বাস্তবিকই পশুর মত লেজ ও কান বাহির হয়।

তাহারা যাহাকে খুসী তাহারই হৃদয় জয় করিয়া তাহাকে একেবারে আপনাদের বশে আনিতে পারে। তাহারা গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও বিরামের কথা বলিতে পারে, শস্য মহার্ঘ হইবে কি সস্তা হইবে তাহা আগে থেকে বলিতে পারে, মানুষের পরমায়ু গণিয়া দিতে পারে। পূর্ণগর্ভা রমণীর জরায়ু কাটিয়া তাহারা তাহা হইতে ছেলে বাহির করিয়া তাহার ভবিষৎ বলিয়া দেয়। (১) এই রাজ্যে একটা আশ্চর্য্য গাছ আছে। যখনই তাহা চিরিয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহা হইতে এক মিষ্ট জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা দূর করে। আর এক প্রকার গাছ আছে, তাহাতে আম ও দ্রাক্ষা (২) উভয়ই ফলে। এরাজ্যে পুষ্পপ্রদায়ী আর এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ (৩) আছে ; তাহা একেবারে উপড়াইয়া ফেলিলেও দুই মাস পর্য্যন্ত শুকায় না, এমন কি তাহার গন্ধ ও বর্ণ নষ্ট হয় না। লোকে তাহাতে গলার মালা তৈয়ারি করে।

এই প্রদেশের সন্নিকটেই আসাম। তাহা বেশ বিস্তৃত দেশ। ইহার কোন শাসনকর্ত্তা দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয়জনবর্গ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আপনাদিগকেও মৃত্তিকাগর্ভস্থ করিয়া থাকে। উত্তরাধিকারী-হীন অবস্থায় কেহ দেহ ত্যাগ করিলে, তাহার দেহের সঙ্গে তাহার যাবতীয় সম্পত্তিও কবরশায়ী করা হয়।

---

(১) "তাহারা ভবিষৎ সম্বন্ধে কিছু বলে"—আ (২।১২৭)

(২) খুলাসৎকার এখানে 'আইন'এর বাক্যার্থ ঠিক ধরিতে পারেন নাই। 'আইন'এ আছে—'তাহাদের একটা আম গাছ আছে, তার গুঁড়ি নাই। তাহা দ্রাক্ষালতার ন্যায় অন্য গাছকে আশ্রয় করিয়া উঠে, এবং ফল দেয়।' (২।১১৭)

(৩) সম্ভবতঃ তুলসী গাছ।

ইহার নিকটে মহাচীন দেশ। ইহার রাজধানী খাম্বলিগ শহর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ৪০ ক্রোশ-ব্যাপী একটি খাল কাটা হইয়াছে। তাহার উভয় তীর চুণ ও প্রস্তর সাহায্যে বাঁধান হইয়াছে। রুম-রাজ আলেকজন্দর এই দেশ হইতে ঐ দেশে গিয়াছিলেন।(১) ঐ দেশের সমস্তটা পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আবার নদীপথে ফিরিয়া আসেন। রাজা আলেকজন্দরের আদেশক্রমে যাবতীয় বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি, সমুদ্রতীরে এক যাদুমন্ত্রপূত মনুষ্য-হস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। কোনও জাহাজ সে দিকে অগ্রসর হইলেই ঐ হাত কোন ভঙ্গী দ্বারা অগ্রসর হইতে বারণ করে, যেন বলে—'এ পথে আসিও না।'(২)

দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে আরাকান নামে এক বিস্তৃত দেশ বিদ্যমান। চাটগাঁও বন্দর ইহার অন্তর্গত। এখানে হাতী পর্য্যাপ্ত; শ্বেত-হস্তীও পাওয়া যায়। এখানকার ঘোড়া, উট ও অশ্বতর (৩) বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। এখানে গরু ও মহিষ একেবারেই পাওয়া যায় না। এখানে এক রকম জন্তু আছে, তাহা নানা বর্ণের এবং তাহাতে গরু ও মহিষ উভয়েরই বিশেষত্বগুলি বর্ত্তমান। তাহার দুগ্ধ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানকার লোকের ধর্ম্ম হিন্দু ও ইসলাম—উভয় ধর্ম্ম হইতেই পৃথক। তাহারা নিজেদের ভগিনীকে, এমন কি যমজ ভগিনীকে পর্য্যন্ত বিবাহ করে, কেবল এক গর্ভধারিণী মাকে ছাড়া সকলকেই তাহারা বিবাহ করিতে পারে। তাহারা তাহাদের ধর্ম্মাত্মাদের 'ওয়ালী' বলে, এবং কখনও সেই 'ওয়ালী'দের সদুপদেশ অমান্য করে না। পুরুষেরা নতশির হয় না বলিয়া, যোদ্ধাদের স্ত্রীদের রাজসভায় অবস্থান করার রীতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।(৪) অধিকাংশ লোকই কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্মশ্রুহীন।

ইহার নিকটে চীনদেশ। ইহার এক দিক শুষ্ক (৫); সে দিকে চুণী, হীরা,

---

(১) মেসিডন-রাজ আলেকজন্দর ভারত হইতে ভারত আসিয়াছিলেন; গ্রন্থোক্ত মত ভ্রান্ত।

(২) আবুল ফজল এই আজগুবি গল্পের উল্লেখ করে নাই।

(৩) আ (২।১১৯তে) কিন্তু আছে—"ঘোড়া দুষ্প্রাপ্য ও দুস্বাকৃতি।"

(৪) এখানে 'আ'র পাঠ অনুসরণ করা হইয়াছে। ১৫৬ ডি পাণ্ডুলিপিতে আছে—"রাজ সভায় স্ত্রী যোদ্ধাদের উপস্থিত রাখা তাহাদের রীতি, আর পুরুষেরা (তাহাদিগকে) নমস্কার করে।" আইন-এ ইহার অপর নাম, 'পেগু' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

(৫) জ্যারেট 'শুষ্ক' স্থলে 'আরাকান' পড়িয়াছেন।

সোণা, রূপা, raftha ও গন্ধকের খনি আছে। এদেশের লোকেরা এই সব খনির জন্য মগেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

অল্পকথায়, এই বাঙ্গালা দেশ অত্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সর্ব্বপ্রধান নদী—গঙ্গা। পূর্ব্বে এই গঙ্গার সম্বন্ধে অনেক গুণগান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় নদ ব্রহ্মপুত্র। ইহা কোচবিহারের পর্ব্বতপুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া বজুহা (১) সরকারের ভিতর দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে।

এই প্রদেশের দৈর্ঘ্য চাটগাঁও বন্দর হইতে গড়ী পর্য্যন্ত ৪০০ ক্রোশ, এবং বিস্তার উত্তর হইতে মদারণ সরকার পর্য্যন্ত ২০০ ক্রোশ। ইহার পূর্ব্বে মহাসাগর, পশ্চিমে বিহার সুবা, উত্তর ও দক্ষিণে তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার তাঁড়া, ফতেবাদ জিন্নতাবাদ, বাগলা, তাজপুর, পিঞ্জরা, বর্‌বকাবাদ, বজুহা, সোণারগাঁও, শ্রীহট্ট, চাটগাঁও, শরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ, ঘোড়াঘাট, মদারণ প্রভৃতি ২৭টি সরকার ও ১১০৯টি মহল। ইহার রাজস্ব ৪৬ কোটি ২৯ লক্ষ দাম (২) (১,১৫,৭২,৫০০৲ টাকা) এবং ৪,২০০ বন্দুক ও ৪,৪০০ নৌকা।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত।
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(১) ময়মনসিংহ-বগুড়া (আ ১।৫২০ টিপ্পনী)।

(২) আ (২।১২৯) মতে ২৪ সরকার ; ৭৮৭ মহল এবং রাজস্ব ১,৪৯,৬১,৪৮২৸৴৭ পাই ; ৪২৬০ বন্দুক ও ৪৪০০ নৌকা। ইহা অবশ্য বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা একত্র লইয়া। উপযুক্ত ১৫টি সরকার ব্যতীত অন্যান্য সরকারগুলি এই—মহম্মদাবাদ, খলিফাবাদ, পুর্ণিয়া, সাতগাঁও, জলেশ্বর, ভদ্রক, কটক, কলঙ্গ, দণ্ডপট ও রাজমহেন্দ্র। ইহাদের মধ্যে শেষ পাঁচটি উড়িষ্যার অন্তর্গত। ১৫৬-ডি সংখ্যক পাণ্ডুলিপির 'পিঞ্জরা' শব্দ 'হিজরা' রূপেও পঠিত হইতে পারে।—সরকার।

মেটিয়াবুরুজের নবাব।

অযোধ্যার শেষ মুসলমান শাসনকর্ত্তা ওয়াজেদ আলী শাহের নাম ইতিহাস-পাঠকের নিকটে অবিদিত নহে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ড্যালহৌসী তাঁহাকে অযোধ্যার সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া রাজকীয় বন্দীরূপে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। ওয়াজেদ্ আলীর শাসন-সময়ে অযোধ্যার রাজকার্য্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং এইজন্যই তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত হইতে হয়। ওয়াজেদ্ আলী প্রথমতঃ কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গে বন্দীরূপে অবস্থান করেন; পরে তাঁহাকে কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত মেটিয়াবুরুজে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময় হইতেই তিনি তথায় বসবাস আরম্ভ করেন। এইজন্য তিনি জনসাধারণের নিকটে 'মেটিয়াবুরুজের নবাব' নামেই সমধিক পরিচিত।

ইতিহাসে নির্ব্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলীর বিরুদ্ধে অনেক কথাই শুনা যায়। যেসকল গুণ থাকিলে লোকপ্রিয় শাসনকর্ত্তা হওয়া যায়, তাঁহার চরিত্রে সেসকল গুণ বর্ত্তমান ছিল না, একথা সত্য; কিন্তু তিনি যে একেবারে সহৃদয়তা-হীন, দয়ামায়াশূন্য, কঠোরচিত্ত নৃপতি ছিলেন, ইহাও ভরসা করিয়া বলিতে পারা যায় না। যে সময়ে তিনি অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সে সময়ে অযোধ্যার বিশৃঙ্খল শাসন-কার্য্য তাঁহার রাজ্যচালনাযোগ্যতার পরিচয় দেয় সত্য, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র বিশেষভাবে অবগত আছেন, তাঁহারা বলেন যে নবাব কখনই প্রজাপীড়নাদি কার্য্যের উৎসাহদাতা ছিলেন না। যদি তাঁহার শাসন-সময়ে অযোধ্যায় প্রজাকুলের উপর অত্যাচারাদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেসকল তাঁহার কর্ম্মচারিগণের দুষ্টতাবশতঃই সংঘটিত হইয়াছিল, এইজন্য কর্ত্তব্যপালনে অবহেলারূপ গুরুদোষ তাঁহার উপরে অবিসম্বাদে অর্পিত করা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি যে স্বয়ং সে সকল কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ওয়াজেদ আলী শাহ রাজকীয় বন্দীরূপে কলিকাতায় আনীত হন। তাঁহার সহিত তাঁহার বেগম নবাব খাস্‌মহল সাহেবা, কতিপয় নিকট

আত্মীয় এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহাকে অনুচরবর্গসহ কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে রাখা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত মেটিয়াবুরুজ নামক স্থানে বসবাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইয়া ওয়াজেদ আলী মেটিয়াবুরুজে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহার সহিত তাঁহার অনুচরবর্গও মেটিয়াবুরুজে বসবাস আরম্ভ করিলেন।

মেটিয়াবুরুজে তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের বাসোপযোগী অট্টালিকা ছিল না বলিলেই হয়। বিশেষতঃ নির্ব্বাসিত নবাব ও তদীয় উচ্চপদস্থ সহযাত্রিগণ বাস করিতে পারেন, এরূপ বিস্তীর্ণ প্রাসাদতুল্য ভবন তখন সেখানে আদৌ ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া নবাব তখন একখানি সামান্য অট্টালিকায় এবং তাঁহার অনুচরবর্গ মেটিয়াবুরুজের সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্র কুটীরাবলীতে বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতার কেল্লা অপেক্ষা এইখানে বসবাস করায় যে তাঁহারা অধিকতর স্বাধীনতা অনুভব করিতে লাগিলেন, এ কথার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

নবাবের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য এই সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করিলেন। এই বৃত্তি তাঁহার অবস্থার উপযোগী হইয়াছিল কি না, তদানীন্তন একজন সদ্যনির্ব্বাসিত নবাবের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের যোগ্য হইয়াছিল, আমরা এ কথার আলোচনা করিব না। এই বৃত্তি-সম্বন্ধে ওয়াজেদ আলীর বেগম খাসমহল সাহেবা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মাসিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তি নবাবের পক্ষে যথাযোগ্য হয় নাই। সম্ভবতঃ সেইজন্যই বেগম সাহেবা তাঁহার স্বামীকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বৃত্তি-গ্রহণে অস্বীকৃত হইতে বলেন। তিনি আরও বলেন, "বৃত্তি গ্রহণ করিলে আপনার পদমর্য্যাদা ও রাজসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে। আর এই সামান্য বৃত্তিতেও আপনার চলিবে না। আপনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই বৃত্তি লইবেন না। আমি যত দিন বাঁচিব, আপনার হাত খরচের জন্য মাসিক এক লক্ষ টাকা করিয়া দিব।" বেগম সাহেবার কথায় নবাব ওয়াজেদ আলী কি করিবেন—প্রথমে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি বেশ জানিতেন যে, বেগম খাসমহল অযোধ্যা হইতে যে বহুমূল্য রত্নরাজি ও অপরিমিত অর্থ লইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে বেগম সাহেবা

তাঁহার কথা অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু ওয়াজেদ আলী নিজ স্ত্রীর অর্থে জীবনধারণ অপেক্ষা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বৃত্তিগ্রহণই সমধিক গৌরবকর বিবেচনা করিলেন এবং স্ত্রীর নিকটে আত্মবিক্রয় অপেক্ষা ইংরাজ-রাজের বৃত্তিই পরম কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলেন।

বেগম খাসমহলের ন্যায় নবাব ওয়াজেদ আলীও বহু অর্থ এবং বহুমূল্য রত্নাদি অযোধ্যা হইতে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন। মেটিয়াবুরুজে বসবাস করিবার অল্পদিন পরেই তিনি এইস্থান রাজ-বাসোপযোগী করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি তাঁহার বিপুল অর্থ প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সুবৃহৎ উদ্যান, পশু-শালা প্রভৃতির নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিলেন; তাঁহার আত্মীয় ও অনুচরবর্গের আবাসস্থানও প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন। অযোধ্যার শেষ নৃপতির রাজ-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই অট্টালিকা, উদ্যানাদি নির্ম্মিত হইতে লাগিল; ইহাতেই বুঝা যায় কিরূপ অপরিমিত অর্থব্যয়ে এ সকল ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছিল। নবাব অতিশয় উর্চ্চমূল্যে মেটিয়াবুরুজের প্রায় সমুদয় ভূমিখণ্ডই ক্রয় করিয়াছিলেন —ভাগীরথীর তীর হইতে সোণাই বাজার পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান নবাবের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। বাস্তবিক ভাগীরথীর বক্ষ হইতে দেখিলে মেটিয়াবুরুজকে ঠিক একখানি ছবির মত বোধ হইত। এখানে তিনি রমণীয় উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বড় বড় পশুশালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রাসাদতুল্য সৌধমালা স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেসকল অট্টালিকা স্থাপত্য-কৌশলে এবং গঠন-পারিপাট্যে অদ্বিতীয়; সৌন্দর্য্যে তখন ইহাদের প্রতিযোগিতা করিতে পারে কলিকাতায় এমন অট্টালিকাদি ছিল না বলিলেই হয়। তিনি এই সৌধরাজির নক্সা স্বীয় মস্তিষ্ক হইতেই বাহির করিয়াছিলেন; কোন স্থপতি বা পূর্ত্ত-বিদ্যাবিশারদের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই। এ সকল নবাবের উন্নতরুচি-অনুসারেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাস্তবিকই ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে মেটিয়াবুরুজ লক্ষ্ণৌ সহরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি হইয়া উঠিয়াছিল। মেটিয়াবুরুজের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি এত অধিক হইয়াছিল যে, তখন যে কোন দর্শক কলিকাতা দেখিতে আসিতেন, তিনি মেটিয়াবুরুজ দর্শন না করিয়া সহর পরিত্যাগ করিতেন না। প্রতি শীতঋতুতে কলিকাতা সহর খুব গুলজার হয়; এই সময়ে নবাবের আদেশে মেটিয়াবুরুজের উদ্যান, পশুশালা, নবাব-বাটী প্রভৃতি সাধারণের

দর্শনের জন্য তিন চারি দিন উন্মুক্ত রাখা হইত। নবাব ওয়াজেদ আলী কেবল যে উচ্চশ্রেণীর স্থপতিবিদ্যাবিৎ ও উদ্যানতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, তাহাই নহে। প্রাণী-বিদ্যাতেও তিনি সুচতুর ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত পশুশালাসমূহ তিনি স্বয়ংই পরিদর্শন করিতেন, অপর কোন প্রাণীতত্ত্ববিদের সহায়তা তিনি গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার পশুবাটিকাসমূহে আরণ্য পশুপক্ষীসকল যেরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকিত এবং তথায় উহাদিগকে যেরূপ যত্ন করা হইত ও পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছিন্ন ভাবে রাখা হইত, ভারতের আর কোন পশুশালায় সেরূপ হইত না।

এরূপ শুনা যায় যে, নবাব ওয়াজেদ আলী অত্যন্ত অপরিমিত ব্যয় করিতেন এবং তাঁহার কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট হইতে টাকাকড়ি ঠকাইয়া লইত। নবাবের অসাবধানতাবশতঃই যে এইরূপ ঘটিত, তাহা নহে; যে অল্প-সংখ্যক স্বদেশবাসী তাঁহার সহিত আসিয়াছিল, তাহাদিগকে মেটিয়াবুরুজের স্থায়ী অধিবাসী করিবার জন্য এ সকল বিষয় জানিয়া-শুনিয়াই তিনি লক্ষ্য করিতেন না। তাঁহার আবাস-বাটীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাসদাসী ও কর্ম্মচারী ছিল, এ সংখ্যাধিক্যও তাঁহার জ্ঞাতসারেই হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ হইতে আগত প্রবাসী অনুচরবৃন্দকে সহায়তা করিবার জন্যই তিনি অর্থব্যয়ের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করিতেন না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের পরে লক্ষ্ণৌ হইতে তাঁহার স্বদেশবাসী অনেকেই মেটিয়াবুরুজে আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। নবাব ওয়াজেদ আলী সানন্দে তাহাদিগকে আশ্রয় ও সহায়তা প্রদান করিয়া-ছিলেন।

ওয়াজেদ আলী কেবল আত্মীয়-স্বজন, অনুচরবর্গ ও স্বদেশবাসীকেই সাহায্য করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন নাই; তিনি ভারতীয় কবি, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ, নর্ত্তক, চিকিৎসক এবং 'সিয়া'-ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকেও প্রতিপালন করিতেন। দেশীয় শিল্পিকুলকে তিনি উৎসাহ দিতেন। তিনি সরল, সদয় এবং ন্যায়পরায়ণ প্রাচ্য আদর্শের নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ একদিনের জন্যও তাঁহার নিকটে অশিষ্ট ব্যবহার লাভ করে নাই। ইহাতেই তাঁহার উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার আচরণ প্রকৃত 'সিয়া'র ন্যায় ছিল। তিনি কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না, এমন কি তামাক পর্য্যন্ত খাইতেন না। অনেকে বলেন, তাঁহার চরিত্র-দোষ ছিল।

ওয়াজেদ আলী শাহ উর্দ্দু ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। উর্দ্দু কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ না হইলেও উর্দ্দু কবিতা ভালরূপ বুঝিবার তাঁহার শক্তি ছিল। তাঁহার কবিতা সরল এবং কষ্ট-কল্পনাপরিশূন্য ছিল। সঙ্গীত এবং নৃত্যবিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। সেকালের প্রধান প্রধান ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও নর্ত্তকগণ একথা স্বীকার করিতেন। তিনিই প্রথম "ইন্দ্রসভা" নামক একখানি নাটকের কল্পনা করিয়া উহাতে যথেষ্ট নৃত্য-গীত প্রবিষ্ট করিবার সংকল্প করেন। তাঁহার সম-সাময়িক উর্দ্দু কবি আমানৎ তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে 'ইন্দ্রসভা' নামক নৃত্যগীতময় নাটক (opera) রচিত করেন। এই নাটক এক্ষণে উর্দ্দু-সাহিত্যে অপেরারূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং এখনও পর্য্যন্ত সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতেছে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ রাজকীয় বন্দীরূপে কলিকাতায় আনীত হন। সেই সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি একরূপ নির্জ্জন-বাসেই জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন অন্তরঙ্গ আত্মীয় ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ভিন্ন তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ অথবা উচ্চ সরকারী সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বা বাঙ্গালী কাহাকেও তিনি সাক্ষাৎদান করিতেন না। এমন কি, যাঁহারা তাঁহাকে দূর হইতেও দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাদেরও বাসনা পূর্ণ হইত না। তবে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব-বর্ত্তী কয়েক বৎসর মুসলমানদিগের 'রমজান'-ব্রতের সময়ে তাঁহাকে শকটা-রোহণে কলিকাতার দক্ষিণস্থ রাজপথসমূহে দেখিতে পাওয়া যাইত। সম্ভবতঃ রমজানের উপবাস-ক্লেশ বিস্মৃত হইবার জন্য তিনি সহরে আসিয়া নানাবিধ দৃশ্য-দর্শন করিয়া বেড়াইতেন।

ওয়াজেদ আলীর অনেক বেগম ছিলেন; তন্মধ্যে নবাব খাসমহল সাহেবাই প্রধানা। তিনি যে কেবল রূপে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা নহে; সঙ্গীতবিদ্যায় এবং কাব্যকলাতেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। বাস্তবিক রূপে, গুণে এবং বুদ্ধিতে বেগম খাসমহল সাহেবা অতুলনীয়া ছিলেন।

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ যেমন উদার, তেমনই মুক্তহস্ত ছিলেন। রাজ-সম্মান ও পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের বৃত্তির অতিরিক্ত অনেক অর্থ নিজ তহবিল হইতে তাঁহাকে ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

আক্কেল সেলামী।*

বিদেশী গল্প।

জগতের দুঃখরাশির সাধারণতঃ দুইটি শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে। কতক-গুলি দুঃখ সাধারণের নেত্র অশ্রুপ্লাবিত করিয়া তোলে, আর সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে সে দুঃখের বিনাশ-কামনা করে। আর এক প্রকার দুঃখ আছে, তাহা যাহার অদৃষ্টাসন অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে সেই জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরে, কিন্তু অপর সকলে সেটাকে দুঃখ বলিয়া ভাবে না, তাহারা ইহাকে হাসি ও স্ফূর্ত্তির উপযুক্ত উপাদান মনে করিয়া, ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করে।

আমার জীবন শেষোক্ত প্রকার দুঃখের একখানি উজ্জ্বল চিত্র। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি সাধ্যানুসারে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উপযুক্ত শিক্ষাও দিয়াছিলেন, সবই বৃথা হইয়াছিল। শিক্ষার প্রতি আমার অতিশয় অনুরাগ ছিল, সুন্দর সুন্দর বইগুলি খেলনার মত যত্ন করিয়া রাখিতাম, অল্প সময়ের মধ্যে বাবার নির্দ্দিষ্ট পাঠ অপেক্ষা অধিক কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁহার নিকটে কত নূতন নূতন জিনিস উপহার পাইতাম, কিন্তু এ সকল সদ্‌গুণ থাকিতেও আমার জীবন মরুভূমির তুল্য। আমার সমগ্র জীবন কেবল নৈরাশ্য ও অনুতাপের সমষ্টি।

সকলে বলিত আমি খুব ভাল ছেলে; আমি যে কখনও কাহারও উপকারে আসিব, এরূপ আশা কেহ কখনও করিত না। কেন জানেন? যৌবন-বিকাশের পূর্ব্ব হইতেই আমি অতিশয় লজ্জাশীল হইয়া উঠি। যে গৃহে দশবার জন লোক বসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিত, সেখানে প্রবেশ করিতে হইলে আমি হতবুদ্ধি হইতাম। সভা-সমিতিতে প্রবেশের কল্পনা আমার হৃদয়ে অপরিসীম আশঙ্কা আনিত।

জানি না ইহা আমার অদৃষ্টের দোষ, কি শিক্ষার দোষ!

যদি কখনও কোন আগন্তুক আমার বাড়ীতে আসিত, তাহা হইলে আমি গৃহের কোণে আশ্রয় লইতাম; কিংবা যদি কখন কাহারও সহিত দেখা

* জর্ম্মান লেখক হেনুরিক কোকের অনুকরণে।

করিতে বাধ্য হইতাম, তাহা হইলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিতাম, আমি তাহাদের কাছে যেন কিম্ভূত কিমাকার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতাম, সামান্য কথার উত্তর দিতে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিতে হইত, অবনত মুখে, মাথার চুল টানিয়া বা পায়ের নখে মাটি খুঁড়িয়া নীরবে সময় কাটাইয়া দিতাম।

লজ্জাশীলতার প্রবল প্রবাহে আমার কত যত্ন-রোপিত আশালতা যে ভাসিয়া গিয়াছে, কত কল্পনার উদ্যান যে বিনষ্ট হইয়াছে, ভাবী জীবনের কত সুখ-সৌধ যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকলের আর ইয়ত্তা নাই।

পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্পত্তির উপরে দাবী করিবার আর কেহ ছিল না, ইহা ব্যতীত মৃত পিতৃব্যের একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে আমার সম্পত্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন প্রতিবেশী অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ একটি বিবাহ করিয়া জীবনটাকে স্থায়ী ও সুখপ্রদ করিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

আমি যতগুলি বালিকার উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে একটি নীলনয়না সুন্দরীর প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। যখন শুনিলাম, সে তাহার মৃত পিতার অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ও নানাবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃতা, তখন তাহাকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করিবার সুবর্ণ-সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সেই উদ্দেশ্যেই তাহার মাতুল-প্রেরিত নিমন্ত্রণ-পত্রের উত্তরে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলাম।

বালিকা পিতার মৃত্যুর পর মাতুল-গৃহেই বাস করিতেছিল।

যদিও আমি সমাজে যাইতে শঙ্কিত হইতাম, জন-কোলাহল হইতে সর্ব্বদা আপনাকে লুক্কায়িত রাখিতাম, তবুও আমার ভাবী পত্নীর অনিন্দ্যরূপরাশি, তাহার সরল, উজ্জ্বল নীল চক্ষু দুটি, তাহার কুঞ্চিত কেশদাম, তাহার সুগোল কমনীয় দেহযষ্টি, সদ্যবিকশিত কাননকুসুমের ন্যায় মধুর মুখচ্ছবি এবং যৌবন-লাজবিদ্ধ বীণাঝঙ্কার তুল্য কথাগুলি মনে করিয়া আমার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব সাহসের সঞ্চার হইল। প্রতিজ্ঞা করিলাম, নিশ্চয়ই আজ তাহার সহিত আলাপ করিব।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমি আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পোষাকে সজ্জিত হইলাম, আমার হৃদয় সাহসপূর্ণ। ক্ষিপ্রগতিতে বাটীর বাহির হইয়া গেলাম।

আমার গন্তব্য গৃহখানি ক্রমে যতই আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই আমার সাহস ও দৃঢ়তা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে করিলাম, আজ কত লোকই বা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন! ভাবিলাম, কেন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। যাহা হউক, আর না ফিরিয়া বহির্দ্বারের ঘণ্টা নাড়িয়া দিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে একজন ভৃত্য আমাকে একটি ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। সেখানে বাড়ীর কর্ত্তা একাই ছিলেন, তিনি আমায় দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া পার্শ্বের চেয়ারে বসিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমাকে আজকার ডাকে কতকগুলি অত্যাবশ্যক পত্র পাঠাইতে হইবে, আশা করি আমার আর দুইখানি চিঠি লিখিবার সময় দিয়া বাধিত করিবেন"।

তাঁহার কথাগুলি কি মধুর! আমি কি এরূপ কথা বলিতে পারি না? উত্তরে কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না; কাজে কাজেই একটু হাসিয়া ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একখানি আসন-গ্রহণ করিলাম।

অপেক্ষাকৃত চঞ্চল, বুদ্ধিমান্ ও সকলের প্রিয় হইবার ইচ্ছায় মনে মনে উপযুক্ত বাক্যরচনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে পার্শ্বের গৃহে বহু লোকের অট্টহাসি আমার শ্রুতিগোচর হইল। ইহা ত হাসি নয়, ইহা যে বজ্রের গম্ভীর শব্দ! ইহা স্ফূর্ত্তি নয়—এ যে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত! আমি কি করিয়া ইহাদের সম্মুখে যাইব, কি করিয়াই বা ইহাদের সহিত উৎসাহে যোগ দিব, সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলাম।

এই অবসরে কর্ত্তা মহাশয় পত্রলেখা শেষ করিয়া পত্রের কালী শুকাইবার জন্য "বালুকা-পাত্রের" অনুসন্ধানে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিয়া তাঁহার মনে আমার ক্ষিপ্রকারিতা ও কর্ম্ম-পটুতার একটা উচ্চধারণা জন্মাইবার আশায় তাড়াতাড়ি একটি পাত্রকে "বালুকা-পাত্র" মনে করিয়া পত্রগুলির উপরে উল্টাইয়া দিলাম।

হায়! এত বালির পাত্র নয়, এ যে কালীর পাত্র! দুই তিনখানি পত্র কালীতে ভরিয়া গেল। এখনও পৃথিবী দ্বিধা হইল না কেন? আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি আমার সাদা রেশমী রুমাল বাহির করিয়া কালী মুছিয়া লইলাম।

কর্ত্তা মহাশয় অবশিষ্ট পত্রগুলি ভৃত্যের হস্তে দিয়া আমার হাত ধরিয়া বাহির

হইলেন। এরূপ একটা গুরুতর বিষয় তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং আমাকে কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল করিবার ইচ্ছায় বলিলেন, "ওজন্য কি আসে যায়"?

আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম, আমার সাদা মোজার উপর একটি বড় কালীর দাগ! ইহাকে লুকাইবার ত উপায় নাই! মনের এ অবস্থা সাধ্যমত দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

আমরা ভোজন-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহখানি খুব বৃহৎ, অতি মনোহারিণী আলোকমালায় সজ্জিত; দ্বারের সোজাসুজী গৃহের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত একটি অপ্রশস্ত পথ।

কর্ত্তা মহাশয় আমায় অগ্রসর হইতে বলিলেন। কি করি, ভাবিবার সময় নাই। নিমন্ত্রিত, উপবিষ্ট ভদ্রলোকগণকে অভিবাদন করিবার জন্য আমাকে একবার ডানদিকে ও একবার বামদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে পশ্চাৎদিকে একটি রমণী মাংসের ব্যঞ্জনপূর্ণ একটি ভাণ্ড লইয়া আমায় ঠেলিয়া গৃহের মধ্যে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সামান্য পাচিকাকে পথ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য আমি কেন সঙ্কুচিত হই! আমি যেন তাহাকে গ্রাহ্য করি না! তখনও নমস্কার চলিতেছিল। সে আমার পার্শ্ব দিয়া তাড়াতাড়ি যাইবার চেষ্টা করিল ও সেই সময়ে আমি আর একজন ভদ্রলোককে নমস্কার করিবার জন্য বামদিকে ফিরিলাম। অমনই আমার হাত লাগিয়া ব্যঞ্জনের পাত্র মেজেতে পড়িল। তখন আমার মনের অবস্থা যে কি প্রকার তাহা আপনারা ধারণা করিতে পারিবেন না।

সম্মুখবর্ত্তী শত্রুর উত্থিত শাণিতকৃপাণের সম্মুখে হতভাগ্য সৈনিকের ন্যায় আমি কিছুকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

এই অভিনব বিপদে ও হৃদয়ের এইরূপ ভীষণ আন্দোলনের মধ্যেও আমি অভিবাদন বন্ধ করিতে পারিলাম না; কারণ আর তিনজনকে নমস্কার করিতে পারিলেই একটি আসন গ্রহণ করিতে পারিব। যদি ইহাদিগকে নমস্কার না করি, তবে আমাকে সকলে নিতান্ত অভদ্র বিবেচনা করিবে।

পাচিকা ক্ষিপ্রপদে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আমি যেমন আর একজন ভদ্রলোককে নমস্কার করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম, অমনই ভূপতিত ব্যঞ্জনের উপর আমার পা পড়িল। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়া

আমার পদস্খলন হইল। আমি লম্বা হইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেলাম। সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উঠিয়া দেখিলাম, আমার পা লাগিয়া আর একখানি চেয়ার উল্টাইয়া গিয়াছে এবং একটী রমণীও তৎসহ ভূতলশায়িনী হইয়াছেন। ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে তুলিলাম। হায় ভগবান! সে যে আর কেউ নয়, সে যে আমার ভাবী পত্নী—বারবেটি।

আমার চারিদিকে যেন পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, ভয়ে ও লজ্জায় আমার গলা শুকাইয়া গেল।

বারবেটিকে দেখিয়া বোধ হইল, সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হয় নাই। আমি আহারের টেবিলের নিকটে গিয়া বসিলাম, কর্ত্তা মহাশয় এবারেও "ও কিছু নয়" বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। আমি একটু আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলাম না।

আমি বারবেটির পার্শ্বের চেয়ারে খাইতে বসিয়াছিলাম, তখন ঝোল দেওয়া হইতেছিল, বারবেটির নিকটে আসিয়া ঝোল ফুরাইল, পাচিকা রন্ধনশালার দিকে দৌড়িল।

বারবেটি তাহার ঝোলের পাত্র, আমায় তুলিয়া দিতে চাহিল। তাহার ঝোলের পাত্র আমি লইব, আর সে ঝোলের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে, ইহা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ মনে করিয়া, তাহাকে ধন্যবাদের সহিত পাত্র ফিরিয়া দেওয়ার সময়ে হাত কাঁপিয়া উঠিল এবং পাত্রসমেত ঝোল তাহার গায়ের উপর পড়িয়া গেল।

এই উষ্ণ, ঘৃতময় পদার্থে বারবেটির পরিষ্কার ও বহুমূল্য রেশমী পোষাক ও আমার নূতন পায়জামা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বারবেটি পোষাক পরিবর্ত্তনের জন্য উঠিয়া গেল, আর হতভাগ্য আমি, বৃথা দুই তিন বার ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া, নিরুপায় হইয়া বসিয়া রহিলাম।

একথা আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

আমায় আর এক বাটী ঝোল দেওয়া হইল, না খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে সকলে কি মনে করিবে তাই ওয়েষ্ট কোটের খোলা বোতাম ছুটি ছুটিয়া প্রদত্ত ব্যঞ্জন উদরস্থ করিতে আরম্ভ করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বারবৌট আবার ফিরিয়া আসিল, আমিও আর একবার তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। আমায় আশ্বাস দিয়া বলিল, "ইহাতে আপনার যত দোষ, আমারও ঠিক তত দোষ"।

তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল দেখিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। আমার দুরবস্থা ও অপমানের যবনিকার পতন হইল মনে করিয়া রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া ফেলিলাম।

বেদম হাসি! সকলেই আমার দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসে! আমি ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমি যদি চুপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে সকলে হয়ত আমায় বোকা ঠাওরাইতে পারে সেই ভয়ে, কোন কিছু না বুঝিয়া, আমিও উহাদের অট্টহাসিতে যোগদান করিলাম। হাসির ফোয়ারা আরও বাড়িয়া উঠিল।

হায়! নীচের দিকে দৃষ্টি পড়িলে বুঝিতে পারিলাম যে, আমার কালীপূর্ণ রুমালখানিই এই নূতন হাস্যের একমাত্র কারণ। আমি যে রুমাল দিয়া পত্রের কালী মুছিয়াছি, তাহা একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তখন আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমি যেন চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলাম।

বাড়ীর খানসামার নিকট হইতে সাবান লইয়া মুখ ধুইয়া ফেলিব ভাবিয়া যেমন উঠিয়া পড়িলাম, অমনই যেন কে আমায় টানিয়া ধরিল বলিয়া বোধ হইল। ফিরিয়া দেখি, যে আমি ভুলে "টেবল ক্লথের" ছিদ্রের মধ্যে আমার ওয়েষ্ট কোটের বোতাম ঢুকাইয়া দিয়াছি। কাঁটা, চামচা, ডিস্, পেয়ালা ঝন্ ঝন্ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল। কর্ত্তা মহাশয় হাত চাপা দিয়া কতকগুলি পাত্র রক্ষা করিলেন।

এত অবস্থা-বিপর্য্যয়ের পর, এত অপমানের পর, এত হাসি-ঠাট্টার উপর কোন্ নির্লজ্জ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে! জোরে "টেবল্ ক্লথ" ছাড়াইয়া বাহিরের দিকে দৌড়িলাম। হায় অদৃষ্ট! দ্বারের চৌকাঠে পা আটকাইয়া দুড়ুম্ করিয়া উঠানে পড়িয়া গেলাম।

আমার জ্ঞান হইলে দেখিলাম, আমার বাড়ীর ভিতরে খাটের উপর শুইয়া আছি। মা আমার বিছানায় বসিয়া গায়ে বাতাস দিতেছেন। আমার

সম্মুখের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 'হায়! এত দিনে সামাজিকতার মূল্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম।'

এক সপ্তাহের মধ্যে বাবুবেটির বিবাহ হইয়া গেল। আমি জীবনে বিবাহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

ইতর প্রাণীর ভাষা।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সকলেরই ধারণা, মানবের ভাষা আছে এবং কেবল মানবজাতিই ভাষার সহায়তায় পরস্পর মনোভাব আদান-প্রদান করিয়া থাকে; ইতরজাতির কোন প্রকার ভাষা নাই, উহারা শুদ্ধ অস্ফুট ধ্বনি করে মাত্র, উহাদের মনোভাব-প্রকাশিকা ভাষা নাই। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এ ধারণার পোষণ করেন না; তাঁহারা বলেন, "ইতর প্রাণীদিগেরও ভাষা আছে, তাহারাও ইহার সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। তবে মনুষ্য জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত-তম জীব, তাহার ভাষার যেরূপ শৃঙ্খলা আছে, ইতর প্রাণীর ভাষার তাহার লক্ষাংশের একাংশও নাই।"

একথা সত্য যে, ইতর প্রাণীর ভাষা মনুষ্যজাতির নিকটে দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু যে সকল প্রাণীর কণ্ঠনালী আছে, তাহারা যে ভাব-প্রকাশক শব্দ করিয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। যেমন গ্রীকজাতির ভাষা চীনদেশের অধিবাসি-বৃন্দের পক্ষে বুঝা অসম্ভব, অথবা তেলেগুভাষা বাঙ্গালীর পক্ষে যেরূপ বুঝা অসম্ভব, সেইরূপ একজাতীয় প্রাণীর ভাষা অপর জাতীয় প্রাণীর পক্ষে বুঝাও অসম্ভব। উই বা পিপীলিকার ভাষা আছে কি না, অথবা তাহারা আদৌ 'কথা কহিতে' পারে কি না, আধুনিক বিজ্ঞান এখনও তাহা নির্দ্ধারিত করিতে পারে নাই; কিন্তু বানর প্রভৃতি অতি উচ্চ পর্য্যায়ের ইতর প্রাণীর যে ভাব-প্রকাশিকা ভাষা আছে, তাহা বিজ্ঞানবলে প্রমাণিত হইয়াছে। বানরের 'কিচিরমিচির' শব্দ, চড়ুই পাখীর অবিরাম 'পিক পিক' ধ্বনি, কাঠ বিড়ালের 'কুর্‌-র্‌-র্‌-র্‌' ডাক এবং কাকের শ্রবণ-দাহকর 'কা-কা'-রব মানুষের কথাবার্ত্তার মত

মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। গ্রীকভাষা-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সম্মুখে উৎকৃষ্ট গ্রীক বক্তার বক্তৃতা কতকগুলি শব্দসমষ্টি মাত্র, কিন্তু তাহা গ্রীকদিগের হৃদয়ে কি ভাব ফুটাইয়া তুলিতেছে, তাহা গ্রীক ভাষায় অনভিজ্ঞ তুমি কি বুঝিবে? গ্রীক ভাষা জানিলে তুমি উহার ভাব অবগত হইতে পারিবে। সেইরূপ প্রাণীগণের দুর্ব্বোধ্য শব্দরাজিতে তাহাদের হৃদয়ের কি ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহা প্রাণী-ভাষায় অনভিজ্ঞ আমরা কি বুঝিব!

এডিসন্ ফনোগ্রাফ-যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া বিজ্ঞান-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ফনোগ্রাফ-যন্ত্রের ক্রিয়া পাঠকপাঠিকাবর্গের অবিদিত নাই। প্রাণী-দিগের ভাষা যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা এই ফনোগ্রাফ-যন্ত্রের সাহায্যেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

জগতে বিভিন্ন জাতীয় মানবের বাস এবং তাহাদের বিভিন্ন জাতীয় ভাষা। এক জাতির ভাষা, অন্যের বোধগম্য নহে। কিন্তু ফনোগ্রাফের সাহায্যে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মধ্য আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যবাসী বানরের ভাষা, দক্ষিণ আমেরিকার বন-বাসী বানরেরা বুঝিতে পারে। সহস্র সহস্র ক্রোশের ব্যবধানেও ইতর প্রাণীর ভাষার পরিবর্ত্তন বা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু এক শত ক্রোশ দূরে যাইলেই মানবীয় ভাষার বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মানবজাতির ভাষা বিবর্ত্তনশীলা, নিয়তই উহার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইতেছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, পূর্ব্বে মানবজাতির আদিপুরুষগণের ভাষা এবং বাসস্থান এক ছিল, পরে বংশবৃদ্ধি-সহকারে আদিম বাসস্থানে আর স্থান না হওয়ায় একই জাতির সন্তান-সন্ততি বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া তত্তৎ স্থানে বসবাস করেন। কালক্রমে ঋতু-পরিবর্ত্তন-ঘটিত বিভিন্নতাহেতু ও অন্যান্য নানা কারণে তাহাদের ভাষা, পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার বিভিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইতর প্রাণীদিগের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। তাহাদের ভাষা বোধ হয় পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তনশূন্যা; অথবা উহার পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হয় না। যাহা হউক, ইহা অতীব বিস্ময়ের বিষয় যে, পৃথিবীর এক প্রান্তবাসী ইতর প্রাণী, অপর প্রান্তবাসী ইতর প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারে।

অধ্যাপক আর, এল, গার্ণার প্রাণিবিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি ইতর

প্রাণীর ভাষা-সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য আফ্রিকার ভীষণ অরণ্যে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। বানরজাতির ভাষা অধ্যয়ন করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি একটি গতিশীল পিঞ্জর প্রস্তুত করাইয়া বনমধ্যে তাহারই ভিতরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বহুদিন তিনি এইরূপে অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিয়াছেন। সেই ঘোর বনমধ্যে একটি ফনোগ্রাফ-যন্ত্রই তাঁহার সঙ্গী ছিল। কিন্তু গোলযোগের কথা এই যে, ফনোগ্রাফটির মধ্যে শুধু বানরের স্বরই প্রবিষ্ট হইত না, বহু আরণ্য পশুপক্ষীর সম্মিলিত কণ্ঠস্বরও উহার ভিতরে প্রবেশ করিত। তিনি স্পষ্টই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বানরের 'কিচিরমিচির'-শব্দও অর্থশূন্য নহে; উহা বানরজাতির সাধারণ ভাষা এবং সকল বানরেই উহা বুঝিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক আফ্রিকাদেশীয় বানর-শিশুকে 'পোষ মানাইয়া' পরীক্ষা করেন। তাহার কণ্ঠস্বর ফনোগ্রাফের সাহায্যে তুলিয়া লন এবং রেকর্ড প্রস্তুত করেন। পরে সেই রেকর্ড যন্ত্রে জুড়িয়া দিলে উহা হইতে উহার কণ্ঠস্বরের অবিকল অনুকরণ বাহির হইত এবং বানর-শিশুও নানারূপ শব্দের দ্বারা উহার উত্তর প্রদান করিত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঐ ফনোগ্রাফের রেকর্ডসমূহ লইয়া তিনি আমেরিকায় আসেন এবং তথায় ঐ বানরশিশুর সমজাতীয় অপর এক আমেরিকা-মহাদেশীয় বানরের সম্মুখে ঐ সকল 'রেকর্ড' চালাইতে থাকেন। তখন দেখা যায়, যে এই নূতন বানরটিও রেকর্ড-প্রসূত শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছে। আনন্দের শব্দে আনন্দ, দুঃখের শব্দে দুঃখ এবং রোষের শব্দে রোষ প্রকাশ করিয়াছে। যেরূপ শব্দের দ্বারা আফ্রিকার বানর-শিশু খাদ্য চাহিয়াছে, আমেরিকার বানর-শিশুও ঠিক সেইরূপ শব্দে আহার্য্য-প্রার্থনা করিয়াছে। একজন যে প্রকার শব্দের দ্বারা তৃষ্ণার ভাব ব্যক্ত করিয়াছে, অন্যেও ঠিক তদ্রূপ করিয়াছে। ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে পৃথিবীর সকল দেশের ভাষাই এক এবং সকলেরই বোধগম্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইতরজাতির মনোভাবপ্রকাশিকা ভাষা নাই;—এ ধারণা ভুল। শোক, দুঃখ, হর্ষ, ভীতি প্রভৃতি প্রকাশের জন্য মানবের যেমন ভাষা আছে, ইতর প্রাণীদিগেরও সেইরূপ তত্তৎভাব-প্রকাশিনী ভাষা আছে।

প্রতিভা।

গগনে উদিলে রবি অন্ধকার যায় সরি',
হয় বিশ্বে আলোক বিস্তার;
জ্ঞানোদয় হ'লে হৃদে, অজ্ঞানতা যায় দূরে,
চিত্তে হয় ব্যাপ্তি প্রতিভার।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-পরিচয়।

শতদল।*

কবি সরোজকুমারী বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠা। "অশোকা"র যে বিরহ ও বিষাদ গৃহগভীর মধ্যে কোরকাকারে দেখা দিয়াছিল, সেই কোরক আজ প্রস্ফুটিত "শতদল"-রূপে প্রেমময়ের চরণে অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়াছে। "শতদল" এক শত প্রার্থনা-কবিতার সমষ্টি। কবির পরিণত মনের প্রশান্ত প্রার্থনা। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ ব্যথা পায় বটে, কিন্তু কে সেই সমস্ত সহ্য করিয়া এক চরমের উদ্ধার-কর্ত্তাকেই ডাকিতে পারে? ভগবানে অটুট বিশ্বাস না থাকিলে এইরূপ প্রশান্তচিত্তে তাঁহাকে আহ্বান করা যায় না। সুখের বিষয়, "শতদলে" সেই পবিত্র আহ্বানগুলিই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রথমে যে উৎসর্গটি আছে, তাহা অতীব মনোজ্ঞ। যতগুলি প্রার্থনা আছে, তন্মধ্যে ৪, ৮, ৯, ১৩, ২১, ৩২, ৩৭, ৪৫, ৬২, ৭৪, ৭৫, ৮৬ ও ৯৭-সংখ্যক কবিতাগুলি বড় ভাল লাগিয়াছে। লেখিকার ছন্দে অবাধ প্রবাহ আছে, ভাব আছে এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা আছে। আজকালকার "চাঁদিনী, জ্যোছনা"-লেখা কবিদল হইতে একটু বেশ স্বতন্ত্রতাও আছে। কিন্তু অনেক কবিতাতে একইভাব প্রকটিত হইয়াছে, এমন কি অনেক স্থলে ভাষাও একই রহিয়া গিয়াছে। ব্যাকরণ-দোষ ও মুদ্রাকর-প্রমাদ স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়। ভবিষ্য সংস্করণে সেগুলির সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

---

* শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী-বিরচিত। ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১০২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রকাশক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়; ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। মূল্য আট আনা।

ময়নামতী।

সে আজ এগার শত বৎসরের কথা। প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ধর্ম্মপাল তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। স্বাধীনতাদৃপ্ত বঙ্গদেশ তখন আ-কাশ্মীর কামরূপ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে স্বীয় নিশান উড্ডীন করিয়া গৌরবের চরম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছে। বঙ্গের সেই মহাগৌরবের দিনে যে মহীয়সী রমণী ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বীয় বীর্য্যপ্রভাব জগৎ-সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপ আজ পর্য্যন্ত যাঁহার স্মৃতিকে উজ্জ্বল মহিমায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারই নাম ময়নামতী। বাঙ্গালীর সে সৌভাগ্যের দিনের ইতিহাস নাই; তাই আমরা অতীত-গৌরব-কাহিনীর সহিত এই বঙ্গরমণীকুলরত্নকে বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বঙ্গরমণী চিরকাল প্রাণহীন জড়পদার্থবৎ ছিল না। যেদিন বাঙ্গালী স্বাধীনতা হারাইয়াছে, সেইদিন হইতে সে বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং সেইদিন হইতেই বঙ্গরমণীও অন্তঃপুর-শোভামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাজস্থানেও কি আমরা এই দৃশ্য দেখিতে পাই না? আর কয়জন রাজপুত-বালার বীরত্ব-কাহিনী আমাদিগকে মোহিত করে? কচিৎ একজন রাণী ভবানী কিম্বা একজন ঝান্সীর রাণী অন্ধকার রাত্রিতে উল্কার মত উদিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইয়া দেয় বটে, কিন্তু ক্ষণপরেই আবার অন্ধকার দ্বিগুণভাবে ঘনায়িত হইয়া আসে এবং আর কোথাও কোন আলোকরশ্মি নয়নপথে পতিত হয় না।

পালরাজগণ প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিতেছিল। আর বিশেষতঃ রাজা ধর্ম্মপাল যেরূপ উদার-স্বভাব ছিলেন, তাহাতে ঐ চেষ্টা একেবারে বিফল হইতেছিল না। রাজা নিজে বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্ম্মদ্বেষ্টা ছিলেন না। তাঁহার অনেক হিন্দু কর্ম্মচারী ছিল এবং ইহাদের অনেকেই দেব-মন্দির-স্থাপনের জন্য রাজার নিকট হইতে ভূমিলাভে সমর্থ হইত। ফলে, হিন্দু

ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ তিরোহিত হইয়া এই দুই ধর্ম্মের সমন্বয়ে এই সময়ে এক নূতন ধর্ম্মপ্রথার সৃষ্টি হইল; যে সম্প্রদায় এই প্রথা গ্রহণ করিল, তাহা তান্ত্রিক বৌদ্ধনামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে সমস্ত পার্থিব কামনা ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণগণের ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইত এবং মৃত্যুর পর নির্ব্বাণলাভের আশায় গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া তন্ত্রমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইত।

ময়নামতী এইরূপ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস অতীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। এই তেজোবীর্য্যবতী রমণীর উপর যে সকল অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ আরোপিত হইয়াছে, বর্ত্তমানকালের জ্ঞানা-লোকবর্ত্তিকা সেগুলি হইতে কতটা ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে জানি না, কিন্তু ঐ সকল কাহিনী যে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার অসীম প্রতাপের পরিচয় দিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হ্যামিল্টন-প্রমুখ ইংরাজ লেখকগণ তাঁহাকে পরাক্রান্ত রাজা ধর্ম্মপালের প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বিনী এবং বিজেত্রীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রঙ্গপুরাঞ্চলে যে 'ময়নামতীর গান' শুনিতে পাওয়া যায় এবং শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় যাহার সঙ্কলন করিয়া বঙ্গভাষার ও বাঙ্গালীজাতির প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি এরূপ তন্ত্রমন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি যমেরও ভীতি উৎপাদন করিতেন। এখনও উত্তর বঙ্গের অখ্যাত জনবিরল গ্রামবিশেষ তাঁহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিতেছে।"

উত্তরবঙ্গ ষ্টেট রেলে, ডোমার নামক ষ্টেশনের প্রায় ৪।৫ মাইল পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামের মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ, অসমতল ভূমিখণ্ড সাধারণ্যে 'ময়নামতীর কোট' নামে পরিচিত। কিম্বদন্তী এই যে, ঐখানে ময়নামতী শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহার এক ক্রোশ পূর্ব্বে একটি প্রাকার-পরিখাবেষ্টিত সুবৃহৎ প্রাচীন দুর্গের ভগ্না-বশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাকে লোকে 'ধর্ম্মপালের গড়' বলে। প্রবন্ধান্তরে* এই দুর্গসম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই দুর্গাধিপতি মাণিকচাঁদ ময়নামতীর স্বামী ছিলেন।

---

* 'সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা'য় এই প্রবন্ধটি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ময়নামতী ও তাঁহার স্বামী মাণিকচাঁদের জন্মব্যাপার লইয়া গাথাকারগণ যে একটী উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উপাখ্যানটি এই,—একদা দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত হইতেছিল; সহসা বাদকের এবং তৎসহ নর্ত্তকীর তালভঙ্গ হইল। ইহাতে ইন্দ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন যে, তাহারা ধরাতলে নরনারীরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। বাদক কদলী সহরে (বর্ত্তমান ডিম্‌লা নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান) মহীপালের পুত্র হইয়া জন্মিলেন এবং পরে মাণিকচাঁদ নামে পরিচিত হইলেন; নর্ত্তকীও নিকটবর্ত্তী গ্রামের তিলকচাঁদের কন্যা হইলেন; ইঁহারই নাম ময়নামতী।

গাথায় তাঁহার রূপ ও গুণের যথেষ্ট বর্ণনা দেখিতে পাই এবং সম্ভবতঃ তাঁহার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়াই মাণিকচাঁদ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতেই ময়নামতীর মন প্রবল ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল। বিবাহিতা হইবার পূর্ব্বে একদিন তিনি সরোবরে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময়ে তন্ত্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ গোরক্ষনাথকে মহাদেবের অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন। ময়নামতী তাঁহাকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎকর্ত্তৃক তান্ত্রিকমতে দীক্ষিতা হইলেন। পরে তিনি তন্ত্রমন্ত্রে এরূপ সিদ্ধা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অসাধ্যসাধন করিবার ক্ষমতা হইয়াছিল। বিবাহের কিছুকাল পরে মাণিকচাঁদ তাঁহার ঐ সকল ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া নিজে অতিমাত্র ভীত হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে স্বগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া নিকটবর্ত্তী একখণ্ড ভূভাগে তাঁহার স্বতন্ত্র বাসের জন্য একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এইখানে ময়নামতী একটি পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রই প্রসিদ্ধ গোপীচাঁদ এবং যে রাজা হবুচন্দ্র বুদ্ধিবৃত্তির অলৌকিক প্রখরতার জন্য বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত, ইনি তাঁহারই পিতা।

ময়নামতী স্বামিকর্ত্তৃক এইরূপে নির্দ্দয়ভাবে পরিত্যক্ত হইয়া ধর্ম্মালোচনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। গোরক্ষনাথের আদেশে তিনি নিজে অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন; হাড়িসিদ্ধা ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল। কয়েক বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইলে মাণিকচাঁদের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল,

ময়নামতী তখন স্বামি-সকাশে গমন করিয়া মন্ত্রবলে তাঁহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করেন। গাথায় এই ব্যাপারের বর্ণনা অতি সুন্দর। যমদূতগণের মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে; কিছুতেই আর তাহারা মাণিকচাঁদকে লইয়া যাইতে পারিতেছে না। অবশেষে ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিয়া তাহারা ময়নামতীকে প্রতারিত করে; সুতরাং ময়নামতী আর মাণিকচাঁদের জীবনরক্ষা করিতে পারিলেন না।

মাণিকচাঁদ রাজা ধর্ম্মপালের অধীনস্থ সামন্তরাজ ছিলেন। পুত্র গোপীচাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত ময়নামতী রাজ্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। রাজক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াই তিনি ধর্ম্মপালকে নির্দ্দিষ্ট করপ্রেরণ বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজা ধর্ম্মপাল তাঁহাকে করদানে বাধ্য করিবার জন্য সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিলেন। তিস্তানদী-তীরে ময়নামতীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ময়নামতীর ক্ষুদ্র-রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল।

গোপীচাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই স্বাধীনরাজ্য-পরিচালনার ভার ময়নামতী তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়া, নিজে পুনরায় ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। গোপীচাঁদ বিবাহ করিয়া পরমসুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্র যে সংসারপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে, প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবাপন্না জননী কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি পুত্রকে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। গোপীচাঁদ একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাতার বারংবার অনুরোধে এবং তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা-দর্শনে বাধ্য হইয়া পরিশেষে হাড়িসিদ্ধা কর্ত্তৃক কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং মস্তক মুণ্ডিত করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ও ভিখারীর ঝুলি গ্রহণ করিয়া গুরুর সহিত বহির্গত হইলেন। ধর্ম্মজগতে এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই ইংরাজ লেখকগণ হিন্দুরমণীর ধর্ম্মভাবের প্রগাঢ়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া, ময়নামতীকে ক্ষমতাপ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ময়নামতী স্বয়ং রাজ্যপরিচালনা করিবার বাসনাতেই পুত্রকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এইরূপ তাঁহাদের মত। কিন্তু গাথায় তাঁহার স্বহস্তে রাজ্যশাসনের কথা কোথাও উল্লেখিত হয় নাই।

গোপীচাঁদের এই সন্ন্যাস-কাহিনীটি বড়ই সুন্দর। ইহা যে অলৌকিকতা-লেশবর্জ্জিত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নবীন রাজার অসাধারণ ক্লেশসহন-ক্ষমতা, ধৈর্য্য ও সংযম বর্ণনাটিকে এরূপ মনোহর ও জীবন্ত ভাব দিয়াছে যে, অশিক্ষিত গাথাকারগণের কবিত্বশক্তিতে বিস্ময়-প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। কিঞ্চিদূর্দ্ধ দ্বাদশবর্ষকাল ভিক্ষামাত্রোপজীবী হইয়া দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণপূর্ব্বক সুকঠোর সন্ন্যাস-পালনের পর গুরু-কৃপায় গোপীচাঁদ সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাজর্ষিরূপে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

দেওয়ালীর বাজী।

দেওয়ালীর সময়ে সচরাচর যে বাজী পোড়ান হয়, তাহা তিন রকমের। (১) শব্দকারী বাজী; (২) নানা রঙ্গের আলো ও তারা; (৩) আতস বাজী ও ফানুস।

(১) যে সকল বাজীর শব্দ হয়, তাহা আবার দুই রকমের; কতকগুলি বাজী যথা,—পটকা বা একদমা অগ্নিসংযোগে ফাটিয়া গিয়া শব্দ হয়, আর কতকগুলি বাজী শুধু চাপের দ্বারা বা খুব জোরে ভূমে ফেলিয়া দিলে ফাটিয়া যায়। ইহাদের ভুঁইপটকা বলে।

পটকার মধ্যে যে বারুদ থাকে, তাহা অগ্নিসংযোগে খুব শীঘ্র একেবারে সমস্তটা জ্বলিয়া উঠিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়। পটকার মধ্যে যেখানে বারুদ থাকে, সেখানটুকু এত ছোট যে বারুদ ছাড়া আর কিছুই থাকিতে পারে না এবং পলিতা যাইবার একটি খুব সরু ছিদ্র ভিন্ন সেই স্থানটুকুর আর সকল দিক খুব ভাল করিয়া বন্ধ করা। বারুদ পুড়িয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইবামাত্র উহা উত্তপ্ত বলিয়া বিস্তৃতিলাভ করিবার নিমিত্ত সেই সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুর চতুর্দ্দিকে খুব জোরে ধাক্কা দেয়। এইরূপে হঠাৎ ধাক্কা পাইয়া

পটকাটি ফাটিয়া যায় ও পটকার মধ্যস্থ উত্তপ্ত বাষ্প বাহিরে আসিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পটকা ফাটিয়া যায় বলিয়া যে শব্দ হয়, তাহা পটকার কাগজ-ফাটার শব্দ নহে। পটকার মধ্যস্থ রুদ্ধ বাষ্প পটকাটি ছিঁড়িয়া হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়া চারিদিককার বায়ুকে প্রবলবেগে ধাক্কা দেয়। সেই প্রবল ধাক্কায় চারিদিককার বায়ু কাঁপিয়া উঠে ও আমাদের কর্ণপটাহে আসিয়া ধাক্কা দেয় এবং আমরা শব্দ শুনি।

ভুঁইপটকার শব্দও ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণে হয়। ভুঁইপটকার মধ্যে যে বারুদ থাকে, তাহা কেবল ছুঁড়িয়া ফেলিলেই শুধু চাপের দ্বারা রাসায়নিক সংমিশ্রণে বাষ্পাকারে পরিণত হয়।

বন্দুকের গুলি বা কামানের গোলাও উত্তপ্ত বাষ্পের বিস্তৃতির জন্য ছুটে। বন্দুকের বা কামানের মধ্যে প্রথমে বারুদ ঠাসা হয়, তাহার পর গুলি বা গোলা দেওয়া হয়। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিবামাত্রই বন্দুকের ভিতরকার বারুদ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বিস্তৃতিলাভ করিবার নিমিত্ত প্রবল বেগে চতুর্দ্দিকে ধাক্কা দেয়। কামান বা বন্দুকের গায়ে ধাক্কা দিয়া কিছু করিতে পারে না, গোলাতে লাগিলেই গোলাটি ছিদ্রপথে ছুটিয়া বাহির হয়।

(২) কতকগুলি ধাতব ও মূল পদার্থ আছে, যাহাদের আগুনে পোড়াইলে স্বভাবতঃ নানা বর্ণের শিখা উৎপাদন করিয়া জ্বলে। যথা,—বেরিয়ামের শিখা সবুজ রঙ্গের, ষ্ট্রন্সিয়ামের শিখা লাল রঙ্গের। তাহাদের বায়ুতে জ্বালাইলে পর জ্বলিয়া উঠিয়া বায়ুর অম্লজানের সহিত মিশিয়া নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে। তবু শুধু যদি ষ্ট্রন্সিয়াম বা বেরিয়াম জ্বালান যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাদের আলোক বড়ই ক্ষীণ ও ধূমাবৃত, মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ, বায়ু হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অম্লজান পাইতেছে না বলিয়া; বায়ুতে যদি শুধু অম্লজান থাকিত, তাহা হইলে তাহা ঘটিত না। উজ্জ্বল আলোক পাইতে হইলে ষ্ট্রন্সিয়াম বা বেরিয়ামের সহিত এমন আর কোনও জিনিষ মিশান প্রয়োজন, যাহা অগ্নিসংযোগে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অম্লজান দিতে পারে এবং যাহাতে অগ্নিশিখা সমস্ত বস্তুটা জ্বলা পর্য্যন্ত একভাবে জ্বলে। ক্লোরেট অফ পটাসে যে অম্লজান আছে, তাহা অগ্নিসংযোগে

বেরিয়ম বা ষ্ট্রন্সিয়ামের সহিত বিনা আয়াসেই মিলিত হইয়া যায়, কিন্তু পটাসে শীঘ্র অগ্নিসংযোগ হয় না বলিয়াই গন্ধক দেওয়া দরকার। বেরিয়ম বা ষ্ট্রন্সিয়াম বা অপর কোনও মূল পদার্থ না লইয়া তাহার কোনও যৌগিক পদার্থ লইলেই আমাদের কাজ চলিবে।

পূর্ব্বোক্ত কারণের নিমিত্ত পটাস ও গন্ধক—এই দুইটি পদার্থ সমস্ত আলোকের উপাদান। পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কিরূপ পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক, তাহা আমরা ঠিক করিয়া লইতে পারি।

(৩) হাউই জিনিষটা কি বোধ হয় সকলেই জানেন; তবু একবার বলা দরকার। হাউইএর খোল প্রায় এক বিঘৎ লম্বা ও প্রায় দেড় ইঞ্চি চওড়া, ব্রাউন কাগজে জড়াইয়া বা তল্‌দা বাঁশের টুক্‌রায় নির্ম্মিত হয়। খোলের ভিতর বারুদ ঠাসিয়া ও পলিতা পরাইয়া একটি লম্বা পাট-কাটিতে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। হাউএর মুখটি অর্থাৎ যেদিকে পলিতা দেওয়া হয়, সেদিকটা নীচে থাকে। পলিতাতে আগুন ধরাইয়া ছাড়িয়া দিলে বারুদে আগুন লাগিবামাত্র হাউইটি আকাশে উঠিয়া যায়।

হাউইএর মুখের কাছ হইতে মাথার দিকে, মাথার দিক হইতে খানিকটা বাদে, বরাবর একটি ছিদ্র আছে। হাউইএর খোলের ভিতর বারুদ ঠাসিবার সময়ে ঐ ছিদ্রটি রাখা হয়। হাউইএর পলিতাটি ঐ ছিদ্রটির শেষ পর্য্যন্ত থাকে। পলিতাটিতে আগুন ধরিলে হাউইএর ভিতরের লম্বা ছিদ্রের চারিদিকের বারুদ একেবারে জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে হঠাৎ সেই ছিদ্রটি উত্তপ্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ওরূপ উত্তপ্ত বাষ্প অতটুকু ছিদ্রের ভিতর স্থিরভাবে অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না; বিস্তৃতিলাভ করিবার নিমিত্ত সেই লম্বা ছিদ্রের চতুর্দ্দিকে ধাক্কা দিতে থাকে।

একটি বস্তুর দুই দিকে দুইটি দড়ি বাঁধিয়া দুজন লোক যদি সমান জোরে টানে, তবে সেই বস্তুটি কোনও দিকে নড়ে না; কিন্তু ঐরূপ টানিতে-টানিতে যদি একজন ছাড়িয়া দেয়, তবে আর একটি লোক তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। হাউইএর ভিতরও আগুন পৌঁছিলে ঠিক ঐরূপ টানাটানি-ঠেলাঠেলি চলে। হাউইএর সম্মুখ দিকে বা পিছন দিকে, ডাহিন দিকে বা বাম দিকে, উপর দিকে বা নীচে দিকে—সকল দিকেই উত্তপ্ত বাষ্প বিস্তৃতি-

লাভ করিবার নিমিত্ত সমান জোরে ঠেলিতেছে। ডাহিন দিকে যত জোরে ঠেলিতেছে, বামদিকে ঠিক তত জোরে ঠেলিতেছে; সম্মুখ দিকে যত জোরে ঠেলিতেছে, পিছন দিকেও ঠিক তত জোরে ঠেলিতেছে, সুতরাং হাউইটি পার্শ্বের কোন দিকেই নড়ে না। রুদ্ধ বাষ্প হাউইএর উপর ও নীচে দিকেও যে ধাক্কা দিতেছে, তাহাও সমান; তবে উপর দিকের ধাক্কা হাউইটিকে উপর দিকে ঠেলিতে পারিতেছে, নীচের দিকের ধাক্কা কিন্তু হাউইটাকে আর নীচের দিকে ঠেলিতে পারিতেছে না। রুদ্ধ বাষ্পের কিয়দংশ হাউইএর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। উত্তপ্ত বাষ্প বিস্তৃতি-লাভ করিবার সময়ে নীচুদিককার সমস্ত বেগই হাউইএর গায়ে না পড়িয়া বাহিরের বায়ুর উপরে পড়িতেছে, সুতরাং উত্তপ্ত বাষ্পের হাউইটাকে নীচে দিকে ঠেলিয়া দিবার আর কোনও বেগই থাকিতেছে না। হাউইএর মধ্যের উত্তপ্ত বাষ্পের বেগ উপরে ও নীচে—দুই দিকেই সমান হইলেও উপর দিক-কার বেগ হাউইটাকে উপর দিকে ঠেলিতে পারিতেছে, নীচেদিককার বেগ হাউইটাকে নীচে দিকে ঠেলিতে পারিতেছে না। দুইজন লোক দুইটি বস্তুকে সমান জোরে দুইদিক হইতে টানিতে টানিতে একজন ছাড়িয়া দিলে যেমন আর একজন সে বস্তুটাকে টানিয়া লইয়া যায়, হাউইএর বেলাও ঠিক তেমনই হই-তেছে। উপরদিককার জোর কেবলমাত্র হাউইএর উপর কার্য্যকারী হওয়ায় এবং নীচে দিকে হাউইটাকে কোনও জোরে না টানায় হাউইটাকে শূন্যে উপর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। হাউইএর মাথাটি বরাবর উপরদিকে থাকিবে বলিয়া একটি পাট-কাটি হাউইএর সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। পাট-কাটি না বাঁধিলে হাউইএর মধ্যের ছিদ্রটি সামান্য বাঁকা থাকিলেই হাউইটি ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে। পাট-কাটি বাঁধা থাকিলে হাউইএর মাথাটি বাঁকিয়া যাইবার উপক্রম হইলে ঐ পাট-কাটির ভারে হাউইটাকে আবার টানিয়া সোজা করিয়া দেয়।

আতসী তুবড়ী। হাউই যেরূপে আকাশে উঠে, ইহাও সেই কারণে উড়ে; তবে হাউইএর বারুদে অগ্নি লাগিবামাত্র যেমন আকাশে উঠে, আতসী বা উড়ান্ তুবড়ীতে তাহা হয় না। বারুদ খানিক পড়িয়া যাইবার পর তুবড়ীটির জোর হইলে তুবড়ীর ছিদ্রের দিকটা নীচে দিকে করিয়া ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিতে হয়, তবে উড়ে। ঘুরাইয়া না দিলে উড়ে না। হাউইএর ভিতর যেমন লম্বা ছিদ্র

বরাবর থাকে, তুবড়ীর ভিতর তাহা থাকে না। তুবড়ীর বারুদ খানিক পুড়িয়া যাইবার পর যে স্থানে হয়, সেই স্থান উত্তপ্ত বাষ্পরুদ্ধ হইয়া বিস্তৃতিলাভ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে ধাক্কা দেয়। তুবড়ীর ছিদ্রের দিকটা নীচে দিকে থাকে বলিয়া উত্তপ্ত বায়ু সেই দিক দিয়া কিছু বাহির হইয়া যায় এবং হাউই যে কারণে উড়ে, আতসী তুবড়ী সেই কারণে শূন্যপথে উড্ডীন হয়।

হাউইএর মাথাটিকে ঠিক রাখিবার নিমিত্ত যেমন পাট-কাটি বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তুবড়ীর বেলায় ত আর পাট-কাটি বাঁধিয়া দেওয়া হয় না, শুধু ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিলেই হয়। উড়ান্ তুবড়ীর যেদিকে মাটি দেওয়া হয়, সে দিকটা মোটা ও ভারী ; তুবড়ীর আকর্ষণকেন্দ্র সেই দিকে থাকে বলিয়া ছিদ্রটি নীচে দিকে করিয়া অগ্নিসংযোগে ছাড়িয়া দিলে তুবড়ীটি ঘুরিয়া যায় এবং ছিদ্রের দিকটা আবার আপনিই উপর দিকে হয় ; সুতরাং তুবড়ীটি আর আকাশে উড়ে না। লাটিম যেমন জোরে ঘুরাইয়া দিলে ঠিক দাঁড়াইয়া ঘুরে, কিন্তু দম চলিয়া গেলে আর কিছুতেই দাঁড়ায় না, তুবড়িটিও মুখটা নীচেদিকে করিয়া ঘুরাইয়া দিলে তাহার আকর্ষণকেন্দ্র ঠিক উপরদিকেই থাকে ও তুবড়ির ছিদ্রটি নীচেদিকে থাকে। এইরূপে আতসী বা উড়ান্ তুবড়ী আকাশে উঠে।

সেল (Shell)—তারাপূর্ণ যে সেল অগ্নিসংযোগে উপরে উঠিয়া ফাটিয়া গিয়া নানাবর্ণের উজ্জ্বল তারকায় আলোকিত করে, তাহারও উপরে উঠা ও ফাটা উত্তপ্ত বাষ্পের বিস্তৃতিলাভ করিবার চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। কামানের গোলার মত সেলটিকে বন্দুকের বারুদ পুড়িয়া আকাশে তুলিয়া দেয় এবং পলিতার সংযোগে সেলের ভিতরে আগুণ প্রবেশ করিয়া পটকার মত ফাটিয়া যায়।

ফানুস। অনেকের বিশ্বাস, দেওয়ালী-উৎসবের সময়ে যে ফানুস উড়ান হয়, তাহা বাষ্প বা গ্যাসের সাহায্য উড়ে। যেমন বেলুন বা ছেলেদের রবারের ছোট বেলুনের মধ্যে গ্যাস থাকে, সেইরূপ কোন গ্যাস কেরোসিন তৈল হইতে তৈয়ারী হয়, তাহাতেই কাগজের ফানুস উড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিধারী আমার কোনও বন্ধু একটি কাগজের ফানুস উড়াইবার নিমিত্ত রাশীকৃত ভিজা খড়ে আগুণ দিয়া খড়ের ধূমের উপরে ফানুস ধরিয়াছিলেন।

খড় ভিজাইবার উদ্দেশ্য—খড়ে ধূম (গ্যাস) বেশী হইবে। বলা বাহুল্য, ফানুসটি তাহাতে উড়ে নাই।

তৈল জলের অপেক্ষা হাল্‌কা অর্থাৎ তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব কম; সেইজন্য জলে ভাসে। আবার দু'একটি পদার্থ ছাড়া সকল পদার্থই উত্তাপ পাইলে আয়তনে বাড়ে ও বেশী স্থান অধিকার করে, সুতরাং তাহাদের ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়। বাষ্পীয় পদার্থের বেলাও ঐ কথা খাটে।

আমি যে ফানুসের কথা বলিতেছি, তাহা অবিকল একটি ছোট জালার মত, পাত্‌লা কাগজে নির্ম্মিত হয়। ফানুসের মুখের কাছে একটি জ্বলন্ত গোলা তারের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং ফানুসটি সেই গোলা লইয়াই উড়ে।

ফানুসের মুখের কাছে যে গোলাটি বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহা ফানুসের ভিতরকার বায়ুকে কেবলমাত্র উত্তপ্ত করিবার নিমিত্ত,—গ্যাস প্রস্তত করিবার নিমিত্ত নহে। ফানুসের ভিতর যে বায়ু থাকে, তাহা উত্তাপ পাইয়া বেশী স্থান অধিকার করে বলিয়া সেই বায়ুর ঘনত্ব বাহিরের বায়ু অপেক্ষা কমিয়া যায়; সেইজন্য ফানুসের ভিতরের উত্তপ্ত বায়ু বাহিরের বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা হইয়া যায় এবং তৈল হাল্‌কা বলিয়া যেমন গ্লাসের নীচে রাখিয়া তাহার উপর জল ঢালিয়া দিলেও তাহা ভাসিয়া উঠে, উত্তপ্ত বায়ুও ঠিক তেমনই হাল্‌কা বলিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করে এবং ফানুসটি খুব পাত্‌লা কাগজে প্রস্তত বলিয়া ফানুসটিকেও উড়াইয়া লইয়া যায়।

জ্বলন্ত উনানের চার পাঁচ হাত উপর হইতে একটি পাত্‌লা কাগজ ছাড়িয়া দিয়া দেখিবেন, কাগজটি কিছুতেই উনানের উপর পড়িবে না। পড়িতে পড়িতে উপরদিকে একটু উঠিয়া বাহিরে পড়িয়া যাইবে। ইহার কারণ উনানটি ক্রমাগত তাহার উপরকার বায়ুকে উত্তপ্ত করিতেছে ও উত্তপ্ত বায়ু হাল্‌কা হইয়া ক্রমাগত একটানা স্রোতের মত উপরে উঠিতেছে এবং কাগজখানি পাত্‌লা বলিয়া সেই উত্তপ্ত বায়ুর স্রোত তাহাকে উড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

সংসারের সুর।

এই জগৎযন্ত্রটি একটি সুরে বাঁধা আছে; সে সুরে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা। সে সুরের ব্যত্যয় তুমিও করিতে পার না, আমিও পারি না। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই, প্রশ্নকর্ত্তা উত্তরটি যে কি হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া বসিয়া আছে এবং উত্তরটি যদি অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার চক্ষুঃদ্বয় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠে; তাহার পর, উত্তরদাতা আবার সুরটি ধরাইয়া দিলে প্রশ্নকর্ত্তা প্রসন্ন হয়। পিতা পুত্রের কাছে, পুত্র পিতার কাছে; মাতা দুহিতার কাছে, দুহিতা মাতার কাছে; ভ্রাতা ভগিনীর কাছে, ভগিনী ভ্রাতার কাছে; পতি পত্নীর কাছে, পত্নী পতির কাছে ঐ বাঁধা সুরেরই প্রত্যাশা করে। যখনই সুরটি অন্য প্রকারের হয়, তখনই একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক হয়। যখন সকলই বাঁধা-ধরার ভিতর, তখন "সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ"—একথা শুনা যায় কেন? কে এই বৈচিত্র্যবিধান করিতে সাহসী হয়—কেই বা তাহা করিয়া নিষ্কৃতি পায় এবং বৈচিত্র্য যদি অসম্ভব, তবে জগৎযন্ত্রে কোথা কে হইতে অভিনবত্বের বিকাশ করে?

এই জগৎযন্ত্রান্তর্গত সুরটির কতিপয় পর্দ্দামাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; এখনও অগণিত পর্দ্দা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে; ক্রমবিকাশ-নিয়মানুসারে স্বয়ং ঈশ্বর ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া অপরাপর পর্দ্দাগুলিকেও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন, তাই এই একই সুরাত্মক জগতে আমরা বৈচিত্র্যের বিকাশ দেখিতে পাই। যে প্রণালীক্রমে এই জগৎযন্ত্রের যন্ত্রী চলেন, সেই প্রণালীক্রমেই জগৎ চলিয়া থাকে।

ঔপন্যাসিকের সুর একটি; তবে যে আমরা পার্থক্য দেখিতে পাই, সে কেবল মৌলিক ঔপন্যাসিক আবার একটি অভিনব পর্দ্দাকে জাগাইয়া তুলেন বলিয়া। তদ্রূপ কি কবি, কি চিত্রকর, কি বাগ্মী, কি তার্কিক, কি ঐতিহাসিক, কি দার্শনিক, কি অর্থনীতিক, কি রাজনীতিক সকলেই একই সুরে গান করেন, তবে তাঁহারা স্বকীয়ত্বপ্রদর্শনেচ্ছু হইলে কোনও এক অনাবিষ্কৃত অভিনব পর্দ্দার অন্বেষণে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন এবং যখন তাঁহারা স্ব স্ব বিভাগে কোনও একটি অপরিচিত পর্দ্দার পরিচয়প্রদানে সমর্থ হন, তখন বিশ্বময় তাঁহাদের বিপুলকীর্ত্তি বিঘোষিত হইতে থাকে।

বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত সকল কবিই এক-একটী অভিনব পর্দ্দার প্রকটনে পটুতাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর, বর্ত্তমান যুগ আসিল। মৌলিক কবি মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দেখিলেন, পরিচিত পর্দ্দায় তান ধরিলে আর কেহ গান শুনিবে না। তাই মাইকেল য়ুরোপ হইতে একটি নূতন পর্দ্দা আনিয়া অমিত্রাক্ষর-ছন্দে এক অভিনব 'মধুচক্র-রচনা করিলেন। হেমচন্দ্র তাহার মধ্য হইতে একটি দেশী পর্দ্দা বাহির করিয়া 'বৃত্রসংহারের' সৃষ্টি করিলেন। নবীনচন্দ্র দেখিলেন, কড়ির পর্দ্দায় আপাততঃ আর হাত দিলে চলিবে না, তাই তিনি একটি কড়ি-মধ্যম পর্দ্দার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তাহারই ফলে তাঁহার 'ভারত'-মূলক কাব্য-ত্রয়ের উদ্ভব হইল। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গে 'প্রদীপ'-প্রণেতা অক্ষয়কুমারও দেখিলেন, আর এখন কড়ির পর্দ্দায় কাজ হইবে না, তাই তাঁহারা দুইজনে দুইটি স্বতন্ত্র কোমল পর্দ্দার প্রকাশপ্রয়াসী হইলেন। তাঁহারা কোমল পর্দ্দায় যে মনো-মোহন গীতলহরী তুলিয়াছেন, তাহাতেই বঙ্গীয় পাঠক এখন বিভোর হইয়া আছে।

অতএব এই বিশ্বযন্ত্র মাত্র একটি সুরের দ্বারা চালিত হইলেও, ইহাতে বৈচিত্র্য-বিধান বিস্ময়াবহ নহে। আমি যে জগতে আজও অজ্ঞাত ও অখ্যাত, তাহার কারণ আমি আজও পরের পর্দ্দায় আত্মপ্রতিভাকে প্রসুপ্ত রাখিয়াছি। বাঁধা সুরেই আমাকে গাইতে হইবে,—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, পঞ্চম প্রভৃতি সুর-সপ্তকের মধ্য দিয়াই আমাকে আমার প্রতিভার বিকাশবিধান করিতে হইবে। তবে আমি কোন্ পর্দ্দায় হাত দিব? কোন পর্দ্দাটি আজও প্রখ্যাত হয় নাই, তাহাই আমার অনুসন্ধেয়। কিন্তু অভিনব একটি পর্দ্দার অনুসন্ধান করিতে পারিলেই যে পটুতাপ্রকাশ করা হয়, তাহা নহে। দেখা কর্ত্তব্য, জগৎ এসময়ে কোন্ পর্দ্দাটির প্রতীক্ষা করিয়া আছে। প্রভাতে "সারঙ্গের" প্রচণ্ড পর্দ্দায় তান ধরিলে প্রীতিকর হইবে না। যে ঋতু, যে ক্ষণ যে কঠোর বা কোমল স্বরলহরীর জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে, সেই ঋতু ও সেই ক্ষণে সেই স্বরটির সন্ধান করিতে হইবে। যখন যে সুরের ললিতলীলায় প্রাণ প্রফুল্ল হয়, তখন সেই সুরটিরই অনুসন্ধান সার্থক! যদি স্বদেশী-আন্দোলন না হইত, তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' যে মাঠে মারা যাইত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। একদিকে বিদ্যাসাগরের

'নবজলধরপটলসংযোগে', অন্যদিকে টেকচাঁদের 'হ্যাদে গরু বেয়ে চল' দুইই সে সময়ের সুরের সঙ্গে থাপ খাইতেছিল না। বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়াই তাঁহার প্রসাদগুণবিশিষ্ট অথচ গ্রাম্যতাদোষবর্জ্জিতা পরিহাস-প্রফুল্লা প্রীতিকরী ভাষার স্বৃষ্টি করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে ভাষায়ও তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাগুলিকে বিকশিত করিতে না পারিয়া নূতন পর্দ্দায় হাত দিবার চেষ্টা করিতেছেন; তিনি একটা বড়রকম পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন, কিন্তু ঋতু ও ক্ষণ উভয়ই প্রতিকূল, কাজেই তিনি পদে পদে প্রতিহত হইতেছেন। ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে পর্দ্দায় হাত দিব, সে পর্দ্দায় যুগেরও যোগ চাহি, নতুবা তাহার নূতনতাই তৎপ্রকাশের প্রণোদক হইবে না।

ধর্ম্মজগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য যুগধর্ম্মেরই সেবক। বর্ত্তমান হিন্দুত্ব দর্শনবিজ্ঞানবিৎ হিন্দুর তৃপ্তিবিধান করিতে পারিতেছে না। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই তর্কের সময়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট বড়াই করিলেও, মনে প্রাণে সে ধর্ম্ম মানিয়া চলেন না। তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব মনোগত ভাবে হিন্দুধর্ম্মকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকারে বুঝিতেছেন। আজিকালি এক হিন্দুর 'স্বধর্ম্মের' সহিত অন্য হিন্দুর 'স্বধর্ম্মে'র সমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ কি? কারণ আর অন্য কিছু নহে, হিন্দুমাত্রেরই আত্মা এখন যে যুগধর্ম্মের স্নিগ্ধ ছায়াতলে উপবেশন করিতে পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, তাহা এখনও ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হিন্দুর প্রাণ মানিতেছে না, তাই কখনও রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্ম, কখনও মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম, কখনও কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্ম, কখনও শাস্ত্রীমহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম, কখনও শশধর তর্কচূড়ামণির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাসর্ব্বস্ব নব্য হিন্দুধর্ম্ম, কখনও বিবেকানন্দের বৈদান্তিক হিন্দু-ধর্ম্ম, কখনও য়্যানি বেসান্তের বিবৃত হিন্দুধর্ম্ম নব্য হিন্দুর ক্ষুধিত ও তৃষিত আত্মার ক্ষুধা ও তৃষ্ণানিবারণের বৃথা চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হিন্দুর এ চেষ্টার ফলে তাহারি অমর আত্মা তাহার অজ্ঞাতসারে কোন্ এক অক্ষয় উৎসের অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, যতদিন হিন্দু পুনরায় যুগধর্ম্মের সাক্ষাৎলাভ না করিবে, তত দিন হিন্দুর ধর্ম্মজগতের গোলমাল কিছুতেই মিটিবে না। ধর্ম্মবিষয়ে মানুষের দ্বারা সুরের পর্দ্দা-পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। তখন মানুষ এইটুকুমাত্র বুঝে

যে, সে একটা কিছু চাহে; কিন্তু সে যে কি চাহে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। যে স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণের জন্য তাহার আত্মিক কর্ণ উৎকর্ণ হইয়া থাকে, সে সঙ্গীতের স্বরগ্রাম সে কিছুঁতেই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না। কি যেন নাই, কি যেন চাই, এইরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। সে ধরি ধরি করিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া বড় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে।

রাজনীতিক্ষেত্রেও ঐ ভাব। প্রজার প্রাণ যখন যে সুরে বাঁধা, তখন সেই সুরেই রাজাকে প্রজাপালন করিতে হয়। এইজন্য আমরা প্রতি রাজ্যেই তন্ত্রপরিবর্ত্তন ও নানা বিপ্লব দেখিতে পাই। সুরের এদিক-ওদিক করিয়া রাজা কিছুতেই প্রজাকে পালন বা শাসন করিতে পারেন না। কর্জ্জন বিচক্ষণ রাজনীতিক হইয়া এ কথা ভাল বুঝেন নাই, একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া গেলেন। বুদ্ধিমান যে, সে অন্যের অজ্ঞাতসারেই আপন স্বার্থরক্ষা করে। কর্জ্জন যে নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, কে বলিবে যে শাসকের পক্ষে তাহা অন্যায়? কিন্তু সে স্বার্থটিকে তিনি প্রজার নিকটে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার মত কূটরাজনীতি-বিশারদকেও বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে। জন মর্লি স্বার্থত্যাগ করেন নাই, কিন্তু প্রজার আকাঙ্ক্ষা কি তাহা বুঝিয়াছেন; ক্রমশঃ বিপ্লব প্রশমিত হইবে।

প্রতি পরিবারও একটি একটি সুরে বাঁধা। পরিবারের কর্ত্তাও সে সুরের ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। যা আছে, তা আছে। তাহার অন্যথা করিতে চাও, প্রত্যক্ষভাবে পারিবে না; পরোক্ষভাবে নানা জটিল ঘটনার আবর্ত্তনদ্বারা যদি তোমার বর্ত্তমান পারিবারিক অবস্থাটির সমূহ পরিবর্ত্তন-সাধন করিতে পার, তবে তুমি সুরান্তরে উপনীত হইতে পারিবে। তুমি গৃহের কর্ত্তা বটে, কিন্তু তোমার সুর তোমার গৃহিণীর সুরের অনুসঙ্গীমাত্র; তোমার সুরে রাগরাগিণী বাজে না, তুমি কেবল প্রাণপণে গাল ফুলাইয়া 'ভোঁ' বাজাইতেছ, গৃহিণীর সুরেই রাগরাগিণী বাজিতেছে। যদি তোমার 'বিভাসে' আলাপ করিবার সাধ হয়, 'বড়ের কিস্তি' ছাড়া বিড়ম্বনা এড়াইতে পারিবে না।

শ্রীললিতমোহন দত্ত।

'সংসারের সুর'-সম্বন্ধে মন্তব্য।

'সংসারের সুরের' আভাস দিতে গিয়া লেখক মহাশয় বোধ হয় স্থানে স্থানে তালমান ঠিক রাখিতে পারেন নাই। কবিরা যে বিশ্বযন্ত্রের 'এক-একটি অভিনব পর্দ্দার প্রকটন' করিয়া থাকেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রকটন-ব্যাপারে তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও ক্ষেত্র-নির্ব্বাচন-প্রণালী সমধিক কার্য্যকরী হয়, এরূপ ধারণা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মনে করি। 'সভা বুঝিয়া গান গাওয়া' কথাটা কবির বেলায় বড় খাটে না; কবি কোন্ সুরে গান ধরিবেন তাহা তিনি কখনই দেশকালপাত্র প্রভৃতি বিচার করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে পারেন না; আর যিনি তাহা করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি কখনও প্রথমশ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। আমাদের দেশে দাশরথী রায় এবং ইংরাজীসাহিত্যে ড্রাইডেনপ্রমুখ Restoration poets ইহার উদাহরণস্থল। প্রকৃত কবির কবিতা এক স্বর্গীয় উন্মাদনার অভিব্যক্তি এবং এইরূপ কবি ব্যতীত বিশ্বসঙ্গীতের সুর মর্ত্ত্যবাসীর কর্ণে পৌঁছাইয়া দিতে আর কেহই সমর্থ নহে। ইংরাজ কবি টেনিসন তাই বলিয়াছিলেন—"I do but sing "because I must"; এইরূপ প্রেরণার অনুভূতিই প্রকৃত কবির লক্ষণ। তাঁহার গান কেহ শুনিবে কি না তাহা তিনি ভাবিবার অবসর পান না; তিনি যে ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, সেইখানে সকলকে লইয়া যাওয়াই তাঁহার কবি-জীবনের ব্রত। যদি কেহ তাঁহার সহিত যাইতে না চায়, তাহাতে তাঁহার বড় আসে যায় না। যুগ-ধর্ম্মের প্রভাব সকল কবির উপর সমানভাবে প্রকটিত হয় না। 'হেম নবীনের জারিজুরি' যুগধর্ম্মের নিকট সম্পূর্ণ নতমস্তক ছিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় বড়াল উহার নিকট আত্মবিক্রয় করেন নাই; ইঁহাদের কবিতা হেম-নবীনের কবিতার ন্যায় যুগ-চিন্তার প্রতিধ্বনিমাত্র নয় এবং এই জন্যই প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ অনেকের নিকট দুর্ব্বোধ্য!

ধর্ম্মজগতে যুগধর্ম্মের প্রভাবপ্রদর্শনকালে লেখক মহাশয়—শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হিন্দুধর্ম্মের উপর যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে অনেকগুলি শাখা উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু এগুলি

"নব্য হিন্দুর ক্ষুধিত ও তৃষিত আত্মার ক্ষুধা ও তৃষ্ণানিবারণের বৃথা চেষ্টা" মাত্র,—এরূপ উক্তির ভিত্তি কোথায়? এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় কি মূলতঃ এক নহে? পৃথিবীতে যদি কোন ধর্ম্ম থাকে যাহা কতকগুলি অনুশাসনের (dogmas) উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা হিন্দুধর্ম্ম। যাহার যেরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাস, সে সেইরূপেই ঈশ্বরের ভজনা করুক, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের অনুজ্ঞা; কিন্তু ইহাতে যে তাহার আত্মার ক্ষুধানিবারণ হয় না, এরূপ মন্তব্য কখনও সমীচীন নয়। খ্রীষ্টধর্ম্মেও শাখা-প্রশাখা হিন্দুধর্ম্মের চেয়ে কম নহে! অধুনা এইরূপ আনুশাসনিক ধর্ম্মও যুগধর্ম্মের কবলে পড়িয়া এক-একটি করিয়া অনুশাসন বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মের সহিত বিচারের (reason) যে চিরন্তন বিরোধ খ্রীষ্টানগণ এতকাল নির্ব্বিবাদে মানিয়া আসিতেছিলেন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে তাহা অনেকটা পরিমাণে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মযাজকগণ এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। তাই মহাজ্ঞানী টলষ্টয় বাইবেলের ধর্ম্মানুশাসন মানিতেন না বলিয়া তাঁহার পবিত্র মৃতদেহ গির্জ্জাপ্রাঙ্গণে সমাহিত হইবার অনুমতি পাইল না। কে বলে ভারতবর্ষই কেবল পুরোহিত-প্রপীড়িত?

'অর্ঘ্য'-সম্পাদক।

জয় পরাজয়।

বিশ্বামিত্র। হে বশিষ্ঠ! ঋষিশ্রেষ্ঠ! অতিথিবৎসল!
পড়ে মনে, যেই দিন লয়ে দলবল
রাজপুত্র গিয়েছিনু আশ্রমে তোমার
মৃগয়ায় শ্রান্ত, চেয়েছিনু বারবার
হোমধেনুটিকে তব মোর রাজ্যধন
সব বিনিময়ে? তুমি নির্লোভ ব্রাহ্মণ
করেছিলে তাই প্রত্যাখ্যান, অতিথিরে
তাই করেছিলে ম্লান, তাই নন্দিনীরে

তব উপলক্ষ করি' তপস্যার বলে
করেছিলে সৈন্য-সৃষ্টি, করুণার ছলে
করেছিলে অপমান মোরে, অতি হীন
ভিখারীর মত! মনে রবে সেই দিন
যুগযুগান্তর। শিরায় শিরায় মোর
ছুটিল বিদ্যুৎ, দন্তে দন্তে ঘন ঘোর
বাজিল ঝঞ্ঝনা, ক্ষীণ বাহু ব্যর্থরোষে
মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল, নিষ্ফল আক্রোশে
ফিরে গেনু নতশিরে; করিলাম পণ
"জীবন প্রতিজ্ঞা মোর হইব ব্রাহ্মণ"!
সেইদিন হ'তে ছাড়ি রাজ্য-ধনজন
হইনু তপস্যারত—ঊর্দ্ধমুখ, অনশন,
রৌদ্র-বৃষ্টি তুচ্ছ করি'। বিধাতার বরে
লভিলাম ব্রাহ্মণত্ব; কিন্তু তোমা'পরে
ক্রোধশান্তি নাহি হ'ল। গাধির সন্তান
বাহিরিল বিশ্বমাঝে করিতে প্রমাণ,
বশিষ্ঠ কি বিশ্বামিত্র শ্রেষ্ঠ কোন্ জন?
একশত পুত্র তব প্রিয়দরশন
সর্ব্বগুণে গুণময়, করিলাম স্থির
বিনষ্ট করিব সবে। দেখি ধর্ম্মবীর
বশিষ্ঠ মহর্ষি প্রাণাধিক পুত্রগণে
বিশ্বামিত্র-কোপ হতে বাঁচান কেমনে,
কোন্ তপস্যার বলে? আজি পূর্ণসাধ,
এতদিনে, সিদ্ধকাম, শূন্য-অবসাদ,
ক্ষোভহীন, জয়ীচিত্ত। ঋষি! আছে মনে
বিশ্বামিত্রে অপমান ক্ষুদ্র তপোবনে?

বশিষ্ঠ। মনে আছে, তাই বন্ধু, চোখে আসে জল,
ব্রাহ্মণত্ব লভি' হায় করিলে বিফল!

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ।

উড়িষ্যা।

সুখদ প্রদেশ—উড়িষ্যা।

ইহার ২৯টি (১) পাকা দুর্গ আছে। ইহার জলবায়ু উৎকৃষ্ট। এখানে বর্ষা আট মাস, শীত তিন মাস এবং গ্রীষ্ম একমাস স্থায়ী হয়। ফল, ফুল পর্য্যাপ্ত—বিশেষতঃ 'নস্‌রিণ' (২) (ইহা বেশ সুস্বাদু ও সুগন্ধ) ও কেওড়া। নানা রকমের পান উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ ধানের চাষই এখানে হইয়া থাকে। এখানকার অধিবাসীরা ভাত, মাছ, বেগুন ও পুঁইডাঁটা, কুমড়া-ডাঁটা প্রভৃতি খাইয়া থাকে। তাহারা রাত্রে রন্ধন করিয়া রাখিয়া দেয় এবং পরদিন সেই খাদ্য আহার করে। যতকিছু বই সব তাহারা তালপাতায় লেখে। লিখিবার সময় লোহার কলমটি 'মুট' করিয়া ধরে। কাগজ-কালির ব্যবহার একেবারে নাই বলিলেই হয়। এখানেও খোজা বানান হয়। এখানে বেশ ভাল কাপড় তৈয়ারি হয়। কড়ির সাহায্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিয়া থাকে। চার কড়িতে একগণ্ডা হয়। (৩)

দক্ষিণদিকে সমুদ্রের ধারে পুরুষোত্তমপুর (পুরী) অবস্থিত। সেখানে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ-নির্ম্মিত জগন্নাথের মন্দির বিরাজ করিতেছে। চার হাজার বৎসরেরও আগে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহারই নিকটে (৪) সূর্য্য-মন্দির অবস্থিত। এই রাজ্যের দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করিয়া ঐ মন্দির নির্ম্মিত হয়। উহার প্রাচীর ১৫০ হাত উচ্চ ও ১৯ হাত পুরু; উহার দ্বার তিনটি। বিচক্ষণ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা উহা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন।

ইহার নিকটে তক্লিয়ারাজ (৫) নামে এক দেশ আছে। তথাকার লোকেরা

---

(১) আ (২।১২৬) মতে ১২৯টি দুর্গ।

(২) হিন্দী নাম—সিওটি (Seoti)

(৩) ২০ গণ্ডায় এক আনা।

(৪) কনারক।

(৫) সম্ভবতঃ ইহা রাজমন্ত্রিয়া (রাজমহেন্দ্রী) হইবে।

সাঙ্গে চন্দন মাথে এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় গহনা পরে। স্ত্রীলোকেরা গুহ্যাংশ ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গই আবৃত করে না; আর সেই সামান্য আবরণস্বরূপ বৃক্ষপত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা এক সপ্তাহ স্বামীর ঘর করে। * * (এইখানে বাকী দুই ছত্রের অনুবাদ যদুবাবু করেন নাই।)

এই প্রদেশের দৈর্ঘ্য ১২০ ক্রোশ এবং প্রস্থ ১০, ক্রোশ। জলেশ্বর, ভদ্রক, কটক, কলিঙ্গ, রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি ইহার ১৫টি সরকার ও ২৩৩টি মহল। ইহার রাজস্ব ৪০ কোটি ৪১ লক্ষ ৫ হাজার দাম (১) (১,০১,০২,৬২৫৲ টাকা)।

ঔরঙ্গবাদ।

সুভিত্তি ঔরঙ্গবাদ (২) প্রদেশ।

কোন কোন ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্বে এই শহর ধরণগিরি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তার পর ইহা দেওগির (দেবগিরি ?) নামে খ্যাতিলাভ করে। দিল্লী-রাজ সুলতান মহম্মদ ফখর-উদ্দীন জুনা সমস্ত দক্ষিণাপথ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া দেওগির দুর্গের দৌলতাবাদ (৩) নামকরণ পূর্ব্বক ইহাকে রাজধানী মনোনীত করেন। সুলতান মহম্মদের পরে সমগ্র দক্ষিণাপথ দিল্লীর রাজাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং তিন শত বর্ষ পরে সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে দৌলতাবাদ দুর্গ পুনরধিকৃত হয় (১৬৩২ খৃঃ)। সম্রাট ঔরঙ্গজেব আলমগীর যখন রাজপুত্র মাত্র ছিলেন, সেই সময় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তনামা দুর্গের সন্নিকটে খিরকি (৪)

---

(১) 'আ' গ্রন্থে উপরি-উক্ত মাত্র ঐ পাঁচটিই উড়িষ্যার সরকার ও উহার মহল সংখ্যা ১১ এবং রাজস্ব ৩১,৪৩,৩১৫৸৴২ পাই। এ সমস্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত।

(২) ইহার চলিত নাম খুজিস্তা বনিয়াদ। (ইলিয়ট ৭।২৬৬)

(৩) দৌলতাবাদ ঔরঙ্গাবাদ হইতে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন রাজ্য অহম্মদ নগরের বৃহদংশ লইয়া যে মোগল প্রদেশ গঠিত হয়, ঔরঙ্গাবাদ তাহার রাজধানী ছিল।

(৪) ইম্পিঃ গেজেঃ (১।৩৮৭) মধ্যে এই শহর ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মালিক অম্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইহার নাম ছিল খিরকি। ঔরঙ্গজেব এখানে একটি প্রাসাদ ও তাঁহার স্ত্রী "সুন্দর" সমাধি মন্দির, নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সুবার রাজধানী স্থাপনা করেন।

গ্রামে ঔরঙ্গাবাদ শহর স্থাপন করেন। এ শহরটি প্রকৃতপক্ষেই অত্যন্ত বিস্তৃত ও প্রকাণ্ড। ইহাঁর বাতাস সর্ব্বদাই স্বর্গের বাতাসের ন্যায় মৃদু এবং চৈত্রের বসন্তের মত মন ও প্রাণ স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিয়া তুলে। ইহার ব্যাত্যা বসন্তের বাত্যার মত প্রীতিকর ও মনোরম। ইহার বাতাস উন্মাদিকা মদিরার মত উত্তেজক ও আনন্দদায়ক। এখানকার প্রত্যেক শস্যই গোলাপের মত জগৎকে তৃপ্তিদান করে। ইহার প্রতিদিনের উষাই বসন্তের অলঙ্কারস্বরূপ। এখানে শীতকালে নববর্ষের প্রথম দিনের বাতাসের মত মোহকর বাতাস বহে। এখানে গ্রীষ্মকালে বসন্তের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। সূর্য্যের মিথুনরাশিতে প্রবেশারম্ভ হইতে কন্যারাশিতে গমন পর্য্যন্ত এই চারিমাসকাল মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। সকল প্রকার ফলই বেশ মিষ্ট হইয়া জন্মায়। এখানে এমন কতকগুলি ফল হয়, যাহা অন্য কোন দেশে একেবারেই জন্মে না। এখানে এত রকম ফুল উদ্যানে ও বনে প্রস্ফুটিত হয় যে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। শস্য এত উৎকৃষ্ট ও এত পর্য্যাপ্ত যে, এখানে সর্ব্বদাই তাহা স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হয়। বহু প্রকারের বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও দুর্ম্মূল্য উজ্জ্বল রত্নাদি সবই এই সহরে সুপ্রাপ্য। ইহার অধিবাসিবর্গ বাস্তবিকই কত সুখী ও সুস্থ; তাহারা কত ধন-সম্পত্তির অধিকারী; এখানকার স্ত্রীলোকেরা আদর-অভ্যর্থনায় কত দক্ষ, তাহাদের ইন্দুসম ললাট হৃদয়কে কতদূর আনন্দাভিষিক্ত করিয়া তুলে—সে সব কথা যথার্থভাবে লিখিয়া বর্ণনা করিবার মত শক্তি আমার নাই।

এই প্রদেশের দৈর্ঘ্য ১৫০ ক্রোশ এবং প্রস্থ ১০০ ক্রোশ। ইহার সরকার-সংখ্যা আট ও মহল-সংখ্যা আশি। ইহার রাজস্ব ৫১ কোটি ৬২ লক্ষ ৮০ হাজার দাম (১) (১,২৯,০৭,০০০৲ টাকা)।

বেরার।

বেরার প্রদেশ।

এই দেশ দাক্ষিণাত্যের দুইটি পর্ব্বতের মধ্যদেশে অবস্থিত। ইহার জলবায়ু ও কৃষির অবস্থা উৎকৃষ্ট। এ দেশে চৌধুরীকে দেশমুখ, কানোন-

(১) আইন-ই-আকবরীতে এই প্রদেশের কোন বর্ণনা নাই, কারণ ইহা আকবরের আমলের পরে মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

লোকে দেশপাণ্ডে, মুকদ্দমকে পাটেল এবং পাটওয়ারীকে কালকর্ণী (১) বলে। এখানে বন্যহস্তী অসংখ্য।

রামগড় (২) ক্ষুদ্র পাহাড়ে অবস্থিত একটি প্রস্তর-দুর্গ। ইহার তিন দিক্ দুইটি নদী (৩) দ্বারা পরিবেষ্টিত। কেরল (৪) সমতলাবস্থিত একটি প্রস্তর-দুর্গ। ইহার মধ্যভাগে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে; লোকে তাহার পূজা করে। এখান হইতে চার ক্রোশ দূরে একটি কূপ আছে; তাহাতে কোন জন্তুর অস্থি পড়িবা-মাত্র প্রস্তরে পরিণত হয়। মেলগড়ের (৫) নিকটে একটি জল-স্রোত আছে, তাহাতে কাঠ বা যাহা কিছু ফেলা যায়, তাহাই প্রস্তর হইয়া যায়। বীরগড়ে (৬) হীরকের খনি আছে; এখানে নানারূপ চিত্রাঙ্কিত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। ইন্দোর ও নারনালে (৭) ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতুর খনি আছে। এখানে প্রস্তরের মনোরম বাসন প্রস্তুত হয়। এখানে একরূপ আশ্চার্য্য কুক্কুট (৮) দেখা যায়, তাহার রক্ত ও অস্থি উভয়ই কৃষ্ণবর্ণের। লোনার একটি পবিত্র ক্ষেত্র; ইহার আর

---

(১) মুকদ্দম—গ্রামের প্রধান রাজস্ব আদায়কারী কর্ম্মচারী; পাটওয়ারী—জমির হিসাব-রক্ষক; চৌধুরী—কোন জাতির বা গ্রামের মণ্ডল; কানোনগো—জিলার আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও জমির খাজনা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী। (আ ২।৪৫-৪৭) সোসাইটির ১৫৩ ডি পাণ্ডুলিপি মতে কর-কর্ণী।

(২) সোসাইটির ১৫৩-ডি পাণ্ডুলিপি-মতে মরগড়। রামগড় মধ্যপ্রদেশের মণ্ডল জিলার অন্তর্গত একটি শহর, এবং বরুনের (burhner) নদের তীরবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতে অবস্থিত। (ইম্পিঃ গেজেঃ ১১।৪৪৭)

(৩) আ (২।২৩০) মতে নদী নহে—জঙ্গল।

(৪) গণ্ড-রাজ্য খেরলের রাজধানী মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিটুলে ছিল। (ই, গে, ২।৩২৯)

(৫) ইম্পিঃ গেজেঃ (৯।৪০৩)তে আছে মেলঘাট, ইলিচপুর জিলার অন্তর্গত একটি তালুক।

(৬) ইহা চণ্ড জিলার অন্তর্গত বৈরাগড় গ্রাম। ২০.২৫ উঃ, ৮০.৭ পূঃ। "হীরক ও পান্নার খনির কাজ পূর্ব্বে হইত।" (ই, গে, ১৩।৫১৩)

(৭) নারনাল বেরারের অকোলা জিলার অন্তর্গত একটি পার্ব্বত্য দুর্গ।—(ই,গে, ১০।২১৩)

(৮) বর্ণিয়ে বলেন, কেবলমাত্র চর্ম্মই কাল। কনুষ্টরল (২৫১ পৃঃ টিপ্পনী) লিনুসোটেনের voyage to the east indies হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—"মোজাম্বিকে এক রকম মুরগী আছে, সেগুলির পালক, মাংস ও হাড় সমস্তই এত কাল যে, তাহারা কর্দ্দমাক্ত হইলে একেবারে কালির মত দেখায়। আবার এমন এক রকম মুরগী আছে, যাহা ভারতবর্ষেও দেখা যায়।"

একটি নাম বিষ্ণু-গয়া। এখানে একটি অত্যন্ত গভীর দীর্ঘিকা আছে ; তাহা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এক এক ক্রোশ ; একটি ঝরণার জল এখানে আসিয়া পড়ে ; ইহার চারিদিকে একটি উচ্চ পর্ব্বত বিদ্যমান। ইহার জল লবণাক্ত, তাহা হইতে কাঁচ, সাবান, ও সোরা প্রস্তুত করিবার উপকরণ পাওয়া যায় ; ইহা হইতে অনেক টাকা রাজস্ব আদায় হয়। এদেশে বানর অসংখ্য।

এ প্রদেশে অনেকগুলি নদী আছে ; গঙ্গগৌতমী বা গোদাবরী তন্মধ্যে প্রধান। হিন্দুস্থানের গঙ্গা মহাদেবের সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত, কিন্তু এই নদী প্রসিদ্ধ ঋষি গৌতমের সংস্পর্শে সেইরূপ পবিত্রীভূত। ইহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনী শুনা যায় ; লোকে বেশ ভক্তির সহিত ইহার পুজা করিয়া থাকে। ত্রিম্বকের (১) সন্নিকট সহির পর্ব্বত হইতে ইহা বহির্গত হইয়া আহম্মদাবাদ দেশের ভিতর দিয়া বেরারে পৌঁছিয়াছে, তারপর তেলিঙ্গানায় যাইয়া অপর দিকের সমুদ্রে পড়িয়াছে। বৃহস্পতিগ্রহ সিংহরাশিতে প্রবেশ করিলে দিগ্‌দেশ হইতে নানা লোক এখানে আসে, তখন এখানে একটা প্রকাণ্ড জনতা হয়। সে জনতার কথা রাজ্যের সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র আছে।

অন্যান্য নদীর মধ্যে তাপী (২) ও তাপ্তী। এই উভয় নদীই পুজিত হইয়া থাকে। অপর নদী পুর্ণা দেওলগাঁও (৩) হইতে বহির্গত হইয়াছে ; হইার একতম উৎপত্তিস্থান তাপীর (৪) উৎপত্তিস্থান হইতে ১২ বার ক্রোশ উর্দ্ধে। আর একটি নদীর নাম মুনিয়া, (৫) তাহা দেওগাঁও (দেওলগাঁও) হইতে বহির্গত হইয়াছে।

---

(১) নাসিক জিলার অন্তর্গত। আ (২।২২৮ টিপ্পনী)

(২) এটা কি খেলনদী, যাহা তাপ্তী ও ওয়ার্দ্ধা নদীর ন্যায় মুলটাই অধিত্যকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ? ইঃ গেঃ (২।০২১)-এ তাওয়া নামে আর একটা নদীর নাম আছে।

(৩) সোসাইটির ১৫৬-ডি পাণ্ডুলিপি মতে দুলগাঁও। বুলদানায় ২টি দেওলগাঁও আছে। একটি অজন্তা হইতে ২২ মাইল পুর্ব্বে, অপরটি ৭৬.২০ পূঃ, ২০.৫ উঃ ; (লেটসের এট্‌লাস্ ০ পৃঃ) ইঃ গেঃ (৪।২০৫)-এ উক্ত দেওলগাঁও এ দেওলগাঁও নয়।

(৪) আ (২।২২৮) মতে 'আবার ওয়ার্দ্ধা তাপীর উৎপত্তিস্থানের ১০ ক্রোশ উর্দ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।'

(৫) মুর্ণা (মুর্শিয়াটি) স্পষ্টতঃই পুর্ণার শাখা। (ইঃ গেঃ ১১।৩২০) 'আ' মতে 'পাপ্‌তা' ?

সংক্ষেপতঃ, এই প্রদেশের দৈর্ঘ্য বতিয়ালা (১) হইতে বীরগড় পর্য্যন্ত ২০০ ক্রোশ, এবং প্রস্থ বিদর হইতে হিন্দিয়া পর্য্যন্ত ১৮০ ক্রোশ। ইহার পূর্ব্বদিকে বীরগড়, পশ্চিমে মথরাবাদ, (২) উত্তরে হিন্দিয়া ও দক্ষিণে তেলিঙ্গানা অবস্থিত। ইহার সরকার ১০টি এবং মহল ২০০টি। ইহার রাজস্ব ৬০ কোটি ৭২ লক্ষ ৭০ হাজার দাম (৩) (১,৫১,৮১,৭৫০৲ টাকা)।

খান্দেশ।

খান্দেশ প্রদেশ।

এই প্রদেশের রাজধানী বুরহানপুর তাপ্তীনদীর তীরবর্ত্তী (৪) একটি প্রকাণ্ড শহর। অনেক শিল্পী এখানে বাস করে। ইহার উপকণ্ঠে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাগান আছে; চন্দন গাছ, aloe গাছ ও নানারূপ ফল-ফুলের গাছ এখানে অনেক আছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ধূলি-বাত্যা উঠে। বর্ষাকালে গোলাপ, Tulips যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়। জওয়াড়ীর চাষই এখানকার প্রধান চাষ। সামান্য দুই এক স্থানে ধান ও paddy বেশ জন্মায়; পান অপর্য্যাপ্ত হয়। সিরিসফ্, অল্‌ফিয়া ও ভীরয়ুন (৫) কাপড় এখানে বেশ সুন্দর বোনা হয়। তাপ্তী ও পূর্ণার সঙ্গমক্ষেত্রের অদূরে চঙ্গদেও (৬) গ্রাম পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত, তাহার আর একটি নাম চক্র-তীর্থ। (৭)

---

(১) বত্তিয়ালা বা পিত্তলবাড়ী ১টি সরকার। চন্দর ইহার অন্তর্গত। (আ) ই. গে. (৩।৩৬৫)-মতে চন্দুর অমরাবতী জিলার অন্তর্গত একটি শহর।

(২) লেটসের এট্‌লাসের ৩ পৃষ্ঠায় ২০.১ উঃ, ৭৪.২৪ পূর্ব্বে এক মোখিয়ের আছে। ই. গে. (১।৪৪৭)-উক্ত মোখের এ মথরাবাদ নহে।

(৩) আকবরের আমলে, ইহার সরকার ১৬টি, পরগণা ২৪২টি ও রাজস্ব ১,৪০,০০,০০০৲ টাকা ছিল। (আ ২।২৩১) জেরেটের অনুবাদে ২৪২টি পরগণার স্থলে ভুলক্রমে ১৪২টি পরগণা মুদ্রিত হইয়াছে।

(৪) 'আ' ভুলক্রমে বলিয়াছেন—'তাপ্তী হইতে তিন ক্রোশ দূরে।' (২।২২৩)

(৫) সিরিসফ ও ভীরয়ুন নাম (আ ১।৯৪)তে পাওয়া যায়। অল্‌ফিয়া সম্ভবতঃ 'আ'র 'অলধাহ্' হইবে।

(৬) ২১.২ উঃ, ৭৬ পূঃ (লেটসের এট্‌লাস, ৬ পৃঃ)

(৭) য়াভুইন ও জেরেট্ (আ ২।২২৪ টিপ্পনী) ইহার নামের অদ্ভুত উৎপত্তি দিয়াছেন। সরকারের মতে কিন্তু বিষ্ণুচক্রে কর্ত্তিত হইয়া সতীদেহের কোন অংশ এখানে পড়িয়া থাকিবে। তাই এই নাম হইয়াছে।

সংক্ষেপতঃ, এ প্রদেশে অনেকগুলি নদী আছে। সকলের মধ্যে তাপ্তীই প্রধান। ইহা বেরার ও গণ্ডওয়ানার মধ্য দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণাও ঠিক ঐখান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। গির্ণি ও তাপ্তী নদী চোপরার (১) নিকটে সম্মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গম-ক্ষেত্র বিশেষ পবিত্র বলিয়া খ্যাতিলাভ করায় দিগ্‌দেশ হইতে বহু লোক ইহার পূজার্থ আসে।

এদেশের রাজা গরীব খানের নামানুসারে এদেশের নাম খান্‌দেশ (২) হইয়াছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সেখ আবুল ফজলের তীক্ষ্ণ অসির সাহায্যে অসিরগড় দুর্গ জিত হইলে এই রাজ্য সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র কুমার দানিয়েলকে উপহৃত হয় ও সেই সময় সম্রাটের আদেশানুক্রমে ইহার দান্দেশ নামকরণ হয়। এই প্রদেশের জমীদারেরা সকলেই হয় কোলী, (৩) নয় ভীল, নয় গণ্ড।

হিন্দিয়ার সন্নিকট বোরগাঁও (৪) হইতে আহম্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী ললিঙ পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ৭৫ ক্রোশ এবং বেরারের নিকটবর্ত্তী জমোদ হইতে মালবের নিকটবর্ত্তী পল পর্য্যন্ত প্রস্থ ৫০ ক্রোশ। ইহার পূর্ব্বে বেরার, পশ্চিম ও উত্তরে মালব ও দক্ষিণে জলনা। ইহার ৫টি সরকার ও ১১২টি মহল আছে। ইহার রাজস্ব ৪৪ কোটি, ৩৬ লক্ষ, ১৯ হাজার দাম (৫) (১,১০,৯০,৪৭৫৲ টাকা)।

---

(১) সোসাইটির ১৫৬-ডি পাণ্ডুলিপিতে ভুলক্রমে 'জুনিরা' লেখা হইয়াছে।

(২) খান্দেশ—মিশ্রিত শব্দ, মানে খান্ বা প্রভুর দেশ। আ (২।২২৬)-এ গরীব খানের নাম দেওয়া হইয়াছে ঘিজনী খান্ ও উপাধি নসির শাহ। ফেরিস্তার মতে ইনি নসির খান্ (৪।২৮৬) এবং গুজরাটরাজের নিকট হইতে খান্ উপাধি প্রাপ্ত হন, ইনি ইঁহার বংশ মধ্যে প্রথম রাজকীয় চিহ্নাদি ধারণ করেন। (মৃত্যু ১৪০৭ খৃঃ) নসিরের সমসময়ে মালবে এক ঘিজনী খান্ রাজত্ব করিতেন। (ফেরিস্তা ৪।১১৪) 'আ' স্পষ্টতঃই এই দুই নামের গোল করিয়া বসিয়াছেন।

(৩) কোলীদের বৃত্তান্তের জন্য আ (২।২৪৫ টিপ্পনী) ও ইলিয়ট (৫।৪৩১) দ্রষ্টব্য।

(৪) বোরগাঁও অসিরগড় হইতে ১২ মাইল উত্তর এবং হিন্দিয়া হইতে ৬৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। (লেটসের এট্‌লাস, ৬ পৃঃ) ললিঙ একটি প্রাচীন দুর্গ এবং উহা ফরুখী-রাজাদের সীমান্ত দুর্গ ছিল; খান্দেশ জিলার অন্তর্গত, ধুলিয়া হইতে ৩ তিন ক্রোশ। (ই. গে. ৪।২৮৯) জমোদ আকোলা জিলার অন্তর্গত। (৭।১০২) হোসেঙ্গাবাদের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে এক 'পলি' আছে। (লেটসের এট্‌লাস ৬ পৃঃ)।

(৫) আকবরের আমলে ইহার মহল ৩২টি ও রাজস্ব ১,১০,৮২,০৫৫দা১৫ গণ্ডা ছিল। আ (২।২২৪)

শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত ও শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন ?

বামুন দেখেই নোয়া'ব মাথা—কেন বলতে পার ?
শূদ্র হ'লেই ছোট কেন খেদাও লাথি মার ?
ধনী হ'লেই কেন সবাই উঁচুতে তুলে ধর ?
ধন নাই যার তা'কেই কেন বল 'সর সর' ?
বড়'র সঙ্গে মিশ্‌লেই তুমি কেন গরম হও ?
(যদিও তুমি আমারি মত,—বড় কিন্তু নও ।)

স্বপ্ন দেখে চম্‌কাও কেন, আঁধারে ভয় পাও ?
আশা কেন মেটে না তোমার পেলেও কেন চাও ?
দেখ্‌ছ মানুষ মর্‌ছে কেমন যাচ্ছে সবই চলে
বাতাসে যার লাগ্‌ত গায়ে তা'কেও দিচ্ছে জ্বেলে !
লক্ষপতি কেমন অমন ন্যাংটা হ'য়ে যায় !
(তবু) মরণ-কালেও বাটোয়ারায় মাথা ঘামায়, হায় !

বরের বাপ হলেই কেন কর্‌তে হবে জোর ?
ক'নের বাবাই কেন অমন নম্র যেমন চোর ?
পয়সা হ'লেই খেতাব নিতে ছোটে কেন ভাই ?
পাশ কর্‌লেই চাকরী ভিন্ন আর কি উপায় নাই ?
বিলেত গেলেই জাতি যাবে, কেন এমন হয় ?
মানুষ মানুষের জাতি মারে, মানুষই আবার দেয় ?

মানুষ চেয়ে টাকার আদর কেন করে এত
গুণের চেয়ে-রূপের এরা বড়াই করে কত !
কুঁড়ের চেয়ে দালান-কোঠা কেন বলে বড় ?
মনের চেয়ে গায়ের জোরের আদর কেন কর ?
সত্যির চেয়ে মিথ্যের আদর, ভদ্র পোষাকেই
এমন বাজি দেখায় যে জন,' "কেন" ও জানে সেই ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

প্রতিফল *

বিদেশী গল্প।

প্রতি বুধবারে কুল্‌টিজে একটি ছোট বাজার বসিত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে কৃষকেরা গ্রীষ্মকালে স্বহস্তপ্রস্তুত রুক্ষ সূত্রবস্ত্রে ও শীতকালে মেষলোমজাত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া আসিত। কেহ গরু, কেহ ঘোড়া, কেহ শূকরশাবক তাড়াইয়া, কেহ গৃহপালিত পক্ষী, ডিম্ব ও ফলমূল মস্তকে করিয়া কুল্‌টিজের বাজারে অন্নের সংস্থান করিতে আসিত।

বাজারের ধারে একটি ছোট নদী। নদীর সেতুর একপার্শ্বে এক বৃদ্ধ অন্ধ প্রতি বাজারের দিনে বসিয়া থাকিত। বৃদ্ধের হৃদয়ে যখন প্রথম যৌবন বসন্ত-প্রভাতের তরুণ তপনের ন্যায় উঁকি মারিতেছিল, তখন নিয়তির তীব্রদৃষ্টি গাঢ় কৃষ্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় তাহার পশ্চাতে অপেক্ষা করিতেছিল। জীবনের মধুমাসে কোথায় তাহার হৃদয় অনাবিল আনন্দের অবারিত উৎস হইয়া উঠিবে—না তাহার পরিবর্ত্তে উহা একটা বালুকাপূর্ণ মরুভূমি। বৃদ্ধ প্রৌঢ়াবস্থার প্রাক্কালে এক রেলওয়ে-দুর্ঘটনাতে পা দুইখানি হারাইয়াছিল, তাহার উপর সে আবার সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন। অদৃষ্টের কি তীব্র কটাক্ষ! নিয়তির কি কঠোর দণ্ড!

পুত্র জনিলগুরেক্, পুত্রবধূ মেরিয়া, পৌত্র বোজেনা ছাড়া বৃদ্ধের এ সংসারে আপনার বলিতে কেহ ছিল না। বোজেনা অতি আদরের; সে একটি সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ, তাহার হৃদয়খানি যেন শরতের নির্ম্মল আকাশ, তাহার কথাগুলি দূরাগত বীণার ঝঙ্কার, তাহার মুখখানি পূর্ণিমার চাঁদ। সে পিতামাতার প্রাণ, অন্ধ পিতামহের নয়নমণি। মেরিয়া যখন বোজেনার হাসিমাখা মুখখানি চুম্বন করিত, তখন মনে হইত বোজেনার চেয়ে সুন্দর, বোজেনার চেয়ে মধুর জগতে আর কিছু নাই। জননী পুত্রের উপর হৃদয়ের সমগ্র স্নেহ গচ্ছিত রাখিয়াছিল।

প্রতি বুধবারে বাজারের দিনে মেরিয়া অন্ধ শ্বশুরের ক্ষুদ্র ও ভগ্ন গাড়ীখানি ঠেলিয়া সেতুর উপরে রাখিয়া আসে এবং বৃদ্ধ সেখানে কাতর-ক্রন্দনে

* জর্ম্মাণ লেখিকা ব্যারোনেস্ পেরিয়ার অনুকরণে।

পথিকদের হৃদয়ে নিজের সীমাহীন ও উপায়হীন দৈন্যের একখানি উজ্জ্বল ছবি আঁকিবার চেষ্টা করে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেরিয়া আবার শ্বশুরকে গৃহে ফিরাইয়া আনে। বৃদ্ধ ভিক্ষালব্ধ তাম্রখণ্ডগুলি অতিশয় আনন্দের সহিত পুত্রের হাতে তুলিয়া দেয়, কিন্তু নিষ্ঠুর মূর্খ কৃষক-সন্তানদের উপহাস ও ব্যঙ্গ সে নিজের প্রাণের অতি গুপ্তস্থানে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখে। কোন কোন দিন হয়ত হতভাগ্যকে রিক্তহস্তে শুষ্কমুখে হৃদয়ভরা দুঃখ লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত। এইরূপে বৃদ্ধের দিন কাটিতেছিল।

বৃদ্ধ মেরিয়ার চক্ষুঃশূল; কারণ সে কর্ম্মচ্যুত ও উপার্জ্জনে অক্ষম। মেরিয়া ভাবিত—অন্ধ তাহাদের একটা অনাবশ্যক ভার, তাহাদের পরিবারের অশান্তি, স্বামীর বিপদ, সংসারের অমঙ্গল। তাহারা যেন আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, জীবনসর্ব্বস্ব বোজেনার মুখের গ্রাস সঙ্কুচিত করিয়া বৃদ্ধের রুটির ব্যবস্থা করিতেছে।

মধ্যে মধ্যে মেরিয়া স্বামীর নিকট শ্বশুরের বিরুদ্ধে দুই একটি কথা উত্থাপন করিত। কিন্তু স্বামীর মুখে পিতৃভক্তির উজ্জ্বল আভা এবং স্বামীর নয়নযুগলের তীব্র কটাক্ষ দেখিয়া নীরব হইয়া থাকিত। নিভৃতে বসিয়া মেরিয়া ভাবিত, ভগবান কেন তুমি আমাদের অশান্তিটুকু দূর কর না! আহা আজ যদি বৃদ্ধের জীবনপ্রদীপ নিভিয়া যায়, তবে পরদিন আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীর নিরবচ্ছিন্ন হর্ষের মধুর কোলাহলে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে! আমাদের অশান্তিময় জীবনে সুখস্রোত প্রবাহিত হইবে!

একদিন শীতকালের প্রভাতে জনিলগুরেক্ বিংশক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বাহির হইয়া গেল। স্ত্রীর নিকট বলিয়া গেল,— "আজ আমি কিছুতেই গৃহে ফিরিতে পারিব না।"

আজ বাজারের দিন। বৃদ্ধ সকাল হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত সেতুর উপর চেঁচাইতেছিল; মেরিয়া শ্বশুরের গাড়ী ঠেলিয়া গৃহে আনিল। বৃদ্ধ মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া চুল্লীর পার্শ্বে বিশ্রাম করিতে লাগিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে বৃদ্ধ ডাকিল, "মেরিয়া, মা, তুমি শীঘ্র আমায় পুলের উপরে রাখিয়া আসিবে চল, বোধ হয় আর বেশী বেলা নাই, আমি আজ অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছি।"

মেরিয়া কর্কশকণ্ঠে উত্তর দিল, "না না বেলা ঢের আছে, আপনি আর একটু ঘুমান না।" মা'র কথা শুনিয়া বোজেনা কিল, "মা বেলাও ত আর বেশী নাই, ঐ দেখ সূর্য্য কেমন লাল হইয়া গাছের পাশে ডুবু-ডুবু হইতেছে।"

মেরিয়া। "একটু পরে গেলেই বা ক্ষতি কি, তাঁহাকে আর একটু ঘুমাইতে দাও।"

মেরিয়া যখন শ্বশুরের গাড়ী ঠেলিয়া চলিল, তখন সূর্য্যকিরণ লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহার সে প্রচণ্ড প্রতাপ আর নাই, তপনের দোর্দ্দণ্ড করের তীব্র পীড়নে তুষারের উন্মুক্ত বক্ষ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কঠোর শাসনের পর বিশ্ব-সম্রাট্ সূর্য্যের কিরণ-রাশি যেন কারুণ্যমণ্ডিত ও বাৎসল্যপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মেরিয়া বৃদ্ধকে সেতুর উপরে রাখিয়া বাড়ী ফিরিল।

বৃদ্ধ যতক্ষণ দৃষ্টির মধ্যে ছিল, ততক্ষণ মেরিয়া বার বার শ্বশুরের দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিল।

অন্ধ স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে নিজ জীর্ণ টুপিটি হাতে করিয়া ভিক্ষা মাগিতে লাগিল। সান্ধ্য তপনের ক্ষীণ আলোক-রেখা বৃদ্ধের কুঞ্চিত কপোলে বিদায়ের শেষ চুম্বন দিয়া গেল।

ক্ষণকালমধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার হিম বায়ু যেন একটা বিরাট রাক্ষসের ন্যায় মুখ-ব্যাদান করিয়া আসিল।

ক্রমেই শীত বাড়িতে লাগিল, বৃদ্ধের অঙ্গুলি কুঞ্চিত হইতে লাগিল, বৃদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "মেরিয়া!" কিন্তু নির্জ্জন পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার ব্যর্থ আর্ত্তনাদ কে শুনিবে?

তীব্র হিমের যাতনায় বৃদ্ধের হস্ত, পদ, অবশেষে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আবার ডাকিতে লাগিল, "মেরিয়া! মেরিয়া"! তখন সে পথে একটি মাত্র লোকও ছিল না। অন্ধ ভাবিল, আজ এত শীত কেন, বোধ হয় আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। বৃদ্ধ আবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, কিন্তু তাহার সে কাতর কণ্ঠস্বর পল্লীর নীরবতায় ডুবিয়া প্রাণ হারাইল। আরও উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "কে আছ, আমার মেরিয়াকে ডাকিয়া দাও।" বৃদ্ধের কণ্ঠ আরও উচ্চ, আরও

কম্পন। ভয়ে অন্ধের বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল ; কিন্তু হতভাগ্যের করুণ, হৃদয়-বিদারক রোদন-ধ্বনি কাহারও কর্ণগোচর হইল না।

পাঁচ বৎসরের বোজেনা ঠাকুরদাদার কোলে বসিয়া প্রতিদিন কত রকম গল্প শুনিত! সেতুর উপর হইতে ফিরিয়া আসিয়া মেরিয়া যখন বোজেনাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য শয্যায় লইয়া গেল, তখন সে ঠাকুরদাদার অভাব প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছিল এবং বারম্বার মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "মা, ঠাকুরদাদা কোথায় গিয়াছেন?"

মা বলিল, "টোমারেনেস্কির বাড়ী গিয়াছেন, আমি এখনই গিয়া তাঁহাকে আনিব।"

বোজেনা ঠাকুরদাদার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

মেরিয়া আজ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত গৃহকার্য্য করিতেছে। কখনও গৃহ পরিষ্কার করিতেছে, কখনও বাসন ধুইতেছে, কখনও বা কাপড় সাজাইতেছে; কিন্তু এসকল কার্য্যে তাহার আদৌ লক্ষ্য নাই। রাত্রির ভোজন শেষ করিয়া মেরিয়া ঘুমাইতে গেল; কিন্তু তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। শয্যাত্যাগ করিয়া আবার গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। গৃহের পুরাতন টেবিলটি ঝাড়িয়া পরিষ্কৃত করিল। জানালার কপাট খুলিতেই বাহিরের দুরন্ত হিমবায়ুর অবাধপ্রবাহ মেরিয়ার হৃদয়ে হতভাগ্য বৃদ্ধের বিপদের গভীরত্ব জানাইয়া দিল।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মেরিয়া আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল; গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—কিন্তু আর কোনও কাজ খুঁজিয়া পাইল না। তখন সন্ধ্যাকাশে নক্ষত্রোদয়ের ন্যায় দুশ্চিন্তাবলী তাহার হৃদয়ে একে একে আবির্ভূত হইতে লাগিল। কা'র করুণস্বর শুনা যাইতেছে না? যুবতী ভাবিল, না ও পাখীর শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে,—এরূপ শব্দ প্রায়ই রাত্রিতে শুনিতে পাওয়া যায়। সে চুল্লীর ভস্মগুলি বাহিরে ফেলিয়া আসিল; তাহার পর মেরিয়া নিদ্রার আশায় শয্যায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল, কিছুতেই নিদ্রা আসে না, সে আবার উঠিয়া পড়িল, তাহার হস্তদ্বয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার নেত্রদ্বয়ে যেন একটা ভাবী বিষাদের গাঢ় ছায়া পড়িল, সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল, মেরিয়ার ভীতি-পাণ্ডুর ওষ্ঠ হইতে বাহির হইল, "হায়! আমি কি করিয়াছি!" হৃদয়ের

শান্তি মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণ হইয়া গেল; কারণ দুশ্চিন্তার সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া মেরিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মেরিয়া যতই নিজ অপকর্ম্মের কথা চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার হৃদয় ভয়ে ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। সে কি এখন গিয়া বৃদ্ধকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবে? হয়ত বৃদ্ধ এখনও বাঁচিয়া আছে,—না অসম্ভব। সে প্রায় ৫টার সময় হইতে পুলের উপর রহিয়াছে, এখন প্রায় রাত্রি দ্বি-প্রহর। এতক্ষণে হয়ত বৃদ্ধের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে! হয়ত বা এখনও মরে নাই! হয়ত তুষারে মণ্ডিত হইয়া যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! উঃ! কি ভয়ানক শীত! ধীরে ভীতিপূর্ণ নয়নে যুবতী চুল্লীর পার্শ্বে বৃদ্ধের বসিবার স্থানের দিকে চাহিল, কিন্তু ও কি! যেন একটি বৃদ্ধ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। যুবতীর হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

তাহার স্বামীই বা কি বলিবে? যদি সে স্বামীকে এই বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করে যে, সে বৃদ্ধকে আনিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি তাহার স্বামী বিশ্বাস করিবে? কখনই না। একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন মেরিয়ার বক্ষঃ ভেদ করিয়া বাহির হইল। এখন সে একটি বিশ্বাসযোগ্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। যদি গিয়া বৃদ্ধকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে সে বলিতে পারিবে যে, প্রভাতে তৃণ-শয্যার উপরে সে বৃদ্ধের মৃত দেহ দেখিয়াছে। তাহাতে স্বামীর সংশয়ের আর কি কোন কারণ থাকিতে পারে?

গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া যুবতী বহির্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। উঃ এ যে ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস! আকাশে একটিমাত্র নক্ষত্র নাই, গাঢ় অন্ধকারে দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া যায়! ভীতি-চঞ্চল হস্তে যুবতী দ্বার রুদ্ধ করিল। এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে, নির্জ্জন পথ বাহিয়া একটি মৃতদেহ বহিয়া আনিতে হইবে! কি ভয়ানক কথা! স্বামীর সন্দেহ অপনোদনের প্রকৃষ্ট উপায় হইলেও ইহা যুবতীর সাধ্যাতীত, তাহার সাহসের বহির্ভূত। পার্শ্ববর্ত্তী ভজনমন্দিরে ঠং করিয়া একটা বাজিল। মেরিয়া ভাবিল, এতক্ষণে বৃদ্ধের সব চেষ্টার অবসান!

মেরিয়া ভাবিত, বৃদ্ধকে সূর্য্যাস্তের পর গৃহে ফিরাইয়া আনিতে বিস্মৃত হওয়া কত সহজ, কিন্তু এই বিস্মৃতির একটি অতি ক্ষুদ্র স্পর্শে তাহার স্বামীর স্কন্ধ হইতে

একটা গুরুভার স্খলিত হইবে। মেরিয়া আজ তাই করিয়াছে, কিন্তু সে আজ নরহন্ত্রী!

যে মেরিয়া প্রতি রবিবারে নিয়মিতরূপে ভজনালয়ে যাইত, যে মেরিয়া আপনার খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া গোশালায় প্রদান করিত, যে মেরিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ও উদার-হৃদয় ব্যক্তির কন্যা, সেই মেরিয়া আজ নিজ পরিবারের সামান্য সুখের জন্য বৃদ্ধ, খঞ্জ ও অন্ধ শ্বশুরের প্রাণহরণ করিয়াছে! ক্রমেই রাত্রি বাড়িতে লাগিল। মেরিয়া ভাবিল, এ কাল রাত্রি কি আর ফুরাইবে না? যদিও যুবতী নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে একটা অজ্ঞাত ও কল্পনাতীত আপদের গুরু আঘাতের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছিল, তথাপি দিবালোকের জন্য মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আরও দুইবার ঘড়ির আওয়াজ শুনিয়া মেরিয়া শয়ন করিল, পরক্ষণেই শান্তিদায়িনী নিদ্রা তাহার সকল দুশ্চিন্তা মুছাইয়া দিল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে মেরিয়া দেখিল, জনিল তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। জনিল হস্তদ্বারা মেরিয়ার গাত্র পীড়ন করিয়া চঞ্চল ও উৎকণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে ডাকিল, "মেরিয়া, ওঠ। বোজেনা কোথায়?"

মেরিয়া তখন শয্যার উপরে বসিয়া চকিতনেত্রে হতাশভাবে নিজের চারি পার্শ্বে চাহিল। তাহার মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তখন সে শিশু পুত্রের ক্ষুদ্র শয্যাটির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, স্বামীর দিকে কাতরভাবে চাহিল। মেরিয়া ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি ত জানি না"।

জনিল। "তুমি কপাট খুলিয়া রাখিয়াছিলে, বোজেনা হয়ত বাহির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাবাকেও ত দেখিতেছি না।" যুবতী সাহস-লাভের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

মেরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আমি কাল প্রায় ৮টার সময় তাঁহাকে পুলের উপরে রাখিয়া আসিয়া বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, ঘুমাইবার পূর্ব্বে বোজেনাকে কিছু রুটি খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। তার পর আর ঘুম ভাঙ্গে নাই।"

জনিল খাটের কাষ্ঠদণ্ড ধরিয়া নিম্নমুখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল।

জনিল। ইহার অর্থ, তাহা হইলে সমস্ত রাত্রি তিনি বাহিরে আছেন? তার পর?

মেরিয়া। নিশ্চয়ই তাঁহাকে কেহ নিজের বাড়ী লইয়া গিয়া থাকিবে।

জনিল। কিন্তু বোজেনা কোথায়?

জনিল আবার একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত গৃহের বাহির হইল এবং মেরিয়াও কুল্‌টিজের সেতুর দিকে স্বামীর অনুসরণ করিল।

তাহারা দেখিল, সেতুর উপর নিরূপিত স্থানে বৃদ্ধ বসিয়া আছে, কিন্তু তাহার কাতর ও উচ্চকণ্ঠ এখন নীরব! সে ভিক্ষার আশায় এখন আর তাহার জীর্ণ টুপিটি প্রসারিত করিতেছে না! সর্ব্বাঙ্গ তুষারপাতে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, আর তাহার কঠিন, অচঞ্চল বাহুযুগলের মধ্যে বসিয়া আছে,—তাহাদের জীবন-সর্ব্বস্ব, নীরব ও প্রাণহীন বোঁজেনা! বালকের কমনীয় কেশগুচ্ছ বৃদ্ধের মৃত্যু-মলিন বক্ষের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

মেরিয়া আকুল ও কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "বোজেনা! বোজেনা!"

সব শেষ! সব নীরব! হায়! তাহারই দোষে তাহারই প্রাণের প্রাণ হৃদয়ে তপ্ত লৌহ-শলাকা দিয়া গেল!

জনিল জানু পাতিয়া বৃদ্ধের বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বোজেনার নাসিকায় হাত দিয়া দেখিল, কিন্তু হায়! সবই বৃথা!

জনিল মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিল, হৃদয়ের সমূহ বাসনা কেন্দ্রীভূত করিয়া বালকের শুষ্ক ও মলিন অধরে একবার চুম্বন করিল। তখনও ঠাকুরদাদার সঙ্গলাভের শেষ আনন্দ-চিহ্ন তাহার মুখমণ্ডল হইতে অপসারিত হয় নাই।

জনিল একবার মেরিয়ার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি কি করুণ! কি গভীর! কি হৃদয়-বিদারক!

জনিল মৃতপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে হতভাগ্য পিতার গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে গৃহে ফিরিল এবং মেরিয়ার কাতর রোদন-ধ্বনিতে পথ শব্দিত হইয়া উঠিল।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

প্রাবৃটের উৎসব।

আজিকে শ্রাবণ গগনের তলে একি ওগো মাতামাতি!
নিখিলের সনে সকল জীবন নাচে প্রেমে হাতাহাতি।
আজিকে কুঞ্জ মঞ্জরীভরা,
শ্যাম রোমাঞ্চে শিহরিছে ধরা,
গিরির সরস শুভাশীষহরা, তটিনী চলেছে ছুটি';
ভূলোকে বিতরি' জীবনানন্দ আলোকে পুলকে লুটি।

কেতকী-পরাগে অন্ধ আজিকে গুঞ্জরি' ঘুরে অলি,
ফুটিতে কি বাকী রয়েছে কাননে যূথী-কামিনীর কলি?
কেলিকদম্ব পুলকে শিহরে,
কূটজ কুসুমে পূজা-ডালা ভরে'
চেয়ে আছে কিবা ভূধর সাদরে, ঢালিতে জলদ-পদে;
সারস-সারসী কল-নিকুজনে মেতেছে প্রণয়মদে।

ইন্দ্রধনুর তোরণ হইতে চলে ইন্দ্রের রথ,
মুখরিয়া উঠে গুরুগর্জ্জনে চপলা-চকিত পথ।
চটুলচাতক গর্ব্বে বেড়ায়,
কেকারবে শিখী কলাপ ছড়ায়,
অবিরল কল সলিল-ধারায় মেঘমল্লার গান;
কুসুমগন্ধে সুষমানন্দে ভরিয়া উঠেছে প্রাণ।

প্রকৃতির গৃহে আজি কোন্ পূজা, কেন এত উৎসব?
ধূপচন্দনগন্ধমোদিত পবনের কলরব।
বাজে মৃদঙ্গ-মুরজ-মুরলী,
প্রাণের গঙ্গা উঠে কলকলি',
জলভরা মাঠে ধায় ছলছলি' নাচিয়া কৃষাণ-প্রাণ;
ধীবর নাবিক তরণীর পরে সুখে তুলে সারি গান।

সকল নিখিল চঞ্চলকরা বরিষা এসেছেরে!
পুলকে মাতিয়া, অর্ঘ্য রচিয়া তাহারে বরিয়া নে!
ধ্যান ভাঙ্গি' কবি ছুটিয়া বেড়াও!
ক্ষম মানিনীরে ও নাথ, দাঁড়াও!
আঁখিজলে সবে কলহ হারাও! বরিষা এসেছে যে।
প্রেম-উৎসবে পাগল না হ'য়ে, না মেতে বাঁচিবে কে!

শ্রীকালিদাস রায়।

গুপ্ততত্ত্ব।

এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে মানবের বর্ত্তমান জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর কত রহস্য আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল রহস্যময় ব্যাপারকে অতি-প্রাকৃত বলিলে বোধ হয় আমরা ভ্রমে পতিত হইব। কারণ প্রকৃতি-দেবীর রাজ্যের বিস্তৃতি ও আইন-কানুনগুলি যতদিন না আমরা সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি, ততদিন এইরূপ গণ্ডীনির্দ্দেশসম্বন্ধে আমাদের কোন মন্তব্য চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এইসকল ব্যাপার বৈজ্ঞানিকের কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার মধ্যে ধরা দিতে চায় না এবং কখনও ধরা দিবে কি না, সে সম্বন্ধেও বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কাজেই বিজ্ঞানও এগুলিকে আমলে আনিতে প্রস্তুত নয় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবের ভ্রান্তিমাত্র বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়।

কিন্তু বিজ্ঞান জড়পদার্থ লইয়া যতই নাড়াচাড়া করুক না কেন, জীবন ও মৃত্যু নামক দুইটি নিত্য সংঘটনশীল ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যাই দিতে পারে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মেডিকেল কলেজে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, মানবদেহস্থিত অণু-(molecules) গুলির এক বিশেষ রূপগঠনই (configuration) মানবের জীবনী শক্তির কারণ, এবং কোনরূপে ইহাতে ব্যতিক্রম বা বিপর্য্যয় ঘটিলেই মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যিনি জড় ও চেতনের মধ্যে ব্যবধানের বিলোপসাধন করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে

উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ এইরূপ জড়াত্মক মত শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। ফ্রান্সে ও মার্কিণে নাকি জড়দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। তবে আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকারে প্রয়োজন কি?

বস্তুতঃ, জন্মমৃত্যুসম্বন্ধে মানুষ চিরকাল স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের উপরই একান্ত নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে সকল দেশেই অল্পবিস্তর সংখ্যায় একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শন না করিয়া কিছুই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন। নানাদেশীয় এইরূপ কতকগুলি লোকই ধর্ম্মকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য Theosophical Society নামক এক পরাবিদ্যালোচনা-সমিতির সৃষ্টি করিয়াছেন। আমেরিকায় এরূপ লোকের সংখ্যা কিছু বেশী। মৃত্যুর পর মানবাত্মা কিরূপ অবস্থায় এবং কোথায় থাকে, এই সকল বিষয়ের চাক্ষুষ জ্ঞানলাভ সম্ভবপর কি না, ইহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তথায় অনেক শিক্ষিত লোক অতি আগ্রহ-সহকারে চেষ্টিত হইলেন। নানাস্থানে আত্মিকতত্ত্বালোচনা-সমিতি (Psychic Societies) প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং খুব উদ্যমের সহিত কার্য্য আরম্ভ হইল। আলোচনার বিষয়টি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক; সুতরাং অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যে এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ষ্টেড্ সাহেবের নাম ইঁহাদের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইনি এই সকল প্রচেষ্টার মুখপত্রস্বরূপ একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রকৃত ব্যবধান নাই এইরূপ মতের প্রচার-সূচনা করিয়াই যেন পত্রিকাখানির নাম রাখিলেন Borderland, পরে যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সার অলিভার লজ্, ক্রুক্স্ প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকগণ এই আলোচনায় যোগদান করিলেন, তখন এইসকল অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-সংক্রান্ত চেষ্টার ফলে যে নানা আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, তাহা একরূপ অবধারিত। এই আশা যে অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই মনীষিগণের এই নূতন কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রেতাত্মা-সম্বন্ধে যে সকল বিশ্বাস ও ধারণা মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ইঁহারা সেই

গুলিরই এক একটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভৌতিক উপদ্রব ও প্রেতদর্শনঘটিত অনেক গল্প আবহমান কাল হইতে মানুষ শুনিয়া আসিতেছে। প্রেতাত্মার ইচ্ছামত স্থূলশরীরগ্রহণ (materialisation of spirits) সম্ভবপর কি না, এই বিষয় লইয়া অলিভার লজ্ বহুকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং কোনরূপে যাহাতে ভ্রমে পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। পরীক্ষান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এইরূপ তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপার মানুষের প্রত্যক্ষীভূত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব ; যদিও আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানে আমরা ঐগুলির কোন সন্তোষজনক কারণ-নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

ষ্টেড্ সাহেব আর একটি নূতন ব্যাপার জগৎ-সমক্ষে প্রচার করিলেন। তিনি সজ্ঞানে মিডিয়ম্ হইতেন এবং কোন প্রেতাত্মা তাঁহার দেহে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দিয়া পরলোকসংক্রান্ত তথ্য লিখাইয়া দিত। এই প্রক্রিয়ার নাম Automatic writing বা ভৌতিক লিখন ; ইহাতে লেখকের কর্তৃত্বব্যতিরেকে হস্ত আপনি সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং লেখকের যেসকল বিষয়-সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোনই ধারণা ছিল না, তাহাই লিখিত হয়। এইরূপে ষ্টেড্ সাহেবের Letters of Julia অর্থাৎ তাঁহার পরিচিতা জুলিয়া নাম্নী কোন মৃতা রমণীর প্রেতাত্মার পত্রাবলী লিখিত হইল। সেদিন কাগজে পড়িতেছিলাম যে, বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিৎ মায়াসে'র প্রেতাত্মা পরলোকের অনেক কথা এইরূপ উপায়ে সকলকে জানাইতেছেন। ষ্টেড্ সাহেবের Borderland গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার Review of Reviews পত্রিকায় প্রায়ই এই সকল বিষয় আলোচিত হয়। কিন্তু বাস্তবিকই যে এইরূপ হস্ত-সঞ্চালন ও লিখন কোন প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক সংঘটিত হয়, সেসম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি Contemporary Review নামক পত্রিকায় একজন লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন :—The theory of the business is, briefly, that the 'subconscious' or 'subliminal' part of the mind is doing it, the part perhaps which is active when we are DREAMING. It is possible that the right hemisphere of the brain (which ordinarily is not much used), may be the chief factor, but

this is no more than a guess, for the physiology of the process is not yet understood." ডাক্তার হীরালাল হালদার আবার Modern Review পত্রিকায় এই মতের বিরুদ্ধবাদ প্রচার করিতেছেন।

আমরা এই ভৌতিক লিখন অভ্যাস করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলাম। দুই প্রকার উপায়ে এইরূপ লিখন-প্রণালী আরম্ভ হইতে পারে। একটি তেপায়া টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে কয়েকজন মিলিয়া একটি ভৌতিক চক্র গঠন করিতে হয়। চক্রমধ্যস্থ যে কেহ একখণ্ড কাগজের উপর একটি পেন্সিল ধরিয়া থাকিলে, অবিলম্বে কোন এক অজ্ঞাত শক্তিদ্বারা প্রশ্নোত্তর লিখিত হইতে থাকে।* কিন্তু এতদপেক্ষা আর একটি সহজ উপায় আছে। ইহাতে একজনের অধিক লোক আবশ্যক হয় না। একটি পেন্সিল এরূপভাবে ধরিয়া থাকিতে হয়, যাহাতে তাহার অগ্রভাগ আলগাভাবে কাগজ স্পর্শ করিয়া থাকে। হাতখানি কাগজের কিঞ্চিৎ উপরে সমান্তরালভাবে রাখিয়া কোন পরিচিত মৃত ব্যক্তির বিষয় ভাবিতে হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হাতটি পেণ্ডুলমের মত একদিক হইতে আর একদিকে খুব জোরে সঞ্চালিত হইতে থাকে। অতঃপর যে কোন প্রশ্ন করা হয়, তাহার উত্তর কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্টভাবে সেই কাগজ খণ্ডটিতে লিখিত হইতে থাকে। ষ্টেড্ সাহেব এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারাই জুলিয়ার পত্রাবলী লিখিয়াছিলেন। ইহা সকলেরই সহজসাধ্য।

একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বৈজ্ঞানিক লজ্ অতিপ্রাকৃতব্যাপারসম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে দেখিলেন যে, কোন প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা জড়পদার্থের ভারবৈষম্য সম্পাদিত করিতে পারা যায়। বিজ্ঞান মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের তিলমাত্র ব্যতিক্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু যখন লজের ন্যায় একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিদ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, একই ভারী বস্তু অপেক্ষাকৃত লঘু এবং লঘু বস্তু ভারী হইতে পারে, তখন কেহ বা বিশ্বাস করিলেন, কেহ বা বলিলেন, বৈজ্ঞানিক-প্রবর নিজে নিশ্চয়ই ভূতগ্রস্ত হইয়াছেন। Borderland পত্রিকায় লজ্-লিখিত সুবিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিয়া, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া ঐ বিষয়-সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করি। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আমাদের ছিল না। একটি তেপায়া টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে আমরা চারিজন হাতে হাত দিয়া চক্র গঠন করিয়া

বসিলাম। অল্পক্ষণ পরেই একটি পায়া উত্থিত হইল। তখন কয়েকটি প্রাথমিক প্রক্রিয়া সমাধা করিয়া, আমরা সেই গৃহমধ্যস্থ একজন বলিষ্ঠ যুবককে টেবিলটি ভূমিতল হইতে ঈষদুচ্চে উত্তোলন করিতে বলিলাম। ক্ষুদ্র তেপায়া টেবিল তিনি অনায়াসে এক হস্তেই শূন্যে তুলিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। বিশ্বাস হউক আর নাই হউক, ধরিয়া লইতে হইবে যে, এই সময়ে চক্রমধ্যে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা তখন সেই চক্রমধ্যস্থ প্রেতাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম যে, টেবিলের ভার যেন বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। অতঃপর পুনরায় সেই যুবককে টেবিলটি উত্তোলন করিতে বলা হইল। পূর্ব্ব-ধারণানুযায়ী তিনি এক হাতে টেবিলটি তুলিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া দুই হস্তে অতিকষ্টে অল্পমাত্র উত্তোলন করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনঃ সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইলেন! আরও দুই একজন টেবিল তুলিতে গিয়া সমদশা প্রাপ্ত হইলেন। টেবিলের এইরূপ ভারবৃদ্ধি-দর্শনে আমরা সকলেই যারপরনাই আশ্চর্য্য হইলাম। অতঃপর পুনরায় আদেশ করিলাম যে, টেবিলটা খুব হাল্‌কা হইয়া যাউক। আমরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে, এইবার সেই যুবক এক হস্তের তিনটিমাত্র অঙ্গুলি দ্বারা টেবিল শূন্যে তুলিলেন।

এতদ্ব্যতীত প্রেতের ফটোগ্রাফ লওয়া প্রভৃতি যেসকল বিষয় প্রেততত্ত্ববিদ্-দিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, সেসকলসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয়—

There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy,

মানবের সাধ্য কি যে বিশ্বরহস্যভেদ করে?

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

দুরন্ত ।*

(১)

দিনের আলো ফুরাইয়া আসিল, দিনদেব অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িলেন। সারাদিনের পর পাখীরা আপন আপন কুলায়ে ফিরিতেছে; ক্রমে তাহাদের কাকলী অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে আম্রকানন ঝঙ্কৃত করিয়া শেষ বসন্তের দুই একটা পাপিয়া রৌদ্রতপ্ত হইয়া বড় করুণস্বরে ডাকিতেছিল।

খেলিতে খেলিতে ক্লান্ত হইয়া সারাদিনের পর চারুচন্দ্রের মনে পড়িল, আজ দুপুরে তাহার খাওয়া হয় নাই! সারা গায়ে ধূলা মাখিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশু ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিয়া ডাকিল, "মাসীমা!"

এই মাতৃহীন দুরন্ত বালকটিকে লইয়া তাহার মাসীমা বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে আর ছোট ছেলেমেয়ে না থাকায়, তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও স্নেহময়ী হইয়াও দুষ্ট চারুর দুরন্তপনার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না! তাঁহার একটি মাত্র কন্যা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত। সেইজন্যই ভগিনীর মৃত্যুর পর তাহার আট বছরের ছেলে চারুকে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী গ্রাম্য এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার পরিবারে অন্য লোক ছিল না। তিনি চারুর ব্যবহার আদৌ পছন্দ করিতেন না। ছেলে-মহলে যদিও তিনি "বাঘা মাষ্টার" ছিলেন না, তথাপি তাঁহাকে বেশ চড়া মেজাজের লোক বলিয়াই তাহাদের ধারণা ছিল। তিনি যখন তখন চারুর কথা লইয়া গৃহিনীর কাছে অতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে তাহার পিতার কাছে পাঠাইয়া দিতে চাহিতেন। গৃহিনী চুপ করিয়া অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া থাকিতেন, কিন্তু চোখের জল অযথা বিনা আহ্বানে গণ্ড ছাপাইয়া কাপড় ভিজাইত। তারাপদবাবু নির্ব্বাক ক্রন্দনের কারণ ভাল বুঝিতেন না, এবং ইহার জবাব দিবার কথা না পাইয়া আস্তে আস্তে বাহিরে বসিয়া তামাক খাইবার চেষ্টা দেখিতেন। কাজেই শেষে, এই বাক্য-শূন্যা, কলহানভিজ্ঞা স্ত্রীলোকটির চোখের জলই জয়ী হইত।

---

* সত্য ঘটনার ছায়া-অবলম্বনে লিখিত।

সন্ধ্যাকালে গৃহিনী রান্না-ঘরে ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া চিন্তিতমনে তরকারী কুটিতেছিলেন। বৈশাখী আকাশে মেঘ ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, যেন একটা কাল দৈত্য দূরের শ্যামল বৃক্ষ-রেখার ভিতর দিয়া আপনার বিকট মূর্ত্তি ক্রমেই বেশী প্রকটিত করিতেছে। আর মাঝে মাঝে তাহারই ভীষণ হাসিটির মত বিদ্যুৎ ধাঁধা দিয়া খেলিতেছে। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এখনই ঝড় আসিবে, হায় হায়! ছেলেটা কোথায়? সকালে ভাত খাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় বলিয়া গিয়াছে, "মাসীমা, দুপুরে তোমার পাতে বসে খা'ব এখন।" দুপুর গেল, বৈকাল গেল, সন্ধ্যাও যায়। তারাপদবাবু গিন্নির স্নেহাতিশয্যজনিত আশঙ্কার কথা দুই তিন বার শুনিয়া কোন জবাবই দিলেন না, শেষে চারুর উদ্দেশে দুই চারিটা গালাগালি দিয়া হরলাল দাদার 'দাবার' বৈঠকে বসিয়া গেলেন। তখন গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কাজেই চারুর পূরা মরসুম! কাঁচা আম, পাকা জাম, পাকা গাব ইত্যাদির রসাস্বাদনের জন্য একখানি ছোট ছুরি হাতে লইয়া দত্তদের বাগানে সঙ্গীদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। আজ তাহার খাওয়ার কথা একেবারে মনেই ছিল না।

মাসীমা চারুর সাড়া পাইয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া ভৎর্সনা পূর্ব্বক বলিলেন, "হাঁরে চারু, দিন দিন বড় হচ্ছিস্, আর তোর দুষ্টামি বেড়ে উঠ্‌চে! সকালে বেরিয়ে গেছিস্, বলেছিস্ কি না, "মেসো মহাশয়ের খাওয়া হ'লে তোমার পাতে খাব এখন।" আমি খেয়ে উঠে ভাত মেখে নিয়ে হাপিত্যেশে বসে রয়েছি, এই আসে, ওমা! দিনের মত দিন গেল, কোথায় বা চারু, কেবা খায় ভাত! দেখ্ দেখি সারা গায়ে ধূলো-বালি, রোদ্দে রোদে ঘুরে মুখখানি কালিপানা হ'য়ে শুকিয়ে গেছে, কাজ নেইরে বাপু, আমার ছেলে মানুষ করা! আমি আজই দিনাজপুরে তারকবাবুর কাছে চিঠি লিখিয়ে দেব এখন, যা'র ছেলে তা'র কাছে যাও।"

চারুর মুখ এতটুকু হইয়া গেল। সে বহু কষ্টে অশ্রুনিবারণ করিয়া বলিল, "না মাসীমা, আর আমি কোথাও যাব না। আমার উপর রাগ করো না মাসীমা!"

মাসিমার রাগ ছিল না; তিনি চারুর কাতর স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "না বাছা, আমি রাগ করি নাই, ভাত খা'বে এ'স। গা'টা মুছে ফেল।"

চারু স্নেহময়ীর অমৃত-স্নিগ্ধ ক্ষমা পাইয়া প্রসন্নমনে ভাত খাইতে বসিল।

(২)

পরদিন সকালে উঠিয়াই মাসীমা চারুকে বলিলেন, "আজ বড় বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি, বাড়ী থেকে কোথাও না বলে যাস্‌নি চারু।"

চারু "আচ্ছা" বলিয়া, কোণ হইতে একটা কঞ্চি টানিয়া লইয়া পরম মনোযোগের সহিত তাহাতে ছিপ তৈয়ারী করিতে বসিয়া গেল।

রান্না-বান্নার পর চারু তারাপদবাবুকে খাইতে বসিতে দেখিয়া তৈল দিয়া গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে চলিল। তারাপদবাবু বলিলেন, "আমার ভাত খাওয়া হ'তে হ'তে ফিরে আস্‌বি, বেশীক্ষণ জলে থাকিস্‌ নি চারু, দত্তদের বাড়ী ২।৩ জন জ্বরে পড়েছে।" চারু সায় দিয়া চলিয়া গেল।

পূর্ব্ববঙ্গের ক্ষুদ্র পল্লী; অধিবাসীর সংখ্যা অধিক নয়। সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং প্রত্যেক গৃহস্থেরই অল্পবিস্তর ভূসম্পত্তি আছে, উপার্জ্জনও কিছু আছে। কোথায়ও বড় একটা কোঠা বাড়ী নাই, কেবল গ্রামের বড় লোক দত্তবাবুদের বাড়ীতে তাঁহাদের অতীত ঐশ্বর্য্যের নিদর্শনস্বরূপ মান্ধাতার আমলের দালানটির ধ্বংসাবশেষ স্মৃতিচিহ্নের মত পল্লীর মাঝখানে জীর্ণ দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বড়বাবু তারিণী দত্ত দারোগা; লোক-পরম্পরায় শুনা যায়, তিনি শীঘ্রই তাঁহার চিকণ মাহিয়ানা ও মোটা উপরির সাহায্যে বাটীর জীর্ণ-সংস্কার কার্য্যে হাত দিবেন। তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রতি পল্লী, প্রতি নগর উকীল-মোক্তার-কবিরাজ-জজ-ব্যারিষ্টারে পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। কাজেই তারিণীবাবুর বড় মান। তাঁহার ছোট ভাই নরেন দত্ত তাঁহার অসাধারণ মানের কথা মনে করিয়া এণ্ট্রান্স ফেল হইয়াও হাসিতে হাসিতে মা সরস্বতীর "কমল কাননের কণ্টক"স্বরূপ বইগুলির হাত এড়াইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। নরেনবাবুর দোষের মধ্যে তিনি বদ্‌রাগী। গুণ আছে অনেক; তিনি হোমিওপ্যাথিক-মতে একটা "cina আর nox-সম্বলিত box" ক্রয় করিয়া গ্রামের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন। দুষ্ট লোকে বলে যে, সেটাও দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্তির জন্য করেন না, তাহারা দশ জায়গায় তাঁহার গুণ গাইবে বলিয়া! তাঁহার কাজের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর নভেলের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করা, আর রবিবাবুর "সোণার তরী" ভাল, কি "মানসী" ভাল, তাই লইয়া

সমধর্ম্মী যুবকদের সহিত তর্ক করিয়া পাণ্ডিত্য-জ্ঞাপন করা এবং নিশীথে নব পরিণীতা পত্নীর সহিত কাব্যপূর্ণ

"কতই না জানি জেগেছ রজনী
করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছ, আমার
মলিন মুখে"

এইরূপ সপ্রেম বিশ্রম্ভালাপ! এ হেন কর্ম্মপরায়ণ যুবক নরেন দত্ত প্রাচীরে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের প্রকাণ্ডকায় নিমগাছের গুঁড়ির উপর পা তুলিয়া একটি "ছিপে"র জন্য ময়ূরের পাখার "টোন" কাটিতেছিলেন। তাঁহাদের দালানের পিছনেই একটী ক্ষীণস্রোতা নামহীনা নদীর শাখা বহিয়া যাইতেছে। চারু স্নান করিতে যাইতেছিল, কি ভাবিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে দেখিয়া ভ্রুকুটি করিলেন। চারু ডরাইবার ছেলে নয়; সে তাহার তৈল-নিষিক্ত শ্যাম চিক্কণ শরীরটি দোলাইতে দোলাইতে আরও অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাঃ! নরেন দা, বেশ ছিপটি ত।"

তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যা, তোর জ্যাঠামি কর্‌তে হ'বে না।"

অবাধ্য চারু তথাপি তাঁহার ছিপটি একটু হাতে করিতে গিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল; সে বড় অপ্রস্তত হইয়া নীচু হইয়া তুলিতে যাইবে, এমন সময়ে ক্রুদ্ধ নরেন তাহার গালের উপর একটা চড় বসাইল। চড় চারুর কর্ণমূলে বড় ভীষণ লাগিল, সে মুখ কাল করিয়া ঘুরিয়া পড়িতেই প্রাচীরে তাহার মাথা জোরে ঠুকিয়া গেল। নরেন তাড়াতাড়ি চারুকে তুলিয়া দেখিল; তাহার মাথা কাটিয়া গিয়াছে, চোখ লাল হইয়াছে, সে অজ্ঞান! নরেন ভয় পাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া বাড়িতে ছুটিয়া গেল।

(৩)

তারাপদবাবু আহারান্তে তামাকু সেবা করিতেছিলেন, ডাক পিয়ন একখানি পত্র দিয়া গেল। গৃহিনী হাঁড়ি তুলিয়া রন্ধন-গৃহ পরিষ্কার করিতেছিলেন, তারাপদবাবু বাম হাতে হুঁকাটি লইয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "ওগো গিন্নি, তারকবাবু চিঠি লিখেছেন, কাল এখানে এসে' চারুকে নিয়ে যাবেন। সেই যে চারু নাইতে গেছে, আজও গেছে কালও গে'ছে, ফিরিবার নামটি নেই;

এমন ছেলে বাপের বয়সে দেখি নাই! নিয়ে যা'বে যা'ক; যাদের বাছা তাদের কাছে দৌরাত্ম্য করবে আমার এতটু ভাল লাগে না!"

বাহিরে নারিকেল গাছের উপর বসিয়া একটা কাক অনেকক্ষণ ধরিয়া বড় বিকটভাবে ডাকিতেছিল। জগতে গলাবাজি অনেকেই করে, কেহ বা তাহাতে একটু মিষ্ট সুর লাগাইয়া জিতিয়া যায়; মাঝে মাঝে চাতক পাখী যে "ফটিকজল" বলিয়া চেঁচাইতেছিল, তাহা তত কর্ণ-বিদারক নহে. কাকের ডাকটা এমনই মিষ্টত্ব-বর্জ্জিত ও অশিবসূচক, যে শুনিলেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মাসীমা বলিলেন, "আমিও তাহ'লে রক্ষে পাই! ওগো, অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে, আজ আর সকালে কিছু খায়নি, একবার ডেকে দাও না।"

তারাপদবাবু বাহিরে হুঁকাটি রাখিয়া খালের দিকে গেলেন।

গ্রামের বুকের উপর মাঝখানেই খালটি। বর্ষাকালে কূলে কূলে জলে ভরিয়া ছোট নদীটির মত হয়। গ্রীষ্মের সময় জোয়ার-ভাঁটা বড় একটা আসে না, স্থানে স্থানে শেওলাতে ভরিয়া যায় এবার তাহার পঙ্কোদ্ধার করাতে, বিশেষতঃ আজ পূর্ণিমা বলিয়া দ্বিপ্রহরে খালের কানায় কানায় জল ছিল। তীরে দত্ত বাবুদের আম্র-কাঁঠালের বাগান।

তারাপদবাবু ঘাটে চারুর খোঁজ পাইলেন না। ভাবিলেন, পাড়ার উপর দিয়া হয়ত বাড়ী গিয়াছে: আবার বাড়ী গেলেন, গৃহিনী ভাতের থালা লইয়া উদ্বিগ্নহৃদয়ে বসিয়া রহিয়াছেন, তারাপদবাবুকে দেখিয়া অস্থির হইয়া বলিলেন, "সেত আসে নি! এমন দুপুরে না খেয়ে কোথায় গেল! জলে দেখ, জলে দেখ!"

গৃহিনীও ঘরে চাবি দিয়া পাড়ায় খুঁজিতে চলিলেন। তারাপদবাবুর কাছে একটি বালক বলিল, তাহাকে গামছা লইয়া ঘাটে যাইতে দেখিয়াছে। তিনি আশঙ্কায় অস্থির হইয়া জলে নামিলেন। ভালরূপ সাঁতার জানিতেন না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জেলে-বাড়ীতে সংবাদ দিয়া জেলে আনাইয়া খালে জাল ফেলিলেন।

অনেক অনুসন্ধানেও মৃত বা জীবিত চারুকে পাওয়া গেল না গৃহিনী নীরবে অনাহারে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নিকটের গ্রাম খুঁজিতে লোক গেল। গৃহিনীর মনে হইতে লাগিল,—এই আসিবে, এখনই তাঁহাকে ডাকিয়া চম্‌কাইয়া দিবে। কিন্তু সে স্নেহময়ীর আশা আকাশ-কুসুম হইয়া শূন্যে মিলাইল।

পল্লীর সকলেই চারুকে খুঁজিল, কেবল সারাদিন কেহ নরেনকে দেখিল না এবং তাহার ঘরের দ্বার মুক্ত হইল না। সকলেই জানিত, তিনি ঘরে বসিয়া বই পড়েন, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজনবোধ করিল না।

নিত্যকার মতই গ্রীষ্মের অত বড় দিন চলিয়া গেল, রাত্রি আসিল। পাখী ঘরে ফিরিল, বাগানে ফুল ফুটিল, সবই হইল; কেবল চারুই ফিরিল না! চাঁদ উঠিল, চাঁদের আলো; একটি অনুসন্ধান-ভরা সকরুণ ম্লান দৃষ্টির মত, যেন চারুকে খুঁজিবার জন্যই পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। মাসীমার আশা ফুরাইল, কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুজল আর ফুরাইল না।

শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে মাসীমার চোখে একটু তন্দ্রার আবেশ আসিল। ভোরের সময় তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তারাপদবাবুকে বলিলেন, "এইমাত্র দেখ্‌তে পেলাম, আমার চারু এসে বল্‌ছে 'মাসীমা, নরেনদা আমায় মেরে তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে, পিপাসায় আমার প্রাণ গেল মাসীমা, আমায় জল দাও'।"

তারাপদবাবু প্রতিবাদ না করিয়া প্রাতঃকালে পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দত্ত বাড়ীতে গেলেন। কিন্তু প্রভাত হইবার অনেক পূর্ব্বেই চারুর দেহ ভস্মাবশেষ করিয়া নরেন গৃহে ফিরিয়াছে এবং তাহার দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শুইয়াও বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

তারাপদবাবু রোরুদ্যমানা পত্নীকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। তিনি অনুমানে কি বুঝিলেন, তাহা জানি না; কিন্তু তারকবাবু আসিতেছেন, এই ভয়ে তাঁহার বাক্‌-শক্তি লোপ হইয়াছিল। ঘরে ফিরিতেই দেখিলেন, তাঁহাদের বিলম্ব দেখিয়া তারকবাবু সঙ্গের ঝুড়ি খুলিয়া কয়েকটি আম ও লিচু মাটীতে রাখিতেছেন।

তাঁহাদের দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোরে উঠেই সপরিবারে সবাহনে কোথা গিয়াছিলে ভায়া! চারু কোথায়? সব ভাল ত?"

তারাপদবাবু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; গৃহিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন!

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

পৌরাণিক সাহিত্য।

সকল প্রাচীন সভ্য দেশেই পৌরাণিক কথা আছে। এই সকল পৌরাণিক বার্ত্তাগুলি তত্তৎ দেশের সাহিত্য, চিত্র শিল্প ও অন্যান্য সুকুমার কলার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে পরিপুষ্ট, অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ, তাহারা কল্পনার মোহন রাজ্য, সৌন্দর্য্যের হাট, ভাবের আকর, রসের প্রস্রবণ ও প্রেমের পূর্ণিমা রজনী। সুকুমার শিল্প ও সাহিত্য তাহাদেরই রসে সঞ্জীবিত এবং তাহাদেরই আলোকে উজ্জ্বল হইয়া এখনও জগতের সভ্যসমাজের জীবনরক্ষা করিতেছে।

চিরদিনই—'ভাব রূপের মাঝারে অঙ্গ পাইতে চাহে'—সৌন্দর্য্য-সাধক কল্পনাকুশল মানব আপন হৃদয়ের উদ্দাম ভাব ও বৃত্তিগুলিকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না—তাহারা কল্পনার পক্ষভরে কেবল হৃদয়নীড় হইতে ছুটিয়া উড়িতে চাহে। স্ফীতিপ্রবণ ভাবের বাস্প বক্ষের কঠোর চাপে অবয়ব-লাভ করিতে চাহে। হৃদয়ের অতৃপ্তিতে ব্যাকুল হইয়া মানুষ দুরন্ত ভাবগুলিকে ইচ্ছা-মত রূপের মাঝারে অঙ্গ দিয়া তাহাদিগকে চোখে চোখে স্থূলভাবে দেখিয়া তবে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ইহা হইতেই পুরাণের সৃষ্টি। তাই মানুষ দার্শনিক হইবার আগে কবি। তাই সকল জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সূক্ষতত্ত্বানুধাবনের আগে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আগে স্থূল নগ্ন সৌন্দর্য্যের উপভোগ, সরল বিশ্বাসের আকুলতা। দর্শনের আগে তাই পুরাণ ও কাব্য। "কত ফুল লয়ে আসে বসন্ত, আগে পড়িত না নয়নে—" তখন কেবল মানব চয়নেই ব্যস্ত ছিল —ভাবিবার অবসর ছিল না। তার পর দার্শনিক আসিয়া, কবির ও পৌরা-ণিকের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া রূপকে ভাবের মাঝারে ছাড়িয়া দিলেন। তাই পুরাণাদির আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির হইল।

পুরাণ-রাজ্য—সৌন্দর্য্যের রাজ্য। ঐ পুরাণের বিদ্যালয়েই জগতের সকল কবির শিক্ষা। কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়ার, মিলটন, শেলি, কীট্‌স্, দান্তে, গেটে ইত্যাদি সকল শ্রেষ্ঠ কবিই পৌরাণিক সাহিত্য হইতেই আপন আপন শক্তিসঞ্চয় করিয়াছেন। সাহিত্যের সকল ফল-পুষ্পই ঐ উর্ব্বর রাজ্যের সরসতা হইতে উদ্ভূত।

ঐ সোমরসের উৎসে অঞ্জলি ভরিয়া রসপান করিয়া সকল কবিই মাতিয়া গিয়াছেন। পুরাণের চন্দ্র-তারকাময় নভোমণ্ডলের তলে কল্পনা-বিহঙ্গ, সৌন্দর্য্যের পিপাসু চকোরবৃন্দ চিরানন্দে সুধাপান করিয়া বেড়ায়—তাহারা চিরতৃপ্ত, তাই তাহারা আমাদের কঠোর ভূতলে অবতরণ করে না।

জগতের সকল দেশের পৌরাণিক-বার্ত্তার মধ্যে গ্রীস, রোম ও ভারতের পুরাণ অধিকতর ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত, লোকশিক্ষা ও সমাজরক্ষার জন্য ইহাদের অবতারণা। ইহা শুধু অলিম্পাস বা পার্ণাসাসের মত উৎসরাশি বুকে ধরিয়া, কুসুম ফুটাইয়া শোভার সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া নাই—ইহা হিমালয়ের ন্যায় বিরাট বিশাল মূর্ত্তিতে ভারতকে রক্ষা করিতেছে ও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় পূতসলিল নদ-নদীর মঙ্গল-পীযূষধারা প্রেরণ করিয়া ভারতকে পবিত্র, চিরশ্যাম, ফলশস্যপূর্ণ "স্বর্গভূমি" করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় পুরাণেও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অভাব নাই। কিন্তু ইহাতে দধীচি, হরিশ্চন্দ্র, শিবি, সতী, সাবিত্রী, নারদ ইত্যাদির স্থান উচ্চে এবং তাঁহাদেরই আধিপত্য সগৌরবে আদর্শলোকে বিরাজ করিতেছে।

রোম ও গ্রীসীয় পুরাণে মোহ ও সৌন্দর্য্যের কথাই অধিক। কবিত্ব হিসাবে ইহার মূল্য অনেক, ইহা সৌন্দর্য্যবুদ্ধিকে মার্জ্জিত করে, শিল্প-পটুতার পরিপুষ্টি করে, কল্পনাকে অবাধ প্রবাহ দান করে, কিন্তু ইহা সমাজ ও সংসারের জীবনশক্তিকে বলদান করিতে পারে নাই। লোকশিক্ষা বা আদর্শ-সৃষ্টিবিষয়ে ইহা তত সাহায্য করে নাই। ইহা ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং সেই হিসাবেই সমাজ-সংসারের যা উপকার।

যাহাই হউক—এই সকল গ্রীসীয় ও রোমদেশীয় পুরাণ-কথার মধ্যেও অনেক চিরন্তন সত্য নিহিত আছে এবং তাহার জন্য ইহা সর্ব্বদেশে সকলকালেই আদর পাইবে। ইহাদের একটা সার্ব্বজনীন মূল্য আছে।

এইগুলিতে দেশ-বিদেশের জীবনচরিত্র প্রতিবিম্বিত হয় এবং ইহাতে দেশের প্রাচীন রীতি, প্রথা ও আদর্শের আভাস পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী সাহিত্য ও শিল্প বুঝিতে হইলে গ্রীস ও রোমের পুরাণের সম্যক জ্ঞান না থাকিলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইংরাজী সাহিত্যের রন্ধ্রে

রন্ধ্রে গ্রীস-রোমের পুরাণ-সাহিত্যরস প্রবেশ করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, কাজেই ইহার সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে সাহিত্যরস হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

ভাষান্তরিত হইলেও উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় না। গল্পাংশের যে সজীবতা ও নবীনতা—তাহা কিছুই নষ্ট হয় না। উহা অক্ষয় আনন্দভাণ্ডার, উহাতে সকলেরই সমান অধিকার এবং সকল দেশের সাহিত্যকে নবীন সৌন্দর্য্যের আদর্শ দান করিয়া ইহা যে গৌরবান্বিত করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীকালিদাস রায়।

অনুতাপ। *

শাপভ্রষ্টা পরী স্বর্গদ্বারের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, কিরূপে স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রবেশলাভে সমর্থ হওয়া যায়! তাহার অস্ফুট বিলাপোক্তি দ্বার-রক্ষকের কর্ণগোচর হইলে, সে ঐ পরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'তুমি যদি এমন কোন সামগ্রী আনিয়া ভগবান্‌কে উপহার দিতে পার, যাহা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বলীলাভূমি স্বর্গে পুনঃপ্রবেশের অনুমতি পাইতে পার।' ইহা শুনিয়া পরী হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে ঈশ্বরাভিপ্সীত বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। পৃথিবীর নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে সে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষ তখন গজ্‌নী মামুদের আক্রমণে বিধ্বস্ত; দলে দলে ক্ষত্রিয় বীর সমরক্ষেত্রে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াও শত্রুর গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। সেই স্বর্গবাসিনী এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে; পার্শ্বে প্রবাহিতা স্রোতস্বিনীর বারিরাশি ক্ষত্রিয়রক্তে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নিঃশেষিতপ্রায় হিন্দুসৈন্যগণকে অনুপ্রাণিত করিয়া এক বীর ক্ষত্রিয়-যুবক বিপুল মুসলমান-বাহিনীর সহিত যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। মৃত্যু অবধারিত; কিন্তু পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। মামুদ এই তরুণ যোদ্ধার অনন্যসাধারণ বীরত্বে পুলকিত হইয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—'যুবক, আমি

* মুরের 'Paradise and the Peri'-অবলম্বনে।

তোমার শৌর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি ; জননী-ক্রোড়ে ফিরিয়া যাও, কেহ তোমার কেশস্পর্শ করিবে না।' ক্রোধে যুবকের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বাহির করিয়া বলিল, 'রে দস্যু, জননী জন্মভূমির ক্রোড়ে শেষ শয়ন করিতেই ক্ষত্রিয় অসি গ্রহণ করে, শত্রুর কৃপায় প্রাণধারণ করিবার জন্য নহে।' এই বলিয়াই সে তূণ হইতে শেষ শরটি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে ধনুতে যোজনা করিল ; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহা নিক্ষিপ্ত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই বীরযুবক অরাতির তীক্ষ্ণশরে ভূপতিত হইল।

পরী আকাশ হইতে নির্নিমেষলোচনে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। বীর ধরাশায়ী হইলে, সে তাহার একবিন্দু রক্ত লইয়া স্বর্গদ্বাররক্ষীর নিকট উপস্থিত হইল। রক্ষী কিন্তু দ্বার না খুলিয়া বলিল, 'সর্ব্বত্যাগী স্বদেশপ্রেম ভগবানের অতি প্রিয় বটে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নহে।' পরী ফিরিল। এবার নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে আফ্রিকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সমগ্র আফ্রিকাদেশ তখন ভীষণ মহামারীতে উৎসন্নপ্রায়। আবিসিনিয়া দেশের একটি জন-বিরল গ্রামে দীন পর্ণকুটীরে রোগক্লিষ্ট একটি যুবক আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছে, আর তাহার বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীর জন্য দুই এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। পরী এই দৃশ্যে ব্যথিত হইতেছিল, এমন সময়ে এক রূপবতী যুবতী আসিয়া সেই রোগীকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া শোকাশ্রু-ধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অচিরে রমণীর শরীরে সেই প্রাণঘাতী ব্যাধির লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইল এবং অল্পক্ষণ পরেই অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক কাতর দীর্ঘশ্বাসের সহিত প্রেমিক-প্রেমিকা একই সঙ্গে চিরানন্দধামে গমন করিল। অকৃত্রিম প্রণয়ের নিদর্শন এই দীর্ঘশ্বাসটি গ্রহণ করিয়া পরী স্বর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবারেও স্বর্গদ্বার মুক্ত হইল না। রক্ষী বলিল, 'স্বার্থলেশশূন্য অকৃত্রিম প্রেম পরমেশ্বরের অতি প্রিয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাই তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নহে।' প্রত্যাখ্যাতা পরী হতাশভাবে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সে ব্যাবিলোনিয়াতে আসিয়া অভীপ্সিত বস্তুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। পথিপার্শ্বে এক ঘোর পাপাচারী উদাসীনভাবে বসিয়া আছে। পাপের দুরপনেয় কালিমা ও চিন্তার

গভীর রেখা তাহার মুখমণ্ডল বিকট ও বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের মৃদু কিরণ তাহার কর্কশ অবয়বে এক অপূর্ব্ব প্রশান্ত ও কোমল ভাবের সৃষ্টি করিতেছে। তপনদেব যখন পশ্চিমদিগ্‌বলয়-নিম্নে নামিয়া গেলেন, তখন সেই মহাপাপীর হৃদয় কি এক অজ্ঞাত বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িল! জীবনে আর কখনও সে এরূপ হৃদয়-পীড়া অনুভব করে নাই। ঠিক সেই সময়ে একটি শিশু এক প্রজাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে যেন এক স্বর্গীয় আনন্দ-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আনন্দ ও নির্ম্মলতার প্রতিমূর্ত্তি সেই শিশুকে দেখিয়া পাপীর স্বীয় পাপহীন বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। অনুতাপবিদ্ধ পাতকীর নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!

পরী সেই অনুতাপাশ্রু-বিন্দুটি লইয়া স্বর্গদ্বারে আসিল। তাহার আসিবার পূর্ব্বেই এবার তাহা উন্মুক্ত ছিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়াই দ্বাররক্ষী আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিল, 'এইবার তুমি ঈশ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আনিয়াছ।'

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

হিন্দুত্ব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দু কে? হিন্দুধর্ম্ম কি?—নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। তাঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম্মের এমন কোন সংজ্ঞা নাই—কোন বিশেষ লক্ষণ নাই, যদ্দ্বারা এই ধর্ম্মকে কোন ধর্ম্মের ক্যাটালগে একটা নম্বর দিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে। মুসলমান বলিলে আরবদেশীয় ধর্ম্মবক্তা মহম্মদের শিষ্য বুঝায়, খ্রীষ্টান বলিলে ইহুদি দেশীয় ধর্ম্মাচার্য্য যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য বুঝায়, কিন্তু হিন্দু বলিলে এমন কিছু বুঝায় না।

তাঁহারা আরও বলেন যে, হিন্দুদিগের কোন ক্রীড্ (Creed) নাই কোন

ধর্ম্মবিশ্বাসজ্ঞাপক বাণী নাই। আমার বিবেচনায় এই মত ভ্রান্ত। এই প্রবন্ধে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য দশবিধ সংস্কার আছে। তাহার মধ্যে শ্রাদ্ধ প্রধানতম সংস্কার। পিতৃপুরুষদিগের—যাহাদিগের কর্ম্মে বা করুণায় এই সংসারে কোন হিন্দু মানব প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখান প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বৎসরে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক হিন্দুকে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ আছে। বস্তুতঃ পারিবারিক মঙ্গলের জন্য কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলেই হিন্দু গৃহস্থকে পিতৃপুরুষদিগের স্মরণ করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধের অঙ্গীয়ভাবে পিতৃগাথা পাঠ করিতে হয়। তাহার এক অংশ এই—

মন্বত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যো শনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ণ বৃহস্পতিঃ॥
পরাশর ব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্টাশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ॥

বুঝা যাইতেছে—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ণ, বৃহস্পতি, শাতাতপ, বশিষ্ট, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, গৌতম—এই মহর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক। ইঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। ইঁহাদিগের প্রণীত সংহিতাদি গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, ধর্ম্ম বৈদমূল। বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু ইহারা বেদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যেরূপ ভাবে বেদের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বেদের অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা হিন্দুর গ্রাহ্য নহে। ঋষিদিগের প্রণীত গ্রন্থ দেখিয়া জানা যায় যে, হিন্দুধর্ম্মের ক্রমে বিকাশ হইয়াছে। সময়ে সময়ে সংস্কার হইয়াছে। সেই সমস্তই হিন্দুর গ্রাহ্য। এস্থলে বলা আবশ্যক, হিন্দু শব্দটি বৈদেশিক। ঋষিগণ আর্য্যসমাজ, আর্য্যধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; হিন্দু শব্দ ব্যবহার করেন নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, ঋষিগণ আর্য্যধর্ম্মের কি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, মহর্ষিগণ আর্য্যধর্ম্মের লক্ষণ দুইদিক হইতে নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। প্রথম ভৌগোলিক লক্ষণ, দ্বিতীয় নৈতিক লক্ষণ। আমি নৈতিক লক্ষণগুলির কথা বলিব, তৎপর ভৌগোলিক লক্ষণের কথা বলিব। মনুসংহিতায় ধর্ম্মের দশবিধ লক্ষণ দেওয়া আছে ; যথা—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতে নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশ লক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥
ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

কিন্তু মনু সত্যযুগের ধর্ম্মব্যবস্থাপক। বর্ত্তমান যুগে এই দশলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম Ideal বা আদর্শমাত্র হইবে। কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন বাইবেল নামক ধর্ম্মগ্রন্থে Ten Commandments দ্বারা ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট সেই দশাজ্ঞা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যানুযারী ধর্ম্মপালন করা অতি অল্পসংখ্যক মানবেরই সম্ভব হইতে পারে এবং তজ্জন্য তাহা Ideal বা আদর্শরূপেই অধিকাংশ মানবের পক্ষে থাকিতে পারে, কার্য্যতঃ নহে। মনুর এই দশলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম সেইরূপ আদর্শই থাকিবে। পরাশর সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে—

কৃতেতু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃস্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥

দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক শঙ্খ ঋষি ধর্ম্মের চারিটি মাত্র লক্ষণ দিয়াছেন—

ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং সর্ব্বেষামবিশেষতঃ॥

এবং কলিযুগের ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক পরাশর মুনি ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ একটি মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন—

চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারোধর্ম্মপালকঃ।
আচারভ্রষ্ট দেহানাং ভবেদ্ধর্ম্মঃ পরাঙ্মুখঃ॥

এমন কি আপধর্ম্ম ব্যাখ্যানে পরাশর বলিয়াছেন—

দেশভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যাধিষু ব্যসনেষ্বপি।
রক্ষেদেব স্বদেহাদি পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥
যেন কেন চ ধর্ম্মেন মৃদুনা দারুণে ন চ।
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানাং সমর্থধর্ম্মমাচরেৎ॥

আপৎ কালেতু সম্প্রাপ্তে শৌচাচারং ন চিন্তয়েৎ।
স্বয়ং সমুদ্ধরেৎ পশ্চাৎ স্বস্থো ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥

ইহাও কথিত আছে যে, সমুদ্রযাত্রা, দেবর-নিয়োগ, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রভৃতির বেদে নিষেধ না থাকিলেও কলিকালে সাধুসম্মত নহে এবং সাধুদিগের সিদ্ধান্ত বেদবৎ প্রবল বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সংহিতাকারগণও বলিয়াছেন যে, দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া পরিষৎ যে ব্যবস্থা বলিবেন, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম-সঙ্গত বলিয়া জানিবে; ব্রাহ্মণসমিতি বা পরিষদের আদেশে সমস্ত পাতকই বিনষ্ট হয়।

এক্ষণে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইতেছে যে, বর্ত্তমান যুগে একমাত্র আচার প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের বা হিন্দুর নৈতিক লক্ষণ। এই আচার কি? তাহা ভৌগলিক লক্ষণ ব্যাখানে বলা যাইবে। খ্রীষ্টের মহামূল্য বাণী আছে,—Do unto others as you would that they should do unto you. খ্রীষ্ট এই মহতী নীতিকে ধর্ম্মের মূল সূত্র ধরিয়াছেন। ভারতীয় ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' 'মাতৃবৎ পরদারেষু'
'লোষ্ট্রবৎ পরদ্রব্যেষু' 'যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'॥

এই "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" মহাবাক্যটি ধর্ম্মের একটি মূলসূত্র ও আদর্শ।

ঋষিগণ এই ভারতখণ্ডে মানবপ্রবাহসম্বন্ধে এক মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই সিদ্ধান্তটি কেবল এই ভারতবর্ষের জন্য। অন্য কোন ভূমিখণ্ডে এই সিদ্ধান্ত তাঁহারা প্রয়োগ করা প্রয়োজনবোধ করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের ধর্ম্মসিদ্ধান্তগুলি তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক চৌহদ্দির ভিতর ফেলিয়াছেন; এই চৌহদ্দির বাহিরে তাঁহাদিগের সংস্থাপিত বিধি প্রযোজ্য নহে। তাঁহারা এই চৌহদ্দির অন্তর্গত ভূমিকে আর্য্যভূমি, কর্ম্মভূমি, আর্য্যাবর্ত্ত, যজ্ঞীয় দেশ, ধর্ম্ম্য দেশ প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন। অনেকেই জানেন যে, ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থানু-যায়ী প্রাণীদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য শারীরিক গঠন প্রভৃতি নিয়মিত হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি জন্তু, বট অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছ কোন কোন দেশে স্বভাবতঃই পরিপুষ্ট হয়; কোন কোন দেশে তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। দেশভেদে মানবপ্রকৃতিরও বিভিন্নতা দেখা যায়।

গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকার নিগ্রো জাতির আর নাতিশীতোষ্ণ ইউরোপের জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতির দেহগঠনে ও প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। ঋষিগণ যে সমস্ত ধর্ম্মব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সকল ধর্ম্মের ব্যবস্থা ভূমণ্ডলের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশের উপর লক্ষ্য করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ণনাদ্বারা সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সেই সমস্ত বর্ণনা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে এই ধারণা জন্মে যে, আর্য্যধর্ম্ম ক্রমবিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম্ম জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষের অন্যতম বর্ষ ভারতখণ্ডের সীমা অতিক্রম করে নাই।

বস্তুতঃ ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে অন্যান্য বর্ষের বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত এবং ইহা বোধ হয় যে, অন্যান্য বর্ষের অধিবাসীদিগের প্রকৃতি বা আচার-ব্যবহার তাঁহারা সম্যক জ্ঞাত ছিলেন না এবং ইহাও বোধ হয় যে, অপরিচিত অচেনা ব্যক্তি-সম্বন্ধে কোন দোষোল্লেখ করা বিজ্ঞজনের উচিত নহে এবং যাহাকে চিনি না তাহাকে ভাল বলাই উচিত—এই নীতি অবলম্বন করিয়া ঋষিগণ অন্যান্য বর্ষের মানবদিগকে ধার্ম্মিক, সুখী, দীর্ঘায়ু, দেবোপম প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের লক্ষ্য ভূমিখণ্ডকে কর্ম্মভূমি বলিয়াছেন; যেহেতু প্রত্যেক কর্ম্মের যেরূপ ফল তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেবল সেই ভূমিখণ্ডেই সেইরূপ ফল দেখা যায়। এই ভূমিখণ্ডের বর্ণনায় কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন যে, গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই আর্য্যাবর্ত্ত, ধর্ম্মক্ষেত্র বা যজ্ঞীয় ভূমি। আবার অনেক ঋষি বলিয়াছেন যে, যে সকল স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাহাই আর্য্যভূমি বা যজ্ঞীয় দেশ এবং এই আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসীদিগের আচারই ধর্ম্ম। অনেক মহর্ষি বলিয়াছেন যে, হিমালয় এবং বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই আর্য্যাবর্ত্ত। তারপর আমরা এই শ্লোকটি দেখিতে পাই—

গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

এই শ্লোক হইতে এই উপপত্তি করা যাইতে পারে যে, উল্লিখিত নদী-প্লাবিত দেশসমূহ পবিত্রভূমি বা আর্য্যভূমি। মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত হইল

যে, এই ভারতভূমি আর্য্যভূমি। ঋষিগণ অপরাপর ভূমির জন্য কোন ধর্ম্মব্যবস্থা প্রণয়ন করেন নাই। হিন্দুধর্ম্ম খাঁটি স্বদেশী জিনিষ। মুশা, ঈশা, মহম্মদ, সোলন, সক্রেটিস্, আরিষ্টটল প্রভৃতি বিদেশীয় মনীষি ও মহাত্মাগণ ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসূত্র প্রকাশ করিয়া মানবকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা ভারতীয় পরিষদ্ বা ব্রাহ্মণসমিতি বা মহর্ষিসঙ্ঘ বা কোন একজন মহর্ষিও গ্রহণযোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত ব্যবস্থা ভারতীয় আর্য্য-সন্তানের গ্রহণীয় হইবে না। ইহার উপর ধর্ম্মসেবার প্রধান ফল আত্মপ্রসাদ আছে। যে ব্যবস্থা নিজ আত্মার তৃপ্তিকর ও গ্রাহ্য না হইবে, তাহাতে মানবের কোনই উপকার নাই। আত্মপ্রসাদ ধর্ম্মের একটি প্রধান পরীক্ষা। *

শ্রীনিত্যশিবানন্দ শর্ম্মা।

বৈজ্ঞানিক ও ভক্ত।

তৃপ্তিহীন তুষ্টিহীন না পায় সন্ধান,
খুঁজে মরে বৈজ্ঞানিক না পেয়ে প্রমাণ;
মুগ্ধ ভক্ত গদ গদ প্রেমাকুলচিতে
বিশ্বময় বিশ্বরূপ দেখে সকলেতে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

---

* গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই প্রবন্ধের লেখক, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ মহাশয় বিগত আষাঢ় মাসে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি 'অর্ঘ্য'-পরিচালন-সমিতির নেতা ছিলেন। তিনি 'অর্ঘ্য'কে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়বস্তু বলিয়া ভাবিতেন। শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া 'অর্ঘ্যে'র কোন উন্নতিসাধন করিতে পারিলেন না—এ দুঃখ তাঁহার রাখিবার স্থান ছিল না। তিনি 'অর্ঘ্যে'র জন্য সম্প্রতি এই প্রবন্ধ-রচনা করিতেছিলেন; ইচ্ছা ছিল, ইহা ধারাবাহিকরূপে 'অর্ঘ্যে' বাহির হইবে। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লওয়ায় আর এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। ভৃগুপদচিহ্নধারণের মত—তাঁহার পুণ্যস্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ এই প্রবন্ধ বক্ষে ধারণ করিয়া আজ 'অর্ঘ্য' গৌরববোধ করিতেছে। অঃ সঃ

ঝরা ফুল। *

(সমালোচনা।)

চিত্রকরকে যেমন কবির কল্পকুঞ্জের অতিথি হইতে হয়, কবিকেও তেমনই চিত্রকরের চিত্রশালিকায় আসিয়া অভ্যাগত হইতেই হয়। চিত্রকরের যেমন কবি-প্রতিভাও চাই, কবিরও তেমনই চিত্রাঙ্কনী প্রতিভাও থাকা চাই।

দুইজনেরই চিত্রের উপাদান বর্ণ। প্রভেদ এই, চিত্রকর যে বর্ণ-ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার অর্থ রঙ এবং কবি যে বর্ণ-ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার অর্থ অক্ষর। চিত্রকরের চিত্র যদি ভাবগর্ভ না হয়, সে চিত্রদর্শনে দর্শকের হৃদয়ে যদি চিত্রাতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস না হয়, তাহা হইলে যেমন সে চিত্র চিত্রপদবাচ্যই নহে, কবির কাব্যও তেমনই যদি ভাবপ্রাণ না হয়, সে কাব্যপাঠে যদি পাঠকের হৃদয় কাব্যাতিরিক্ত ভাবে ও রসে উদ্বেলিত না হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে কাব্য সুললিত শব্দপিণ্ডমাত্র অথবা অন্য কিছু—কাব্য নহে।

আজিকালি আমাদের বঙ্গসাহিত্যে কবি বা কবিতার অপ্রতুলতা নাই। তরুণবয়স্ক যুবকমাত্রেই সাহিত্যসেবী হইতে ইচ্ছা করিলে বঙ্গভাষার বরাঙ্গে প্রথমে কবিতা-কুসুমের কঙ্কণ-কিঙ্কিনী পরাইতেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য'-সমাজপতি, প্রভাতকুমার, দীনেন্দ্রকুমার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় লেখকগণ প্রথম বয়সে কবিতা লিখিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা তাঁহাদের স্বকীয় সাহিত্যশক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছেন।

আজিকালি অনেকেই কবিতা লিখিতেছেন বটে, কিন্তু কবিকে যে ছবি আঁকিতে হয়, অন্তঃ ও বহির্জগতের সুকুমার চিত্রগুলির আলোকালেখ্যাবলী যে তাঁহার চিত্তপটে তুলিয়া লইতে হয় এবং আবশ্যক হইলে যে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহাকে যে জড় ও মনঃ উভয় জগতেরই সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ রাখিতে হয়, তাঁহার যে এক অতি সূক্ষ্ম পর্যাবেক্ষণপটুতা থাকা চাই, তাঁহার যে চিত্রকরের মত বর্ণের সহিত বর্ণের—অর্থাৎ রসের সহিত রসের সুনিপুণ সংযোগসাধনের যোগ্যতা আবশ্যক এবং তাঁহার যে গতানুগতিকতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিবার উপযোগী স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বকীয়তার প্রয়োজন আছে—এ সকল তত্ত্ব কবিযশঃপ্রার্থী তরুণ লেখকগণের অনেকেরই জানা নাই।

যিনি যত নিপুণ চিত্রকর, তিনি তত নিপুণ কবি। যিনি যত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জড় ও মনোজগৎকে পর্যাবেক্ষণ করিতে পারেন—সূক্ষ্ম তুলিকাপ্রয়োগে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যসমূহ দর্শকের তথা পাঠকের নেত্রপথে উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ, তিনি তত নিপুণ চিত্রকর—নিপুণ কবি।

---

* ঝরা ফুল—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৸৹। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও ৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে বঙ্গভাষায় উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে এত নিপুণতার সহিত অবশ্যই নহে, কিন্তু এমনই ভাবে চিত্রাঙ্কন-চেষ্টা কোন্ কবির আছে ? গিরিজানাথের না প্রমথনাথের, দেবকুমারের না সত্যেন্দ্র দত্তের, রসময়ের না করুণানিধানের ? যদি সত্য বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, অন্যান্য গুণে প্রাগুক্ত শক্তিশালী কবিগণ করুণানিধানের সমকক্ষ বা তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু চিত্র বর্ণবিষয়ে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত করুণানিধানের ন্যায় কৃতিত্ব-প্রদর্শনে কৃতকার্য্য হন নাই। করুণানিধানের স্বকীয়তা চিত্রাঙ্কনেই সুপরিস্ফুট—এ কবি ছবি আঁকিতেই বড় পটু। ইঁহার প্রত্যেক কবিতাটিই এক একখানি মনোরম ছবি। সে ছবিগুলি পাঠকের নিরতিশয় প্রীতিবিধান করে—সে ছবিগুলি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র নূতন না হইলেও এক অভিনবভাবে পাঠকের মানসপটে 'চিরতরে' অঙ্কিত হইয়া যায়। সে ছবিগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতে পাঠকের হৃদয়ে আরও কত সুন্দর সুন্দর ভাবের,—শিশিরভূষণা ঊষার ও গৈরিকবসনা গোধূলির রমণীয় ও কমনীয় ছবি আপনাআপনি ফুটিতে ও 'টুটিতে' থাকে। দুঃখের বিষয়, এই কবির অনুপম অঙ্গুলিস্পর্শে বস্তু-চিত্রগুলি যত পরিস্ফুটভাবে ফুটিয়া উঠে, ভাব-চিত্রগুলি তত পরিস্ফুটভাবে ফুটে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে করুণানিধান একজন প্রথম শ্রেণীর কলাবিৎ কবি হইতে পারিতেন। তবুও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, করুণানিধানের ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল এবং উদীয়মান তরুণ কবি-সমাজে বাস্তব-চিত্রাঙ্কন-বিষয়ে তিনি একক বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। নিম্নে করুণানিধানের একটি কবিতার একটি অংশ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতেই পাঠক তাঁহার অনুপম চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

"হেথা, গাছের ফাঁকে টুকরা আকাশ,
মউল শালের সবুজ ভিড়,
উঠেছে দূর মাঠের কোণে
ময়ূর-কণ্ঠ 'ত্রিকূট'-শির ;
পটে আঁকা তরুর শিরে
চূর্ণ কিরণ-পিচ্‌কিরী,
কানন-হাওয়া মিঠে আওয়াজ
লাখ' পাখীর গিট্‌কিরী।
সামনে জরির ফিতায় বোনা—
জলের কণা ফেনিয়ে ধায়,
তটিনীটির নর্ম্ম-নটন
ঊর্ম্মি-নূপুর তটের গায়।

করুণানিধানের আর কি কোনও বিশেষত্ব নাই ? আছে। তিনি প্রকৃতির অবিকল চিত্রকর। তাই তাঁহাকে দীনবন্ধুর ন্যায় 'আদুরীর' চিত্র 'আদুরীর' ভাষাতেই ফুটাইতে হয়।

'আতুরীর' ভাষার সংস্কার-সাধন তাঁহার মতে অস্বাভাবিক ও অনাবশ্যক। তবে তাঁহার 'ঝরা ফুলে' কলাবিদের অঙ্গুলির কনক-স্পর্শ যে নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। সত্যাত্মক হইলেও তিনি স্বপ্নাত্মকের সুকুমার তুলিকার সুখস্পর্শটুকু দিতে ছাড়েন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, কবি লিখিয়াছেন—

"বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে,
মোতির 'সাত-নরী';
কদম-কেশর শিউরে উঠে
পড়্‌বে ঝরি' ঝরি'।"

* * * *

"অঙ্গ মাজি' দুখের সরে,
ঘাটটি হতে ঘটটি ভরে',
সইএর সথে গৃহিনী মোর
আসুবে ফিরে ঘরে।"

এখানে কবি সত্যাত্মক হইলেও স্বপ্নাত্মকের মত ললিত-তুলিকা-সঞ্চালন করিয়াছেন।

আর কোন্ গুণে করুণানিধান আমাদের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতেছেন? বর্ত্তমান কালের বহু কবিরই ভাব ও ভাষা প্রহেলিপীড়িত, যেন কুহেলি-কলিত,—ভাষায় ভাবের যথাযথ প্রতিধ্বনি উঠে না; তাঁহাদের ভাষা তাঁহাদের মনোগত ভাবের প্রকৃষ্ট পরিবাহিকা নহে। প্রাঞ্জলতাই যে ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ, এই জ্ঞান অধুনাতন কালের অনেক লেখকেরই নাই। তাঁহাদের ভাষা যেন ভাবগোপন করিতেই সমধিক সমুৎসুকা। সুখের বিষয়, করুণাবাবুকে আমরা এ দোষ দিতে পারি না। তাঁহার ভাব সরল, ভাষা স্বচ্ছ। তাঁহার সুনির্ব্বাচিত, সুকুমার ও সুললিত শব্দসমূহ তাঁহার মর্ম্মকথাগুলি পাঠকেরও মর্ম্মস্থলে সুচারুরূপে পঁহুছিয়া দিতে পারে; পাঠকের মর্ম্ম-বীণার যে তন্ত্রীটিতে যখন ঝঙ্কার দিবার প্রয়োজন হয়, দিতে পারে। তবে করুণাবাবুর ভাষা যেমন স্বচ্ছ, তেমনই যদি শুদ্ধ হইত, তাহা হইলে মণি-কাঞ্চনের সংযোগ হইত। বর্ত্তমান কালের কবিগণ ভাষার শুদ্ধি-সম্পাদনে কি অবহিত হইবেন না?

যে কবি আপনার ভাবে আপনি বিভোর ও বিহ্বল হইতে পারেন না, তাঁহার কাব্য-পাঠ করিয়া পাঠক তাঁহার ক্লিষ্টতাই অনুভব করিয়া থাকেন, সুতরাং তৎপাঠে পাঠকের বিস্ময় বা বিভ্রম কিছুই জন্মে না। করুণাবাবু তাঁহার কাব্যমধ্যে তাঁহার হৃদয়ের সমুদয় সহানুভূতিটুকু কেমন করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ঢালিয়া দিতে হয়, তাহা জানেন। তাই তাঁহার কাব্যপাঠে পাঠকেরও হৃদয়ে মাদকতা ও উন্মাদনা সঞ্জাত হয়। যে গীতশ্রবণে শ্রোতা, যে চিত্রদর্শনে দর্শক এবং যে কাব্যপাঠে পাঠক মোহাবিষ্ট হন না, সে গীত, সে চিত্র ও সে কাব্য অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। করুণানিধানের এই কাব্য-পাঠে পাঠকের বিলক্ষণ বিহ্বলতা জন্মে। অতএব এই কাব্যখানি যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের মতে কবির বর্ত্তমান কাব্যখানি তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্য দুইটি অপেক্ষা নানাগুণে ভাল হইয়াছে; কারণ কবির প্রতিভা এক্ষণে পরিপক্কতা-লাভ করিয়াছে। ভক্তির যে শ্রেণীর কবিতা-রচনায় কবি সিদ্ধহস্ত, আলোচ্য কাব্যখানিতে সেই শ্রেণীর কবিতারই প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইতেছে। চিত্র-শ্রেণীর কবিতা-রচনায় কবি সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন। 'ঝরা ফুল' এই শ্রেণীর কবিতায় পূর্ণ।

বলা বাহুল্য, এই কাব্যখানি উদীয়মান কবির রচনা হইলেও বাঙ্গলা ভাষার সম্পৎস্বরূপ হইয়া রহিল। আশা করি, এইবার করুণাবাবু একখানি ভাবচিত্রময় কবিতাপুস্তকরচনা করিয়া ভাবচিত্র-রচনায়ও যে তাঁহার হাত আছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবেন।

মাতৃত্ব ও নাস্তিকতা।

"He saw the face of a little child and looked on God."
—Michæl Fairless.

"মার মত কা'র স্নেহ আর এ' ধরায়,—
আর কা'র সান্ত্বনায় জীবন জুড়ায়?
কোথা হ'তে বহে মা'র স্নেহ-সুধা-ধারা?
অন্ধ তুমি তাই ওর উৎস-পথ-হারা!"
ভূতি।

ভগবদ্বিষয়িনী ভাবনার পর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়করী ভাবনা—মাতৃবিষয়িনী ভাবনা। জননী জগজ্জনকের অস্তিত্বের অনুকূলে এক মহতী যুক্তি—এক এক মূর্ত্তিমতী যুক্তি। মাতৃত্ব এক বিস্ময়করী ক্রিয়া। যে স্নেহে মানব-জননী মানবের নিমিত্ত সহস্রবার ব্যাকুলিতা, রুধিরবিপ্লুতা ও প্রীতি-পুলকিতা হইয়া থাকেন, সে স্নেহের উৎপত্তি-রহস্য মানব কোন দিনই উদ্ভিন্ন করিতে পারে নাই। যে অচ্ছেদ্য স্নেহ-বন্ধনে মাতা ও সন্তান সম্বদ্ধ, কোন্ দিন হইতে মাতৃহৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে সেই স্নেহের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা মাতাও বলিতে পারেন না। এই স্নেহের মত তেমন পবিত্র ও এমন আশ্চর্য্য বস্তু আর নাই। ইহা প্রতি গৃহেরই বিস্ময়করী ক্রিয়া; কিন্তু আত্মীয়তা ও অন্তরঙ্গতা আমাদিগকে এমনই অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, প্রতি মানব পরিবাররূপ প্রাসাদের ভিত্তিমূলাবস্থিত এই মহা-তত্ত্বটি ঈশ্বর ও মানব-জীবন-ঘটিত অন্য সমস্ত তত্ত্বের অপেক্ষা অধিকতর

বিস্ময়াবহ হইলেও সেই সমস্ত তত্ত্বালোচনায়ই আমরা আমাদের স্ব স্ব আত্মাকে উৎপীড়িত করিতে পারি, কিন্তু এই তত্ত্বটিকে বিনা বিচারেই গ্রহণ করি। মাতৃত্ব একাধারে তথ্য, রহস্য ও অলৌকিক ক্রিয়া। মাতৃত্বে আস্থাবান্ হইয়াই আমরা অস্তিত্ব-লাভ করি। আমরা আজীবন উহাতে আস্থাবান্ থাকি। যখন আমরা ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া যাই, তখনও আমাদের শেষ নিশ্বাসে ঐ আস্থাটুকু থাকিয়া যায়।

কি এক পবিত্র রহস্য—এই মাতৃত্ব!

সে অনেকদিনের কথা, যখন এই আশ্চর্য্য ক্রিয়াটি আরদ্ধ হয়—সে অনেকদিনের কথা, যখন অবনির আদি-প্রসূতি তাঁহার সদ্যোজাত পুত্রের অকৃণিম অধরোষ্ঠে, কি এক প্রীতিপুলকাবেশে তাঁহার স্নেহসিক্ত অধরোষ্ঠ মিলিত করিয়া মর্ম্মন্তুদ প্রসব-বেদনা বিস্মৃতা হইয়াছিলেন! শিশুমাত্রকেই আমরা আগন্তুক বলি, সে বাস্তবিক তাহাই বটে; কারণ জীবনের এই অনন্ত পর্য্যটনে, যে পথের আদি নাই অন্ত নাই, জগৎ সেই পথের একটি ক্ষুদ্র পান্থ-নিবাস মাত্র। যাহাকে আমরা সূচনা মনে করিয়াছি, তাহার নাম দিয়াছি—জন্ম এবং যাহাকে আমরা সমাপ্তি মনে করিয়াছি, তাহার নাম দিয়াছি—মৃত্যু; কিন্তু প্রকৃত কথা এই—আমরা অনন্ত হইতে নির্গত হইয়া কিছুকাল জীবনযাপন করি,—ভালবাসি; তাহার পর আমরা যে অনন্ত হইতে নির্গত হই, পুনরায় তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করি।

আমাদের জীবন মাত্র একটি সুপ্তি ও বিস্মৃতি; আমাদের আত্মা, আমাদের জীবনাকাশের নক্ষত্র, আমাদের সহিত উদিত হয়,—সে বহুদূর হইতে আসে এবং অপরত্র অস্তগিত হয়। আমাদের যিনি নিকেতন সেই ঈশ্বর হইতে আমরা বিলুণ্ঠমানা ময়ুখমণ্ডিতা মেঘমালার ন্যায় আসি,—একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া আসি না, একেবারে নগ্ন হইয়া আসি না। *

---

* "Our birth is but a sleep and forgetting:
The Soul that rises with us, our lifes star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar:
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home."
—WORDSWORTH.

উহার পর শিশু ক্রমে ক্রমে মানুষ চিনিতে শিখে,—ক্রমে ক্রমে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এত প্রখরা হয় যে, সে জগতের নিখিল মুখ মধ্য হইতে একখানি মুখকে বাছিয়া বাহির করিতে পারে। অতঃপর সেই মুখখানি যদি অন্তর্হিত হয়, শিশু সেই প্রথমবার দুঃখের সহিত পরিচিত হয়, প্রথমবার তাহার নেত্রে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠে এবং সেই মুখখানি পুনরুদিত হইলে প্রথমবার তাহার মধুর অধরে স্মিতহাস্যের লাস্যলীলা হয়। অতএব শিশুর শৈশব যখন একটু পরিণত হইয়া উঠে, তখন তাহার জীবনে অবশেষে এমন একটি সময় উপস্থিত হয়, যখন মাতৃ-হৃদয়ের দূরাবস্থিতি তাহার সেই ক্ষুদ্র জীবনটিকে দুঃসহ দুঃখময় করিয়া তুলে।

পরে, সেই শিশুর জীবনের যতগুলি বর্ষই সময়-সমুদ্রে বিলীন হউক না কেন, এই আশ্চর্য্য ক্রিয়াটি স্থগিত হয় না। যতই বয়স বাড়ে, ততই এই আশ্চর্য্য ক্রিয়াটির চমৎকারিত্ব ফুটিয়া উঠিতে থাকে। কাহার প্ররোচনায় সদ্যঃনিদ্রোত্থিত শিশু শয্যাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে মাতা থাকে প্রবৃত্তা, সেখানে হামাগুড়ি দিয়া যায়? কেন মায়ের কৃতী পুত্র, যে সহস্রের মন্ত্রণাদাতা, সেও সকল বিষয়ে বারম্বার মায়ের মত ও পরামর্শ লইতে ছুটিয়া আসে? কেনই বা প্রবীণ-প্রবীণা জীবনে যখন কোনও অকার্য্য করিয়া লজ্জাম্লান হয়, তখন যদি মৃত মাতার ক্ষোভমলিন মুখখানি কল্পনা করে, তাহা হইলে বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে? অম্বা যে অটুট বিশ্বাসে মনে করেন যে, তাঁহার সন্তান নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ, মানুষকে পবিত্র ও নিষ্পাপ রাখিতে তাহার তুল্য বস্তু জগতে আর কিছুই নাই।

আমরা সেই স্নেহ-সুধা পান করিয়াছি এবং সেইজন্যই প্রেমময় ঈশ্বর আমাদিগকে এই অনুগ্রহময় বিধানের অধীন করিয়াছেন যে, আমরা সর্ব্বদাই—

> "Shall feel an overseeing power
> To kindle or restrain."

কিন্তু মায়ের চিন্তা অপেক্ষা মায়ের স্মৃতিই বলবতী।

মাতৃস্মৃতিচর্চ্চায় ঐ বিস্ময়করী ক্রিয়াটি ক্রমশঃ নিবিড় হইতে থাকে। কারণ তখন আর মায়ের শরীরসাহায্যে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

জীবনের কালটি তখন বর্ত্তমান হইতে অতীতে গড়াইয়া পড়িয়াছে, প্রত্যক্ষ উপস্থিতিটি তখন স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তখন যে প্রেরণা পাও, তাহা পূর্ব্ব অপেক্ষা বলবতী; কিন্তু যে স্নেহসিক্ত অধরের চুম্বন-লাভ করিয়া তুমি জীবনে প্রথম পুলকিত হইয়াছিলে, সে অধরনিঃসৃত অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণী-সহায়তায় তাহা আর তুমি পাইতেছ না। সেই সংযমসাধিনী শক্তি সেইখানেই রহিয়াছে, কিন্তু সেই নির্ম্মল নয়নদ্বয় আর তথায় নাই। সেই উৎসাহ সেইখানেই অবিরত উদ্দীপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু যে স্নেহ-করের সম্মোহন-স্পর্শে তুমি উহার বিদ্যুৎ-স্পর্শ অনুভব করিতে, তাহা আর নাই। সকলই শমনচ্ছায়ার অন্তরালে উহ্য উপস্থিতিতে পরিণত হইয়াছে! কিন্তু এখনও উহা মাতৃত্ব—সেই একই মাতৃত্ব। সেই দৈনন্দিনী বিস্ময়করী ক্রিয়া এখনও তোমার উপর সেইরূপই প্রখর-প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এখন তাহা বরং আরও প্রহেলিকাময়ী, আরও বীর্য্যবতী হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃত্বের মৃত্যু নাই, উহা অমরলোকের অক্ষয় বস্তু, সর্ব্ব-সংহারক মাতৃত্বের সংহার-সাধনে অক্ষম। প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অপেক্ষা স্মৃতি আরও আশ্চর্য্য। মাতৃস্মৃতিসর্ব্বস্ব মনুষ্য প্রতিদিনই অলৌকিক ক্রিয়া দেখে, জীবনান্তেও তাহার সেই আলৌকিক ক্রিয়া দেখা সমাপ্ত হয় না।"

"I cannot understand: I love." আমরা সকলে মাকে ভাল বাসিয়াছি বলিয়াই, মাতৃত্ব কি তাহা না বুঝিলেও, জীবনে মাতৃত্বে আস্থাহীন হইব না।

মাতৃত্ব-সম্বন্ধে এই সমস্ত চিন্তা আমাদিগকে স্বতঃই ঈশ্বর-চিন্তার অভিমুখে লইয়া যায়।

অনেকেই ঈশ্বরান্বেষী, কিন্তু অনেকেই জীবনে তাঁহাকে পাইবে না। অনেক লোক আস্তিক হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করে। তাহারা সাংসারিক জীবনের শোক-দুঃখের দ্রব ধাতুময় তপ্ত কটাহের মধ্যে পড়িয়া ভগবদপ্রেমের অস্তিত্ব ও অমৃতরস অনুভূত করিতে পারে না এবং যে বিভু তাহাদের বিকৃত বোধের বহির্ভূত তাঁহার উপর কিছুতেই বিশ্বাস রাখিতে পারে না। ঈশ্বর-বিশ্বাস এক মহাবস্তু, কিন্তু ইহা কাহারও কাহারও পক্ষে নিরতিশয় কঠিন প্রয়াস। মনুষ্য মনুষ্যকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্টির সূচনা হইতে তর্কের উপর তর্ক, যুক্তির উপর যুক্তি স্তূপীকৃত করিয়াছে, কিন্তু সকলই বিফল হইয়াছে।

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা এই যে, বুদ্ধিই বিশ্বাসের প্রসূতি; এই ধারণায়, কূট তর্কে মাতিয়া কত লোকের বিশ্বাস করিবার বৃত্তিটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। কত লোক, চার্ব্বাক ও ইয়াঙচুর ন্যায়, দিমক্রীতস্ ও স্পিনোজার ন্যায়, অগস্ত্ কম্প্ত ও হকস্লীর ন্যায়, জন ষ্টুয়াট মিল ও স্যার লেস্লি ষ্টিফেনের ন্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস-লাভাশায় দর্শনচর্চ্চা করিয়া নেতি নেতির দারুণ দংশনে অভিভূত হইয়াছে, তাহাদের জীবন নীরস ও নিরুৎসাহ করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি ঐশ তত্ত্বের কণামাত্রেও আস্থাস্থাপন করিতে পারে নাই।

প্রকৃত কথা এই, মৃত যুক্তিতে কিছু হইবে না—আমাদের প্রাণস্পন্দনময়ী যুক্তি চাই।

মাতৃত্ব এইরূপ একটি চিণ্ময়ী যুক্তি। মা সংসারের যাহা, ঈশ্বর মানবজাতির তাহাই। প্রভেদ এই, তিনি মা অপেক্ষা অনন্ত গুণে তাহাই।

যাহা তুমি বুঝ না, তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে না—এ কথা আর বলিও না। তুমি প্রতিদিনই যাহা বুঝ না তাহাই বিশ্বাস করিতেছ। তুমি মাতৃত্বে বিশ্বাস কর, যে মুখখানি আজি মরণ তোমা হইতে বড় ব্যবহিত করিয়া দিয়াছে, সে মুখের স্মৃতিতে তুমি বিশ্বাসবান্। প্রতিদিন এই যে, একটি অলৌকিক ক্রিয়া ঘটিতেছে, যে অলৌকিক ক্রিয়াটি তোমার জীবনান্তে এক অশেষ অলৌকিক ক্রিয়ায় পরিণত হইবে, ইহাতেও তুমি বিশ্বাসবান্। তবু তুমি ইহা কি, তাহা বুঝ না।

মাতৃত্বে যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার সে বিশ্বাস ঈশ্বরত্বে পরিবর্ত্তিত করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে না। তোমার মাতৃত্বকে যদি তুমি বড় করিয়া দেখিতে পার, তাহা হইলে তুমি তোমার জীবনে ঈশ্বরত্বের অনুকূলে একটি মূর্ত্তিমতী যুক্তি পাইবে।

এইজন্যই "বিশ্বাসে লভয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর"—এই কথাটি উঠিয়াছে। এইজন্যই খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, 'তোমরা যদি ছোট শিশুর মত না হও, তাহা হইলে তোমরা ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।' যে শিশুটি আজন্ম মাতৃত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, তাহার স্থলে তাহারই মত সরলহৃদয়ে যদি তুমি আপনাকে পরিস্থাপিত করিতে পার, তাহা হইলে

ঈশ্বরত্বের মহতী চিন্তায় প্রবিষ্ট হইয়া তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করা যে দুরূহ, ইহা বোধ করিবে না।

অতএব, ঈশ্বরে বিশ্বাস করা অসম্ভব একথা বলিবার পূর্ব্বে অবিশ্বাসী মাত্রেরই তাহার মন হইতে প্রথমে মাতৃচিন্তা উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। সে দেখিবে যে, তাহা করা একেবারে অসম্ভব। কোনও মানুষই তাহার মন মাতৃচিন্তাবিরহিত করিতে পারে না। মানবীয় আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় বিশ্বাস করা যদি এতই সহজ, তবে ঐশী আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় বিশ্বাস করা এত কঠিন কেন? উহার অনুকূলে মাতৃচিন্তা যে এক মহাযুক্তি।

মানব-শিশু আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছে যে, হে মানব! যখন তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিবে না—ন্যায়ের কচ্‌কচি যখন তোমার বড়ই বিরক্তি-কর হইয়া উঠিবে, তখন তুমি নির্ম্মল স্নেহের খনি, তোমার সেই ছেলেবেলাকার সুখস্বপ্ন, স্নেহময়ী মায়ের মায়ামাখা মুখখানি মনে করিও। আমি যেমন মা ছাড়া আর কাহাকেও জানি না, আমি যেমন পথে সুন্দর পাখীর সুন্দর পালকটি কুড়াইয়া পাইলে আনন্দে মাকে দেখাইতে যাই, আবার যদি খেলিতে খেলিতে আঘাত পাই—পড়িয়া যাই, তাহা হইলেও কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কাছে ছুটিয়া যাই, তেমনই তুমিও যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে আত্মহারা হইতে পার, সম্পদে বিপদে তাঁহারই কাছে ছুটিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার বুকের দুখের আগুন নিবিবে, সেই স্নেহময়ের স্নেহকরস্পর্শে তোমার আত্মা প্রীতিপুলকিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

প্রার্থনা।

নমঃ দেব নমঃ!

এ কি দিব্য জ্যোতি-রাশি এ হৃদয়ে মম
জাগাইয়া দিলে প্রভু, অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
তোমার পবিত্ররূপে অনন্ত মহান্
ভরিয়া উঠিছে মম, হৃদয়-কমল
প্রেমরবিহেমকরে—করে ঢল ঢল।
দয়াময় তব দয়া লভি ধরা' পরে,
কি সুখ-সৌভাগ্যে তৃপ্ত হয়েছে অন্তর।
সংসারের ক্ষুদ্র আশা অসার বাসনা,
আর এ হৃদয়-মন ব্যথিত করে না।
আশা পূর্ণ করিয়াছ নিজে ধরা দিয়া,
তৃষিত তাপিত মম জুড়ায়েছ হিয়া।
প্রভু পিতা সখা তুমি সর্ব্বস্ব আমার,
লভেছি সকল সুখ তোমারি মাঝার।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

মৃত্যুভয়।

স্নেহময়ী মা যেমন ক্ষুধার্ত্ত সন্তানে টানি ল'ন
শুষ্ক স্তন হ'তে,
কাঁদে শিশু ভয়ে, কিন্তু শান্ত পুনঃ পেয়ে অন্য স্তন
পূর্ণ নবামৃতে,—
তেমনি মানুষ ভাবে—শ্রেয়ঃ শুষ্ক জীবন এমন
ডরি' মৃত্যু নামে,
জানে না, আছে যে সেথা আরো স্নিগ্ধ নবীন জীবন—
সে মৃত্যুর ধামে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিক্রমোর্ব্বশী ও ঋগ্বেদীয় সুক্ত।

সাহিত্যসেবিগণের নিকট "বিক্রমোর্ব্বশীর" পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষিত লোকের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি বিক্রমোর্ব্বশীর নাম না শুনিয়াছেন, যিনি ইহাকে কালিদাসের রচনা বলিয়া না জানেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণানুসারে আমরা ইহাকে ত্রোটক বলিয়া থাকি। মালবিকাগ্নিমিত্রের মত এই ত্রোটকখানিও যে কালিদাসের নবোদ্যমের ফল,—ইহা যে তাঁহার নবীন বয়সের রচনা তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। কবির যৌবন-সুলভ কেমন-এক তরলতা, কেমন-এক উদ্দামতা এবং কেমন-এক উদ্‌ভ্রান্ত ভাব ত্রোটকখানির প্রতি অঙ্গে মাখান রহিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন ত্রোটকখানি পড়িতে পড়িতে আমরা এক অভিনব সৌন্দর্য্য হৃদয়ে অনুভব করি, যখন এক অভূতপূর্ব্ব রসের আস্বাদন করি—যে রস কেবল কালিদাসেরই কাব্যে সম্ভবে,—যখন আমরা প্রেমের নন্দনকাননমধ্যে অলৌকিক কল্পনা-মলয়-হিল্লোলের প্রাণস্পর্শিনী ক্রীড়া—সতৃষ্ণভাবে, প্রমুগ্ধহৃদয়ে পরীক্ষণ করি, তখন মনে হয়, কালিদাসের যে লেখনী রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলে পরিপুষ্টি ও পক্কতা লাভ করিয়াছিল, বিক্রমোর্ব্বশীও সেই লেখনীরই আদিম অবস্থার ফল। বিক্রমোর্ব্বশী কালিদাসের রচিত কাব্যগুলির মধ্যে এইরূপ অপেক্ষাকৃত অধস্তন স্থান অধিকার করিলেও ইহা যে অন্য কবির রচিত কাব্য অপেক্ষা সমধিক উচ্চস্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত, তাহা কে না বলিবে?

বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাসের সমালোচক মাত্রেই বিক্রমোর্ব্বশী-সম্বন্ধে তাঁহাদের অমূল্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য আমি গতানুগতিকের মত তাঁহাদের অবলম্বিত মার্গ অনুসরণ করিয়া কালিদাসের লিখনরীতির গুণাগুণ বা নাটকোক্ত ব্যক্তিগণের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিতে যাইতেছি না। তবে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়টি এই যে, বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের বীজ আর্য্যগণের আদিম গ্রন্থ ঋগ্বেদে নিহিত এবং কালিদাস কর্ত্তৃক তথা হইতে সংগৃহীত। কালিদাস কিরূপে এই শুষ্ক, নীরস বীজটিকে স্বকীয় কল্পনাপ্রভাবে—পত্রপল্লবময়ী, ফলভারাবনতা, স্নেহপ্রেমাত্মিকা লতারূপে পরিণত করিলেন, তাহাই এ প্রবন্ধে দেখাইব।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তটিই আলোচ্য প্রণয়-কাহিনীর অঙ্কুর। পুরূরবা অপুত্রক ছিলেন, তাই তাঁহার পরম মিত্র স্বর্গাধিপতি বাসব স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশীকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন, পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন হওয়াই বাসবের বাসনা ছিল। ঐরূপ পুত্রের জন্ম হইলেই উর্ব্বশী পুনরায় স্বর্গে ফিরিয়া আসিবেন, এই সর্ত্তে উভয়ের মিলন হইল। ইচ্ছানুরূপ ফললাভের পর উর্ব্বশী পৃথিবী ছাড়িয়া,—রাজার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম দূরে নিক্ষেপ করিয়া, নির্ম্মমহৃদয়ার ন্যায় স্বর্গের দিকে সমধিক ঔৎসুক্যের সহিত প্রধাবিতা হইয়াছেন, রাজা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কত অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, তাঁহার সকল আকিঞ্চন বৃথা হইল,—এ ঘটনাই পূর্ব্বোক্ত সূক্তটির প্রতিপাদ্য। এই কঠোর, প্রাণস্পর্শী, বিদায়দৃশ্যটি ভিন্ন উক্ত সূক্তে আর কিছুই দেখিতে পাই না। যখন আমরা ক্ষণেকের জন্য চিন্তা করি যে, কালিদাস একজন সিদ্ধহস্ত ঐন্দ্রজালিকের মত কিরূপে এই অতি ক্ষুদ্র উপকরণটি লইয়া তাহা হইতে এমন এক বিশাল সুরম্য বিলাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন,—যখন দেখি যে, এই স্বল্পমাত্র বিপ্রলম্ভের সূচনাটুকু অবলম্বন করিয়া এমন পরিপাটীরূপে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বরাগ এবং সম্ভোগের পূর্ণ পরিপোষ সাধন করিলেন, তখন আমরা মন ও প্রাণের সহিত তাঁহার অলৌকিক কল্পনার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আবার তৎকালে পুরাণাদি অধ্যয়নের ফলে ভারতীয়গণের স্বর্গের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মিয়াছিল এবং তদভিগমনের জন্য তাঁহাদের বলবতী স্পৃহা ও চেষ্টা প্রাচীন সাহিত্যের মানবজীবনের প্রধানতম বৃত্তিরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট স্বর্গ দুঃখলেশশূন্য নিরবচ্ছিন্ন সুখের আস্পদরূপে প্রতীয়মান। কল্পনারাজ্যের একচ্ছত্রাধিপতি কবি কালিদাস অমিত সাহস দ্বারা এই আবহমান সংস্কারকে একেবারে উল্টাইয়া দিলেন এবং মর্ত্তবাসীর স্বর্গের প্রতি আকর্ষণের পরিবর্ত্তে স্বর্গবাসীর মর্ত্তের প্রতি অনুরাগ প্রকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের সহিত স্বকীয় কাব্যের প্রধান প্রতিপাদ্য করিয়া তুলিলেন। তাঁহার কাব্যে উর্ব্বশী স্বর্বেশ্যা হইয়াও, দেবরাজের পরম প্রেমপাত্রী হইয়াও স্বর্গের প্রতি বীতরাগিণী; পৃথিবীর কি এক সৌন্দর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তিনি পার্থিব নৃপতি পুরূরবার প্রেমে আত্মহারা হইয়াছেন। তাই আজ স্বর্গের অতুল ঐশ্বর্য্যানুরূপ সুসজ্জিত দেবসভায় লক্ষ্মী-

স্বয়ংবর নাটকের অভিনয়ে উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে পুরুরবা-প্রেমবিমূঢ়া হইয়া পুরুষোত্তম বলিবার সময়ে 'হে পুরুরব' বলিয়া উঠিলেন। এবার আর নিস্তার নাই, শাপ দ্বারা তিনি মর্ত্ত্যধামে নিপতিতা হইলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অণুমাত্র ক্ষোভ হইল না, তাঁহার যেন শাপে বর হইল, তিনি যাহা চান তাহাই পাইলেন। ইহাতে আর তাঁহার দুঃখ কি? বরং আমরা শেষ অঙ্কে মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে এই ভয়ে তাঁহাকে আকুলভাবে কাঁদিতে দেখিয়াছি। কালিদাস ভিন্ন অন্য কোন্ কবি এইরূপে "নয় কে হয়" করিতে পারেন, এমন সুন্দরভাবে, অবলীলাক্রমে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের নিকট স্বর্গের চিরন্তন সৌন্দর্য্যের পরাভব-সাধন করিতে সাহসী হইতে পারেন?

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলেন যে, সূক্তোক্ত পুরুরবা এবং উর্ব্বশী যথাক্রমে সূর্য্য ও ঊষার অনুকল্প এবং সূর্য্যের উদয়ে ঊষার অবসানই এই সূক্তে সূচিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু সূক্তটির বিদায়কালীন দম্পতীর আলাপরূপ ভাসমান অর্থ ত্যাগ করিয়া ম্যাক্সমূলরের ঐরূপ গূঢ়ার্থ-বিশ্লেষণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে এই সূক্তেরই প্রসঙ্গে উর্ব্বশী ও পুরুরবার সুবিস্তৃত প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মনে হয়, শত সহস্র বৎসরের পর প্রাদুর্ভূত হইয়াও কালিদাস এই কাহিনী দ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং উহাকে নিজ মনোমত করিয়া গড়িয়াছিলেন। ইহাই ত্রোটকাকারে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। কালিদাস কিরূপে সূক্তোক্ত কাহিনীর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সূক্ত ও ত্রোটকে বর্ণিত উর্ব্বশী-গত পার্থক্যের পরীক্ষা করিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঋগ্বেদের উর্ব্বশী ও কালিদাসের উর্ব্বশীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, আপুত্রজন্ম পর্য্যন্ত উভয়ের একত্রবাস চলিবে এবং তাহার পরই উর্ব্বশী স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হইবে, এইরূপ নিয়ম থাকায় ঋগ্বেদের উর্ব্বশী পুত্র জন্মিবা মাত্রই রাজার প্রতি সমস্ত প্রণয় ত্যাগ করিয়া নির্ম্মম জনের মত স্বর্গের দিকে সমধিক ঔৎসুক্যের সহিত ধাবিতা হইয়াছেন, রাজার সকল সাধ্য-সাধনা বৃথা হইল। উর্ব্বশী মমতাশূন্য হইয়া বলিলেন—

"অজিজ্ঞ ইল্যা গোপীথ্যায় হি দধাথ তৎপুরুরবো মে ওজঃ।
অশাসং ত্বা বিদুষী সস্মিন্নহন্ন ম আশৃণোঃ কিমভুগ্ বদাসি॥"

অর্থাৎ হে পুরুরবা, তুমি পৃথিবী-পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করিলে

আমার গর্ভে নিজ বীর্য্য পাতিত করিলে, সর্ব্বদা আমি তোমাকে কহিয়াছি; যে কি হইলে আমি তোমার নিকট থাকিব না, কারণ আমি তাহা জানিতাম। তুমি কিন্তু তাহা শুনিলে না, এক্ষণে পৃথিবীপালনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ?" অনেকে বলেন, এরূপ কঠোর, নির্ম্মম ব্যবহার বহু-পুরুষানুরক্তা শিথিলপ্রেমবন্ধনা স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশীর উপযুক্তই বটে। আবার অনেক পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, নীরস শব্দ-শাসনাত্মক বেদে এরূপ প্রণয়চিত্রের পরিস্ফুটন সম্ভবে না। কালিদাসও শেষোক্ত মতাবলম্বিগণের একতম। তাঁহার মতে বেদ যে নীরস, প্রেমতন্ত্রে যে বেদের গতি অসঙ্গত, তাহা তাঁহার সুপরিচিত—

"বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো

নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ।"—

ইত্যাদি পরিহাসোক্তি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয়। এই বাক্যদ্বারা আরও সূচিত হইয়াছে যে, উর্ব্বশীর চরিত্র-চিত্রণ ঋগ্বেদে সম্ভবে না। তাই প্রেমের কবি কালিদাস উর্ব্বশীকে আর এক ছাঁচে গড়িলেন এবং কুলকামিনীগণের আদর্শরূপে তাঁহাকে প্রেম, কোমলতা ও মায়ার একখানি ছবি করিয়া তুলিলেন। কালিদাসের নাটকে রাজা যে পর্য্যন্ত না তাঁহার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জাত পুত্রের মুখাবলোকন করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিচ্ছেদ হইবে না, পুত্রমুখ দেখিলেই বিচ্ছেদ হইবে—এই নিয়মানুসারে রাজার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, প্রেমাধীনা উর্ব্বশী,—পুত্র জন্মিবার পর অনেক বৎসর অবধি তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন,—পাছে রাজা পুত্রের মুখ দেখিয়া ফেলেন এবং তাঁহাদের দারুণ বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অবশেষে দৈবাৎ রাজা একদিন স্বকীয় পুত্রকে দেখিয়া ফেলিলেন, উর্ব্বশীর মুখ শুকাইল, কেন না এইবার তাঁহাকে মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতে হইবে,—পুরূরবার মত হৃদয়-মন ঢালিয়া স্বর্গে আর তাঁহাকে কে ভালবাসিবে? তাই তিনি কাঁদিলেন, পুরূরবাও কাঁদিলেন এবং অবশেষে পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন,—ভাবী বিচ্ছেদের অন্ধকারে সকলেরই মুখ মলিন এবং হতশ্রী হইয়াছে, এমন সময় নারদ মূর্ত্তিমান্ হর্ষের মত মহেন্দ্রের আদেশ লইয়া উপস্থিত হইলেন। আদেশটি এই যে, উর্ব্বশী ও পুরূরবার সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকিবে এবং কখনই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ

হইবে না। প্রণয়ি-যুগল হাতে স্বর্গ পাইলেন; উর্ব্বশী আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অহো! শল্যমিব মে হৃদয়াদপনীতং"—হৃদয় হইতে যেন একটা শেল উঠিয়া গেল। এইরূপে প্রণয়ের কবির নিকট প্রণয় জয়ী হইল, স্বর্গের মনোলোভা মাধুরীও তাহার বেগ নিরোধ করিতে সমর্থ হইল না,—নির্ম্মম মরুতে কোমলতার নির্ম্মল সরিৎ প্রবাহিত হইল। কালিদাস ভিন্ন অন্য কোন্ কবি এমন সুন্দরভাবে বৈদিক আখ্যায়িকাটিকে পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী ও সমর্থ হইতেন?

কিন্তু উভয় স্থলেই,—সূক্তে এবং ত্রোটকে, পুরুরবাকে একই বলিয়া উপলব্ধি হয়। উভয়ত্রই প্রণয়োন্মত্ততায় পুরুরবার সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। উর্ব্বশীর অচিরভাবী বিরহ আশঙ্কা করিয়া যেমন ঋগ্বেদে পুরুরবা বলিতেছেন,—

"কো দংপতী সঁ মনসা বি যূয়াদধযদগ্নিঃ শ্বশুরেষু দীদয়ৎ"

অর্থাৎ পরস্পর প্রীতিযুক্ত দম্পতীর মধ্যে কি কেহ নিজেদের বিচ্ছেদ ঘটাইতে ইচ্ছা করে, তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন অদ্য অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল অর্থাৎ তোমার বিরহ আমার নিকট অগ্নির মত অসহ্য। কালিদাসের নায়কও যেন ইহার অবিকল অনুকরণ করিয়া বলিতেছেন—

"সদ্যস্তয়া সহ কৃশোদরি! বিপ্রযোগঃ,
বৃক্ষস্য বৈদ্যুত ইবাগ্নিরুপস্থিতোঽয়ম্।"

"অয়ি কৃশোদরি! সহসা তোমার বিরহ—বৃক্ষের উপর বজ্রাগ্নির মত আমার নিকট অসহ্য। আবার যেমন—

"সু দেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ
পরাবতং পরমাং গং ত বা উ।
অধঃ শয়ীত নিঋতেরূপস্থেহ
ধৈনং বৃকা রভসাস অদ্যুঃ॥"

(অর্থাৎ তোমার প্রণয়ী (আমি) অদ্য পতিত হউক, আর যেন কখনও উত্থিত না হয়, সে যেন বহু দূরবর্ত্তী প্রদেশে দূরীভূত হয়, সে যেন নিঋতের অঙ্কে শয়িত হয়, হিংস্র প্রাণিসঙ্কুল বনে বলবান্ বৃকগণ তাহাকে ভক্ষণ করুক) ইত্যাদি ঋকে রাজার বিষয়-বিরতি, ঔদাসীন্য এবং জীবনের প্রতি যেমন অনাদর প্রকাশ পাইয়াছে তেমনই বিক্রমোর্ব্বশীতেও—

"অহমপি তব সূনাবস্য বিন্যস্যরাজ্যং
বিরচিতমৃগযূথান্যাশ্রয়িষ্যে বনানি।"

এই বাক্যটি রাজার সমধিক বৈরাগ্যেরই সূচনা করিতেছে।

এইরূপ আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, কালিদাস নিশ্চয়ই নাটকখানি রচনা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদীয় সূক্তটি পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য।

আপন ও পর।

কোকিল পঞ্চমে গাহিয়া কুহুতানে,
মাতায়ে তুলে নিতি নিখিল প্রাণ।
আপন সন্তানে পালিতে জানে না সে
অপরে পালিবারে করে সে দান।
নিখিল-প্রাণ, কবি তুষে গো নিতি নিতি
বিতরি' সঙ্গীত-কবিতা-সুধা।
অন্ন জুটে নাক, দৈন্য চির, তার,
ভিন্ন পরদ্বার মিটে না ক্ষুধা।
যে জন আলো ধ'রে, অপরে সাথে ক'রে
আঁধার প্রান্তরে লয়ে যায়,
সুপথ দেখাইয়া দেয় সে কত জনে,
অন্ধকারে নিজে রহে হায়।
ক্ষুধিত পিপাসিত ভিখারী দীন শত,
তৃপ্ত, লভি' ধনি-করুণা-কণা।
ধনীর হৃদয়ের গুপ্ত গহ্বরে
দৃপ্ত তৃষা শ্বসে বিথারি' ফণা।

শ্রীকালিদাস রায়।

খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ।

মালব।

সুন্দর জলবায়ুর দেশ—মালব।

উজ্জয়িনী একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন সহর। এখানে রাজা বিক্রমজিতের রাজধানী ছিল। এই রাজার সংবৎ এখনও হিন্দুস্থানে প্রচলিত রহিয়াছে। শুনা যায়, তাঁহার সময়ে এদেশ অত্যন্ত বিশাল ছিল। শুপর্ম্মা (সিপ্রা) নদী ইহার পাদদেশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। অত্যন্ত পবিত্র তীর্থ বলিয়া ইহা পরিগণিত। কি আশ্চর্য্যের কথা, সময়ে সময়ে এখানে দুগ্ধ-স্রোত বহিতে থাকে, আর লোকে পাত্রপূর্ণ করিয়া তাহা লইয়া গিয়া ব্যবহার করে। ভগবানের প্রসাদেই এই আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়া থাকে।

প্রাচীন বিস্তৃত শহর-সমূহের মধ্যে চন্দেরী একটি। এখানে একটি প্রস্তর-দুর্গ, ৩৮৪টি বাজার, ৩৬০টি বিস্তৃত সরাই ও ১২,০০০টি মসজিদ আছে। নানাশ্রেণীর লোক এখানে বাস করে। তওয়া নদীর তীরে দুমন (১) গ্রাম। সেখানে চিরপ্রবহমান এক উৎস আছে। সেখানে এত বড় একটা মন্দির আছে যে, তাহার ভিতর হইতে ঢাক বাজাইলেও সে ঢাকের শব্দ বাহিরের কেহ শুনিতে পায় না। মণ্ডু দ্বাদশক্রোশব্যাপী এক প্রকাণ্ড শহর। ইহার দুর্গের মধ্যস্থলে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি মন্দির আছে। পূর্ব্বে কিছুকালের জন্য (১৩৮৭-১৫২৬ খ্রীঃ) এখানে রাজধানী ছিল। এখানে বড় বড় অট্টালিকা, সমাধি-মন্দির ও খিলিজী রাজগণের কবর আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রীষ্মকালে সুলতান হুশঙ্গের পুত্র সুলতান মহমুদের (২) সমাধি-মন্দিরের চূড়া হইতে জল-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, আর লোকে সে সম্বন্ধে 'বাজী' রাখে (৩)। শুনা যায়, এ প্রদেশে একটি স্পর্শমণি আছে। হিন্দুতে তাহার নাম 'পরশ'। ধার নগর ভোজরাজ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবল রাজার রাজধানী ছিল।

---

(১) কোথায় অবস্থিত, জানা যায় নাই। 'অ' মতে—'তুমন গ্রাম বেৎবা নদীর তীরে অবস্থিত।'

(২) সুলতান মহমুদের পিতা সুলতান হুশঙ্গের সমাধি-মন্দির হইবে। খুলাসৎ উক্ত পাঠ ভুল। ফেরিস্তা (৪।১১০)র এই মন্দিরের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) এ বাজী কি বৃষ্টিসম্বন্ধীয়?

সংক্ষেপতঃ, এ প্রদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এখানে শীতকালে তুলার বস্ত্র ব্যবহারের অথবা গ্রীষ্মকালে সোরা দিয়া জল ঠাণ্ডা করিবার প্রয়োজন কদাচিৎই হইয়া থাকে। বর্ষা চার মাস কাল স্থায়ী হয়। এই সময়ে একটু ঠাণ্ডা পড়ে এবং রাত্রিতে লেপ ব্যবহার করিতে হয়। এখানকার জমি অন্যান্য যায়গার তুলনায় কিছু উচ্চ এবং সর্ব্বত্রই কৃষির উপযোগী। বৎসরের দুইটি শস্যই যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। গম, পেঁপে, আক, আম, ফুটি ও আঙ্গুর খুব ভাল রকম জন্মে। কোন কোন যায়গায়, বিশেষতঃ হাসিলপুরে আঙ্গুর বৎসরে দুইবার জন্মে। পান এত যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অনেক বনেই অসংখ্য হস্তী আছে। উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর লোকই তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের আফিঙ্ খাওয়ায়। কি কৃষক, কি বেনিয়া, কি শিল্পী, কি কারু কি অন্য কোন লোক সকলেই যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে।

এ প্রদেশের প্রধান নদী হইতেছে নর্ম্মদা, সরকালী, সিন্ধু, বেতম গোড়ী ও সুপর্মা। (৪) প্রতি দুই ক্রোশ অন্তর একটি করিয়া নির্ম্মল জলবিশিষ্ট নদী দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সব নদীর তীরে willow গাছ, বহুবর্ণের সুগন্ধ ফুল, এবং বিশেষতঃ সম্বুল ফুল (hyacinth) আপনাপনিই জন্মিয়া থাকে। অনেক বনেই গাছ ও চাপড়া ভূমির (Greenswards) সংখ্যা অগণ্য।

এ প্রদেশের দৈর্ঘ্য গড় (গড়মণ্ডল)এর শেষ সীমা হইতে বাঁশওয়াড়া পর্য্যন্ত ২৪০ ক্রোশ, এবং বিহার চন্দেরী হইতে নন্দুরবর পর্য্যন্ত ২৩০ ক্রোশ। ইহার পূর্ব্বে বন্ধু (বান্দা), পশ্চিমে গুজরাট ও অজমীড়, উত্তরে নরোয়ার (৫) ও দক্ষিণে বগলানা। উজ্জয়িনী, রায়সিন, চন্দেরী, সরঙ্গপুর, বীজগড়, মণ্ডু, গগরাঁও, কোত্রী, (৬) হিন্দিয়া প্রভৃতি ইহার বারটি সরকার ও ৩০৯টি মহল আছে। ইহার রাজস্ব ৩৬ কোটি, ৯০ লক্ষ, ৭০ হাজার দাম (৭) (৯২,২৫,৪২৫৲ টাকা)।

---

(৪) আ (২।১৯৫) মতে—নর্ম্মদা, সিপ্রা, কালিসিন্ধু, বেতোয়া ও কোড়ী নদী। জ্যারেট বলেন, কোড়ী ও লোনী একই নদী। বেতম—বেতোয়া, সুপর্মা—সিপ্রা, গোড়ী—নর্ম্মদার একতম শাখা। মালবে সিন্ধু নামযুক্ত তিনটি নদী আছে যথা- সিন্ধু, কালিসিন্ধু ও ছোট সিন্ধু।

(৫) গোয়ালীয়র রাজ্যান্তর্গত একটি শহর। (৬) কোত্রী নহে—কোত্রী পরয়া (Kotri Parayah) আ (২।১৯৭)। (৭) অন্য তিনটি সরকার এই—কনৌজ, মন্দেসর ও নদরবার। আকবরের সময়ে ইহার ১২টি সরকার, ৩০১টি পরগণা ও ৬০,১৭,০৭৬৲ টাকা রাজস্ব ছিল। আ (২।১৯৭)।

অজমীড়।

সাধুতার আলয় অজমীড়-প্রদেশ।

অজমীড় একটি প্রাচীন শহর। ইহার নিকটে এক পর্ব্বতে রাজা বিঠলের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিট্‌লী দুর্গ (৮) অবস্থিত। শহরের নিকটে অনসাগর (৯) নামে এক অতি গভীর হ্রদ আছে। তাহা তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া আছে। কুম্ভীর প্রভৃতি অনেক জলজন্তু সেখানে দেখা যায়। তাহার তীরে এক রাজপ্রাসাদ বিরাজ করিতেছে।

শহরের ভিতরে পর্ব্বত-পার্শ্বে ঝালরা (১০) হ্রদের নিকটে প্রভাবিত খোজা মৈন-উদ্দীন চিস্তীর সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইনি গিয়াস-উদ্দীন চিস্তীর পুত্র এবং চিস্তী সৈয়দদিগের অন্যতম। ৫৩৭ হিজরীতে (১১৪২) খৃঃ সিজিস্তান জিলার সিজ গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার পনের বৎসর বয়সের সময় ইহার পিতা পরলোক গমন করেন। ইব্রাহিম কহন-দাজী নামে জনৈক ভগবদ্ভক্ত ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলে ইহার মনে ভগবদ্ভক্তি জাগরিত হয় এবং লোকে ইহাকে গুরুরূপে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। উশপুরের অধীন রাজ্যহরণে ইনি খোজা উস্‌মন চিস্তীর সঙ্গ-লাভ করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হন। বিশ বর্ষ বয়সে ইনি শেখ আবদুল কাদীর গিলানী (মিরণ মহী-উদ্দীন)এর আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। ৫৮৮ হিঃ (১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে) সুলতান শাহবউদ্দীন ঘোরী হিন্দুস্থান জয় করিয়া দিল্লীতে আগমন করেন। পরে তিনি বিশ্রামাভিলাষে অজমীড়ে গমন করেন। তাঁহার পবিত্র প্রশ্বাস-প্রভাবে (অর্থাৎ সংশ্রবে) কত লোকের উপকার হইয়াছে। ৬৩০ হিজরীতে (১২৩৩ খৃষ্টাব্দের) ৬ই রজব শনিবারে তিনি স্বর্গে প্রস্থান করেন। (১১) তাঁহার পবিত্র সমাধি-মন্দির তীর্থবিশেষ হইয়া উঠিয়াছে।

অজমীড় হইতে তিন ক্রোশ দূরে পুষ্কর (১২) নামে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। ইহার গভীরতা কত দূর, তাহা কেহই অনুমানও করিতে পারে না। ইহা একটি প্রাচীন তীর্থ। হিন্দুশাস্ত্রমতে ইহা তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া

(৮) ইম্পি, গেজে, ১।১১১। (৯) রাজস্থান (১।৮০২)। (১০) অজমীড়ের বহু-উৎপার উৎস (ইম্পি, ১।১৩৩)।

(১১) আ (৩৮/২) মতে ৬৩৩ হিজরী (১২৩৬ খৃঃ)। (১২) রাজস্থান (১।৮১২)।

পরিগণিত। তৎপাঠে জানা যায়, সর্ব্বতীর্থে স্নান ও পরিভ্রমণ করিয়াও যদি কেহ ইহার জলে স্নান না করে, তবে তাহার কিছুই পুণ্য হয় না।

চিতোর একটি বিশ্ববিখ্যাত দুর্গ। এ প্রদেশের একতম সরকারের নামও চিতোর। ইহার অধীন রাজ্য গোগড়ে (১৩) একটি লৌহখনি আছে। মণ্ডলের অন্তর্গত চিনপুরে তাম্রখনি দেখা যায়। এই দুর্গ পূর্ব্বে রাণার অধিকারে ছিল। সম্রাট আকবর স্বয়ং ইহার বিজয়ে সাহায্য করিয়াছেন। অনেক যুদ্ধের পর ইহা জিত হয়। সে সব কথা এখন সর্ব্বজনবিদিত। পূর্ব্বে এখানকার অধিপতিদের 'বাওয়াল' বলিত, এখন তাঁহারা অনেকদিন হইতেই 'রাণা' নামে পরিচয় দিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা গিহ্লোট-বংশীয় এবং ন্যায়বান্ নৌশীরবানের অধস্তন পুরুষ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ শিশোদ গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহারা শিশোদিয়া নামে খ্যাত হইয়াছেন। এক ব্রাহ্মণ (১৪) তাঁহাদের দুরবস্থার সময়ে তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করায় তাঁহারাও ব্রাহ্মণ আখ্যা পাইয়াছেন। সিংহাসনে আরূঢ় হইবার সময় নররক্তে তিলক পরিবার বিধি এই রাজবংশে দেখা যায়। (১৫)

সম্ভরে সুন্দর লবণ উৎপন্ন হয়। শহরের নিকটে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। তাহা দৈর্ঘ্যে চার ক্রোশ এবং প্রস্থে এক ক্রোশ। ইহার জল অত্যন্ত লবণাক্ত। হ্রদের মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্রের মত অনেকগুলি ক্ষেত্র আছে। কোদালি দিয়া মাটি কাটিয়া লইয়া সেই গর্ত্ত জলে পূর্ণ করা হয়। ১৫।১৬ দিন পরে জল শুকাইয়া যায় এবং গর্ত্ত লবণে পূর্ণ হইয়া উঠে। তার পর সেই লবণ কাটিয়া গর্ত্তের ধারে তুলিয়া জল ছিটাইয়া দিলে, তাহা হইতে মাটি আলাহিদা হইয়া পড়ে এবং নির্ম্মল লবণ পাওয়া যায়। এই লবণ কোথাও নীল, কোথাও লাল, কোথাও বা সাদা। (১৬) প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার লবণ বিক্রীত হয়। মোগল সম্রাট ইহার উপর একটি কর স্থাপন করিয়াছেন।

---

(১৩) কেট্‌লের এটলাস (৩৫ পৃঃ উ. পৃ)-এ চিতোরের কিছু উত্তরে গঙ্গরর্ণ নামে একটা যায়গা আছে। তাহা ২৫.৩ উ, ৭৪.৪০ পূ। চেনপুরীয়া ২৫.১২ উ, ৭৪.২১ (৩৪ পৃঃ দ, প) এটলাস-মতে ইহার ৬ মাইল দক্ষিণে তাম্র ও সীসের খনি অবস্থিত। মণ্ডল উদয়পুর হইতে ৭০ মাইল উঃ পূর্ব্বে এক শহর। (ই, গে, ১৷২৮৭)। (১৪) টডের মতে ঋষি হারীত (১২৩৫)। আ (২৷২৬১) মতে হরজী বা মরিজ (মরিচ)। (১৫) রাজস্থান (১৷২০০)। (১৬) সাধারণতঃ সমস্ত লবণই সাদা ও সামান্য বিবর্ণ। অল্প পরিমাণই নীল ও লাল। ই, গে, (১২৷১৮৮)।

এ প্রদেশে অনেক মরু আছে। জল দূর-দেশ হইতে (মাটীর ভিতর দিয়া) আসে। কৃষি বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। জোয়ার, বাজরা ও মোঠ পর্য্যাপ্ত। শস্যের সপ্তমাংশ বা অষ্টমাংশ রাজ-সরকারে দিতে হয়। টাকা-কড়িতে কর দিবার প্রথা নাই বলিলেই হয়। বসন্তকালে সামান্য ফসল জন্মে। শীতকাল প্রায়ই নাতিশীতোষ্ণ থাকে; গ্রীষ্মকাল কিন্তু স্থানে স্থানে অত্যন্ত গরম পড়ে। দক্ষিণবর্ত্তী গিরিপুঞ্জ ও অন্য কয়টি স্থান অগম্য। অধিবাসীরা কচ্ছ, (১৭) রাঠোর ও অন্যান্য রাজপুত। এখানকার অধিবাসীদের ক্রোধ-প্রবলতা মরুর প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে ক্রোশের পর ক্রোশ চলিয়াছে, তথাপি কোথাও একটুও জল নাই। এই জলহীনতা বশতঃই মোগল সম্রাটের সৈন্য এখানকার অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিতে পারে নাই।

ইহার দৈর্ঘ্য অম্বর (১৮) হইতে বিকানীর ও জশলমীর পর্য্যন্ত ১৬৮ ক্রোশ এবং প্রস্থ অজমীর জেলার সীমা হইতে বাঁশোয়াড়া পর্য্যন্ত ১৫০ ক্রোশ। ইহার পূর্ব্বে প্রধান প্রদেশ আকবরাবাদ, পশ্চিমে মুলতান-অন্তর্গত দিপলপুর, উত্তরে শাহজাহানাবাদ-অন্তর্গত গ্রামপুঞ্জ এবং দক্ষিণে গুজরাট অহম্মদাবাদ। ইহার সরকার—আজমীঢ়, চিতোর, রন্তম্ভর, যোধপুর, নাগোর, শিরোহী, ও বিকানীর এই সাতটি এবং মহল-সংখ্যা (১২৩) এক শত তেইশ। ইহার রাজস্ব ৫৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬০ হাজার দাম (১৯) (১,৩৮,৮৪,০০০৲ টাকা)।

গুজরাট।

সুরম্য-প্রদেশ গুজরাট অহম্মদাবাদ।

গুজরাট দেশের বিশেষতঃ (এখানকার একতম অধিপতি) বাহাদুর শাহের ইতিহাস (২০) হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে ইহার রাজধানী ছিল পটন (২১)

---

(১৭) রাজস্থান (১।১৩)। (১৮) জয়পুর হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বোত্তরে। (১৯) আকবরের আমলে ইহার সরকার ৭টি, মহল ১৯৭টি এবং রাজস্ব ৭২,১০,০৩৮৮/১৫ ছিল। আ (২।২৭১)। (২০) নাম সুলতান বাহাদুর গুজরাটি-প্রণীত তারিখ-ই-বাহাদুর শাহী। (২১) পটন—হিন্দু রাজধানী ৭৪৬—১১৯৪ খৃষ্টাব্দ (ই, গে, ১১।৮২), চম্পানীর—মুসলমানদের রাজধানী ১৪৯৪—১৫৬০ খৃষ্টাব্দ (২।৩৩০)।

চাম্পানীরও কিছুকাল রাজধানী হইয়াছিল। ৮১২ হিজরী (২২) (১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে) সুলতান মজফর শাহের পুত্র সুলতান মহম্মদের পুত্র সুলতান অহমদ স্বীয় রাজত্ব-কালে সবরমট্টি নদীর তীরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ, নূতন প্রাসাদাবলী ও একটি বিস্তৃত শহর স্থাপন করিয়া তাহার নামকরণ করেন অহম্মদাবাদ। তাহাই তাঁহার রাজধানী হয়। অহম্মদাবাদ একটি প্রকাণ্ড শহর হইয়া উঠে। অহমদ ৩২ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই তাঁহার এই নূতন রাজধানী বহুজনাকীর্ণ হইয়া উঠে। শহরের বাহিরে ৩৬০টি পোড়ায় (২৩) লোক-বসতি হয় এবং সেই সব পোড়ায় (পাড়ায়) শহরের স্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই সুপ্রাপ্য ছিল। এই শহরে এক সহস্র মসজীদ, মঠ ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত মিনার আছে। রসুলপুর পোড়ায় ফকীর শাহআলম বোখারীর (২৪) সমাধি-মন্দির আছে। বহু লোকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল ও তাঁহার পবিত্রতায় বিশ্বাসবান্ ছিল।

সংক্ষেপতঃ, এই শহরের প্রত্যেক বাড়ীর ছাদ টালীর এবং প্রাচীর—ইট ও চুণের। কোন কোন বাড়ী বিজ্ঞতাসহকারে প্রস্তর-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৃহের দেয়ালগুলি ফাঁপা, তাহাদের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিবার গুপ্ত পথ আছে। প্রয়োজন হইলে লোকেরা এই সব পথে লুকাইয়া থাকিতে পারে। কোন কোন ধনী ব্যক্তি গৃহমধ্যে গহ্বর করিয়া বাড়ীট এমনই ভাবে পাকা গাঁথুনি করিয়া ঢাকিয়া রাখে যে, নির্ম্মল বৃষ্টির জল অনায়াসেই তাহাতে গিয়া পড়িতে পারে। এই সব গহ্বরকে দীঘির (২৫) মত কাটা হয়। এদেশের ভাষায় ইহাদের নাম তনৃকা (?)। সারা বৎসর এই তনৃকার জলই তাহারা পান করে। চিত্রকর, জড়োয়াকারিকর, ও অন্যান্য শিল্পীরা শুক্তিকে অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়া এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করে। (২৬) এই

---

(২২) ৮১৫ হিজরী হইবে। ফেরিস্তা (৪।১৪)।

(২৩) শহরের এক একটি পাড়া, প্রত্যেক পাড়ায়ই একটি করিয়া কটক আছে। আ ২।২৪০ ই, গে, ১।১৫।

(২৪) জন্ম (১৪১৫ খৃঃ) মৃত্যু (১৪৭৫ খৃঃ)—আ (২।০৭২)। (২৫) ই, গে, ১।১৭।

(২৬) আ (২।২৪০) মতে—চিত্রকর, শিলপ্রস্তুতকারীর ও অন্যান্য শিল্পীর সংখ্যা অগণ্য। তাহারা বেশ কৌশলের সহিত শুক্তি দিয়া সুন্দর সুন্দর বাক্স ও পোঁয়াত প্রস্তুত করে।

প্রকারে কলম, ছোট ছোট বাক্স ও অন্যান্য অনেক জিনিস প্রস্তুত হয়। সোনার জরীর কাপড়, চিড়া (রং করা পাগড়ী), ফোটা (কোমরবন্ধ), জমাবর (ফুলকাটা পশমী কাপড়), মখমল, কিংখাব, রেশমী কাপড় ও খাড় (তরঙ্গায়িত রেশমী বস্ত্র) এখানে বেশ সুন্দর বোনা হয়। তাহারা তুরস্ক, ইয়ুরোপ ও পারস্যের বিভিন্ন বয়ন-রীতির অনুকরণ করে? বিশেষতঃ ধুতি (২৭) সুন্দর করিয়া বোনা হয়। উপহারস্বরূপে তাহা কত দূর দূরান্তরে চলিয়া যায়। সুন্দর তরবাল, জমধার, খপোয়া (২৮) ও ধনুক প্রস্তুত হয়। দীপ্তিমান্ রত্নসমূহ এখানে আনীত ও বিক্রীত হয়। তুরস্ক ও ইরাকের সোনা ও রূপার আমদানী হয়। জলবায়ুর সুরম্যতা ও সুন্দর দ্রব্যের সুপ্রাপ্যতার জন্য এদেশ অদ্বিতীয়।

অহম্মদাবাদ হইতে তিন ক্রোশ দূরে বেটোয়া নামে এক সুন্দর পল্লী অবস্থিত। সেখানে বহু সাধু বিশেষতঃ শাহ আলম বোখারীর পিতা কুতব-ই-আলম চির নিদ্রায় অভিভূত আছেন। এখানে প্রায় এক হস্ত পরিমাণ একটি ঢাকনী আছে। কেহ বলে তাহা কাঠের, কেহ বলে পাথরের (২৯) আর কেহ বা বলে যে লোহার। সকলেই কিন্তু তাহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প বলিয়া থাকে।

পট্টন * একটি প্রাচীন শহর। পূর্ব্বে ইহা এ দেশের রাজাদের রাজধানী ছিল। এখানে দুইটী দুর্ভেদ্য দুর্গ আছে—তাহাদের একটী প্রস্তরের এবং অপরটী ইষ্টকের। এদেশে উৎকৃষ্ট গাভী পাওয়া যায়। চম্পানীর অর্দ্ধ-ক্রোশ উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি সুন্দর দুর্গ। ইহার অনেক-গুলি দ্বার আছে। এক স্থানে ৬০ গজ পরিমিত স্থান খুঁড়িয়া তক্তা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। বিপদের সময় সেই তক্তা সরাইয়া লওয়া হয়। বিখ্যাত

(২৭) In the A-text (ms. 156D of Society) this word may be read as watani "belonging to the country." Can it mean the country-made paper for the manufacture of which Ahmedabad has long been famous? (I. G. I, 95.)

(২৮) দুই প্রকার ছোরা (আ, ১।১১০) জমধার—যমধার (যমের মত অর্থাৎ মৃত্যু তীক্ষ্ণ ধার) (২৯) জ্যারেট এই প্রস্তরের বর্ণনা করিয়াছেন। আ (২।২৪০ টিপ্পনী)।

* অনহিলবাড় পট্টন—২৩°৫১,৩০ উ, ৭২°১০°৩০ পূ। ইহা সোমনাথ পট্টন নহে।

বন্দর সুরাটে, এক সময়ে রাজধানী ছিল। এ জেলায় আরও অনেক বন্দর (৩০) আছে। তাপ্তী-নদী ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া সাত ক্রোশ দূরে সমুদ্রে পড়িয়াছে। নানাবিধ ফল বিশেষতঃ আনারস পর্য্যাপ্ত। অনেক রকমের ফুল এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধ এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুপ্রাপ্য। জোরাষ্ট্রিয় জাতিরা (পার্শীরা) ফার্স (Fars) হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করিতেছে। তাহারা অগ্নির উপাসক।

সুরাট ও নন্দুবরের মধ্যস্থলে বগ্‌লনা নামে একটি পার্ব্বত্য-প্রদেশ আছে। সেখানে লোকের বাস আছে। সে অঞ্চলে চাষ হয়। সেখানকার জলবায়ু উৎকৃষ্ট। নানাবিধ ফল, বিশেষতঃ পিচ, আপেল, আঙ্গুর, আনারস, বেদানা, লেবু ও আম পর্য্যাপ্ত। সেখানে সাতটি বিখ্যাত দুর্গ আছে; তন্মধ্যে সলের ও মুলহর (৩১) বিশেষভাবে বিখ্যাত। সেখানকার অধিপতিরা রাঠোর-বংশীয়।

ভরোচে (ব্রোচ) একটি উৎকৃষ্ট দুর্গ আছে। নর্ম্মদা ইহার পাদ ধৌত করিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। এ জেলায় আরও কতকগুলি বন্দর (৩২) আছে। নানা প্রকারের বস্ত্র এখানে বোনা হয়। এখানকার (৩৩) অলচ (Alchah) কাপড় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বণিকেরা এই কাপড় দিগ্‌দেশে লইয়া যায়।

সোরঠ (কাথিবাড়) সরকার পূর্ব্বে একটি পৃথক রাজ্য ছিল। এখানকার রাজাদের পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। অহম্মদাবাদের রাজাদের সহিত তাঁহাদের সম্প্রীতি ছিল না। আকবরের নুথানাই এই রাজ্য প্রকৃতপক্ষে জয় করেন। ইহার দৈর্ঘ্য ঘোঘা বন্দর হইতে অরমরা (৩৪) বন্দর পর্য্যন্ত ১২৫ ক্রোশ, এবং প্রস্থ সর্দ্দর হইতে ডিউ বন্দর পর্য্যন্ত ৭২ ক্রোশ। ইহার জলবায়ু মনোরম। এখানে ফল-ফুল যথেষ্ট।

(৩০) আ (২।২৪৩)এ আছে—রন্দর, খম্বেবী ও বল্‌সর।

(৩১) পারকোয়াড় রাজ্যের সোনরি জিলায় অন্তর্গত। (৩২) আ (২।২৪৩)এ আছে—কবী, গান্ধার, ভভূত ও ভকোয়া। (৩৩) আ (১।৯৪)এ উল্লেখ আছে। (৩৪) অরমরা বা অংমরো লেটসের এটলাস ৫ পৃঃ মতে দ্বারকার ১৯ মাইল উত্তরে। ইহার পূর্ব্বে বইট দ্বীপ। সর্দ্দর বা সর্দ্দোর উপদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত, রাজকোট হইতে ১৩ মাইল অতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে।

এখানে আঙ্গুর ও ফুটি জন্মে। রাজ্যটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডেই এক একজন স্বাধীন রাজা আছেন। স্থানটি অরণ্যময় ও দুর্গম পর্ব্বত-সঙ্কুল বলিয়া ইহার অধিবাসীরা বিদ্রোহস্বভাব। জুনাগড় একটি সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রস্তর দুর্গ। গুজরাট-রাজ সুলতান মহম্মদ (৩৫) অনেক যুদ্ধের পর ইহা অধিকার করেন। এখানে তিনি আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। গীর্ণাল (গীরনার) পর্ব্বত-শীর্ষে অবস্থিত একটি দুর্গ। এখানে অনেকগুলি উৎস আছে। ইহা একটি তীর্থবিশেষ। ইহার নিকটে ভাদর নদ সমুদ্রে (৩৬) পড়িয়াছে। এই নদের মৎস্য এত কোমল যে, কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিলেই গলিয়া যায়। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে উৎকৃষ্ট উষ্ট্র ও অশ্ব পাওয়া যায়।

সোমনাথ একটি প্রাচীন তীর্থ। ইহার খ্যাতি সর্ব্বত্রই। সমুদ্র হইতে ইহা তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এ রাজ্যে পাঁচটি বন্দর (৩৭) আছে। ইহার নিকটে সরস্বতী নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে। তীর্থরাজ বলিয়া ইহা পরিগণিত। প্রায় পঞ্চ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যদুবংশের ছাপ্পান্ন কোটি লোক সরস্বতী ও হরণ (৩৮) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রে ক্রীড়াচ্ছলে যুদ্ধ করিতে করিতে নরকে যায় (হত হয়); (৩৯) ইহা সর্ব্বজনবিদিত কথা। সোমনাথ হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে (৪০) ভলকা (৪১) নামে এক অতি পবিত্র স্থান আছে। সেখানে সরস্বতীর তীর-বর্ত্তী অশ্বত্থ-বৃক্ষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ পাদদেশে ব্যাধ-নিক্ষিপ্ত তীরাহত হইয়া লোকান্তরে গমন করেন। ইহাকে বেলনীর (৪২) বলে। অত্যন্ত পবিত্র-ক্ষেত্র বলিয়া ইহা পরিগণিত।

(৩৫) প্রথম মহমুদ, বিগারা (১৪৫৯—১৫০০ খৃঃ) Bayley's Gujarat Ch. VIII.

(৩৬) আ (২।২৪৫) মতে তরবোধ গ্রামের নিকটে ভাদর নদ সমুদ্রে পড়িয়াছে।

(৩৭) আ (২।২৪৬)এ ইহাদের নাম আছে। (৩৮) Letts' atlas sheet 5, has Sursooty and Heerny., ইহারা একত্রে সোমনাথের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। (৩৯) খুলাসৎ-কার হিন্দু হইয়াও মুসলমান লেখকদের মত অ-মুসলমান ব্যক্তিদের মৃত্যুর কথা লিখিতে বসিয়া 'নরকে গমন করিল' লিখিয়াছেন। এখানেও তাহাই করিয়াছেন। (৪০) এখানে আইনের কথা মানা করা হইয়াছে।

(৪১) আঃ মতে ভল-কা-তীর্থ (তীরের তীর্থ)। ই. গে (১৩।৫০)-এ এ স্থান ভট-কুণ্ড (Bhat kund) নামে উল্লেখিত হইয়াছে। (৪২) আ মতে পিপল-নীর।

মুল (৪৩) শহরে মহাদেবের মন্দির আছে। প্রতি বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে শথ (৪৪) (শুকপাখী?) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পারাবত অপেক্ষা ক্ষুদ্র, সুগন্ধ, শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণ। ইহা মন্দিরের চূড়ায় আসিয়া বসে, তার পর কাতরোক্তি করিতে করিতে মাটীতে গাড়াগড়ি দেয় ও শেষে প্রাণ-বায়ু ত্যাগ করে। শহরের যাবতীয় লোক সেদিন একত্র সমবেত হইয়া নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য পোড়াইতে থাকে; এবং এই পাখীর (পাখার) শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের অনুপাত হইতে বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কথা গণনা করিয়া থাকে। কৃষ্ণ-বর্ণাধিক্য বৃষ্টি এবং শ্বেতবর্ণাধিক্য অনাবৃষ্টির লক্ষণ।

ইহারই নিকটে দ্বারকা। ইহা জগৎ নামেও পরিচিত। এখানে একটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আসিয়া এখানে তাঁহার বাসস্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা পবিত্র তীর্থস্বরূপ হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে কাশী (৪৫) গ্রাম। তাহার অধিবাসীরা আহির জাতি। তাহারা হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর বহির্ভূত। তাহারা যে কোন লোকের রান্না খায়। তাহাদের অনেক-গুলি করিয়া স্ত্রী থাকে। যখন কোন নূতন শাসনকর্ত্তা এখানে আসেন, তখন তাহারা তাঁহাকে এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয় যে, তিনি তাহাদের রমণী-কুলের অসতীত্বের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য করিবেন না। তিনি এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলে, তাহারা এখানে থাকিতে সম্মত হয়, নতুবা ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

ইহার সন্নিকটে ৯০ ক্রোশ দীর্ঘ এক দেশ (রণ) আছে। বর্ষার পূর্ব্বে সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠিয়া এই দেশকে জলপ্লাবিত করিয়া ফেলে। তার পর বর্ষাপগমে জল নামিয়া যায় ও জমি শুষ্ক হইয়া উঠে ও পর্য্যাপ্ত লবণের আকরে পরিণত হয়।

কচ্ছ একটা পৃথক্ দেশ। ইহা দৈর্ঘ্যে ২৫০ ক্রোশ ও প্রস্থে ১০০ ক্রোশ।

---

(৪৩) আ মতে মুল মহাদেব। বেজের মতে (১১৭ পৃঃ) মঙ্গলোর পরগণার অন্তর্গত মাধোপুর। জেটসের এটলাস ৫ পৃষ্ঠায় মধুপুর মৌনুগ্রোট হইতে ১০ মাইল পশ্চিমোত্তরে। (৪৪) শথ—হিন্দী শব্দ। আ মতে মুখ। (৪৫) আ মতে—"এদেশে কাথীর সংখ্যা অগণ্য। তাহারা জাতিতে আহির।" ই, গে, (৮।৮১)-এ কাথীদের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৪৬) ইহার পশ্চিমে সিন্ধুদেশ ও কতকগুলি মরুভূমি। এখানে উষ্ট্র ও ছাগ অগণ্য। এ দেশের আরবী ঘোড়া প্রসিদ্ধ। শুনা যায়, একবার এক সওদাগর নদী দিয়া অনেকগুলি আরবী ঘোড়া লইয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু হঠাৎ জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঘোড়াগুলি ডুবিয়া যায়; কতকগুলি তক্তা ধরিয়া তীরে আসিয়া উঠে ও এ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই ঘোড়ার বংশ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সংক্ষেপতঃ, এ প্রদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। ইহার অধিকাংশই মরু। জোয়ারী ও বাজ্‌রা প্রধান শস্য ও প্রধান খাদ্য। বাসন্তিক ফসল অতি সামান্য পরিমাণে জন্মে। মালব ও অজমীড় হইতে গম ও অন্যান্য শস্য এবং দক্ষিণা-পথ হইতে চাউল আনীত হয়। শস্যক্ষেত্র ও উদ্যানের চারিধারে কাঁটা গাছ পুঁতিয়া দেওয়া হয়। সেগুলি দুর্ভেদ্য বেড়ার কাজ করে। এই কারণে এ দেশে পরিভ্রমণ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। এখানে গাছ এত বেশী জন্মায় যে, শিকার করিবার মত স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আম ও অন্যান্য ফলের গাছ এখানে এত অধিক যে, এ দেশকে ফলোদ্যান বলিলেও চলে। (অনহিল-বড়া) পট্টন হইতে বরোদা পর্য্যন্ত এই একশত ক্রোশব্যাপী স্থান কেবল আমগাছে পূর্ণ। এই সব গাছে খুব ভাল ভাল আম হয়। কোন কোন গাছের আম পাকিবার পূর্ব্বেও সুমিষ্ট হয়। ডুমুর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। মূলা শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই পাওয়া যায়। আঙ্গুর ও গোলাপ যথেষ্ট। মরু-দেশে চিতাবাঘ থাকে। প্রতি বৎসর ফাঁদ পাতিয়া ইহাদিগকে ধরা হয় এবং শিকার করিতে শিখান হয়। এ দেশের ষাঁড়,—ভার, প্রকাণ্ডত্ব, সুন্দরগতি ও ক্ষিপ্রপাদের জন্য প্রসিদ্ধ। এক এক জোড়া ষাঁড়ের দাম পাঁচ শত টাকারও বেশী। অর্দ্ধ দিনের মধ্যেই তাহারা ৫০ ক্রোশ (৪৭) পথ চলিতে পারে। এ দেশে প্রধান নদী—সবরমতী, বত্রক, মহেন্দ্রী (৪৮), নর্ম্মদা, তাপ্তী, সরস্বতী ও হরণ। এখানে গঙ্গা-যমুনা নামে দুইটি উৎস আছে।

---

(৪৬) গ্রন্থের মাপ খুলাসতে ভুল থাকায় 'আ'র নির্দ্দিষ্ট মাপ গৃহীত হইল। (৪৭) আ (২।২৪২) মতে পট্টনের ষাঁড়গুলি এই সব গুণ-বিশিষ্ট।

(৪৮) বত্রক—খৈরা হইতে ৬ মাইল উত্তরে সবরমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। মহেন্দ্রী (মাহিন্দ্রী) সম্ভবতঃ মাহী নদী।

এ প্রদেশের দৈর্ঘ্য বর্‌হনপুর হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত ৩০২ ক্রোশ, এবং প্রস্থ জেলোর হইতে দমন বন্দর পর্য্যন্ত ২০৬ ক্রোশ। ইহার পূর্ব্বে খান্দেশ, পশ্চিমে (উপকূলবর্ত্তী) দ্বারকা, দক্ষিণে গিরিপুঞ্জ ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, উত্তরে জেলোর ও ইদর অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে দমন ও কম্ভয়ৎ নামক দুইটি বন্দর আছে। ইহার সরকার—অহম্মদাবাদ, পট্টন, নদোট, ভরোচ, বরোদা, চম্পানীর, গোধ্রা, সুরাঠ ও সিরোহী—এই নয়টি। ইহার মহল-সংখ্যা ১৮৮, বন্দর সংখ্যা ১৩ এবং রাজস্ব ৫৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ৯০ হাজার দাম (৪৯) ১,৪৫,৯৪,৭৫০৲ টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত।
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

গড়-দর্শন।

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত নীলফামারী-মহকুমায় অবস্থানকালে একদা আমার তত্রত্য কোন বন্ধুর নিকট অবগত হইলাম যে, দশ বার মাইল উত্তর-পূর্ব্বে জলঢাকা থানার অধীন ধর্ম্মপাল নামক একটি গ্রাম আছে, এবং তথায় একটি অতি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সাধারণ্যে উহা 'ধর্ম্মপালের গড়' নামে পরিচিত। তৎসন্নিকটেই ময়নামতী নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম এবং ময়নামতীর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। আমি পূর্ব্বেই উত্তর বঙ্গের ময়নামতীর গানের বিষয় শুনিয়াছিলাম, এবং এই ময়নামতীর সঙ্গে ধর্ম্মপালের নামও যে জড়িত, তাহাও অবগত ছিলাম। এই সকল ধ্বংসাবশেষের অন্তরাল-স্থিত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় আপনাকে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বে ঐগুলি একবার দর্শন করিবার ইচ্ছা ও কৌতূহল দমন করিতে না পারায়, গত ১৯১০ সালের গুডফ্রাইডের অবকাশে একদিন প্রাতে একজন বন্ধুর সমভিব্যাহারে

(৪৯) আকবরের আমলে ইহার সরকার-সংখ্যা ৯, মহল-সংখ্যা ১৩৮ ও রাজস্ব ১,০৯,২০,৫৫৭১০ ছিল। আ (২।২৫২)

রেলযোগে নীলফামারীর পরবর্ত্তী ষ্টেষণ ডোমার-অভিমুখে রওনা হইলাম। সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফার লইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু যথাসময়ে কাহাকেও না পাওয়ায় স্থানীয় স্কুলের ড্রয়িং মাষ্টার মহাশয়কে সঙ্গে লইলাম।

আমরা যখন ডোমার ষ্টেষণে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলা নয়টা। আমাদের ধারণা ছিল যে, ধর্ম্মপাল গ্রাম ষ্টেষণ হইতে আনুমানিক দুই মাইল দূরে অবস্থিত। অনেক ব্যক্তিকে উক্ত স্থানের দূরত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইল। কিন্তু সে সঠিক উত্তর দিতে না পারায় আমাদের পূর্ব্ব বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রহিল। আমরা তখন বসন্ত-প্রভাতে গ্রাম্যশোভা সন্দর্শন করিতে করিতে পদব্রজে গমন করিতে আরম্ভ করিলাম।

সেদিন দোলযাত্রার পরাহ্। আবির-রঞ্জিত-দেহবস্ত্র একদল মাড়োয়ারী পটহকরতাল-সহযোগে সঙ্গীত-কোলাহলে চারিদিক মুখরিত করিয়া এবং বিক্ষিপ্ত-পদসঞ্চালনে রাজপথ হইতে বিপুল ধূলিরাশি সমুত্থিত করিয়া হোলি-উৎসব করিতেছিল। আমরা এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। আর কোথাও কোন কোলাহল নাই। মানববিরল, ধূলিবহুল, বৃক্ষচ্ছায়া-সমন্বিত পথে,—কখনও অদূরবর্ত্তী হাট হইতে প্রত্যাগত শব্দায়মান গোঃযান অথবা দুই একটি ভারবাহী কৃষক সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, সেই নির্জ্জন স্থানটিকে ক্ষণিক সজীবতা প্রদান করিতেছিল।

এইরূপে দুইটা মাইলষ্টোন অতিক্রম করিয়া যখন শুনিলাম যে, ধর্ম্মপাল তথা হইতেও অন্ততঃ এক ঘণ্টার পথ, তখন আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। অদূরে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু দৃষ্টিগোচর হইল। নিম্নে চাঁড়ালকাটা নামক একটি ক্ষীণকায়া নদী নিঃশব্দে প্রবাহিত হইতেছে। নদীটি এখন স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে নাকি এই মৃতপ্রায়া নদী ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে। কথিত আছে যে, প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে নীলফামারীর কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট উৎকোচগ্রহণের অপবাদ ও তজ্জনিত অপমান হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য বর্ষাকালে এই সেতু হইতে নদীগর্ভে ঝম্প প্রদান করিয়া আত্ম-হত্যা করেন।

চৈত্রের বেলা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সূর্য্যদেবও অতি নির্দ্দয়ভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। বেলা এগারটার সময় পথশ্রম

ও সূর্য্যের উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া পথিপার্শ্বস্থ একটি বিল্ব-বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। নিকটেই কয়েকজন মুসলমান কৃষক দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারা গেল যে, আমরা ধর্ম্মপাল গ্রামেই পৌছিয়াছি; কিন্তু 'গড়' তথা হইতে দুই মাইল দূরে পাট্‌কেপাড়া গ্রামে অবস্থিত। আমরা তখন গড়দর্শনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্রামোপযোগী স্থানের অনুসন্ধান করায় জ্ঞাত হইলাম যে, গড় সন্নিকটেই হরিপ্রসাদ নামক জনৈক সম্পন্ন যোগীর বাসস্থান আছে। তথায় বিশ্রাম ও ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তির ব্যবস্থা হইতে পারে। ময়নামতীর গড় সে স্থান হইতে কতদূর জিজ্ঞাসা করায়, একটি কৃষক অনতিদূরে সম্মুখস্থিত পথের সমান্তরালভাবে বিস্তীর্ণ এক উচ্চভূমির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—'ওঠে হামারা মৈনাবতী কোট কয়'। এই ময়নামতীর কোট! এইরূপ অপ্রত্যাশিত স্থানে ঈপ্সিত-বস্তুলাভজনিত আনন্দ উপভোগ করিবার পুর্ব্বেই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখরতাপ ও শরীরের অবসন্নতাবশতঃ ঠিক সেই সময় তথায় গিয়া গড় সন্দর্শন করা যে অসম্ভব, তাহা উপলব্ধি করিয়া বিলক্ষণ কষ্ট অনুভব করিলাম। অতএব দূর হইতে আংশিক পরিদৃশ্যমান ধ্বংসাবশেষটিকে কল্পনাসাহায্যে যতদূর সম্ভব পূর্ণতা প্রদান করিয়া ধর্ম্মপাল গড় দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সম্যক্‌রূপে উহা পুনরায় দেখিব স্থির করিয়া হরিপ্রসাদ যোগীর গৃহোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলাম।

অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে, অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় স্বেদসিক্ত তাপদগ্ধকলেবরে আমরা যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ববঙ্গের রীতি-অনুসারে হরিপ্রসাদ যোগীর গৃহটি কাষ্ঠ, বাঁশ, টিন, ও খড়দ্বারা নির্ম্মিত বটে, কিন্তু সুবৃহৎ এবং অন্দর ও ভিতরমহলে বিভক্ত এবং তৎসংযুক্ত একটি স্কুলঘর গৃহস্বামীর আর্থিক সচ্ছলতার পরিচয় দিতেছিল। শুনিলাম, বৃদ্ধ হরিপ্রসাদ কয়েকদিন হইতে ভীষণ জ্বরে শয্যাগত; কিন্তু তিনজন ভদ্রলোক অতিথিরূপে তাহার গৃহে সমাগত এই সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ একটি বালকের দেহে ভর দিয়া টলিতে টলিতে অতিকষ্টে বাহিরে আসিয়াই আমাদের নিকটস্থ বারান্দায় শুইয়া পড়িল। অতঃপর যুক্তকরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া এবং নিজে সর্ব্বসময়ে অনুপস্থিত থাকার জন্য যে সমস্ত ত্রুটি হওয়া সম্ভব, তজ্জন্য কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা

করিল এবং সেই অবস্থাতেই আহারাদির যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিয়া আমাদের বিশেষ অনুরোধে কিয়ৎকাল পরে পুনরায় অতিকষ্টে গৃহাভ্যন্তরে গেল। বৃদ্ধের আতিথ্যে এইরূপ যত্ন ও উৎকণ্ঠা আমাদের অনেকদিন মনে থাকিবে। অল্পক্ষণ পরেই বিশালকায় অনৈক প্রৌঢ় লোক অতিব্যস্তভাবে সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলে আমার ব্রাহ্মণ বন্ধুটি রন্ধনের জন্য অগ্রসর হইলেন। শুনিলাম, এই লোকটি বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর রৌদ্রের তাপ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, গৃহস্বামীদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া বেলা চারিটার সময় আমরা গো-যানে আরোহণ করিলাম। শস্যক্ষেত্র, জঙ্গল, বাঁশ-বন, শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণী এবং স্থানে স্থানে কৃষকদিগের পর্ণকুটীর ব্যতীত পথে উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়নগোচর হয় নাই। পনের মিনিট মধ্যে আমরা ক্ষেত্র-সংলগ্ন একটি অতি সঙ্কীর্ণ পথের পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চালকের কথা অনুসারে আমরা তথায় অবতরণ করিলে ১০।১২ হাত লম্বা এক ভীষণ কালীমূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মূর্ত্তিটি তদুপযোগী একটি খড়ের ঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

সেই তরুলতাগুল্মাদিতে ঘনসমাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই উত্তর-দক্ষিণে বহুদূরব্যাপী প্রাচীরসদৃশ উচ্চ মৃণ্ময়স্তূপ নয়নপথে পতিত হইল। আমাদের পথপ্রদর্শক শকট-চালক বলিল যে, উহাই ধর্ম্মপালগড়ের বহিঃপ্রাকার। আরও নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলাম যে, এই প্রাকার—ইহার উচ্চতা অন্যূন দশ হস্ত হইবে—একটি সুবিস্তীর্ণ সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া আছে এবং চতুর্দ্দিকে অনতিগভীর, কিন্তু সুপ্রশস্ত পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। পরিখার স্থানে স্থানে বৃষ্টির জল জমিয়াছিল; অবশিষ্ট অংশ প্রায় সমস্তই শুষ্ক ছিল। শুনিলাম, বর্ষাকালে এগুলি জলপূর্ণ হইয়া যায়।

আমরা পরিখা পার হইয়া প্রাকারের উপরিভাগে আরোহণ করিলাম।

যে স্থানে দণ্ডায়মান হইলাম, সে স্থানটি উহার একটি কোণ; সুতরাং তথা হইতে প্রাকারের তিনদিক আমরা বেশ দেখিতে পাইলাম। যে ভূখণ্ডটিকে এই প্রাকার-চতুষ্টয় বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে অন্যূন এক মাইল, এবং প্রস্থে পূর্ব্ব-পশ্চিমে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধমাইল হইবে। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে এইরূপ প্রাকার-পরিখা-বেষ্টিত আর একটি ক্ষুদ্রতর ভূখণ্ড রহিয়াছে।

ইহাই ভিতর-গড়, এবং এইখানে রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা এখন ব্যাঘ্র-বরাহসঙ্কুল ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগকে সময়ে সময়ে ঐ সকল বন্যজন্তুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া স্থানীয় জমীদারের শরণাপন্ন হইতে হয়। বহিঃপ্রাকারবেষ্টিত ভূমিখণ্ডটি তত জঙ্গলময় নয়। গ্লেজিয়ার (Glazier) সাহেবের 'Report on the District of Rungpur' নামক গ্রন্থে এইস্থানে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর অস্তিত্ব উল্লিখিত আছে; কিন্তু আমরা তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। প্রাচীরটির উচ্চতা ও সাধারণ আকৃতি প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। ইহার ভূমি (Base) প্রস্থে ৫।৬ হাত হইবে; কিন্তু ক্রমশঃ ইহা স্বল্প-প্রসর হওয়ায় উপরিভাগের ক্ষেত্র (Surface) তিনহস্তের অধিক প্রশস্ত হইবে না। প্রাচীরের কোন কোন স্থান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ত, এবং প্রাচীরভাগ ছাড়িয়া বাহিরের কিয়ৎস্থল অধিকার করিয়া আছে। এইগুলির উপরিভাগ ঠিক সমকোণ চতুর্ভুজাকৃতি চত্বরসদৃশ। এইগুলি কি উদ্দেশ্য সাধন করিত? হয়ত এই সকল স্থানে নহবৎখানা কিম্বা প্রাচীর-রক্ষক প্রহরিগণের বিশ্রামাগার অবস্থিত ছিল। দুর্গাভ্যন্তর হইতে বহির্গমনের একটিমাত্র পথ ছিল; সেটি উত্তরদিকে অবস্থিত; আমরা দক্ষিণদিকস্থিত প্রাচীরে উঠিয়াছিলাম; কাজেই আমাদের সেই দুর্গদ্বার দেখা হয় নাই।

পরিখার খাতে কয়েকজন লোক মাছ ধরিতেছিল। তাহারা বলিল যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জীবনেই দেখিয়াছে) এই প্রাচীর এত উচ্চ ও সোজা ছিল যে, লোকে তদুপরি অতিকষ্টে আরোহণ করিতে পারিত। কেহ যেন মনে না করেন যে প্রাকারগুলি বাস্তবিকই চিরকাল মৃণ্ময় ছিল। হরিপ্রসাদ যোগীর পুত্রের নিকট ও পূর্ব্বোক্ত কৃষকগণের নিকট শুনিলাম যে, এগুলি পূর্ব্বে সমস্তই ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যখন উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত হইতেছিল, তখন রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি এই ভগ্ন দুর্গের ইষ্টকরাশির উপর পতিত হয়; আর সহস্র বর্ষের স্মৃতিবিজড়িত যে ইষ্টকগুলি এত দিন কালের অত্যাচার সহ্য করিয়াও আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছিল, সেগুলি এইরূপ সামান্য কারণে স্থানান্তরে নীত ও লুপ্ত হইল, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। এখনও স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত দুই চারিটা ইষ্টক মৃত্তিকাগাত্রে প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একখানি

ইষ্টক অতি যত্নে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি। শুনিলাম, ময়নামতীর গড়ও ঐ সময় নষ্ট করা হয়।

সেই দিগন্তবিস্তৃত নানাসুখদুঃখস্মৃতিবিজড়িত অতীত গৌরবের নিদর্শন-স্বরূপ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাকারোপরি দণ্ডায়মান হইয়া, কল্পনালোকে সুদূর অতীতের কুহেলিকা ক্ষণেকের তরে সরাইয়া দিয়া, আপনাকে সেই বিলুপ্ত রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া মনে করিলাম। ভাবিলাম 'কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে' এই পরিখা-প্রাকার-বেষ্টিত সুরক্ষিত রাজপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল? একদিন এইখানে গজবাজি-সমন্বিত সৈন্যগণের কোলাহল দশদিক্ মুখরিত করিয়া নগরবাসীদিগকে গর্ব্বিত করিয়া তুলিত। কতদিন এই দুর্গ হইতে সশস্ত্র সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইয়াছে, আবার যুদ্ধাবসানে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে! কিন্তু হায়!

"আজি হেথা নাহি ধ্বজা, নাহি সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল,
হর হর হর।"

সমস্তই কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছে। সূর্য্যদেব কোন্ সময় অলক্ষিতে অস্ত গিয়াছিলেন দেখিতে পাই নাই। দূরে দিগ্‌বলয়-প্রান্তে বৃক্ষরাজির নীলরেখা অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। আমরা একটা অজ্ঞাত বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রাচীর হইতে অবতরণ করিলাম; এবং পুনরায় গোশকটারোহণপূর্ব্বক ষ্টেষণের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

সেদিন বাসন্তী পূর্ণিমার পরদিন। নিশাগমের অনতিকাল পরেই 'চন্দ্রমা উদয়' হইল, এবং 'কৌমুদীরাশি'তে ধরাতল ধৌত হইতে লাগিল। যখন ময়নামতী গড়-সন্নিহিত হইলাম, তখন রাত্রি প্রায় সাতটা সেখানে গড়দর্শনার্থ নামিলে যথাসময়ে ট্রেণ ধরিতে পারিব না এবং তাহা হইলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনেক রাত্রি হইবে, এই আশঙ্কায় আর কালবিলম্ব না করিয়া ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রবন্ধান্তরে এই দুর্গ-সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। দুইটি অনুমান করিয়াছি মাত্র; কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। একটি অনুমান এই যে, পালরাজ ধর্ম্মপাল সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হইলেও কামরূপ রাজ্য স্থায়ীরূপে অধিকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং পূর্ব্বে কামরূপ ও উত্তরে ভূটান, সিকিম প্রভৃতি স্থানের শত্রুগণের আক্রমণ হইতে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ দুর্গটি নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে পারেন। আর দুর্গটির অবস্থানও এইরূপ অনুমানের অনুকূল। কিন্তু এই ধর্ম্মপালের গড়ের সহিত ময়নামতীর নাম সংসৃষ্ট। আর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ময়নামতীর আবির্ভাব-কাল দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে নহে। কিন্তু পালরাজ ধর্ম্মপাল অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাজেই দশম শতাব্দীই ময়নাবতীর আবির্ভাবকাল মানিয়া লইলে, এই দুর্গ পালবংশীয় ধর্ম্মপাল ব্যতীত তন্নামধেয় অন্য কোন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল নামক উত্তর বঙ্গের এইরূপ একজন রাজার উল্লেখও পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

শূন্যতত্ত্ব।

অঙ্কশাস্ত্রে শূন্যতত্ত্ব সকলের আগে। যদি শূন্য না থাকিত, তবে হয়ত অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতি হওয়াই অসম্ভব হইত। শূন্যের ন্যায় অদ্ভুত সংখ্যা বিরাট অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে আর একটিও নাই। নিজের কোন মূল্য নাই, কিন্তু যখনই কাহারও পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার মূল্য দশগুণ বাড়িয়া যায়। এইরূপে পরের পিঠে চড়িয়া শূন্য কত জটিল প্রশ্নের সমাধান করে,—সমস্ত অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতি তাহারই উপর নির্ভর করে।

সেদিন এই শূন্যতত্ত্বসম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম। দেখিলাম; এই শূন্যতত্ত্ব কেবল অঙ্কশাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মনুষ্যসমাজেও ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি লক্ষিত হয়। একবার বিপুল জনসঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সেই জনসংঘের প্রত্যেক মানব এক একটি মহাশূন্য। তাহার নিজের কোন

মূল্য নাই। তাহাকে জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু একবার তাহাকে কার্য্যের পশ্চাতে জুড়িয়া দাও, তাহার মূল্য দশগুণ বর্দ্ধিত হইবে, তাহার ব্যক্তিত্ব বুঝিতে আমাদিগের কোন কষ্ট হইবে না। এই সমস্ত মানব-মহাশূন্যকে কর্ম্মের পশ্চাতে বসাইয়া কত রাজ্যের উত্থান-পতন, কত দেশের উন্নতি-অবনতিবিষয়ক বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে; তাহার ইয়ত্তা নাই।

সৃষ্টিপতি কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে বসিয়া এই সব শূন্য দিয়া জগতের ইতিহাসে যুগযুগান্তর ধরিয়া অঙ্ক কষিতেছেন। ধন, সুখ, স্বার্থত্যাগ, প্রেম, আত্ম-বলিদান প্রভৃতি সংখ্যাগুলির পশ্চাতে এক একটা জাতিকে বসাইয়া, তিনি অঙ্কশাস্ত্রের জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন। ফলাফল নিত্যকাল ধরিয়া জগতের ইতিহাসে লিখিত হইতেছে। একদিন তিনি প্রেমের পশ্চাতে ভারতের নরনারীকে বসাইয়া, অঙ্ক কষিতে কষিতে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ ফল বাহির করিয়াছিলেন। সেদিন জগতের পক্ষে এক নূতন দিন। সেদিন অকস্মাৎ আসমুদ্র-হিমাচল অহিংসামন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিল; ঘাতকের উদ্যত খড়্গ হস্ত হইতে স্খলিত হইল, ভারতে পশুরক্তনদী কোন্ মন্ত্রবলে শুকাইয়া গেল।

বিধাতা আজ আবার এক নূতন অঙ্ক কষিতে বসিয়াছেন। সুখের পশ্চাতে প্রত্যেক নরনারীকে বসাইয়া, স্বার্থ ও ধনের দ্বারা গুণ করিতে করিতে যে সমষ্টির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে অসংখ্য কারখানা প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপ বিরোধের শাণিত অস্ত্র লইয়া পুঞ্জীভূত ধূমরাশির মধ্যে দেখা দিয়াছে। সেই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশির পশ্চাতে কি উত্তর প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা এক লীলাময়ই বলিতে পারেন। কিন্তু আজ শিল্পিকুলের স্বেদক্ষরিত অবসন্ন দেহ ও অসংখ্য নরনারীর সুখোন্মত্ততা দেখিয়া য়ুরোপের অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা একটা চীৎকার তুলিয়াছেন, ধন ও স্বার্থ-গুণিত গুণফলকে শীঘ্র প্রেম ও আত্মবলির দ্বারা ভাগ করিয়া লও, নতুবা যে উত্তর বাহির হইবে,—তাহার অর্থ সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস। এই যে য়ুরোপের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিরাট সভ্যতা দেখিয়া আমরা ভুলিয়াছি, ইহার মূলমন্ত্র বিরোধ; সুতরাং ইহার মূলেই যে ছিদ্র আছে, তাহার মধ্য দিয়া যে দিন শনি প্রবেশ করিবে, সেদিন আপনার স্বার্থের জন্য ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, জাতির সহিত জাতির এক মহাসংগ্রাম ঘটিবে। সেদিন পৃথিবীর ইতিহাসে কুরুক্ষেত্র,—কাহারও নিস্তার থাকিবে না। কিন্তু বিধাতার অঙ্গুলিতাড়নে সকলেই

বিক্ষিপ্ত, সে কথায় কর্ণপাত করিবার কাহারও শক্তি নাই। ভারতও আজ সেই য়ুরোপীয় আদর্শের পশ্চাতেই ছুটিয়াছে। আজ ভারতকে য়ুরোপের অনুকরণে গড়িয়া তুলাই ভারতবাসী তাহার চরম বলিয়া বুঝিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটা কার্য্যের পশ্চাতে মানুষকে জুড়িয়া না দেখিলে, তাহাকে আর কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই। তাহার যতটুকু কার্য্যকারিণী শক্তির পরিচয় আমরা পাই, তাহার দ্বারাই আমরা তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি। কার্য্যের মধ্য দিয়া যাহার যতটুকু অভিব্যক্তি, আমরা ততটুকুই তাহাকে পাই, ততটুকুই তাহাকে যথার্থ জানি। "An author is but revealed in his works"-কথাটা যিনি বলিয়াছেন তিনি এটাকে আরও বিস্তৃতভাবে মানবসমাজের উপযোগী করিয়া বলিতে পারিতেন। কার্য্যের ভিতর দিয়া না বুঝিলে মানুষকে বুঝিবার আর উপায় নাই। যদি সাজাহানের দাম্পত্যপ্রেম বুঝিতে চাও, তবে ঐ যে মর্ম্মরপ্রাসাদ ধরণীর বক্ষভেদ করিয়া উঠিয়াছে, সাজাহানের অতুলকীর্ত্তি, প্রেম ও সহানুভূতির নিদর্শন সেই তাজমহলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাঁহার হৃদয় কত গভীর ছিল বুঝিতে পারিবে। কোন বিশিষ্ট কার্য্য ব্যতীত মনুষ্যজীবনের পৃথক্ কোন মূল্য নাই। যে জীবনকে আমরা মূল্যহীন অসার মনে করি, তাহাকে একটা কার্য্যের সহিত জুড়িয়া দাও, তাহার মূল্য দশগুণ বর্দ্ধিত হইবে; তাহার স্মৃতি সমগ্র মানবমণ্ডলীর পক্ষে হয় বেদনাজনিত অশ্রুর, না হয় আনন্দের কারণ হইবে।

ভারতে আজ কার্য্যের ক্ষেত্র প্রশস্ত নয়। অল্প পরিধির মধ্যে অসংখ্য প্রাণী কীটের ন্যায় 'কিলিবিলি' করিতেছে। তাই আজ ভারত এত ছোট। ভারতের লোকেরা জগতের সমক্ষে তাই এত ক্ষুদ্র, এত হেয়, এত অপদার্থ। একদিন ভারতে যখন কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত ছিল, তখন কত শাক্য, কত নানক, এই স্থবিরা জননীর উদরে জন্মলাভ করিয়া জ্ঞানে, ধর্ম্মে, শিক্ষায় দেশবাসীকে উন্নত করিয়াছেন। তখন তাঁহাদের জীবন কত উন্নত ছিল। আজ যদি আবার ভারতবাসী তাহার যোগ্য কর্ম্মের পশ্চাতে আপনাকে জুড়িয়া দিতে না পারে, তবে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় এক 'কেরাণী'-বহুল জাতি শুধু পরের জন্য লেখনী-ধারণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগতে একটা বিদ্রূপের ইতিহাস রাখিয়া যাইবে।

শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ভাগবত-পাঠ।

১

"মা! ও মা!"

"কি বল্‌ছ?"

"আমিও শুন্‌তে যাব!"

"ওঁকে জিজ্ঞেস্ করি।"

"হাঁ, বাবাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লেই বল্‌বেন,—'ও ছেলে মানুষ কোথা যাবে'। আমি কিন্তু বাপু তা' শুন্‌ব না। আমি কি এখনও সত্যি ছেলে মানুষ আছি। ২৫।৩০ বছর বয়স হ'য়ে গেল।"

"নে বকিস্ নে! পঞ্চাশ বছরের বুড়ী হয়েছিস্!"

"তা যাই বল'—আমি নিশ্চয়ই যাব কিন্তু।"

মাতঙ্গিনী তাহার পিতা-মাতার বড়ই আদরের মেয়ে। তাহার বয়স ত্রিশ বৎসর না হউক, সাতাইশ বৎসর হইয়াছে। একটি দুই বৎসরের শিশু পুত্র লইয়া বিশ বৎসর বয়সে মাতঙ্গিনী বিধবা হইয়াছে। সে পিতা-মাতার এক মাত্র সন্তান,—এজন্য শ্বশুর-ঘর করা তাহার তেমন অভ্যাস ছিল না। বিবাহের পর, দিন কয়েকের জন্য একবারমাত্র সে স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে বাস করিয়াছিল, তাহারই পর মাতঙ্গিনীর পিতা-মাতা জামাতাকে বেশ একটু বশীভূত করিয়া লইয়াছিলেন ও আপনাদের কাছে রাখিয়াছিলেন। সাত বৎসর হইল,—জামাতা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, কন্যা ও দৌহিত্র লইয়া সুখে দুঃখে দিনপাত করিয়া থাকেন। অত আদরের একমাত্র কন্যা আজ ভাগবত-পাঠ শুনিতে যাইবার জন্য আব্দার ধরিয়াছে, অবশ্য কন্যা আব্দার ধরিলে যদিও তাহা বড় একটা অপূর্ণ থাকে না; তবুও কিন্তু বৃদ্ধ সময়ে সময়ে কিছু কড়া মেজাজের ও একগুঁয়ে রকমের হইয়া পড়ে'

২

পাড়ার ঘোষেদের বাটী ভাগবত-পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীর প্রায় সকল-বিধবাই প্রণামী-স্বরূপ সিকি অথবা আধুলি লইয়া কেহ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া, কেহ বা কপালখানি ঢাকিয়া, কেহ বা নাকে কাপড় দিয়া দলে দলে চলিয়াছেন। অবশ্য চলিবার সময়ে তাঁহাদের চরণদ্বয় কার্য্য করিতেছিল বলিয়া বাক্‌যন্ত্র নীরব

ছিল না। বরং নানা সুরে, নানা স্বরভঙ্গীতে সন্ধ্যার সময়টা রাজপথ কতকটা গুলজার হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ বলিতেছেন, "দেখ ভাই বামুন দিদি, আর ত পারিনে বোন্! পোড়ারমুখী বউটা যদি গতর একটু নড়াবে! সেই উদয়-অস্ত চরকার মত কি ঘোরা যায় বোন্! বল'ত! তা আবার কিছু বল্‌বার যোটি নেই! যদি বলি ত দাদা অমনি রুকে উঠে হিন্দী করে বল্‌বেন, 'না পার তো নিকাল যাও!" আমারও তো আর মরণ নেই! জানিনে আরও কত কাল এমনি ক'রে ভুগ্‌ব!"

কেহ বলিতেছেন, "সেই বলে না কাল এল নেড়ী, আস্তা ভাঙ্গলে ক্ষুদের হাঁড়ী। আমার ওপর কিনা উনি টেক্কা দিতে যান! আ মরণ আর কি! বেটার বউ। পোড়া কপাল! পেটের সন্তানেই সব কল্লে—তা' বেটার বউ আবার আমার কর্‌বে!"

কেহ বা বলিতেছেন, "আর বোন্, সত্যি বল্‌তে কি,—ভাগবত শুন্‌তে কি আসি, এই তোমাদের দশজনের কাছে দশটা কথা কইলে তবু প্রাণটা যেন কতকটা হাল্কা হয়। আমরা অধর্ম্মী, পাপী মনিষ্যি। কি জান বোন্, এই শোকে তাপের শরীল কিনা।"

"আহা তা' আবার বল্‌তে দিদি।"

বলা বাহুল্য, এইরূপ শ্রোতার সংখ্যাই অধিক। তবে ইহাদের সঙ্গে যে অল্পবয়স্কা রমণীও নীরবে যাইতেছিল না, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কারণ মাতঙ্গিনীও এই দিন কয়েক হইতে ভাগবত-পাঠ শুনিতে চলিয়াছে। অবশ্য, অনেক মাতঙ্গিনীই এইরূপ গিয়া থাকে। ইহাতে যে দোষের কিছু আছে, এমত কথা বলিবার আমরা বিন্দুমাত্রও স্পর্দ্ধা রাখি না।

৩

গোস্বামী মথুরা মোহনের বয়স প্রায় ৩৬।৩৭ হইয়াছে। গোঁসাই ঠাকুর দেখিতে বেশ সুপুরুষ না হইলেও তাঁহার ভক্ত মহিলারা কেহ কেহ বলিতেন, "আহা কি রূপ, ঠিক যেন গোপাল।" জানি না যশোদা-দুলাল গোপাল ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সে দেখিতে কিরূপ ছিলেন; তবে গোঁসাই ঠাকুরের রূপের পরিচয় আমরাও কতকটা দিতে পারি। পাঠক মহাশয় সেই ব্রজের গোপালের সঙ্গে ইঁহার তুলনা করিয়া লইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

গোঁসাই ঠাকুরের বয়স ছত্রিশ হইলে কি হয়, আতপ তণ্ডুল ও গব্য-রসের অত্যধিক সেবায় তাঁহার উদরের পরিধি যেন কিছু জোর করিয়া বাড়িতেছিল। তদুপরি ঠাকুর নিয়ত কৃষ্ণ-প্রেমে বিহ্বল হইয়া থাকায় কটিদেশের বসনগ্রন্থিও দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। ঠাকুরের অপরাধ কি? গব্য-রসের সহিত কৃষ্ণ-প্রেমের ঘন ঘন সম্মিলনে যাহা হইবার তাহাই হইতে লাগিল—অনতিদূর হইতে ঠাকুর মহাশয়ের বদন-চন্দ্রিমা দেখিবার অভিলাষ করিলে, ঠাকুরের উদর সর্ব্বাগ্রেই দেখা দিত! শুনিয়াছি, ইহাই নাকি এমন কাজের মাহাত্ম্য!

যাহাই হউক, ঠাকুরের দৈহিকবর্ণের পরিচয় দিতে হইলে বিশেষ বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন হইবে না। 'কাক কাল,' 'কোকিল কাল,' 'গদাধরের পিসি কাল,'—তদুপরি আরও একটু ঘন কৃষ্ণবর্ণের যোগ করিয়া একটা বিশাল উদরের কল্পনা করিয়া লও এবং তাহার উত্তরদেশে নাসা, চক্ষু ও মুখ-গহ্বর-যুক্ত একটা বৃহৎ শালগ্রাম শিলার ধ্যান করিতে থাক, দেখিবে তোমার সম্মুখে ঠাকুর মথুরামোহন গোস্বামী রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের গভীর নেশায় ঢুলুঢুলু ভাবে ও আলুথালু বেশে বিরাজমান। ঠাকুরের সেই মুণ্ডিত মস্তকের শীর্ষদেশে বেশ একগোছ কুচ্‌কুচে কাল শিখা দুলিত,—অবশ্য সেই শিখারূপ বোঁটায় যে গোটাকয়েক বেল, মল্লিকা না থাকিত, এমন কথা বলিয়া আজকালকার ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামির গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারি না! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়; কবি যে গাইয়াছেন, "শুধু রূপে কি করে?" কোকিলের মত আমাদের গোঁসাই ঠাকুরও কোকিলকণ্ঠ!

গোঁসাই ঠাকুর বেশ আসর জমাইয়া সুর-সংযোগে পড়িতে লাগিলেন, "অগ্রহায়ণ মাস সমুপস্থিত হইলে নন্দব্রজবাসিনী যাবতীয় কুমারী হবিষ্য-ভোজিনী হইয়া, সর্ব্বশক্তিশালিনী কাত্যায়নীর পূজাব্রতে প্রবৃত্ত হইল।" পরে তিনি ইহার টীকা করিলেন, "আহা! ব্রজবাসিনী যাবতীয় কুমারী কৃষ্ণ প্রেম লাগি! —হরি হরি বল!"

কোনও রমণী সেই সময় হাই তুলিতেছিলেন, কাজেই তাঁহাকে তুড়ী দিতে দিতে বলিতে হইল, "হ-ই হ-ই বর!"

ঠাকুর মশায় এবার সপ্তমে সুর তুলিয়া আরম্ভ করিলেন, "একদা সেই ব্রজ-বাসিনী যাবতীয় কুমারী নদীতীরে উপনীত হইয়া, অন্যান্য দিনের ন্যায় স্ব স্ব বসন তথায় স্থাপন করিল এবং প্রীতিপ্রফুল্ল উৎসুক হৃদয়ে হৃদয়হারী বাসুদেবের

অসীম গুণরাশি গান করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সলিলে অবতীর্ণ হইয়া, নানা প্রকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ভগবান হরি তাহাদের এই আন্তরিক ভাব অবগত হইয়াছিলেন। তদনন্তর তথায় উপনীত হইয়া তাহাদের বসন হরণ পূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে সন্নিকৃষ্ট কদম্বতরুশিখরে আরোহণ করিলেন।" "আহা এ যে বাঁকা শ্যামের লীলা!"—টীকা হইল।

"কত নয়নভঙ্গী করিয়া তিনি হাস্যোল্লসিত সুমধুর বাক্যে পরিহাস পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, 'হে নিতম্বিনীগণ! হে ভাবিনীগণ! তোমরা একে একে অথবা সকলে মিলিয়া আগমন পূর্ব্বক বসন গ্রহণ কর'।"

"এদিকে ব্রজকুমারীদিগের অন্তঃকরণ একেবারে প্রেমরসের অপার সাগরে অবগাহন করিল। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া অনবরত হাস্য করিতে লাগিল।" গোসাই ঠাকুর টীকা করিলেন, "আহা সে যে কি হাসি বুঝা'ব কেমনে? চতুর হরি সকলেই বুঝিলেন।"

"আহা! কাছে না আসিলে পরে,
বসন কি দেয় গো তারে—
সে যে প্রেমের হরি!" – টীকার উপর টিপ্পনী!

রাত্রি ১১টা বাজিল, পাঠ আজিকার মত বন্ধ হইল। রমণীগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিল ও একে একে বিদায় হইল। কিন্তু শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ ভক্তিরসে বিষমরূপে আপ্লুত হইয়া ঠাকুরের চরণরেণু লইবার জন্য কিছু অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঠাকুর যেন আর গোপাল-অবতার!

৪

"একি মাতু! তোর এত রাত্তির হ'ল? পাড়ার ওরা সব কখন্ এসেছে।"

"ভাঙ্‌বে তবে ত আস্‌ব। আমরা ত একসঙ্গেই এলাম। বাবা! যে ভিড়—বের হয় কার সাধ্যি!"

"বের হতে এক ঘণ্টা লাগ্‌ল? কত বেজেছে জানিস্—রাত্তির প্রায় সাড়ে বারটা। উনি রাগ কচ্ছিলেন, বল্‌ছিলেন মাতু এত রাত্তির অবধি যে অন্য জায়গায় ভাগবত শুন্‌বে, সে বয়স ওর হয়নি!"

"না; মাতু এখনও খুকী আছে! শুনেও গা জ্বালা করে! আর ঐ ত একটা বুড়ীর সঙ্গেই গিয়েছিলাম; আমি তো আর কিছু একা যাই নাই।"

বৃদ্ধা ঝি হরিদাসী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "তা দিদিমণি, মা আর কি করে বুঝ্‌বেন বল; উনি ত আর দেখ্‌লেন না।" পরে দুই কর প্রসারিত করিয়া বলিল, "কি বল্‌ব মা, এই রঙ্গের লোক জমেছিল। আর ঠাকুর কি ঘটই কর্‌লেন! আহা-হা-হা!"

হরিদাসীর কথা সমাপ্ত না হইতেই মাতঙ্গিনী বলিল, "আমি কি কোথাও যাই? তবে প্রাণটা থেকে থেকে বড্ড কেমন হুহু করে উঠে, তাই এই ঠাকুর-দেবতার নাম একটু শুন্‌তে গিয়েছিলাম।"

মাতঙ্গিনীর চোক দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল।

মাতঙ্গিনীর মাতা ইহা লক্ষ্য করিলেন। মাতার হৃদয় অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার দুই ফোঁটা অশ্রুতে গলিয়া গেল। একমাত্র দুহিতা মাতঙ্গিনীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তা কি আর বুঝিনে মা! কি কর্‌ব বল! কি পোড়া অদৃষ্ট নিয়ে যে এসেছিলাম, তাও জানিনে! একটা মেয়ে নিয়ে সংসার, তার কপালও এমন হ'ল! ছি ছি—এমন অদৃষ্টে ধিক!"

"কি জান মা, চারি দিকে সব জ্ঞাতি শত্রু, কে কোন্ দিন কি বল্‌বে? উনি বলেন, তা কি সহ্য হ'বে? তার চেয়ে নিজেদের সাবধান হওয়াই ভাল। তোমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠাইনে, তাতেই যার কত কথা উঠে!"

মাতৃস্নেহে সঞ্জীবিত মাতঙ্গিনী এবার একটু বল পাইল এবং চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিল, "ওদের কথা আবার মানুষে গ্রাহ্যি করে! ওরা কি না বলে! ওদের গুণের কথা বল্‌তে গেলে যে মহাভারত হয়ে যায়!"

"থাক্ মা থাক্! আবার শুন্‌তে টুন্‌তে পাবে। রাত ঢের হ'য়েছে, তুমি শোও গে। খোকার কাছে আমি এতক্ষণ ছিলাম, সে এখন একা রয়েছে। ছেলের গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, কি জ্বরটাই হয়েছে। ও আবার বাঁচ্‌বে কিনা তাও জানিনে! যাও মা, শোও গে!"

(৫)

গভীর রজনীতে মাতঙ্গিনী শয্যা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু তাহার নিদ্রা হইল না। একবার উঠিয়া সেই নিদ্রিত নবম বৎসরের বালকের মুখখানি দেখিল, ভাবিল, 'সত্যিই যদি এ না বাঁচে।' তখনই পুত্রের মুখচুম্বন ও মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ভগবানের নিকট তাহার কল্যাণকামনা করিয়া চিন্তাস্রোত ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কখনও বা উঠিয়া কক্ষমধ্যে পায়চারি করিতে থাকে, কখনও বা মৃত স্বামীর চিত্রের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহে। মাতঙ্গিনীর হৃদয়ে আজ কেমন একটা অশান্তির তুফান উঠিয়াছে। সে আপনাকে সংযত করিবার শত চেষ্টা করিয়াও আজ বিফলমনোরথ হইতেছে। তাহার মুখমণ্ডলে গভীর

বিষাদের একটা ছায়া পড়িলেও সে যেন কি এক দুরূহ কার্য্যপালনের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিল।

ইতিমধ্যে বাহির হইতে দ্বারে মৃদু আঘাত হইল। মাতঙ্গিনী সহসা নিশ্চল হইয়া কি ভাবিল। আবার মৃদু আঘাত—এবার ধীরে ধীরে দ্বার খুলিবামাত্র এক অবগুণ্ঠনবতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মাতঙ্গিনী স্থির অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "যাও, তুমি এখনি চলিয়া যাও! আমি ভুল করিয়াছি—তুমি দূর হও!"

"সে কি! এমন কি অপরাধ—"

মাতঙ্গিনী বাধা দিয়া বলিল, "অপরাধ আমার—তোমার নয়। তুমি শীঘ্র দূর হও।"

তাহাদের কথায় বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; বিস্ময়ের সহিত কহিল, "ওকে মা?"

মাতঙ্গিনী পূর্ব্ববৎ স্থির অথচ অবিচলিতকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর মশায়।"

বালক অস্ফুটস্বরে কহিল, "এত রাত্তিরে ঠাকুর মশায় কেন!"

ঠাকুর মশায় দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মাতঙ্গিনী দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল, আজ এ কি করিলাম! মুহূর্ত্তের হঠকারিতায় এমন পদস্খলন হইল! দেহ কলঙ্কিত হয় নাই কিন্তু মন! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু—মৃত্যু ব্যতীত উপায় নাই! পরক্ষণেই ভাবিল, মৃত্যুতে ত শান্তি—প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? শাস্তিভোগ করিব! হে প্রভো! হে স্বামিন্! কঠিন বজ্রাঘাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দাও—আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে যেন মরিতে পারি! ছি ছি! সন্তানের সম্মুখে কলঙ্কিনী হইলাম! ভাবিতে ভাবিতে মাতঙ্গিনী নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িল; স্বপ্নে দেখিল, অতি বিষণ্ণ মুখে এক বালক ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। মাতঙ্গিনী স্বপ্নাবস্থায় তাহাকে ধরিবার জন্য যেমন বাহু প্রসারিত করিয়াছে—অমনই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিল, বেলা অনেক হইয়াছে। বাহির হইতে মাতা ডাকিতেছেন, "মাতু ওঠ্! বেলা যে আটটা বেজে গেল!"

* * * *

বালক শয্যা হইতে তখনও উঠে নাই। সেই রাত্রি হইতে তাহার জ্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাতঙ্গিনী উন্মাদিনীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; পুত্রের কাছে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া! তাহার হৃদয়মধ্যে আজ যে অন্তর্দাহ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নির্ব্বাণ কি এ জীবনে হইবে!

সন্ধ্যার সময়ে বালক প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। রজনী দ্বিপ্রহরের সময় মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বালক শেষ কথা কহিল, "এত রাত্তিরে ঠাকুর মশায় কেন!"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।